মানুষের ঘরবাড়ি

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ

জুন ১৯৭০

প্রকাশক

বামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী

১৮এ, টেমার লেন

কলকাতা-৯

মুদ্রাকর

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

করুণা প্রিণ্টার্স

১৩৮ বিধান সরণী

কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী

গৌতম রায়

অমিতাভ চৌধুরী

অকৃত্রিম অগ্রজপ্রতিমেষু

প্রথম পর্ব

॥ এক ॥

এদেশে এসেই আমার বাবা খুব গরীব হয়ে গেলেন। হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছিলাম, দেশে থাকতে আমরা এতটা গরীব ছিলাম না। বাবা মা আমাদের ক ভাই বোন সম্বল করে এদেশে পাড়ি জমালেন সত্য, কিন্তু থিতু হয়ে তাঁরা বসতে পারছিলেন না। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়—কখনো কোনো প্ল্যাটফরমে অথবা ভাঙা মন্দিরে, পরিত্যক্ত কারো আবাসে থাকতে থাকতে কিছুটা যাযাবরের মতো জীবন বয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত একটা গভীর বনের ভেতর বাবা তার সঠিক আস্তানা খুঁজে বের করলেন।

আমাদের কাজ ছিল সকাল হলে জমির জঙ্গল কাটা, আগাছা সাফ করা। মানুষের নতুন ঘরবাড়ি যেমনটা হয়ে থাকে। অথবা সেই প্রাচীনকালের মতো, কোথাও জল এবং জমিতে উর্বরা শক্তি থাকলেই যেমন জনপদ গড়ে উঠত আমরাও তেমন একটা জনপদের আদি বাসিন্দার মতো জায়গাটাতে এসে উঠেছিলাম।

দু বছর নানা জায়গায় ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত এমন একটা জায়গায় এসে থিতু হয়ে বসার আশায় বাবা খুব খুশী। বাবা বলতেন, জমি খুবই উর্বরা। রাজরাজড়ার পতিত জমি, নানা রকমের জীবজন্তুর বাস, এই সবই বোধ হয় জমিটার উর্বরা শক্তির উৎস। জমি খুব উর্বরা বলতে বাবা বোধ হয় এ-সবই বোঝাতে চাইতেন। বাবা খুব খুশী থাকলে মাঝে মাঝে বলতেন, দু ক্রোশ হেঁটে গেলে শহর, আড়াই ক্রোশের মাথায় একটা কাপড়ের মিল, বড় মাঠ পার হয়ে গেলে পুলিস ব্যারাক, জলের অভাব নেই, খাবারের অভাবও হবে না।

এত বড় বনটা কতদূর কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে কিছু বোঝার উপায় নেই। বনটার সামনে একটা বড় শস্যবিহীন মাঠ, তারপর দিঘির মতো কালো জল টল-টল করছে, একটা পুকুর এবং আমবাগান ছাড়িয়ে ব্যারাক বাড়ি। হেস্টিংসের আমলের জীর্ণ প্রাসাদ-সংলগ্ন সব ঘেড়া দেওয়া প্ল্যাটফরমের মতো লম্বা খুপরি ঘর।

জায়গাটা সম্পর্কে শেষ পর্যন্ত বাবার কতটা উৎসাহ থাকবে মা বুঝি টের পেত। সংশয় ছিল হয়তো আবার কোন নবর বাবার খবর পেয়ে বাবা উধাও হতে চাইবেন। জমিটার প্রশংসায় মা বেশি রা করত না। প্রায় সময় চুপচাপ শুনে যেত। কিছু বলত না। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারলে হয়।

হেস্টিংসের আমলের সেই পুরনো বাড়িটাতেই ছিল পুলিসের আরমারি। বিরাট গম্বুজয়ালা বাড়িটার সামনে মাঠ। সকালে বিউগিল বাজলে শ দুই রিক্রুট ফল-ইনে দাঁড়াত। তারপর পিটি প্যারেড আরম্ভ হয়ে যেত। মাঠের ভিতর রেলগাড়ির মতো সব লম্বা খুপরি ঘর, আমবাগানের ভেতর সেই কুঠিবাড়ি, পুকুরের টলটলে জল আর মানুষজনের সাড়াশব্দে বনটাকে বাবার কাছে মানুষের আবাসযোগ্য মনে হয়েছিল হয়তো। বাবা এখানেই শেষবারের মতো থিতু হয়ে বসতে চাইলেন।

বাবার কাছেই পরে জেনেছি এই বনভূমির পশ্চিমে রয়েছে কারবালার মাঠ। পুবে ব্যারাকবাড়ি এবং বাদশাহী সড়ক, উত্তরে রাজরাজড়ার পুরনো শ্যাওলা-ধরা প্রাসাদ। বাবা ঘুরে ঘুরে সব দেখে এসে খবর দিতেন। অথচ প্রথম দিন এখানে এসে বাবার কথায় মনে হয়েছিল আমাদের সবাইকে একটা গভীর বন দেখাতে নিয়ে এসেছেন।—এই যে বনটা দেখছ, এখানে আছে সব বিষধর সর্প। বাবার অভ্যাস গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তায় এলে সাধু ভাষার ব্যবহার।—বিষধর সর্প, একদা ব্যাঘ্র দেখা যেত। তরুলতা বলতে শাল, শিমুল। উত্তরে দক্ষিণে এর বিস্তার ক্রোশের ওপর। রাজরাজড়ার পতিত জমি বিনে পয়সায় বলতে গেলে মিলে গেল। উর্বরা জমিতে চাষাবাদ হলে তখন দেখবে এর চেহারা কত আলাদা।

বনটা ঘুরে দেখার সৌভাগ্য এখনও আমার কিংবা পিলুর হয় নি। শুধু বাবা বলেছেন, বনের শেষে আছে রাজবাড়ি। পিলখানা আছে একটা। হাতি বাঁধা থাকে। একদিন তোমাদের হাতি দেখাতে নিয়ে যাব।

দেশ ছেড়ে আসার পর এই নিয়ে বাবা চারবার জায়গা বদল করলেন। কিছুদিন এখানে বসবাস করতে করতে কি কখন মনে হবে বাবার, লোটা কম্বল গুটিয়ে ফের রওনা। তার আগেই রাজবাড়িটা দেখে আসতে হবে। অনেকদিন পর আবার হাতি দেখার এই মোকা। বাবার মাথায় দুর্বুদ্ধি গজাবার আগেই আমি এবং পিলু কাজটা সেরে ফেলব ভেবেছি।

আসলে আমাদের অন্নকষ্ট আরম্ভ হলেই বাবা এমন একটা পৃথিবী খুঁজে বেড়াতেন, যেখানে দু বেলা পেট পুরে আহার পাওয়া যায়—সদলবলে তার

খোঁজে তখন শুধু রওনা হওয়া। খোঁজখবর করবেন, দেশের লোক কে কোথায় এসে উঠেছে, কি ভাবে বেঁচে আছে। এবং কুপরামর্শ দেবার লোকের অভাব ছিল না। সেই জায়গাটাতে যাবার আগে যা কিছু অসুবিধা ঘটাত আমার মা। মাকে সহজে তিনি বাগে আনতে পারতেন না। মা বলত, এখানেই কোথাও কিছু জোটাতে পার কিনা ত্যাখো। ঘুরে ঘুরে আর পারছি না।

বাবার কৃতবিদ্যা বলতে যজনযাজন। এবং বাবা দেশ ছেড়ে আসার আগে জমিদার বাড়িতে আমলার কাজ করতেন। পুজো আর্চা করতেন। এখানে এসে তেমন একটা উপযুক্ত কাজের সন্ধানেই আছেন। যদি কোথাও পাওয়া যায়। একবার খবর এল গুপ্তিপাড়াতে সব বনেদী মানুষের বাস। সেখানে গেলে এমন একজন সৎ ব্রাহ্মণের কিছু একটা হয়ে যাবেই। গুপ্তিপাড়াতে আমরা একটা ভাঙা মন্দিরের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাবা খুব সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের মতো চলাফেরা করলেন কিছুদিন। ঘাটে স্নানের সময় শব্দই ব্রহ্ম—এমন জোরে জোরে স্তোত্র পাঠ করতেন যে মাঝে মাঝে মনে হত প্ল্যাটফরমে রেলগাড়ি পর্যন্ত থমকে দাঁড়িয়েছে। আর নড়তে পারছে না।

বাবার বোধ হয় আশা ছিল, ঠিক খবর পৌঁছে যাবে ঘরে ঘরে—লাইনবন্দি হয়ে আসবে মানুষজন। যাবতীয় পূজা পার্বণে ডাক পড়বে মানুষটার। এমনই বোধহয় সব মনে হত তাঁর। অথচ গাড়ি যায় ট্রেন আসে। বাবুদের সব কাজ কাম হয়ে যায়, ভাঙা মন্দিরে সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে। বাবা তারপর রেগে-মেগে কোথায় চলে যায়। আহার আমাদের কমে আসে। মন্দিরের চাতালে আমরা উপোসী মানুষ, কখন বাবা আসবে এবং না বলে না কয়ে তিনি কোথায় যে চলে যেতেন! তারপর একদিন ফিরে এসেই যেন একেবারে সদরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখেছেন—ওঠো ওঠো। সব ম্লেচ্ছর বাস! মানুষ এখানে থাকে না। গলসীতে নবর বাবা আছে। সে তোমাদের নিয়ে যেতে বলেছে। গোপালদির বাবুরা ওখানে বিরাট খামার করেছে। নবর বাবা চালের আড়ত করেছে বর্ধমান শহরে। না খেয়ে আর মরতে হবে না। স্টেশনে নবর বাবার সঙ্গে ভাগ্যিস দেখা হয়ে গেল।

বাবার কথাবার্তা শুনে মনে হত চালের আড়তটা আসলে নবর বাবার নয়, আমার বাবার। আর অন্নকষ্ট থাকবে না। কেবল খাও আর খাও। সারাদিন—অহ সে কি স্বপ্ন! যখন তখন খেতে বসে যাব। বাবা কত সহজে সব কিছু নিজের বলে ভাবতে পারতেন। বলতেন, এত বড় আড়ত নবর বাবার—চার পাঁচটা পেটের সংস্থান হবে না সে কি হয়! এবং রওনা হবার আগে ধুমধাড়াক্কা লেগে

যেত। এটা নাও ওটা নাও। কিছু পড়ে থাকল না তো। স্নান আহার করার সবুর সইত না বাবার। রওনা হতে পারলেই হল।

পিলু আর আমার তখন কাজ ছিল স্টেশনে বসে দুর্লভ হাঁড়ি পাতিল, ভাঙা বাক্স, ছেঁড়া শীতলপাটি পাহারা দেওয়া। চারপাশের মানুষজনদের মনে হত চোর বাটপাড়। কে কি ভাবে ঠকিয়ে শীতলপাটি কিংবা ভাঙা বাক্সটা মাথায় করে ভাগবে কে জানে!

আর ট্রেনে সেই পকেটমার হইতে সাবধান—এমন সব বাক্য জোরে জোরে পড়তে আমাদের ভাল লাগত। আর তখন এই গাড়িতে কে পকেটমার নয় সেটা ঠিক করাই ছিল বড় দুরূহ কাজ। মনে হত সবাই পকেটমার। গাড়িতে সবাই সবাইকে বুঝি পকেটমার ভাবছে। আমাদের যা চেহারা এবং যা অবস্থা সহজেই সবাই পকেটমার ভেবে ফেলতে পারে। গাড়িতে উঠে ভয়ে আমরা দুই ভাই কাঁচুমাচু হয়ে বসে থাকতাম। কারণ আমার আর পিলুর যা পোশাক-আশাক ওতে অন্তত চোর বাটপাড় না ভাবুক, চোর বাটপাড়ের আণ্ডা বাচ্চা ভাবতে পারে।

মার মুখ তখন আরও করুণ। একে বিনা টিকিটের যাত্রী—তার ওপর ট্রেনের গায়ে ও-সব লেখা, মা বোধ হয় ভয়ে কেঁদেই ফেলবে। এত ভয় যে বাংকে না বসে নিচে বসে পড়েছে। বিনা টিকিটের যাত্রী—কখন কোথায় নামিয়ে দেবে—তার চেয়ে নিচে বসে থাকলে কেউ কিছু বলবে না। নিচে তো আর কেউ বসে না। কারো জায়গা দখল করেও মা বসে নেই। কিছুতেই কারো কোনো অসুবিধা হোক মা চাইত না। আমরাও পাশে গোল হয়ে লটবহরের মতো গাদা মেরে পড়ে থাকতাম। বাবার অবস্থা একেবারে অন্যরকমের। যেন সংকীর্তনের দল নিয়ে বের হয়েছেন। গাঁয়ে গঞ্জে ঈশ্বরের নাম দেবে তার আবার ভাড়া কি। এবং সহজেই এত ভাল মানুষ হয়ে যেতেন তখন যে আমার মা পর্যন্ত তাজ্জব বনে যেত।

আর আমার বাবা তখন এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারতেন না। কামরার জানলায় মুখ বাড়িয়ে কখনও কি দেখতেন। কখনও দরজায়। কোনো স্টেশনে প্ল্যাটফরমে নেমে ঘোরাঘুরি করতেন। যেন বাবার জমিদারি ওটা। কার কি বলার আছে! আর চেকারবাবুকে দেখলেই মুখটা ভয়ে সাদা হয়ে যেত। কিন্তু কাছে এলে একেবারে তিনি দু পাটি দাঁত বের করে হেসে ফেলতেন। বাবার হাসি দেখলেই বোধ হয় টের পেত নির্ঘাত রিফিউজি।

বাবা তখন সব সামলেসুমলে একেবারে অন্তরঙ্গ মানুষের মতো কথা-বার্তা আরম্ভ

করে দিয়েছেন চেকারবাবুর সঙ্গে। যত বাবাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করছে তত বাবা মনে যেন বেশি জোর পাচ্ছে। এবং সব সময় একটা লোককে স্যার স্যার করলে যা হয়, একসময় চেকারবাবুটি যথার্থই সহৃদয় হয়ে উঠতেন। আর যেই না সামান্য সহৃদয় হয়ে ওঠা, বাবার সেই প্রথম আপ্ত বাক্যটি মুখ ফসকে বের হয়ে আসত—স্যার আপনার দেশ ছিল কোথায়?

বাবার সাহস দেখে চেকারবাবুটি তার কাজকর্মের কথা ভুলে যেত। বোধ হয় বিরক্তও হতেন। আচ্ছা ফিচেল লোক তো। তোমার কি এত দরকার আমার দেশ বাড়ির খবরে।

আমরা নানা জায়গায় বাবার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে এই আপ্ত বাক্যটির মূল ভাবার্থ ততদিনে আবিষ্কার করে ফেলেছি। ঢাকা জেলার মানুষ আমরা। এতটা সগৌরবের জেলা বাংলাদেশে আর যেন একটাও নেই। বাবার অহংকারা ঢাকা জেলার লোক দেশবন্ধু, ঢাকা জেলার লোক বিজ্ঞানী জগদীশ বসু। আর সেই জেলার লোক বাবার ডাকসাইটে জমিদার দীনেশবাবু। এই তিন ব্যক্তি বাবাকে তার জেলা সম্পর্কে আমাদের এই দুঃসময়ে খুব অহংকারী করে রাখে মাঝে মাঝে। চেকারবাবুটাবুর সঙ্গে দেখা হলেই সেটা তাঁর যেন আরও বেশি করে মনে হয়।

বাবার বুঝি খুব ইচ্ছে হত, চেকারবাবু যদি ঢাকা জেলার লোক হন! ঢাকা জেলার লোক হলেই নিশ্চিন্ত। একই জেলার মানুষ, সুতরাং ভাই ব্রেদারের মতো। এবং সেই প্রথম আপ্তবাক্যটির পর বাবা আর কি বলবেন, তাও জানা থাকত। ঢাকা জেলার লোক হলেই বাবার পরের আপ্তবাক্যটি হচ্ছে, দীনেশ-বাবুকে চেনেন?

চেকারবাবু যদি জবাব না দিত তাতেও তাঁর কিছু আসত যেত না। ঠিক বাবা পরের তিন নম্বর আপ্তবাক্যটি উচ্চারণ করতেন, কি দেশ ছিল বলুন। কত বড় পাপ করলে সে দেশ ছেড়ে মানুষকে আসতে হয়। আমাদের আর কি থাকল। চেকারবাবুটি হয়তো তাঁর একটা কথাও শুনছে না। কিন্তু বাবার কথার কামাই নেই। চার নম্বর আপ্তবাক্যটি আবার বের হয়ে আসত।—দীনেশবাবুকে চেনেন না! ঢাকা জেলার লোক হয়ে তার নাম শোনেন নি। আমার তখন মনে হত, দীনেশবাবু হচ্ছে বাবার দেখা পৃথিবীতে সব চেয়ে সেরা মানুষ। সে মানুষটার নাম জানে না ঢাকা জেলাবাসী চেকারবাবু—কি তাজ্জব। লোকটা আসলে তখন ঢাকা জেলার কিনা বাবার সংশয় হত। তাঁর পাঁচ নম্বর আপ্ত বাক্যটি আর মুখ ফসকে বের হয়ে আসত না। কেমন দমে যেতেন একেবারে।

মুড়াপাড়া কত বড় গ্রাম—শীতলক্ষার পারে দীনেশবাবুর সেই প্রাসাদের মতো বাড়ি, দীনেশবাবুর নুন খায় নি ঢাকা জেলার মানুষ বাবার বিশ্বাস করতে কষ্ট হত। আর কি বৈভব। পূজাপার্বণে দোল-দুর্গোৎসবে তিনি ছিলেন সে বাড়ির প্রাণ। দীনেশবাবু এমন মানুষ, যাঁর পরিচয়ে আমার বাবার পরিচয় মিলে যাবে। এবং বাবার মুখ দেখলেই আমরা টের পেতাম, তাঁর ছ নম্বর এবং শেষ আপ্ত বাক্যটি এবারে বের হয়ে এল বলে, আমাদের এমন দিন ছিল না মশাই, যা দেখছেন বুঝছেন আমরা তা নই।

তখনই আমার মা নড়েচড়ে বসত। বাবার এই অসহায় উক্তি এতবার মা শুনেছে যে আর সহ্য করতে পারত না। বাবার এই দীন হীন উক্তি মাকে ভীষণ ক্ষুব্ধ করে তুলত। এবং তখনই মনে হত বাবার ডাক পড়বে এবার।—ন্যাখ তো বিলু লোকটার সঙ্গে তোদের সেনাপতি কি এত ব্যাজর ব্যাজর করছে।

আমি উঠে গিয়ে বলতাম, বাবা, তোমাকে ডাকছে।

কে ডাকছে, কেন ডাকছে বাবার সব জানা। বলতেন, যাচ্ছি যাচ্ছি। কিন্তু যতই তিনি চড়া গলায় কথা বলুন না কেন, তাঁর আর এক দণ্ড দেরি করার সাহস থাকত না। পৃথিবীতে এখন একমাত্র যাকে সমীহ করার সে হচ্ছে আমার মা। পাশে চলে এসে বলতেন, ডাকছ কেন!

—কি অত ব্যাজর ব্যাজর করছ।

বাবার রক্ত বোধ হয় গরম হয়ে যেত। এবং সেই এক কথা—আরে রণ-সাজে আছি। এখন কে কোথায় কি করে বসবে তার আমরা কতটুকু জানি। সবাইকে খুশী না রাখলে চলে!

রণ সাজে কথাটা বাবা খুব ইদানীং ব্যবহার করছেন। আর মাও বাবাকে সেই সুবাদে সেনাপতি আখ্যা দিয়েছে। এখন আর মা তোদের বাবা না বলে, বলে, তোদের সেনাপতি কোথায় গেল রে।

বাবা আবার লাফিয়ে কামরার দরজায় ছুটে গেলে মা বলত, ন্যাখ তোদের সেনাপতি কার সঙ্গে আবার পরামর্শ করতে গেল।

আমরা বুঝতে পারি মার ভয়টা কোথায়। এমন একটা যুদ্ধের ফ্রণ্টে বাবা বোধ হয় তাঁর স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে পারছেন না। মার ভয় সেই চেকারবাবুটির সঙ্গে পরামর্শ করে হয়তো সামনের স্টেশনেই নেমে পড়বে। নেমে পড়বে না নামিয়ে দেবে কে জানে। কোনো কিছু ঠিকঠাক নেই—কি যে হবে! কিছু বললেই রেগেমেগে বলবে, যুদ্ধক্ষেত্রে রণ-সাজে আছি। কখন কি হবে কিছু বলা যাবে না।

মার তখন আর কোনো উপায় থাকে না।—মতিভ্রংশ হয়েছে তোমার। মা খুব বেশি গালাগাল দিলে বাবাকে এমন সব নিষ্ঠুর কথা বলত।

মা কোনো উপায় না দেখে বলল, যা তো, কি বলছে শোন।

খুব সন্তর্পণে দরজার কাছে এগিয়ে গেলাম। ট্রেন তেমনি দ্রুত আমাদের নিয়ে কোথাও যাচ্ছে।

কাছে যেতেই বাবা বললেন, তোর মাকে বল সামনের স্টেশনে নামব। মার কাছে ফিরতে না ফিরতেই দেখলাম বাবাও ফিরে এসেছেন। সেই আমাদের হাঁড়ি পাতিল, শেতলপাটি, একটা পেতলের কলসি, বালতি দুটো এবং জীবন-ধারণের যা কিছু প্রয়োজন—কারণ আমাদের সঙ্গে এমন সব মহামূল্য সামগ্রী রয়েছে যে একটা ফেলে গেলে প্রচণ্ড সর্বনাশ হবে। বাবা গুনতে থাকলেন, আমি গুনে দেখলাম। পিলু টেনে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সব ঠিক নিয়েছে কিনা মা একবার গুনে দেখল—একটা শেষ পর্যন্ত কম পড়ে যাচ্ছে—কি গেল, খোঁজ খোঁজ —যা চোর বাটপাড়ের দেশ, কোনটা কে নিয়ে যাবে—খুঁজে পাওয়া গেল, একটা ছেঁড়া চটের বস্তা। বাবা মহাখুশী কিছুই খোয়া যায়নি দেখে। তাঁর ছেলেরা যে ভীষণ উপযুক্ত হয়ে উঠেছে ভেবে হয়তো গানই ধরে দিতেন—কিন্তু স্টেশনে ট্রেন তখন থেমে গেছে। বাবার আর গান গাওয়া হল না। হাঁকডাক শুরু করে দিলেন। যেন স্টেশনে নেমেই দেখতে পাবেন, নবর বাবা দাঁড়িয়ে আছে। বাবাকে মহামান্য মানুষের মতো স্টেশনে নিতে এসেছে নবর বাবা।

কেউ স্টেশনে ছিল না। বাবা স্টেশনে নেমেই খোঁজাখুঁজি করলেন। কোথায় নবর বাবা, কোথায় সেই গোপালদি বাবুদের খামার! যাত্রীরা চলে গেলে শুধু ফাঁকা প্ল্যাটফরম পড়ে থাকল। অথচ এমন একটা অচেনা নির্বান্ধব জায়গায় বাবা এতটুকু ঘাবড়ে গেলেন না। সন্ধ্যা হয়ে আসছিল, কোথায় আর অন্ধকারে খোঁজাখুঁজি হবে। স্টেশনেই থাকার মতো ব্যবস্থা হয়ে গেল। স্টেশনের কল থেকে জল নিয়ে এল বাবা। প্ল্যাটফরমের একপাশে ছোট মতো একটা সেডও আবিষ্কার করা গেল। সেডটা পাওয়ায় জায়গাটা ভালই মনে হচ্ছে। নবর বাবা কোথায় থাকে, নবর বাবা এবং তার উর্ধ্বতন পিতৃপুরুষের পরিচয় দিয়ে দু-একজনের কাছে খোঁজ খবরও নিলেন। সবাই বাবার কথাবার্তা শুনে মাথার কোনো গোলমাল আছে ভাবল। যত বললেন, নবর বাবা শ্রীশ পাল এখানে বাড়ি করেছে, বর্ধমানে চালের আড়ত আছে তার, তত তারা বুঝে শুনে গা ঢাকা দেওয়াই শ্রেয় মনে করল। কেউ আর দাঁড়ায় না। বাবার কথা শুনলেই পালায়। অন্ধকারে অদৃশ্য জনতার দিকে তখন বাবা হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন।

গোপালদির বাবুরা আছেন এখানে, কোনদিকটায়—তারও খোঁজখবর পাওয়া গেল না কিছু। বাবা কি বুঝে আর আমাদের কাছে আসতেও সাহস পাচ্ছিলেন না। ঠায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মার বোধ হয় মায়া হল। বলল, ডেকে আন।

ফিরে এসে খুব নম্র গলায় বাবা বললেন, ধনবৌ, আজকের মতো এখানেই রাত কাটাতে হবে দেখছি।

মার কোনো যেন এতে আর আপত্তি নেই। অথবা মার চোখমুখ দেখে বোঝা গেছিল, বিপত্তি বাড়বে বই কমবে না। শুধু বলল, শ্রীশ পাল এখানে কোথায় থাকে না জেনেই চলে এলে।

—সেই তো বর্ধমান স্টেশনে দেখা। সব বললাম। শুনে বলল, আমাদের দিকে চলে আসুন, বামুনের অভাবে পুজো পার্বণ সব ভুলে যাচ্ছি।

পিলু ইতিমধ্যে কিছু খড়কুটো সংগ্রহ করে ফেলেছে, ওর খাবার ঠিক না থাকলে মাথা গরম হয়ে যায়। বাবার ওপর ভরসা করে থাকতে সে বোধ হয় আর রাজী নয়। সে আর মায়া কিছু শুকনো প্যাকিং বাক্সের কাঠও নিয়ে এসেছে। মা তাড়াতাড়ি কাঠগুলো লুকিয়ে ফেলল। শিতলপাটি দিয়ে সেই কাঠগুলো ঢেকে রাখা হল। আর প্ল্যাটফরম পার হলে বর্ষার জল, নালা ডোবা। ডোবা থেকে পিলু অন্ধকারেই কিছু কলমি শাক তুলে এনেছে। মা সবই সযত্নে রেখে দিল। কুপি জ্বালানো হল।

বাবা ফের স্টেশনমাস্টারের কাছে হাজির হয়ে আদ্যোপান্ত খুলে বলছেন। শুনতে চায় না তবু বাবা বার বার বোঝাচ্ছিলেন, শ্রীশ পাল আমাকে কি বিপদে ফেললে বলুন তো। এখন এই ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় উঠি।

ফিরে এসে বাবা খুব মিনমিনে গলায় বললেন, বুঝলে ধনবৌ, একটা চিঠি দিয়ে এলে ভাল হত। ও জানবে কি করে আমরা এসে বসে আছি। আমাকে তিনি বললেন, মার যা লাগে এনে টেনে দিস। আমি একটু খোঁজাখুঁজি করে দেখি কে কোথায় আছে।

মা বলল, কোথাও যেতে হবে না। সকালে দেখা যাবে।

আমিও বললাম, সকালেই দেখা যাবে বাবা।

মা কোলের ভাইটাকে ঘুম পাড়াচ্ছিল। খুব জোরে কথা বলতে পারছে না। পারলে যেন বলত, পুন্থু ঘুমচ্ছে। ওকে আর জাগিয়ে দিও না। জেগে গেলেই খেতে চাইবে।

—সকালে কি আর সময় পাব। যেন কত কাজের মানুষ বাবা। আমার দিকে

তাকিয়ে বললেন, ছাখ বাবা কোথাও গোটা তিন চার ইট পাস কিনা। কিছু তো খেতে হবে।

মেটে হাঁড়িতে চাল আছে এখনও কিছুটা। চাল থাকলে মার অন্ত দুঃখ বড় একটা বেশি থাকত না। চাল ফুটিয়ে দেওয়া যাবে। ঠিক ভাত না। ফ্যানা ভাতও নয়। সবটাই জল, কিছুটা চাল। জাউ। খুবই পাতলা। এনামেলের থালায় ঢেলে পাখার হাওয়া। আমাদের খিদে এত প্রবল থাকে যে ভাঙা পাখার শনশন শব্দ একদম সহ্য হয় না। দেরি হয়ে যাচ্ছে। যত গরমই হোক মুখে দিয়ে হাঁ করে বসে থাকা। আর প্রবল শ্বাসে তাকে ঠাণ্ডা করে নেওয়া। মুখের বাতাসে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পেটে গেলে আরও ঠাণ্ডা। বাবা আমাদের খাওয়া দেখতে দেখতে বললেন, তোরা বড় হা-ভাতে। এমনভাবে খাস যেন জীবনেও ভাত খাস নি। আস্তে খা। গাল, গলা পুড়ে গেলে ডাক্তার পাব কোথায়। সময় যা যাচ্ছে।

প্ল্যাটফরম পার হয়ে যাবার সময় কাউন্টারে দেখলাম স্টেশনমাস্টার মশাই টেবিলে ঝুঁকে কি লিখছেন। একবার অফিসঘরটার পাশে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা। দু-তিনজন বাবু মতো মানুষ বসে গল্প করছে। টরে টক্কা শব্দ হচ্ছে। কেমন একটা আশ্চর্য স্বপ্নের মতো পৃথিবী। আমি বড় হয়ে স্টেশনমাস্টার হব ভাবলাম। এবং এটা প্রায়ই দেখেছি, যখন কোনো মানুষ বাবাকে ধমকে কথা বলত, অথবা বাবা যাদের সমীহ করে কথা বলতেন তাদের ওপরয়ালা হবার মনে মনে বাসনা জাগত। তখন বাইরে অন্ধকার মতো একটা রাস্তায় বাবা কার সঙ্গে কথা বলছেন। কাছে যেতেই বললেন, সাবধানে থাকিস। আমি একটু ঘুরে আসছি। রাতে আর সত্যি বাবা ফিরলেন না। আমাদের বাবা মাঝে মাঝে এ-ভাবে হারিয়ে যেত। কলমি শাক সেদ্ধ আর জাউ-ভাত খেয়ে মনটা বেশ প্রসন্ন হয়ে উঠেছিল। অথচ বাবা নেই। মনটা ভার হয়ে গেল। অবশ্য জানি বাবা আবার ঠিক এক সময়ে ফিরে আসবেন। এ ক'দিন কিভাবে যাবে আমরা জানি না। মাও জানে না। আমাদের কথা মনে হলে, মার কথা মনে হলে, বাবা কোথাও গিয়ে বেশিদিন থাকতে পারেন না।

অনেক রাত এ-ভাবে তখন পরিত্যক্ত আবাসে অথবা প্ল্যাটফরমে আমাদের কেটে গেছে। আমি, পিলু, মায়া কখনো চুপচাপ প্ল্যাটফরমে বসে থাকতাম। ঘুরতাম। কখনো আকাশে জ্যোৎস্না থাকত, কখনো অন্ধকার। কিছু কুকুর বেড়াল ছিল তখন আমাদের সঙ্গী। ওরাও আমাদের সঙ্গে পায়ে পায়ে ঘুরত। বাবা আমাদের কোথায়, কতদূরে—বাবার জন্য আমাদের ভারি কষ্ট হত তখন।

আমরা তবু কিছু খেয়েছি, বাবা কিছু না খেয়েই কোথায় চলে গেল। একটা মাল গাড়ি টং লিং টং লিং ঘণ্টা বাজিয়ে চলে আসত। অন্ধকারে কোনো দূরবর্তী ছায়া এগিয়ে আসতে থাকলে মনে হত বাবা বুঝি ফিরছেন। সবার আগে ছুটে যেত পিলু। পেছনে আমি। সবার শেষে মায়া। কিন্তু সে অন্য মানুষ। মাঠের অন্ধকারে মেঘলা আকাশের নিচে আমরা বাবার জন্য এভাবে অপেক্ষা করতাম। বাবা বুঝি ফিরছেন। মাথায় হাতে বাবার রকমারি পোঁটলা-পুঁটলি। ভেতরে পূজা-পার্বণের চাল-ডাল। মার জন্য লাল পেড়ে শাড়ি। হাত দিলে বলবেন, ওটা তোমার মার। ধরো না।

এতবড় পৃথিবীতে আমাদের বাবা বাদে আর কিছু নেই। মানুষের ঘরবাড়ি থাকে আমাদের তাও নেই। চুপচাপ থাকলে মায়া বলত, দাদা ছাখ, দূরে কেমন একটা নীল বাতি জ্বলছে। সিগন্যালের লাল বাতিটা গাড়ি আসবে বলে নীল হয়ে গেছে। সাইডিং-এ মালগাড়ি সান্টিং হচ্ছে। ইচ্ছে হত এঞ্জিনের ড্রাইভারের পাশে গিয়ে বসে থাকি। সে আমাকে দূরে কোথাও নিয়ে যাক। আমি তো বড় হয়ে যাচ্ছি। ইচ্ছে করলে আমি নিজেও কিছু একটা করতে পারি।

॥ দুই ॥

বাবার দূর সম্পর্কের এক ভাই কাছাকাছি শহরটায় থাকে। তাঁর কাছে খবর পেয়েই এখানে চলে আসা।

ফলে আমাদের মনে হত, এতদিন আমরা অজ্ঞাতবাসে ছিলাম। এখন থেকে বনবাসের পালা। অন্তত বাবার কথাবার্তা এবং আচরণে এসবই মনে হত। বাবা কোথাও আর জায়গা পেলেন না, এখানে পাণ্ডববর্জিত একটা বনভূমিতে শেষ পর্যন্ত চলে এলেন।

ঘর বলতে বাঁশের খুঁটিতে দরমার বেড়া। টিনের চালের একটা বাছারি ঘর। আকাশ সামান্য ফর্সা হলে ঘরও ফর্সা হয়ে যায়। জ্যোৎস্না রাতে বেড়ার ফাঁকগুলো এক একটা এক এক রকমের। কোনোটা তারাবাতির মতো, কোনোটা যেন মোমবাতির শিখা। বাঁশ কেটে মাচান করে দিয়েছে বাবা। লম্বা মাচান। থলফা ফেলে মাচানকে সমতল করা হয়েছে। মা, পিলু, মায়া, পুনু বড় মাচানটায় শোয়। ছোটটা আমার আর বাবার। দুটো ছেঁড়া মশারি। কতকালের পুরনো বাবাও বলতে পারবেন না। রং একেবারে কালো—ধুলো ময়লা লাগলে নতুন

করে টের পাবার উপায় নেই। তালিমারা এত যে আসল মশারিটা কবেই উবে গেছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে দেখলাম বাবা পাশে নেই। বোধহয় রাত থাকতেই উঠে পড়েছেন। মানুষের ঘরবাড়ির বুঝি আলাদা একটা গন্ধ থাকে। সকাল না হতেই বাবা গন্ধটা পান। তখন আর বিছানায় থাকতে পারেন না। এত শীতেও কাবু হন না বাবা। এত ঠাণ্ডা যে কাঁথার ভেতর হাত পা জমে যায়। টিনের চাল বলে ঠাণ্ডাটা আরও বেশি। দরমার বেড়ার ফাঁকে হা হা করে শীত ঢুকে যায়। লেপ কাঁথা সব বরফ। বাবা পাশে শুয়ে থাকলে বেশ গরম থাকে। উঠে গেলেই শীতটা যেন আমাকে একলা পেয়ে বেশ জেঁকে বসে।

সূর্য ওঠার আগে বাবা তাঁর ঘরবাড়ির সীমানাটা প্রতিদিনের মতো একবার ঘুরে দেখবেন। বেশ চিন্তাশীল মানুষের মতো তখন তাঁকে হাঁটতে দেখা যায়। পাঁচ মাসে বিঘে পাঁচেক জমির বেশ কিছুটা সাফ করা হয়ে গেছে। শীতের সময় বলে হিম পড়ে থাকে ঘাস পাতায়। কোথাও শুকনো কাটা জঙ্গল, কোথাও আগুনে ডালপালা পোড়ে নি বলে আধপোড়া ঘাসপাতা। সব মাড়িয়ে খালি পায়ে হেঁটে যাবেন বাবা। কোন দিকটায় হাত দেওয়া দরকার, কোনদিকে হাত লাগালে তাড়াতাড়ি সাফ হবার কথা—সব ভেবে ভেবে দেখা। তারপর যেমন পালংয়ের জমি, পেঁয়াজের জমি, সীমের মাচান, লাউয়ের মাচান, কোথাও সামান্য জমিতে মুলো চাষ, সব জমিতে বীজ বপনের পর কার কতটা বাড়বাড়ন্ত প্রতিদিন সকালে না দেখতে পেলে যেন তাঁর ভাল লাগে না। এ-সময়টুকু এইসব হাতে বোনা ফসলের সঙ্গে থাকতে পারলে যেন বেঁচে যায় মানুষটা। আয়ু বাড়ে তাঁর।

আর মনে হত বাবা সারারাতই জেগে থাকেন সকাল হবার আশায়। কতক্ষণে সকাল হবে। যে গাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে, অথবা যে লতায় ফুল আসবে, কখন কার কি পরিচর্যার দরকার রাতে শুয়ে শুয়ে কেবল বুঝি ভাবেন। কখন কোথাও দাঁড়িয়ে কোথাও বসে অতি সন্তর্পণে সব কিছু ঠিকঠাক করে দিতে দিতে দেখতে পান সকাল হয়ে গেছে। পাখিরা মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অন্য আকাশে। ঘরবাড়ি মিলে বাবার সকালটা আমাদের চেয়ে কেমন অন্য রকমের মনে হয় তখন।

বিছানায় শুয়ে বাবার গলা শুনতে পাই—উঠে পড় সবাই। সূর্য উঠে গেছে আর বিছানায় থাকতে নেই।

পুব আকাশটা সামান্য ফর্সা হলেই বাবা সূর্য ওঠার কথা বলতেন। তখন আমাদের কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে হত না। কাঁথা গায়ে শুয়ে থাকার ভেতর ভারি

আরাম। কুঁকড়ে শুয়ে থাকি। চোখে রাজ্যের ঘুম। বাবা চায় তাঁর সঙ্গে আমিও এই সব চাষ আবাদ ঘুরে ফিরে দেখি।

এ-ভাবে বুঝতে পারি বাড়িটার চারপাশে ধীরে ধীরে সব শস্যক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। খুব সকালে মাও বোধ হয় শস্যের গন্ধ পায়। আর শুয়ে থাকতে পারে না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘুম থেকে উঠে পড়ে।

এখানে আসার পর বাবা কিছু পেঁপে গাছ লাগিয়েছেন। কোথা থেকে নিয়ে এসেছেন দুটো চাঁপা কলার গাছ। বড় যত্ন সহকারে গাছ দুটো জমির একপাশে লাগিয়েছেন। এতসব দেখেই বোধ হয় মা বাবাকে আবার নির্ভরশীল মানুষ ভাবতে পারছে। কথায় কথায় বাবাকে সেনাপতি বলে আর ঠাট্টা করে না।

এবং দেখা গেল, বাবা কিছু কলাপাতা এনে মায়াকে বললেন, অ আ লেখ। আমাকে বললেন, তোর বইগুলো বের কর, মান্নুর কাছে যা। পরীক্ষাটা দিতে হয়।

পরীক্ষাটা দিতে হয়, যেন অনেকদিন পর কথাটা বাবার মনে পড়ে গেল। দেশ ছেড়ে আসার পর গত দু'বছর কথাটা আমার এবং বাবার কারো মনে ছিল না। জমিজমা এবং মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে গেলেই বুঝি কথাটা মনে হয়। পিলুকে বাবা কিছুতেই পড়াতে বসাতে পারলেন না। তা ছাড়া পিলু খুব একটা আজকাল ভয়ও পায় না। অভাবী মানুষের সন্তানেরা বুঝি একটু বেশি বেয়াড়া হয়। পিলু যে বের হয়ে গেল, বাবা পিলুকে কিছু বলতে পর্যন্ত সাহস পেলেন না। পিলু এখন সিক্স-সেভেনে পড়তে পারত। দুটো বছর বাবার সঙ্গে এখানে সেখানে ঘুরে ওর স্বভাবটাও কিছুটা বাউণ্ডুলে হয়ে গেছে। অবশ্য ঠিক বাউণ্ডুলে না বলে বরং বলা যায় পিলু মার দুঃখ অথবা অভাববোধটা বোধহয় আমার চেয়ে বেশি টের পায়। সে যতটা পারে মার জন্য বাবার জন্য কাজ করে বেড়ায়। কেউ তাকে আর ঘাঁটায় না। দেখা গেল পিলু আসছে, হাতে পায়ে কাদা মাখা—কোঁচড়ে সব পুঁটি ট্যাংরা মাছ। কোনো গর্ত থেকে সব ধরে এনেছে। হয়তো দেখা গেল পিলু মাথায় করে নিয়ে আসছে এক ঝুড়ি গোবর। কখনো কোঁচড়ে গিমা শাক। সে বাড়িতে বাবার মতো ইতিমধ্যেই আংশিক সংসারী মানুষ হয়ে উঠছে।

বাবা একদিন ভারি আশ্চর্য একটা খবর নিয়ে এল। বনটার শেষ প্রান্তে কেউ ঠিক আমাদের মতো মানুষের ঘরবাড়ি গড়ে তুলছে। বাবা সারাটা সকাল তাদের বাড়িতেই ছিলেন। এবং কতদিন পর একজন প্রতিবেশী পাওয়া গেল ভেবে বোধহয় বাড়ির কথা ভুলে গিয়েছিলেন। এসে সারাটা দিন, নিবারণ দাস আর নিবারণ দাস। তার দুই বউ। বড় সংসার। বাদশাহী সড়কের ধারে বনের

একটা অংশ কিনে ফেলেছে। বাবা এখানটায় তার ঘরবাড়ি করে যে ভুল করেন নি নিবারণ দাসের মতো বিচক্ষণ লোকের আগমনের সংবাদ দিয়ে সেটা বার বার মাকে বোঝাতে চাইলেন। বিচক্ষণ কে বেশি, যে আগে করল, না যে পরে।

বিকেলে ঠিক বাবার বয়সী সেই লোকটা আমাদের বাড়িতে এসে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, ঠাকুর কর্তা আছেন। বাবা তাড়াতাড়ি জঙ্গল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বের হলেন। জঙ্গলের ঝোপঝাড় কাটছিলেন বলে মাথায় মুখে ঘাসপাতা লেগে ছিল। নিবারণ দাস এসেছেন, নিবারণ দাস, খোঁজ-খবর করতে এসেছেন—বারে বা—দেশ ছেড়ে আসার পর বাবার জীবনে কত বড় ঘটনা, বোধ হয় আর ইহজীবনে এত বড় ঘটনা ঘটেছে বাবার জীবনে নিবারণ দাসের আসা দেখে, আদর আপ্যায়ন দেখে আমাদের বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। বাবা তাকে তামাক খাওয়ালেন, এবং এমন একটা জায়গা বসবাসের জন্য নির্বাচন করেছে বলে তাকে কত যে সাধুবাদ দিলেন। লোকটা মাকে কর্তা মা কর্তা মা করছিল। মাও বেজায় খুশী, আর লোকটির কথাবার্তা হাবভাব অদ্ভুত আপনজনের মতো। যেন এই ব্রাহ্মণ পরিবারের কথা শুনেই এখানে চলে আসা। সাত পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে গঙ্গা পারে আসা। পালা পার্বণে যদি একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ না পাওয়া যায় তবে বেঁচে থাকার আনন্দ থাকে না। এমন কি দুজনে বসে ঠিকও করে ফেলল, আগামী শনিবারে শনিপূজা করবে নিবারণ দাস। বাবার একজন যজমান পাওয়া গেল তবে।

লোকটা চলে যাওয়ার পর বাবা কিছুক্ষণ কেমন ধন্দ লাগা মানুষের মতো বসে থাকলেন। লাখ টাকা লটারি পেয়েছে শুনলে দুঃখী মানুষের মুখে যেমন রা সরে না বাবারও বুঝি তেমন কিছু হয়েছে। বসে আছেন তো আছেনই। আমাদের ভয় ধরে গেল। ডাকলাম, বাবা! মা বলল, হ্যাঁগো তুমি কি ভাবছ অত!

বাবা কেমন সুদূরের মানুষ হয়ে গেছেন। খুব ধীরে ধীরে বললেন, ভাবছি মানুষের বাড়িঘরের কথা। বাবার এই ধরনের আত্মদর্শন ঘটলেই কেমন আমাদের সব গোলমাল ঠেকে। কাছে বসে বললাম, লোকটা সত্যি শনিপূজা করবে তো বাবা! মাও বলল, হ্যাঁগো, সত্যি করবে তো! এত সুখ শেষ পর্যন্ত কপালে সইবে তো!

বাবা কেমন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ করবে। একবার যখন বলে গেছে তখন আর মিথ্যে হবে না।

আর আমার মনে হল, বাবা কাল সকালেই চলে যাবেন—কি দাস মশাই পূজা

তা হলে হচ্ছে। আর যদি না হয়, তবে বাবা না আবার ভিরমি খেয়ে পড়ে যায়। কে দেখবে তখন! ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি কাল তোমার সঙ্গে যাব।

—কোথায় যাবি?

—নিবারণ দাসের বাড়ি।

—কেন?

তোমার কি হবে-না-হবে শেষ পর্যন্ত বলতে পারলাম না। বললাম শুধু, দেশের মানুষ এসেছে, ঘরবাড়ি করছে, দেখে আসব।

বাবা খুব ভারিক্কি গলায় বললেন, শনিপূজার দিন নিয়ে যাব।

শনিবারের জন্য আমাদের তখন কি আকুলি-বিকুলি! মাও শনিপূজা একটা না করলে হয় না এমন বায়না ধরলে বাবা বললেন, হবে হবে। সবই তো হয়ে যাচ্ছে। কোনটা বাকি থাকছে! আগে একটা পঞ্জিকা কিনি। পঞ্জিকা না হলে পুরুত মানুষের মান-সম্মান থাকে না।

শনিবারের আশায় পিলু পর্যন্ত সুবোধ বালক হয়ে গেল।

শনিবার সত্যি এসে গেল। বাবা বেশ বিকেলেই আমাদের নিয়ে রওনা হলেন। কতকাল পর আমরা আবার সম্মানিত মানুষ। আমাদের জামা প্যাণ্ট খারে কাচা হয়েছে। কালীর পুকুরে মা সারা দুপুর আমাদের ছেঁড়া তালিমারা যা জামাকাপড় ছিল সব ধুয়ে ঘাসের ওপর শুকোতে দিয়েছে।

আমরা যাচ্ছিলাম। রাস্তাটা বেশ মনোরম লাগছিল। কখনও এদিকটায় আসা হয় নি। বাবার গায়ে নামাবলী। মা সঙ্গে থাকলে একেবারে সপরিবারে শনিপূজা সেরে আসা হত। দু-একবার বাবা যে বলে নি তা নয়। কিন্তু নিবারণ দাস বিশেষ কিছু বলে যায় নি বলে আত্মসম্মানে মার লেগেছে। বোধহয় সে-জন্যই আসে নি। তবে মা বলেছে, আমি গেলে বাড়িটা খালি থাকবে না।

শনিপূজার দিন বাবা বেশ বিকেল থাকতেই আমাদের নিয়ে রওনা হলেন। আমরা আমাদের তালিমারা ছেঁড়া জামা প্যাণ্ট পরে রওনা হয়েছি। মা চুলে কাকুই দিয়ে দিয়েছে। ভুরুর ওপরে একটু কাজলের ফোঁটা। মার এতদিন পর মনে হয়েছে তাঁর সন্তানেরা ভারি সুন্দর দেখতে। এবং চারপাশে যা বনজঙ্গল, আর ভূত-প্রেত কখন কার নজর লেগে যাবে ভয়ে মা মাথায় একটু থুথু দিয়ে বা পায়ের গোড়ালী থেকে সামান্য ধুলো মাখিয়ে দিয়েছে মাথায়। যতই রাত হোক, যতই অপদেবতার ভয় থাকুক, আমরা তার বাইরে। মা কত সহজে আমাদের সব বিপদ থেকে যে রক্ষা করে থাকেন।

ব্যারাকবাড়িতে তখন প্যারেডের হুইসিল বাজছে। এখন প্যারেড না থাকলে

বাবা বোধহয় ঘুরে ব্যারেকের পথটা ধরে যেতেন। বাবা যে কত বড় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের সন্তান এটা বোঝাবার এমন একটা মোকা হাতছাড়া হয়ে গেল বলে বোধহয় মনে মনে এখন আপসোস করছেন। ক'মাস হয়ে গেল, তবু পুলিসের কোয়ার্টারগুলোতে পূজা পার্বণে বাবার একদিনও ডাক পড়ে নি। দেশ ছেড়ে সবাই এদেশে এসে মুচি মেথর সব ঘোষ বোস বনে যাচ্ছে। বাবা যে তেমন একজন কেউ নয় কে জানে। বাবা কিছুতেই বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারছিলেন না। নামাবলী গায়ে খালি পায়ে শনিপূজা সারতে যাচ্ছেন বাবা, যেন হাবিলদার সুবেদারের সঙ্গে দেখা হলেই বলা, যাচ্ছি শনিপূজা করতে। নিবারণ দাস শনিপূজা করছে। এসে হাতে পায়ে ধরল, কি আর করা যায়, শনিঠাকুর বলে কথা। কিন্তু প্যারেডের সময় কে আর কাকে লক্ষ্য করে! বাবা অগত্যা যেন বনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

রাস্তাটা বেশ মনোরম লাগছিল। কখনও এদিকটায় আমি আসিনি। দু-পাশে বড় বড় শিরীষ গাছ, তার ছায়া এবং লতাপাতায় ঢাকা আশ্চর্য সব বনঝোপ। আমাদের পায়ের শব্দে পাখিরা উড়ে গেল ঝোপ থেকে। এবং কোথাও সুন্দর কুরচি ফুল ফুটে আছে। নাকে সুবাস এসে লাগছে। একটা পায়ে হাঁটা পথ এঁকে বেঁকে কতদূরে যে চলে গেছে মনে হয়।

বাবা অনেকটা আগে চলে গেছেন। গায়ে নামাবলী। একটা ছোট বাঁকের মাথায় বাবা অদৃশ্য হয়ে যেতেই কেমন ভয় ধরে গেল। ডাকলাম, বাবা। পিলু বলল, আমি ঠিক চিনি। তুই আয়। মায়া বাবার নাগাল পাবার জন্য দৌড়চ্ছিল। আমি পিলু বাবাকে ধরার জন্য তারপর দুজনেই একসঙ্গে ছুট লাগালাম। বাবাকে আমাদের খুব এখন ভালবাসতে ইচ্ছে করছে। পিলু পর্যন্ত বাবার কথা শুনছে। সে বাবার নাগাল কিছুতেই ছাড়ছে না। আমার গায়ে হাফশার্ট। পা খালি আমাদের সবার। বেশ উঁচুনিচু পথ। দু'পাশের সব ঝোপজঙ্গল রাস্তা ঢেকে রেখেছে। কিছুটা প্রায় লাফিয়ে যেতে হচ্ছে কখনো। মনে হল পিলু এ-সব অঞ্চলে ঘুরে গেছে। সে-ই সব খবর দিচ্ছিল আমাকে। বলল, ডান দিকে ঐ যে দেখছিস, দেখতে পাচ্ছিস না দাদা, বড় বড় দুটো বাঁশঝাড়, ওপাশে গেলে একটা পোড়ো বাড়ি আছে। তারপর আছে তোর কারবালা, পরে মাঠ, রেল-লাইন। কারবালায় তোকে একদিন নিয়ে যাব। ইটের ভাটা আছে একটা। নবমী বলে একটা বুড়ি থাকে। কচু আর বনআলু সেদ্ধ করে খায়। কোনো দুঃখ নেই। লোক দেখলেই ফোকলা দাঁতে হাসে, ওমা তুমি কেগা। সুমার বনে একা ঘুরে বেড়াচ্ছ!

আমার ভাল লাগল না। পিলুর বেজায় সাহস। কোনো বনের ভেতর বুড়ি থাকলে ডাইনী বুড়ি না হয়ে যায় না। বুড়িটা যদি পিলুকে ছাগল ভেড়া বানিয়ে রাখে।

পিলু বলেছিল, জানিস দাদা, বুড়িটার দুটো বড় ছাগল আছে। কত বড় শিং। ভাবলাম মাকে বলব, মা, বুড়িটা দেখবে পিলুকে বাঁদর বানিয়ে রেখে দেবে।

—কত তুকতাক জানতে পারে।

পিলু হাসত। বলত, তুই খুব ভীতু স্বভাবের। আমরা হেঁটেই যাচ্ছি; রাস্তা আর শেষ হচ্ছে না। বনবাদাড়ের রাস্তা বুঝি কখনও শেষ হতে চায় না। সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না। এত ঘন গাছপালা যে মাথার ওপরে আকাশ আছে বোঝা যাচ্ছিল না। দিনের বেলাতেই গা ছমছম করছে। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। কেমন ভয় লাগছিল। রাতে আমরা ফিরব কি করে! যদিও বুঝতে পারছিলাম এ-সব বলা যায় না। বাবা খুব গুরুগম্ভীর গলায় বলবেন, তুমি বামুনের ছেলে। তোমার তো ভয় থাকার কথা নয়। বাবার কিছু দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যেমন সব ভূতপ্রেতের কথায় এলে বাবা অনায়াসে বলবেন, বামুনের বাচ্চা, কেউটের বাচ্চা এক। সবাই ভয় পায়।

পিলু বাবার কাছাকাছি হাঁটছে। মায়া মাঝখানে। সবার শেষে আমি। মাঝে মাঝে আমি কতদূরে আছি বাবা ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলেন।

বাবার ডান হাত ধরে রেখেছে মায়া। সে পুজোর সব খেয়ে নেবে বলছে। পেট ভরে সিন্নি খাবে, মুড়ি খাবে, নারকেল বাতাসা খাবে, যেন এমন অতীব এক ভোজন কতকাল পরে প্রায় উৎসবের মতো এসে গেছে।

আমি জানি, বাবা, আজ ভারি তন্ময় হয়ে যাবেন পুজোয় বসে। বেশ নিয়ম নিষ্ঠা, যা দেখলে নিবারণ দাস আখেরে আর সাহসই পাবে না, পুজো-পার্বণে অন্য বামুনের কথা ভাবতে। একেবারে বাবা যেন আত্মীয়ের মতো অথবা পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ, পূজার সুফল কি, কেন এইসব পালাপার্বণ, হিন্দুধর্ম, তার দেবদেবীর কি মাহাত্ম্য এবং পাঁচালী পড়লে গেরস্থ মানুষের যা কিছু ফললাভ বাবা ব্যাখ্যা করে যাবেন।

পিলু বলল তখন, দাদা যাবি?

—কোথায়?

—কারবালাতে।

—আমার ভয় করে।

—ভয় কি রে!

—ওখানে মুসলমানদের কবরখানা আছে।

—তাতে কি।

—কত সব মানুষের কঙ্কাল।

—তুই দেখেছিস?

—দেখব কি করে?

—তবে। শেষে সে অভয় দেবার মতো বলল, একটাও থাকে না। শেয়ালেরা সব খেয়ে নেয়। সে একবার একটা শেয়ালকে মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। প্রায়, যা বর্ণনা পিলুর, বাঘ-টাঘের শামিল। সে কিছুদূর পর্যন্ত শেয়ালটার পেছনে দৌড়েছিল। এবং বনের ভেতর ঢুকে যেতেই ভারি একা মনে হয়েছিল নিজেকে। আর বোধ হয় ভয় ভয়ও করছিল। দাদা সঙ্গে থাকলে অন্তত সেটুকু থাকত না। এবং এ-জন্যই মাঝে মাঝে তোষামোদ দাদাকে—যাবি দাদা। কত রকমের সব ফলের কথা, এবং বড় বড় বন-আলু তুলে আনা যায়—এক একটা আলু মনের বিশ সের ওজনে। একবার তো সারাদিন পিলুর দেখা নেই। মা বার বার বলেছিল, কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবার সাদাসিধে কথা। গেছে কোথাও—ঠিক চলে আসবে। সকালে পিলু কিছু না খেয়ে বের হয়ে গেছে সেদিন। মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে। মা রেগে গিয়ে খেতে দেয় নি কিছু। রাগের মাথায় যদি একটা কিছু করে ফেলে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। মা না খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে—আমিও কতবার ডাকাডাকি করেছি। ব্যারাকের মাঠে এবং বাদশাহী সড়কে উঠে দেখে এসেছি। নেই। মা তখন প্রায় ভেউভেউ করে কেঁদেই দিত। মায়া এসে বলল, ছোড়দা আসছে। ছোড়দা মাথায় কি একটা অতিকায় বহন করে আনছে। কাছে এলে দেখতে পেলাম অতিকায় বন-আলু। প্রায় হাতির সাদা দাঁতের মতো। মার যত রাগ, নিমেষে উবে গিয়েছিল।—এতবড় বন-আলু মা জীবনেও দেখে নি। প্রায় দু হাতে মাথা থেকে নামাতে গেলে পিলুর প্যাণ্ট হড়হড় করে নেমে গেল পেট থেকে। কিছু খায় নি বলে পেটটা কোথায় ঢুকে গেছে। হাতে পায়ে মুখে—শরীরের সর্বত্র মাটি কাদা এবং সেদিন ওকে পুকুরপাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বাংলা সাবানে শরীর পরিষ্কার করে দিয়েছিল মা। একটা আলুতে আমাদের কতদিন চলে যাবে। খেতে বসে পিলুর সাম্রাজ্য জয়ের কথা শুনতে শুনতে মা কেবল চোখের জল ফেলেছিল। বাবার মতো পিলুকে সেই থেকে কেন জানি মাঝে মাঝে আমার ভারী সমীহ করতে ইচ্ছে হত।

তখনই বাবা বলল, এসে গেছি।

আমার ভাল লাগল না। পিলুর বেজায় সাহস। কোনো বনের ভেতর বুড়ি থাকলে ডাইনী বুড়ি না হয়ে যায় না। বুড়িটা যদি পিলুকে ছাগল ভেড়া বানিয়ে রাখে!

পিলু বলেছিল, জানিস দাদা, বুড়িটার দুটো বড় ছাগল আছে। কত বড় শিং। ভাবলাম মাকে বলব, মা, বুড়িটা দেখবে পিলুকে বাঁদর বানিয়ে রেখে দেবে।

—কত তুকতাক জানতে পারে।

পিলু হাসত। বলত, তুই খুব ভীতু স্বভাবের। আমরা হেঁটেই যাচ্ছি; রাস্তা আর শেষ হচ্ছে না। বনবাদাড়ের রাস্তা বুঝি কখনও শেষ হতে চায় না। সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না। এত ঘন গাছপালা যে মাথার ওপরে আকাশ আছে বোঝা যাচ্ছিল না। দিনের বেলাতেই গা ছমছম করছে। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। কেমন ভয় লাগছিল। রাতে আমরা ফিরব কি করে! যদিও বুঝতে পারছিলাম এ-সব বলা যায় না। বাবা খুব গুরুগম্ভীর গলায় বলবেন, তুমি বামুনের ছেলে। তোমার তো ভয় থাকার কথা নয়। বাবার কিছু দৃঢ় বিশ্বাস আছে। যেমন সব ভূতপ্রেতের কথায় এলে বাবা অনায়াসে বলবেন, বামুনের বাচ্চা, কেউটের বাচ্চা এক। সবাই ভয় পায়।

পিলু বাবার কাছাকাছি হাঁটছে। মায়া মাঝখানে। সবার শেষে আমি। মাঝে মাঝে আমি কতদূরে আছি বাবা ঘাড় ফিরিয়ে দেখছিলেন।

বাবার ডান হাত ধরে রেখেছে মায়া। সে পুজোর সব খেয়ে নেবে বলছে। পেট ভরে সিন্নি খাবে, মুড়ি খাবে, নারকেল বাতাসা খাবে, যেন এমন অতীব এক ভোজন কতকাল পরে প্রায়-উৎসবের মতো এসে গেছে।

আমি জানি, বাবা, আজ ভারি তন্ময় হয়ে যাবেন পুজোয় বসে। বেশ নিয়ম নিষ্ঠা, যা দেখলে নিবারণ দাস আখেরে আর সাহসই পাবে না, পুজো-পার্বণে অন্য বামুনের কথা ভাবতে। একেবারে বাবা যেন আত্মীয়ের মতো অথবা পরম হিতাকাঙ্ক্ষী মানুষ, পূজার সুফল কি, কেন এইসব পালাপার্বণ, হিন্দুধর্ম, তার দেবদেবীর কি মাহাত্ম্য এবং পাঁচালী পড়লে গেরস্থ মানুষের যা কিছু ফললাভ বাবা ব্যাখ্যা করে যাবেন।

পিলু বলল তখন, দাদা যাবি?

—কোথায়?

—কারবালাতে।

—আমার ভয় করে।

—ভয় কি রে!

—ওখানে মুসলমানদের কবরখানা আছে।

—তাতে কি!

—কত সব মানুষের কঙ্কাল!

—তুই দেখেছিস?

—দেখব কি করে?

—তবে! শেষে সে অভয় দেবার মতো বলল, একটাও থাকে না। শেয়ালেরা সব খেয়ে নেয়। সে একবার একটা শেয়ালকে মাঠের ভেতর দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। প্রায়, যা বর্ণনা পিলুর, বাঘ-টাঘের শামিল। সে কিছুদূর পর্যন্ত শেয়ালটার পেছনে দৌড়েছিল। এবং বনের ভেতর ঢুকে যেতেই ভারি একা মনে হয়েছিল নিজেকে। আর বোধ হয় ভয় ভয়ও করছিল। দাদা সঙ্গে থাকলে অন্তত সেটুকু থাকত না। এবং এ-জন্যই মাঝে মাঝে তোষামোদ দাদাকে—যাবি দাদা। কত রকমের সব ফলের কথা, এবং বড় বড় বন-আলু তুলে আনা যায়—এক একটা আলু পনের বিশ সের ওজনে। একবার তো সারাদিন পিলুর দেখা নেই। মা বার বার বলেছিল, কোথায় যে গেল ছেলেটা। বাবার সাদাসিধে কথা। গেছে কোথাও—ঠিক চলে আসবে। সকালে পিলু কিছু না খেয়ে বের হয়ে গেছে সেদিন। মার সঙ্গে কথা কাটাকাটি করেছে। মা রেগে গিয়ে খেতে দেয় নি কিছু। রাগের মাথায় যদি একটা কিছু করে ফেলে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল। মা না খেয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে—আমিও কতবার ডাকাডাকি করেছি। ব্যারাকের মাঠে এবং বাদশাহী সড়কে উঠে দেখে এসেছি। নেই।
মা তখন প্রায় ভেউভেউ করে কেঁদেই দিত। মায়া এসে বলল, ছোড়দা আসছে। ছোড়দা মাথায় কি একটা অতিকায় বহন করে আনছে। কাছে এলে দেখতে পেলাম অতিকায় বন-আলু। প্রায় হাতির সাদা দাঁতের মতো। মার যত রাগ, নিমেষে উবে গিয়েছিল।—এতবড় বন-আলু মা জীবনেও দেখে নি। প্রায় দু হাতে মাথা থেকে নামাতে গেলে পিলুর প্যান্ট হড়হড় করে নেমে গেল পেট থেকে। কিছু খায় নি বলে পেটটা কোথায় ঢুকে গেছে। হাতে পায়ে মুখে—শরীরের সর্বত্র মাটি কাদা এবং সেদিন ওকে পুকুরপাড়ে টেনে নিয়ে গিয়ে বাংলা সাবানে শরীর পরিষ্কার করে দিয়েছিল মা। একটা আলুতে আমাদের কতদিন চলে যাবে। খেতে বসে পিলুর সাম্রাজ্য জয়ের কথা শুনতে শুনতে মা কেবল চোখের জল ফেলেছিল। বাবার মতো পিলুকে সেই থেকে কেন জানি মাঝে মাঝে আমার ভারী সমীহ করতে ইচ্ছে হত।
তখনই বাবা বলল, এসে গেছি।

বনটার শেষ। এদিকেও সেই বাদশাহী সড়ক ঘুরে গেছে। এবং বোঝাই যায় পুব-উত্তরে কিছু দক্ষিণেও বনটাকে একটা হাঁসুলির মতো এই বাদশাহী সড়ক প্রায় সবটা ঘিরে রেখেছে। ঠিক রাস্তার ধারেই দুটো দোচালা টিনের ঘর নিবারণ দাসের। পুব-দক্ষিণ খোলা বলে সকাল দুপুরের সবটা রোদই বাড়িটা পায়।

সাজ লেগে গেছে। আমাদের দেখে নিবারণ দাস হাতজোড় করে ছুটে আসছে। একটা জলচৌকিতে বাবাকে বসতে দেওয়া হল। বারান্দায় একটা হারিকেন জ্বলছে। খোলা উঠোনে বেশ বড় গামলায় দুধ, চালের গুঁড়ো। সাদা পাথরে ঠাণ্ডা নারকেলের জল। দাসের দুই বউ আমাদের দেখে কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে সেজেগুজে আছে। বড় মেয়েটা শাড়ি পরেছে। ঢপ ঢপ করে প্রণাম বাবাকে। তারপর আমাকে পিলুকে লুটের বাতাসার মতো প্রণাম করতে থাকল। আমরা কত বড় মানুষের ছেলে এই বুঝি প্রথম টের পেলাম। পিলু দেখলাম মুখ বেশ গম্ভীর করে রেখেছে। ওর জামার নিচে প্যান্ট, প্যান্টে দড়ি পরানো নেই। পরিয়ে দিলেও থাকে না। এখন পিলু এত গম্ভীর যে মনে হয় দম বন্ধ করে আছে। দম আলগা করে দিলেই হয়েছে। প্যান্ট আবার হড়হড় করে নিচে নেমে না যায়। ভাগ্যিস বড় মেয়েটা একটা শতরঞ্চ পেতে বারান্দার একপাশে বসতে দিল। তাড়াতাড়ি যেন নিজের গরজেই আর মান-সম্মানের ভয়ে পিলুকে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলাম। আর আমরা সবাই নিরীহ মানুষের মতো পুজার ভোগসামগ্রী সতৃষ্ণনয়নে দেখার সময় মনে হল বুড়ি মতো কেউ লাঠি ঠুকে ঠুকে এদিকটায় আসছে। হারিকেন তুলে আমাদের মুখ দেখছে। ফোকলা দাঁতে বলছে, এ যে সব কার্তিক ঠাকুর এক একজন। বলেই লাঠি পাশে রেখে মাথা ঠুকতে থাকল। আমাদের তখন একেবারে হতভম্ব অবস্থা।

বাবা পদ্মাসনে বসে আছেন। আমরা তাঁর ছেলেপুলে কে দেখলে বলবে? আমরা কি করছি, কি-ভাবে আছি একবারও মুখ ফিরিয়ে দেখছেন না। কেবল পুজোর ফুল নৈবেদ্য, ঘট, আমের পল্লব, সিঁদুরের থান, তিল তুলসী সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। নিবারণ দাস বাবার পা ধুইয়ে দিয়েছে জলে। পা মুছে দিয়েছে। এত বড় মানুষটা বাবাকে এ-ভাবে সমাদর করতেই আমরা আরও নিরীহ গোবেচারা হয়ে গেলাম। বাবার মান-সম্মান এখন সব কিছুই আমাদের স্বভাব-ধর্মের ওপর নির্ভর করছে।

চারপাশে আর কোনো লোকালয় নেই। দূরে এই কিছু জমি পার হয়ে গেলে চৌমাথা। বাদশাহী সড়ক ফুড়ে রাস্তাটা গেছে রাজবাড়ির দিকে। চৌমাথায় বড় পাটের আড়ত।

বারান্দায় হ্যাজাকের আলো। এখানে বসেও দেখা যায় পাটের আড়তে কাজকর্ম হচ্ছে।

নিবারণ দাস বলল, পাটের আড়ত দেব ভেবেছি কর্তা। কেমন হবে? চারপাশে বাবা ফুল চন্দন ছিটিয়ে দিচ্ছিল। বাড়িটা জুড়ে বেশ পূজা পূজা গন্ধ। বাবা ভারি নিপুণ গলায় বললেন, লক্ষ্মী আপনার বাঁধা দাসমশাই। যাতে হাত দেবেন সোনা ফলবে। বাবার কথা অমৃত সমান ভেবেছে নিবারণ দাস।

আমার কেবল মনে হয়েছিল, আমাদের জন্য কেন বাবা এমন আশীর্বাদ ঈশ্বরের কাছে চেয়ে নেয় না। কত সহজে বাবা নিবারণ দাসকে অমৃত সমান কথা বলে দিতে পারল। আমার বাবা বেশ সুশ্রী মানুষ, লম্বা এবং গৌরবর্ণ। আর বাবা এত অভাবের ভেতরও শরীর বেশ কোমল এবং মাথা ঠিক রাখতে পেরেছেন। পূজায় বাবাকে কে কি দিল—এই যে শনির পূজা, একটা বড় গামছা দিতে পারত নিবারণ দাস—কত না জানি দক্ষিণা দেবে, অথচ সে-সব বাবা আদৌ গ্রাহ্য করেন না এবং বেশ সময় নিয়ে নিষ্ঠা সহকারে পূজা করে গেলেন। শান্তির জল দিলেন সবাইকে। সুর ধরে পাঁচালী পাঠ করলেন। সবাইকে প্রসাদ মেখে সিন্নি, চাল কলা এবং আমাদের হাতে হাতেও দিল। কাউকে বেশি না কম না। মায়া যে রাস্তায় পইপই করে বলেছে পেট ভরে সিন্নি খাব—সেসব যেন বাবা একেবারেই ভুলে গেছেন। অবস্থা এমন যে শেষ পর্যন্ত বাবা তাঁর ছেলেমেয়েদের বাড়ি পর্যন্ত চিনে নিয়ে যেতে পারলে হয়। এত কমে এত বেশি পুণ্য হয় না—বাবাটা যে কি! রাগে ভেতরটা গরগর করছিল।

পিলুর দিকে তাকিয়ে আরও বেশি রাগ হচ্ছিল। তুই কি রে! নিজের স্বভাব-ধর্ম মানুষ এ-ভাবে ভুলে যায়! তুই পর্যন্ত একবার বলতে পারলি না, আমাকে আর একটু দাও বাবা। তুই চাইলে বাবা দুবার আমাকেও দিত। মায়া পেট ভরে সিন্নি খাবে বলেছিল—কথাটা মনে পড়ত বাবার।

তখনই দাসের মা বলল, কর্তা, এত প্রসাদ খাবে কে?

দাসের মার কথা শুনেই আবার নড়েচড়ে বসা গেল।

বাবা বলল, আসবে। মানুষজন আসবে। এলে দেবেন, প্রসাদ নামমাত্র।

তখন ভগবানকে বললাম, হা ভগবান, মানুষের বাবা এত নিষ্ঠুর হয়! পূজার দক্ষিণা মাত্র তিন আনা পয়সা। তিন আনা পয়সাই তামার। পয়সা কটা বাবা

আঁচলের কোণায় শক্ত করে বাঁধলেন। দুবার টেনে দেখলেন, খুলে পড়ে-টড়ে যেন না যায়। গামছায় ভোজ্য দ্রব্য বলতে সামান্য চাল, দুটো নাতি-বৃহৎ বেগুন, একটা হরিতকী, ছোট ছোট লাল জরুলের মতো দুটো আলু খুব যত্নের সঙ্গে নিয়ে নিলেন। এই সামান্য পাওনার বিনিময়ে বাবা লোকটাকে কত বড় কথা বলে গেল! বাবা যখন উঠব উঠব করছে, নিবারণ দাস বলল, এরা তো কিছুই খেল না। কর্তামার জন্য একটু এবং এই বলে সে একটা বড় জামবাটিতে অনেকটা সিন্নি, চাল কলা ফল গামছায় বেঁধে দিল নিজে। বাবা কিছুই দেখছেন না, যত কথা বলছেন দাসের সঙ্গে। আমাদের চোখ চকচক করছে। মেয়ের একটা ভাল বর খোঁজা দরকার। বাবা নিজের ওপরেই ভারটা নিয়ে নিলেন এবং এমন সব মানুষজনের খবরাখবর দিলেন বাবা, যে নিবারণ দাস বাবাকেই এ-বিপদে একমাত্র কাণ্ডারী ভেবে ফেলল।

ফেরার পথে একটা হারিকেন দিয়ে দিল। নিবারণ দাস কথা বলতে বলতে কিছুটা পথ এগিয়ে দিচ্ছিল। সিন্নি প্রসাদ নিবারণ দাসের হাতে। যে-ভাবে বাবা আর নিবারণ দাস কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গেল, না জানি পুঁটুলিটা দাসের হাতেই থেকে যায়। যা আমার একখানা বাবা, ফেরার পথে শুধু হারিকেনটাই হয়তো ধরা থাকবে হাতে। পিলু বোধ হয় এটা টের পেয়ে বেশ কায়দা করে বলল, জ্যাঠা, আমাকে দিন। আমি নিচ্ছি।

জ্যাঠা বলল, পারবে তো?

পিলু ঘাড় উঁচিয়ে বলল, খুব।

যখন কিছুটা পথ এগিয়ে দিয়ে নিবারণ দাস টর্চ জ্বেলে চলে গেল তখন পিলু আর স্বভাব-ধর্ম ঠিক রাখতে পারল না। হাত ঢুকিয়ে একটা কলা বের করে বলল, দাদা খা।

আবার বের করে নিল দু টুকরো নারকেল। মায়াকে দিল, আমাকে দিল। সে নিজেও রাক্ষসের মতো সব মুখে ফেলছিল।

বাবা বললেন, বেশ তো ভাল ছেলে হয়ে ছিলে বাবারা। জঙ্গলে ঢুকতে না ঢুকতেই স্বমূর্তি ধারণ করলে বাবারা। তোমার মার জন্য কিছু রেখ।

আমরা এ-ভাবে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আমার হাতে হারিকেন। অন্ধকার ঘোলাটে পৃথিবী ফুঁড়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম। আলোতে আমাদের ছায়াগুলো কখনও লম্বা কখনও ছোট হয়ে যাচ্ছিল। পিলু সবার আগে। এবং জানি মা খলপার দরজা বন্ধ করে রাস্তায় কোনো শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছে। মা না একা আবার ভয় পায়। আমরা তখন প্রায় দৌড়ে সেই অন্ধকার বনভূমি পার হবার চেষ্টা

করছিলাম। পৃথিবীতে এ-কটা প্রাণী বাদে এই বনভূমি এবং অন্ধকারে কিছু জোনাকি পোকা—বনের মধ্যে মা নিশীথে আমরা কতক্ষণে ফিরছি সেই আশায় বসে রয়েছে। বাড়ির কাছে আসতেই পায়ে ভীষণ জোর এসে গেল। দৌড়ে দরজায় উঠে গেলাম। ডাকলাম, মা আমরা এসেছি। ওঠো। মা লম্ফ হাতে দরজায় দাঁড়িয়ে প্রথমেই বলল, তোর বাবা কোথায়?

—আসছে।

আমরা মার যেন কেউ না। বাবার জন্য লম্ফ হাতে মা উঠোনে নেমে গেল। বাবা যাতে ভাল দেখতে পায় সেজন্য লম্ফটা আরো উঁচু করে ধরল।

মনে হল মা আমার নিমেষে আকাশবাতি হয়ে গেছে। সবার ওপরে হাত। হাতে লম্ফ। লম্ফের আলো দাউদাউ করে জ্বলছে। বাবা আলোর দিকে এগিয়ে আসছেন। বাবাকে খুব শক্তিশালী যুবকের মতো মনে হচ্ছিল।

নিবারণ দাস পরদিনই সকালে এসে হাজির। একটা চাটাই পেতে দিল মায়া। মা ঘোমটা টেনে বলল, তোর বাবাকে ডেকে দে। বাবা এ-সময়টাতে কোথায় থাকেন সংসারে সবাই জানে। সীমানা বরাবর জিয়ল গাছের ডাল পুঁতে নিজের জমি ঠিক করে নিচ্ছেন। বাবা এলে দাস বলল, এলাম কর্তা। একটা দিনক্ষণ দেখে দিন। শুভদিনে আড়ত খুলব ভাবছি।

বাবা বলল, দাসমশাই, পাঁজি তো নেই।

এবং দাসমশাই পরদিনই একটা নতুন পঞ্জিকা উপহার দিয়ে গেল। দিনক্ষণ জেনে গেল। বাবা পঞ্জিকাটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ভারি অভিভূত হয়ে বসে থাকলেন। বড় মূল্যবান সামগ্রীর মতো বইটাকে দেখতে থাকলেন। কাছে গেলে ধমকে উঠলেন, এখানে কি, যাও! পাছে কেউ বইটাতে আমরা হাত দিই ভয়ে একদম কাছে ভিড়তে দিলেন না। দূর থেকেই আমরা যতটা পারলাম আশ মিটিয়ে দেখলাম।

খুবই ভাগ্যবান মানুষ বাবা—আস্ত একটা পঞ্জিকা নিবারণ দাস উপহার দিয়ে গেল —ভাগ্যে লেখা না থাকলে এ-সব হয় না। এখানে আসার পর কতবার তো চেষ্টা করেছেন শহর থেকে বইটা আনিয়ে নেওয়ার। কিছুতেই হয়ে ওঠে নি। গত জন্মের পুণ্যফলেই এখনও যা কিছু হচ্ছে। বিশেষ করে বইটা পেয়ে বাবা কেমন খুবই ছেলেমানুষ হয়ে গেলেন। পাতা খুলে খুব সন্তর্পণে একের পর এক দেখে যেতে থাকলেন। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। এমন অমূল্য ধন তাঁর কাছে আছে, আর যদি জানতে পারে মানুষেরা, অমোঘ দিনক্ষণ বলে দিতে পারে মানুষটা তবে অঞ্চলের একজন সেরা মানুষ হতে বেশী আর সময় লাগবে না।

বইটা পেয়ে দু-তিন দিন বাবা নাওয়া-খাওয়ার কথাই ভুলে গেলেন। বাড়িঘরের কথা মনে থাকল না। সারাটাক্ষণ উবু হয়ে গোটা পঞ্জিকাটা পড়ে বোধ হয় শেষ করে ফেললেন। কোনো পাতায় আবার দুটো লাইন দেগে দিলেন। বইটা কোথায় রাখা যাবে, এই নিয়েও বড় সমস্যা দেখা দিল। পিলুকেই বেশি ভয় বাবার। ছবি দেখতে গিয়ে ছিঁড়ে না ফেলে। মলাট দেবার মতো বাড়তি কাগজ নেই। তিনি বইটি রাখার মতো কোনো জায়গাই ঘরে নির্বাচন করতে পারলেন না। ট্রাংক ভাঙা। যে কেউ খুলতে পারে। নিবারণ দাস দিলই যখন বাড়তি একটা তালা চাবি দিলে পারত। কোথায় এখন যে রাখা যায়!

মা বলল, দাও তুলে রাখি।

—কোথায়

—কেন ট্রাংকে।

—থাকবে ভাবছ?

—থাকবে না তো কে খাবে!

—তোমার মূর্তিমান শ্বাপদেরা সব করতে পারে। সব খেতে পারে।

পিলু বলল, আমি ধরব না তো বলেছি।

আমিও বললাম, কেউ ধরবে না বাবা, তুমি ভাঙা ট্রাংটাতেই রাখ। মা বলল, তোরা কিছু বলতে যাস না। তারপর কিছু হলে সব দোষ তোদের।

কিন্তু দু দিন ধরে পঞ্জিকাটা বাবাকে ভারি বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রেখেছে। তিন দিনের দিন বাবা শেষ পর্যন্ত ট্রাংকে রাখাই স্থির করলেন। এত করেও পঞ্জিকার ভবিতব্য সম্পর্কে খুব একটা সংশয় থেকে গেল তাঁর। পিলুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার তো সংসারের সব কিছুই কাজে লাগে। এটাকে আর কাজে লাগাতে যেও না।

পিলু বলল, আমি ধরবই না।

যতই বলুক, আমিও বাবার মতো শেষ পর্যন্ত পিলুই অনিষ্টের কারণ হবে ভাবলাম। কারণ পিলুকে বিশ্বাস নেই। সে আজকাল সহজেই একশ রকমের মিথ্যে কথা বলতে শিখেছে। এবং সেবারে বাবা প্রায় মাসখানেক বাদে নিরুদ্দেশ থেকে ফিরলে আনন্দে পিলু বনটার এমন সব জীবজন্তুর খবর দিয়েছিল তার সাহসিকতা প্রমাণের জন্য যে একটা কথাও সত্যি না। বাবার একটা আমলকী গাছের চারা পিলু তুলে নিয়ে তার পছন্দমতো জায়গায় ফের পুঁতে দিলে গাছটা মরে গেল। পিলু স্বীকারই করল না সে কাজটা করেছে। আমরাও ঠিক দেখি নি, বাবা বাড়ি নেই, খাওয়া-দাওয়ার ঠিক নেই, পিলু বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়—এরই মধ্যে কখন

সে কাজটা করেছিল আমরা কেউ জানিও না। অথচ পিলু ছাড়া এত বড় দুঃসাহসিক কাজ আর কেউ করতে পারবে না। তিন ক্রোশ দূর থেকে বাবা হেঁটে গিয়ে চারাটা এনে ছিলেন। ফিরতে ফিরতে সাঁজ লেগে গেছিল। বাবা সকালে গর্ত করে গাছটা লাগিয়েছিলেন। পিলু বলেছিল, তুমি রাস্তার পাশে লাগালে বাবা! সব আমলকী লোকে চুরি করে নিয়ে যাবে।—এই সুমার বনে লোক আসবে কোত্থেকে? পিলু বলেছিল, গাছটা বড় হতে হতে সুমার বনটা আর থাকবেই না। মানুষজন ঠিক চলে আসবে। ফল হলে চুরি যাবে ভয়ে সে ঠিক গাছটা ঘরের পেছনে বেশ একটা নিরিবিলি জায়গায় পুঁতে দিয়েছিল বোধ হয়। এবং শেষে মরে গেছে বলে বেশ কিছুদিন বাবা বাড়ি ফেরা পর্যন্ত ভাল মানুষ হয়ে ছিল। বাবার চেঁচামেচিতে বুঝতে পেরেছিলাম পিলুর খুব সদাশয় হয়ে যাওয়ার মূলে ছিল গাছটা।

তবে আমাদের সৌভাগ্য বাবা রাগ খুব বেশিক্ষণ পুষে রাখতে পারেন না। খেতে বসে বাবা পিলুর পাতে বড় পুঁটি মাছটা তুলে দিয়ে বলেছিলেন, খা। একটা আমলকী গাছ কোথায় আবার পাই। আমলকী ফল অজীর্ণ রোগে কত কাজে লাগে জানিস!

পিলু বেশ বড় মাছটার লেজ থেকে মাছ তুলে দুবার মাছটা চাটল। তারপর এক গাল হেসে বলল, জান বাবা কটা বাবু মতো লোক এসে না বনটা দেখে গেছে।

বাবা বললেন, কারা ওরা?

—আমি তখন না বাবা মাঠে ছিলাম। আমাকে বলল, খোকা তুমি থাকো কোথায়। বনের ভেতরে বাড়িটা দেখালে,বলল, এই জঙ্গলে তোমরা থাক। ভয় লাগে না?

জঙ্গল বলায় পিলুর খুব রাগ হয়েছিল। সে বলেছিল, জঙ্গল কোথায়। এটা তো একটা বন।

—তোমার বাবা বাড়ি আছেন?

—বাবা কোথায় গেছেন।

—কোথায়, জান না?

—না। বাবা মাঝে মাঝে আমাদের ফেলে চলে যান।

এতে বোধ হয় বাবার আত্মসম্মানে লেগেছে। তিনি বললেন, কোথায় যাই আবার! দেশ গাঁয়ের লোক কে কোথায় এসে উঠছে খুঁজতে হয় না। এখানে আমাদের আর কে আছে! ওরা কোথাকার লোক জিজ্ঞেস করিল না?

—বলল কোটালি পাড়ার লোক।

—কোন কোটালিপাড়া ? বুলতার কোটালিপাড়া না ফরিদপুরের কোটালিপাড়া। আর একটা কোটালিপাড়া আছে কিশোরগঞ্জের কাছে। এতকিছু বোঝ আর এটা বোঝ না। কোন কোটালিপাড়া জিজ্ঞেস করতে হয়। ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার মজুমদার মশাইরা তো রানাঘাটে বাড়ি করেছে।

বাবার ভূগোল এত জানা যে মাঝে মাঝে মনে হত অনায়াসে বাবা পৃথিবীর সব খবর দিয়ে যেতে পারেন। আসলে বাবা জমিদার স্টেটে আদায়ের কাজ করেছেন। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত বাবাকে। কত সব মানুষ পৃথিবীতে বাবার চেনা হয়ে গেছে। তখন বাবার জন্য আমরা গর্ববোধ না করে পারতাম না।

বাবা আবার ফিরে আসায় সংসারে সবাই ফের নিশ্চিন্ত। কটা দিন আবার পেট ভরে খাওয়া। বাবা এ-কটা দিন কোথায় কি-ভাবে কাটিয়েছেন সারাক্ষণ সেই গল্প। কোথায় অনেকদিন পর কার বাড়িতে এই কর্তাঠাকুরটিকে পাবদা মাছের ঝোল খাইয়েছে তার বিশদ ব্যাখ্যা টীকা সহকারে মাকে বোঝাচ্ছিলেন।—পাবদা মাছ, তবে বুঝলে ধনবৌ, দেশের মতো না! তেমন পাবদা মাছ এ-দেশে পাওয়া যাবে কেন। এবং এই পাবদা মাছ প্রসঙ্গে বাবা এমন নিদারুণ সব ঝালঝোল শুকতোনির গল্প করছিলেন যে রাতে আর আমাদের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আমরা সবাই মশারির ভেতর থেকে মুখ বার করে বাবার পাবদা মাছ খাওয়ার কথা শুনছিলাম।

পিলু বলে ফেলল, আমরা একদিন খাব বাবা।

—খাবে তো পাবেটা কোথায়। খেতে হলে রানাঘাটে যেতে হয়।

পিলু বলেছিল, রানাঘাট কতদূর বাবা ?

—অনেক দূর। বড় হলে যাবে।

আমি বললাম, ও মা, তুই কি রে! আমরা যখন এদেশে এলাম তখন তো রানাঘাটের ওপর দিয়েই এলাম।

—সত্যি! পিলুর যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না।

মা বলল, ওর মনে না থাকারই কথা।

—রানাঘাটে আমরা রাতে ট্রেন বদল করলাম না বাবা! স্টেশনে ম্যাজেন্টা রঙের আলো। কি রকম অদ্ভুত একটা দেশ মনে হচ্ছিল আমার। আর কত গাড়ি। এদিকে গাড়ি ওদিকে গাড়ি। মাথার ওপর দিয়ে একটা পুল চলে গেছে। ঘটাং ঘটাং শব্দ।

পিলুর বুঝি মনে হল ওটা একটা স্বপ্নের দেশ। সে বড় হয়ে একবার রানাঘাটে যাবে বলল।

বাবাও খুব আত্মবিশ্বাসের গলায় বললেন, এত দেশে গেছ আর রানাঘাটে যাবে না সে হয়।

এত দেশ বলতে তো আমাদের নিয়ে বেড়ালছানার মতো দুটো বছর এখানে সেখানে বাবা ঘুরে বেড়িয়েছেন। নবর বাবার খোঁজে তিনি সেই যে আমাদের প্ল্যাটফরমে ফেলে চলে গেলেন আর আসেনই না। সারাদিন না খেয়ে থাকার পর পিলু একটা বাড়ির পাশে শসার মাচান আবিষ্কার করে ফিরে এল। বিকেলে সে আমাকে নিয়ে সব দেখাল। আট দশটা কচি শসা। আমাদের চোখ মুখ এত ক্ষুধার্ত থাকত যে লোকে দেখলেই তেড়ে মারতে আসত। মা তো নির্বিকার। স্টেশনে দিনের পর দিন বাবার ফিরে আসার আশায় বসে আছে। পিলু সারাদিন না খেয়ে থাকলে ভীষণ বেয়াড়া হয়ে যায়। মাকে যা খুশি গাল দেয়। সেদিন সন্ধ্যায় দেখি দূরের মাঠে সোরগোল। পিলু কাছে কোথাও নেই। মাঠে দেখছি একদল ছেলে পিলুকে ঠ্যাঙাবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আর পিলুর সেই আর্ত চিৎকার—দাদা রে। সেই প্রথম আমার মাথায় ভীষণ বুনো একটা মোষ তাড়া দিয়ে উঠেছিল। ছুটে গিয়েছিলাম। সবার ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে বলেছিলাম, আমার ভাইকে ছেড়ে দিন। ও শসা চুরি করেনি। আমরা খুব গরীব। বাবা তিন চারদিন হল কোথায় গেছে!

সেই ষণ্ডামতো ছেলেগুলো আমাকে দেখে কি ভাবল জানি না, পিলুকে ছেড়ে দিয়েছিল। বলেছিল, হারামজাদা, তোমার ভাইকে সহ এবার তোমাকে প্যাদাব। আবার যদি দেখি এদিকে ঘুরঘুর করছ কখনও।

সবিনয়ে বলেছিলাম, আর আসব না ইদিকে। পিলুর দিকে তাকিয়ে খুব গার্জেনি গলায় বললাম, তুই চুরি করেছিস। সত্যি করে বল?

—নারে দাদা! মিছি মিছি ওরা আমাকে ধরে নিয়ে ঠ্যাঙাবে বলছে।

ওরা চলে গেলে পিলু ভারি সন্তর্পণে বলল, বাবাকে খুঁজতে যাবি আবার?

—কোথায়?

—চল না। বলে সে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বড় একটা ইটের ভাঁটায়। কেবল জঙ্গল আর আগাছা। সামনে বড় বড় সব শিরীষ গাছ। পর পর সব উইয়ের বড় ঢিবি। ঢিবিগুলি পার হলে সুন্দর মতো দুটো মিনার। বোধহয় এখানে কোনো দরগা আছে। মেলা বসে কখনো। সে কি সব চিহ্ন দেখে ক্রমে গভীর জঙ্গলে ঢুকে যাচ্ছিল। এখানে বাবা কেন মরতে আসবে বুঝতে পারছিলাম না। সে একসময় শিশুর মতো সরল গলায় বলল, এই যে পেয়েছি। ঘাস পাতা সরিয়ে ফেলল সে দু হাতে। জগজগ করছে কটা কচি শসা। সত্যি পিলু চুরি

করেছে তবে। পিলু চুরি করেছে বাবা জানতে পারলে খুব কষ্ট পাবেন। সে বলল, দাদা, তুই বাবাকে বলে দিস না। কিরে বলে দিবি না তো?

পিলুর এত ভারি কষ্টের মুখ আর আমি জীবনেও দেখিনি। বললাম, বলব না। পিলুর ওপর রাগটাও আর বেশিক্ষণ থাকল না। পেটের খিদেটা যে কি, যে কোনো কুকর্মই এসময় খুব মহৎ কাজ মনে হয়। কিছুক্ষণ আগে যে পিলুকে সেই ষণ্ডামতো ছেলেগুলো ঠ্যাঙাবে বলে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, শসা কটা পিলু বাদে যে আর কেউ চুরি করেনি—ওরা ঠিকই ভেবেছিল, এবং আমার ভাই পিলু, তা ছাড়া পিলু আমার বাবার মতো মানুষের ছেলে, আমার সম্মানে খুব লেগেছিল—সে সব কিছুই আর মনে পড়ছিল না।

চারপাশে তাকিয়ে বললাম, কেউ আবার যদি দেখে ফেলে?

—কত বড় জঙ্গল। কেউ এখানে আসেই না।

সত্যি বনজঙ্গলটা বেশ বড়। অদূরে রেল-লাইন, ইস্টিশান, লাল ইটের বাড়ি। পাড়াগাঁয়ের মানুষজনের চলাফেরার আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। শসা কটা জামার তলায় লুকিয়ে ফেলা দরকার। কে কোথায় আবার দেখে ফেলবে। এত সব গাছপালা পাখি, কাউকে যেন বিশ্বাস নেই। প্ল্যাটফরমে আমাদের থাকা খাওয়া এবং শসা কটা কি যে অমূল্য ধন তখন, আমি খাব, পিলু খাবে, মা খাবে, মায়া তো সব কটা একাই খেয়ে নিতে চাইবে। কিন্তু মা যদি না খায়। চুরি করা শসা মা না-ও খেতে পারে। তা ছাড়া মার মাথাও খুব একটা ঠিক নেই। বাবার আক্কেলের কথা ভেবে অদৃষ্টকে শাপমণ্যি করছে। আর ইস্টিশানে ট্রেন এলে আমরা দু ভাই ছুটোপুটি লাগিয়ে দিই। এই বুঝি ট্রেন থেকে বাবা নামল। কত লোক আসে ট্রেনে, অথচ বাবার মতো মানুষ ট্রেন থেকে একজনও নামে না। তখন পিলুর এই দুর্বুদ্ধিকে দুঃসময়ে বাহবা না দিয়ে পারা যায় না। পিলুর প্রতি বরং প্রগাঢ় ভালবাসাই আমার প্রবল হয়ে উঠল। পিলু বলল, দাদা তুই একটা খা, আমি একটা খাই। সে একটা আমাকে দিল, নিজে নিল একটা। আর একটা শসা দেখিয়ে বলল, এটা মায়ার। এটা খাবে মা। দুটো থাকল, কাল সকালে খাব। পিলু খুব হিসেবী মানুষের মতো বলল, বাবা ফিরে না আসাতক আমাদের বেঁচে থাকতে হবে দাদা। প্ল্যাটফরমে ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে গেল।

বাবার হাতে পয়সা নেই। রেলগাড়িতে বাবার টিকিট লাগে না। পয়সা না থাকলে মানুষের যা হয়। খুব মিশুকে স্বভাবের মানুষ—যেখানেই তিনি যান একসময় ঠিক ঠাকুরকর্তা বনে যান। ফলে পয়সা না থাকলেও কিছু আসে যায়

না। ঠিক ট্রেনে চড়ে দূরদেশে চলে যেতে পারেন। বাবা কোথায় কি খায়, কি পরে, কে জানে। কোথায় ভাল মাছ দুধ পাওয়া যায়, চালের দাম কত কিংবা কোথাও যদি কিছু যজন-যাজন করা যায় সেই আশায় বোধ হয় কেবল বাবা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দেশ ছেড়ে এসে বাবা খুব অথৈ জলে পড়ে গেছেন—কিছু একটা করা দরকার, বাবার মুখের দিকে আমরা আর তখন তাকাতে পারতাম না।

প্ল্যাটফরমের পানিপাঁড়ে বলল, কোথায় গেছিলে ছেলেরা ? বাবার খোঁজ মিলল।

পিলু বলল, বাবা কি আমার নিখোঁজ হয়েছে ?

—শুনেছি, তোমাদের ফেলে কোথায় চলে গেছে।

আমার ভীষণ রাগ হচ্ছিল পানিপাঁড়ের কথায়। বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, আমার বাবা কি তেমন মানুষ! আমাদের জন্য তাঁর কত দুর্ভাবনা। তবু কিছু বললে, কি আবার ভাববে, ওদের দয়াতেই এখানে পড়ে আছি। আবর্জনার মতো ঝেড়ে ফেললে যাবটা কোথায়।

পিলু এবং আমি খুবই সন্তর্পণে হাঁটছি। জামার নিচে বাকি কটা শসা। ধরা পড়ে গেলেই হয়েছে। সব চেয়ে ভয় আমার নিজের মাকেই। বলতে পারব না চুরি করে এনেছি। বরং বলা ভাল বড়বাবুর বউ দিয়েছে। কিন্তু মা তবে সকালেই জল আনতে গিয়ে বড়বাবুর বউকে কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারবে না। আমাদের এই দুঃসময়ে একটুকু কেউ দয়া দেখালেই মা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়ে। সুতরাং বুদ্ধি-বিবেচনায় যখন মাথায় কিছুই আসছিল না, পিলু বলল, মাকে সত্যি কথা বললে কিছু বলবে না দেখিস। এবং মাকে সব খুলে বলতেই কেমন তাড়াতাড়ি শসা কটা লুকিয়ে ফেলল। ধমক খেতে হতে পারে, এমনকি, ঠ্যাঙাতেও পারে—আর কত সহজে মা আমার, শসা কটা লুকিয়ে ভাল মানুষের ঝি হয়ে গেল।

আমি মায়ের যেহেতু খুব সুপুত্র, বললাম, পিলুর কি সাহস মা!

ছোট বোন মায়া পাশে পা গুটিয়ে ঘুমিয়ে আছে। পুনুটাও ঘুমে অচেতন। কেবল আমরা তিনজন প্ল্যাটফরমে জেগে। যেন যে কোনো সময় দেখব প্ল্যাটফরম পার হয়ে বাবা চলে আসছেন। মা শুধু বললে, ভগবান তো মানুষকে উপোষ রাখেন না।

পিলু দিগ্বিজয়ী বীরের মতো বলল, মায়া ওঠ। দেখ কি এনেছি।

মা বলল, না বাবা না। ডাকিস না। অনেক করে ঘুম পাড়িয়েছি, খাব খাব করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছে। থাকুক। সকালে তো হাতের কাছে কিছু নেই। নীল লণ্ঠন দুলিয়ে একটা লোক হেঁটে চলে গেল। মা এই লোকটাকে দেখলেই

মাথায় বড় ঘোমটা টেনে দেয়। ছেঁড়া মাদুর কাঁথায় একটা সংসার লেপটে আছে। বড় করুণ দেখায় প্ল্যাটফরমটা। যাত্রীরা তাকায়, দেখে। নতুন এই সব উদ্বাস্তুতে সব স্টেশনগুলি ভরে যাচ্ছে। কোনো সময় অযথা গালিগালাজও করতে থাকে কেউ। আমাদের সব গা-সওয়া হয়ে গেছে। মনেই করতে পারছি না, আমাদের আবাস ছিল একটা। সেখানে শিউলি ফুলের গাছ ছিল। শরৎকালে আমরা ভাইবোনেরা মিলে ফুল তুলেছি। স্থলপদ্ম গাছ থেকে পদ্ম তুলে এনেছি। বাবা হাট থেকে তাজা আস্ত ইলিশ কিনে এনেছেন। বাড়িতে লক্ষ্মীপূজা হয়েছে। আমের দিনে আম, লিচুর দিনে লিচু পেট ভরে খেয়েছি। বড় মাঠ ছিল, কখনও পার হয়ে গেছি তা। পুজোর ছুটি পড়লে স্কুল থেকে ফেরার পথে নৌকা ডুবিয়েছি জলে—কিছুই আর মনে করতে পারছি না। যেন কতদিন থেকে এমন একটা প্ল্যাটফরমে পড়ে আছি। আমাদের বাড়িঘর ছিল এখন দেখলে কে আর এটা বিশ্বাস করবে। আর সেই কবে থেকে একটা ট্রেন আসে যায়, সূর্য ওঠে আকাশে, শরতের জ্যোৎস্নায় পৃথিবী ভেসে যায়, বাবা তবু আসেন না। বাবার মতো মানুষ আর নেমে আসে না ট্রেন থেকে।

ঘুম থেকে সকালে উঠেই অবাক। ট্রেন থেকে বাবা নামছেন। ইয়া বড় বড় পুঁটলি। ডেকেডুকে যেন গোটা প্ল্যাটফরমটাকেই কাঁপিয়ে তুলছেন।—নামা নামা। পিলু, ও বিলু, বাবা তাড়াতাড়ি আয়। ধর সব। দেখিস যেন কিছু থেকেটেকে না যায়। শ্রাদ্ধের কাজটাজ কিছু সেরে বাবা ফিরেছেন। আমরা টেনে টেনে নামাচ্ছি। মাথায় করে নিয়ে যাচ্ছি। ছেঁড়া শীতলপাটিতে বসে বাবা তখন তালপাতার হাওয়া খাচ্ছেন।—তা দেরি হল একটু। বামুন মানুষ, হাতের কাছে কাজ, ফেলে আসি কি করে।

আমার মা তখন শুধু চোখের জল ফেলছিল। কিছু বলছে না। সব গোছগাছ করে রাখছে। সকালের রোদ আমাদের খুব মনোরম লাগছিল। এমন সুন্দর দিন মানুষের জীবনে খুব কমই বুঝি আসে। পিলু তখন ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছিল। পুনু বাবাকে দেখেই কোলে গিয়ে বসে পড়েছে। মায়া বাবাকে হাওয়া করছে। টের পেলাম, আমার বাবার হাতেও একটা নীলবাতি আছে। বুঝতে পারলাম, সিগনাল ডাউন। আমাদের গাড়ি ছাড়ার আবার সময় হয়ে গেছে। কোথায় গিয়ে গাড়িটা শেষ পর্যন্ত থামবে জানতাম না। আমাদের ছিল তখন এখানে সেখানে ছুটে বেড়ানোর জীবন। একটা নীলবাতি নিয়ে বাবা তাঁর বাড়িঘর খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

॥ চার ॥

পড়াশোনার ব্যাপারটা আমাদের এখনও কিছু তেমন ঠিকঠাক হয়নি। দেশ ছেড়ে আসার সময় আমার কিছু বই সম্বল ছিল। সে ইতিহাস, ভূগোল অঙ্ক সব ক্লাসেই চলবে এমন ভেবে বাবা পাকাপাকিভাবে বাক্সে তুলে রেখেছিলেন। দুটো একটা বের করে নিতে বলেছেন। বাবার ধারণা ঠিকঠাক হয়ে বসতে না পারলে পড়াশোনায় মন বসবে না আমার।

বিউগিল বাজলেই বুঝতে পারতাম পাঁচটা বাজে। সকাল হয়ে গেছে। ব্যারাকে ফল-ইনের সময়। এবারে দূরে মানুষজন দেখতে পাব বলে বারান্দায় এসে দাঁড়াতাম আমরা, বাছারি ঘরটার টিনগুলি বাইরে টানা। ছায়া পড়লে বারান্দা হয়ে যায়। ঘরটার একমাত্র দরজা খলপা দিয়ে তৈরি। একটা তেলতেলে বাঁশের খুটি—দরজাটা ধরে রাখার জন্য ঠ্যাকার কাজ করে। একপাশে ছোট্ট বেড়া দিয়ে মাকে ঘরের সংলগ্ন রান্নাঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। গোবরে লেপা উনুনের পাশে আছে বড় একটা মেটে হাঁড়ি কাঁঠালের বিচি ভরা। সকালের জলখাবার গোনাগুনতি কাঁঠাল বিচি ভাজা। কারো ভাগে একটা কম হতে পারত না, বেশি হতে পারত না। বাবা কখনও ছেলেমানুষের মতো হাত পেতে বলতেন, বেশ খেতে। আর দুটো দাও না।

মা নির্বিকার। এমন উদাসীন মা, একটা আর কথা বলত না বাবার সঙ্গে। বাবা ভয়ে ভয়ে উঠে যেতেন।

তখন বাদশাহী সড়কের ওপর দিয়ে মার্চ করে যেত পুলিসেরা। কখনও ডবল মার্চ, কখনও কুইক মার্চ করে তারা যাচ্ছে। আমার ভীষণ ইচ্ছে হত, বড় হলে আর স্টেশনমাস্টার হয়ে কাজ নেই। বরং পুলিস হব। বাবা বলেছেন, এতে খুব উন্নতি। খুব বড় সাহেবসুবো হতে বাধে না। কাজ দেখাতে পারলে দারোগা পর্যন্ত হওয়া যায়। কোনো হাবিলদার বাড়ির পাশ দিয়ে যাবার সময় ডাকতেন, ঠাকুরমশাই আছেন। বাবার সঙ্গে কি সব কথাবার্তা হত। এবং কথাবার্তা শেষে বাবাকে মনে হত খুব অসহায়। এমন অবিষয়ী মানুষের জন্য বোধহয় লোকটারও করুণা হত। বলত, কি ঠাকুরমশাই, মরতে আর জায়গা পেলেন না। এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গায় বাস করতে চলে এলেন।

বাবা কিছুতেই অবশ্য শেষ পর্যন্ত দমে যেতেন না। কারণ দমে গেলেই মা বাবাকে

পেয়ে বসবে। কোথায় কি কথাবার্তা হয় যার কান খাড়া করে শোনার অভ্যাস। —লোকটা কি বললো গো। সুতরাং বাবা বিচলিত হতেন না শেষ পর্যন্ত। খুব আত্মবিশ্বাসের গলায় বলতেন, মাটি, বুঝলে না, একবার সব আগাছা সাফ করতে পারলে দেখবে ফসল। জমি জুড়ে শুধু ধান। শীতের দিনে কলাই। সামনের জমিটাতে আম, জাম, লিচুর গাছ লাগিয়ে দেব। বড় হলে কত ফল। কত পাখপাখালি দেখবে তখন উড়ে আসবে। জমির ধানে সম্বৎসর চলে গেলে দুটো একটা বাতাবি লেবুর গাছ লাগিয়ে দেব ভাবছি। এমন জমি মানুষ পতিত ফেলে রাখে।

আসল কথা অবশ্য কাউকে বলা যাবে না। বাবা খবর পেলেন মানুকাকা বহরমপুরে থাকে। বাবার সম্পর্কে পিসতুতো ভাই। খবর পেয়েই লটবহর নিয়ে রওনা। এবং কোনো দ্বিধা না করে পরম আত্মীয়ের মতো ভাই-এর বাড়িতে উঠে পড়লেন। আমাদের সেই কাকাটি বাবাকে দেখে একেবারে হতবাক। এতগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে কোনো খবর না দিয়ে কেউ কখনও আসে! দেশে অবশ্য খুবই যাওয়া-আসা ছিল। কাকার মা, এবং ভাইবোনেরা ঠাকুরদা ঠাকুমা বেঁচে থাকতে বর্ষায় দু-চার হপ্তা বেড়িয়ে যে না গেছে তাও না। সংসারে কোনো অভাব ছিল না বলে বাবা কিছুতেই তার পিসিকে এবং ভাই বোনেদের যেতে দিত না। সেই সুবাদে খবর পেয়েই সোজা সেখানে উঠে বললেন, চলে এলাম মানু। দেশ থেকে যা এনেছি শেষ। শোনলাম তুই এখানে আছিস। তুই যখন আছিস তখন আর ভাবনা কি। কিছু একটা ঠিক হয়ে যাবে। কি বলিস! কাকা ঢোক গিলে বললেন, তা হয়ে যাবে!

কদিন যেতে না যেতেই কাকীমার গঞ্জনা শুরু হয়ে গেল। কাকা সারাটা দিন বাড়ি থাকে না। অফিসে থাকে। বাবা চুপচাপ বসে থাকেন মাদুরে। আগে তবু একটা চেষ্টা ছিল, এখানে এসে ওঠার পর বাবা কদিনেই কেমন ভালমানুষ হয়ে গেছিলেন।

কাকা একদিন বলল, সরকারী ক্যাম্পে উঠে যান দাদা। ক্যাম্পের খাওয়াদাওয়া মন্দ না। আমাদের অফিসের বড়বাবুর ভাই ক্যাম্পে চলে গেছে।

অভাব অনটনের কথা বোধহয় পাড়তে যাচ্ছিল, বাবা বললেন, ক্যাম্পে কোনো জাত বিচার নেই'। আমি উঠি কি করে! তার চেয়ে এদিকে কোথাও পুজোআর্চা করে যদি থেকে যেতে পারতাম। তোর বৌদির তাই ইচ্ছা।

অবশ্য আমি বুঝতে পেরেছিলাম, বাবার পৃথিবীটা কবেই ধুয়ে মুছে শেষ হয়ে গেছে। মানুকাকারও বিড়ম্বনা। তাঁর ছেলেমেয়েরা আমার বয়সী, শহুরে মানুষ।

পরিচয় দিতে কিছুটা কুণ্ঠাবোধ হওয়া স্বাভাবিক। এবং আমার মা কেমন সেই প্রথম মনে হল বাবাকে ডেকে গোপনে কিছু বলল। বাবা বললেন, তাই বুঝি। এবং পরদিনই বাবা মানুকাকার সঙ্গে কোথায় গেলেন। ফিরলেন রাত করে। বাবা ফিরেই বললেন, সব ঠিক হয়ে গেল, আর তোমাদের ভাবনা নেই।

সলতে জ্বালাবার শেষ তেলটুকু গোপনে এতদিন কি করে এত কষ্টের মধ্যেও সঞ্চয় করে রেখেছিল মা ভাবলে অবাক হতে হয়। অবশ্য জমি এবং যথার্থ বন ভূমিতে হাজির হয়ে মার চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছিল—তাই বলে শেষ পর্যন্ত এখানে!

বাবা বলেছিলেন, একেবারে জলের দরে জমি। একশ টাকায় কত জমি দেখ। তা তোমার পুরো একশও ছিল না। মানু কিছু দিয়েছে। জমির শেষ কোথায়, সীমানা কোথায় কিছুই বোঝার উপায় নেই। বাবা উত্তরে দক্ষিণে পুবে পশ্চিমে চারটে গাছ দেখিয়ে বললেন, এই তোমাদের সীমানা। এ জায়গা তোমাদের। বনের ভেতর সেই বড় চারটে গাছ সব কটাই শিরীষ। এবং লম্বা বরাবর আর যা আছে মাঝখানে, তার মালিক আমার বাবা। বাবা বনটার পাশে গ্রীকরাজের মতো দণ্ডায়মান ছিলেন। যেন বনটা রাজা পুরুর মতো বশ্যতা স্বীকার করতে চাইছে না। বাবা বললেন, এখানেই জঙ্গল সাফ করে তোমাদের আবাস তৈরি হবে। আগাছা জঙ্গল সাফ করে বুঝতে হবে কতকটা জমি শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। রাজবাড়ির আমলারা তো বেজায় খুশী। বলেছে বনটায় লোকবসতি দেখলেই জমির দর বাড়বে। এবং যা বললেন, তাতে মনে হয়েছিল, টাকা না দিলেও প্রথম আবাস করার দুঃসাহসের জন্য মিনি-মাগনায় জমিটা পাওয়া যেত। সুতরাং জলের দরে জমি—একটা অদূরে গাছ দেখে বোঝা যাচ্ছিল জমির সীমানাটা কোথায় শেষ। জঙ্গল সাফ করে শেষ পর্যন্ত কবে সেখানে পৌঁছনো যাবে সেটা বাবার ঈশ্বরই একমাত্র বলতে পারেন। বরং জমি না বলে বন বলা ভাল। বাঘের নিবাস ছিল, এবং যে দুটো-একটা এখনও নেই কে বলবে। বাবা যতই সাহসী হোন অদূরে পুলিস ব্যারাক না থাকলে এখানে বাড়িঘর করার সাহস পেতেন না। সব বাবলা গাছ, নানা রকমের সব লতা, কাঁটা ঝোপ কোথাও কোথাও সব মরা গাছের গুঁড়ি, ভাঙা ইটের ভাঁই। যত সাফ করে এগোনো যাচ্ছে, তত সব আবিষ্কার করা যাচ্ছে। হেস্টিংসের আমলের কুঠিবাড়িও বনের ভেতর মিলে যেতে পারে—কিংবা নগর-টগর ছিল—এখন শুধু তার ধ্বংসাবশেষ। বাবা সারাদিন কোদাল কুপিয়ে আগাছা তুলছেন, সঙ্গে আমি

এবং পিলু। আর ঠুং করে কোদালে শব্দ হলেই বাবা খুব সচকিত হয়ে উঠতেন ; বুঝি আছে কোথাও কোন গুপ্তধন। তিনি ঝুঁকে বসতেন, কোদাল মেরে সেই ইষ্টকখণ্ডের নাড়িসুদ্ধ টেনে তুলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেন—ইষ্টকখণ্ড, না আসলে স্বর্ণপিণ্ড—বহুকাল মাটির নিচে পড়ে থাকায় বিবর্ণ হয়ে গেছে।

সবাই দৌড়ে আসত। মা পর্যন্ত। মার মুখের কাছে নিয়ে বাবা বলতেন, কি মনে হয় ? কেমন শক্ত দেখ। পাথর। পাথর আসবে কোত্থেকে। মা কিছু না বলা পর্যন্ত ফেলে দিতে পারতেন না।

মা বলত, তার কি মনে হয়! আমাদের কপাল খুলবে, তালেই হয়েছে।

বাবা অভয় দিয়ে বলতেন, পেয়ে যাব। ঠিক পেয়ে যাব। বুঝলে এটা কাশিম-বাজার কুঠির কাছাকাছি জায়গা। একসময় খুব বড় নগর ছিল এখানে। কলকাতা শহর আর কত বড়, তার চেয়ে বড় শহর ছিল। মানুষজন, কুঠি সাহেবরা, পৃথিবীর সোনাদানা সব লুটেপুটে এখানে এনেই জড় করেছিল। নবাব বাদশা সদাগর, বেনে কি না ছিল! কত নীলকুঠির ধনরত্ন এখানে সেখানে মাটির নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ঠিক পেয়ে যাব।

একদিন ছোট দুটো শালগাছের চারা আবিষ্কার করা গেল। বাবা বললেন, থাক, বড় হলে কাজে লাগবে।

সারাদিনে বাপ বেটা মিলে পাঁচ-সাত হাত জমি সাফ করে ওঠা যেত না। আর মাঝে-মধ্যেই বাবার রহস্যময় অন্তর্ধান তো লেগেই আছে। তখন আমার পিলুর ছুটি। পিলু এখন এই বনভূমিটার ছোটখাটো একজন সামন্ত রাজ। আর আমি হচ্ছি তার দাদা।

কত রকমের সব যে লতাপাতা! আশ্চর্য লাল নীল ফুল বনের গভীরে ফুটে আছে। জঙ্গলের ভেতরে অদ্ভুত বড় বড় সব গিরগিটি, গোসাপ, বেজি। একটু সমতল মতো জায়গায়, যেখানে বেশ সবুজ ঘাস আছে এবং একটা ছোটখাটো উপত্যকার মতো মনে হয়, ঢুকে গেলে, দেখা গেল দুরন্ত খরগোশেরা ছুটছে। আমাদের মটরশুঁটি গাছগুলোর ডগা রাখা যাচ্ছে না। কারা খায় বোঝাও যাচ্ছে না। সজারু এসে খেতে পারে—পিলু বলেছিল। বাবা বলেছিলেন, সজারু ডগা খায় না। মূল খায়। এবং এক সময় খরগোশের খবর প্রথম পিলুই এনে দিয়েছিল বাবাকে।

বাবা বললেন, খরগোশের মাংস খুব সুস্বাদু। কখনো খেয়েছ ? আমরা কি খাই না খাই বাবার চেয়ে আর কে ভাল জানে! তবু তাঁর এমনধারা প্রশ্ন ছিল। যেন আমরা কত কিছু তাঁকে না দিয়ে খেয়ে নিচ্ছি।

বাবা আরও বললেন, সজারুর মাংস খেতেও বেশ। তবে একটা দিন মাটির নিচে রাখতে হয়। তা না হলে গায়ের বুনো গন্ধ যায় না।

বাবার রহস্যময় অন্তর্ধানের সময় আমরা একেবারে শুধু বনআলু খেয়ে দিন কাটাই সেটা বোধহয় তাঁর খুব মনঃপূত ছিল না। সঙ্গে মাংসের ঝালঝোল, বেশ জমবে তবে। আর বাবাও নিশ্চিন্তে দুটো দিন দেরি করে ফেললে, কিছু আসবে যাবে না। এ সব ব্যাপারে বাবা পিলুকে যতটা গুরুত্ব দিত, আমাকে তার সিকি ভাগ দিত না। এবং একবার বাবা না থাকায় পিলু ঠিক দুটো খরগোশ শিকার করে চলে এল। মা বলল, করেছিস কি। এমন সুন্দর দুটো খরগোশকে মেরে ফেললি!

পিলু খুব মুষড়ে পড়ল। বলল, বাবা যে বলেছেন খরগোশের মাংস খেতে বেশ।

—তোমার বাবা এবার আরও কি তোমাদের খেতে বলবেন কে জানে।

পিলু খুব একটা অপরাধ করে ফেলেছে—কি করা যায়। মা কিছুতেই রাঁধতে রাজী হচ্ছে না। অগত্যা এ-সব ক্ষেত্রে সে আমারই শরণাপন্ন হতে পছন্দ করে। মায়া তো উল্টে-পাল্টে দেখে ওক তুলে ফেলল। এবং আমিই বললাম, ঠিক আছে, তোমরা কেউ খাবে না। আমি, পিলু খাব। এবং যখন কেটেকুটে থালায় রাখা হল, হলুদ বেটে মাখা হল, সামান্য আদা বাটা, রসুন, পেঁয়াজ দিয়ে বেশ সুঘ্রাণ তৈরি হয়ে গেল, তখন মা বলল, দাও রেঁধে দিচ্ছি। তোমরা তো দেশ ছেড়ে এসে এক-একজন বকরাক্ষস হয়ে গেছ। এখন যা পাবে তাই খাবে।

কিছু চাল ছিল ঘরে, মা দুটো ভাতও ফুটিয়ে দিল। এবং খেতে বসে দেখা গেল, কেউ বাদ গেল না। মা নিজেও বড় পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে ফেলল শেষটুকু। বলল, খেতে তো বেশ। তোর বাবা এলে আবার দুটো ধরে আনবি তো।

বাবা বাড়ি থাকলে ঝোপজঙ্গল কেটে রাখা আমাদের কাজ। এবং টেনে আনা, অথবা কোন ঝোপজঙ্গল টেনে আনতে না পারলে রেখে দেওয়া। শুকোলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। কতসব গাছের গুঁড়ি আর ইটের চাতাল। কোনো ঢিবি আবিষ্কার করলেই বাবা গুপ্তধনের গন্ধ পেতেন। সহজে হাত দিতেন না। মনে হত বুঝি ঢিবিটা আছে থাক। সময় মতো খুঁড়ে ধনরত্ন তোলা যাবে।

জঙ্গল কাটতে কাটতেই বাবা কখনও চেঁচিয়ে বলতেন, ওদিকে না। এদিকে চলে এস। তেনারা পড়ে আছেন।

তেনারা কে এবং কি রকমের আমাদের এতদিনে বেশ ভাল জানা হয়ে গেছে। বলতাম কোথায় বাবা?

ঐ দেখ। আলিসান ভুজঙ্গ। এতটুকু ভয় ভীতি নেই। পিলুটার ছিল আবার

খুব বাড়াবাড়ি। সে লাঠি তুলে তেড়ে গেলে বাবা বলতেন, তোমার তো কোনো অনিষ্ট করেনি। কেন মারতে যাচ্ছ।
এত বড় আলিসান ভুজঙ্গ দেখে আমাদের হৃৎকম্প দেখা দিত। বাবা কিন্তু নির্বিকার। কাজ করে যাচ্ছেন।

॥ পাঁচ ॥

আমাদের খাওয়া-দাওয়াটা এখন কোনো নিয়মমাফিক ব্যাপার নয়। ভাত খাওয়াটা আমাদের কাছে ভোজের মতো। ভাত না থাকলে, বনআলু না পাওয়া গেলে শুধু গাছের পেঁপে সিদ্ধ করে খাওয়া। কিছু পেঁপে শহরে নিয়ে যেতে পারলে বিক্রি হত। দু-একদিন পেঁপে বিক্রির পয়সায়ও ভাত মাছ হয়ে যায় কখনো। এবং বাবা একদিন গোটাদশেক বড় সাইজের পেঁপে পেড়ে একটা ঝোলায় নিয়ে চাল সংগ্রহের জন্য চলে গেল। কিন্তু আর ফিরল না।
ঠিক শহরে বাবা মানুকাকার কাছে কোনো খবর পেয়ে চলে গেছে কোথাও। ফিরবে যখন, মাথায় বড় সব পোঁটলাপুঁটলি। আমার কেবল ধারণা হত, বাবা গোপালদির বাবুরা কোথায় আছে জানতে পারলে গুপ্তধন পেয়ে যাবে। বাবুদের সঙ্গে দেখা হলে পূজা-পার্বণে বাবাকে ডাকবে। দেশে থাকতে ওরা খুব দিত-থুত। দু আড়াই বছরে বাবার স্বভাবধর্ম আমাদের খুব জানা। না থাকলেও এখন আর মা এবং আমরা তেমন দুশ্চিন্তা করি না। পিলুটা কেবল বনের ভেতর অন্ধকারে ঢুকে গেলে রাতে ভয় পায়। ঘর থেকে বের হতে চায় না। ওর ধারণা, বাবা যেহেতু বাড়ি নেই, ভূত-প্রেত দৈত্য-দানোরা সুযোগ বুঝে নিশীথে একটা লম্বা হাত বনের ভেতর থেকে বাড়িয়ে দেবে। এবং আমাদের ছোট বাড়িঘর তুলে নিয়ে মাথায় টোপর পরে বসে থাকবে। এই ভয়টাই খুব কাবু করত পিলুকে।
আর মার মনে হত, বাবা বাড়ি না থাকলে যা হোক একটা লোকের আহার বেঁচে গেল। কারণ তিনি যেখানেই যান বেশ চালিয়ে নেন। কোথাও বাবার কিছু অভাব থাকে না। এবং যদি কোনো শিষ্যবাড়ির খোঁজ পাওয়া যায়—বাবা সেখানে তো ধর্মগুরুর মতো। এমন কি তখন সেখানে মচ্ছব-টচ্ছব লেগে যায়। তারপর ফেরার সময় নগদ টাকা, মার জন্য প্রণামীর শাড়ি, আমাদের জন্য শীতের চাদর নিয়ে আসতে পারেন।

বাবা পরদিনও ফিরল না। আশ্চর্য, এবারে মাকে খুব চিন্তিত দেখাল। মানুষের বাড়িঘর হয়ে গেলে এমনটাই বুঝি হয়। সকালের দিকে মা বলল, একবার যা তোর মানুকাকার কাছে। মানুষটা কোথায় গেল খবর নিবি না?

পিলু বলল, চল দাদা, বাবাকে খুঁজে আসি। এবং দুজনে কাকার বাড়ি গেলে জানলাম, বাবা গেছে বেথুয়াডহরি। পেঁপে বিক্রির পয়সা কাকার কাছে রেখে গেছে। কাকা আমাদের খেয়ে যেতেও বললেন। পিলু বলল, দাদা আমার তো খাবার ইচ্ছে খুবই। তোর? আমার কি ইচ্ছে কী করে পিলুকে বোঝাই, তবে অস্বস্তি এই যে, কাকার ছেলেমেয়েদের পোশাক এবং পারিপাট্য এত বেশি যে গেলে চাকর-বাকরের মতো মনে হয় নিজেদের। তবু খেতে বলায় দুজনই খুব খুশি। খাবার লোভে একটা ঘরে দুজনে চোরের মতো বসে থাকলাম। একটা কথা বললাম না ভয়ে। খুড়তুতো ভাইবোনেরা দু-একবার উঁকি মেরে গেল। আমরা তখন অন্য দিকে চেয়ে থেকেছি। যেন আমরা খাওয়া বাদে পৃথিবীতে আর কিছু জানি না বুঝি না। বড়ই সুবোধ বালক। ওদের চোখে চোখ পড়ে গেলেই টের পাই বড়ই অদ্ভুত দুটো জীব আমরা। কাকা অদ্ভুত দুটো জীব ধরে ঘরে পুরে রেখেছে। ওদের কৌতূহল মেটাবার জন্য যতটা পারলাম খাঁচায় পোরা দুটো হরিণ শাবকের মতো মুখ করে রেখেছি। যদিও খুবই অস্বস্তি হচ্ছিল, তবু খাবার লোভে পালাতে পারছি না। খেতে বসে কোনোরকমে ঘাড় গুঁজে আমরা খেয়ে ফেললাম। পিলু ভাত খেতে খুব ভালবাসে বলে আকণ্ঠ খাওয়া কি ঠিক বোঝে না। ও বোধহয় ঘিলুতক ঠেসে খেল। খাওয়া দেখে হাঁ হয়ে গেল আমাদের ভাইবোনেরা। পেটে কি ধামা বাঁধা আছে—এত খায় কি করে! অন্য ঘরে ওরা ফিসফিস করে কথা বলে খুব হাসাহাসি করছিল। সবই শুনতে পাচ্ছিলাম। আর লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছিল।

কাকা গুনে দু টাকা দশ আনা পয়সা হাতে দিয়ে বললেন, ধনদার ফিরতে দেরি হবে বলে গেছে। বেথুয়াডহরিতে দেশের লোক এসেছে অনেক। খবর পেয়েই চলে গেল। তাছাড়া তোদের কিছু শিষ্যবাড়িরও খোঁজ নিতে যাবে বলেছে। বাবার একটা খেরোখাতায় আজকাল রাজ্যের সব মানুষজনের নাম ঠিকানা লেখা থাকে। পিতামহের আমলের কিছু শিষ্যদের নাম বাবা 'পুনরায়' হেডিং দিয়ে লিখে রেখেছেন। বাবা দেশে থাকতে হেলায় এই গুরুগিরির ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছিলেন। এখন এই দুঃসময়ে তাদের খোঁজখবর করে বেড়াচ্ছেন বোধহয়। তাছাড়া নিবারণ দাসের দেওয়া পঞ্জিকাটা তো বগলে রয়েছেই। এত বড় একটা মূলধন যাঁর আছে তাঁর আবার ভাবনা কি।

ট্রেনে যাবার যেহেতু পয়সা লাগে না, বাবা সহজেই যে কোনো সময় খুশিমত সুদূরে চলে যেতে পারেন। যারাই দেশ ছেড়ে এসেছে, সবাই প্রায় রেল-লাইনের লাগোয়া গ্রামে গঞ্জে অথবা কোনো পতিত জমিতে নিজেদের আবাস গড়ে তুলছে ক্রমশ। রেলে যাবার টিকিট লাগে না এটা বড়ই গৌরবের ব্যাপার আমাদের কাছে। আর বাবার অকাট্য যুক্তি, আমরা ছিন্নমূল মানুষ, সব দেশের স্বার্থে, এটা কত বড় আত্মত্যাগ! আমাদের আবার ভাড়া কি। অথবা কখনও বাবা যেন দেশ ভাগ করে নেহরু যে ভুল করেছেন বিনা টিকিটে ভ্রমণ করে তার খানিকটা উশুল করে নিচ্ছেন। বাবা তাঁর বিনা টিকিটে ট্রেনের ভ্রমণ-কাহিনী ফিরে এসে সগৌরবে বলতে খুবই ভালবাসতেন।

আর থাকা খাওয়ার ব্যাপারটা বাবার যে কোনো জায়গায়, যে কোনো পরিচিত মানুষের বাড়িতে আজন্ম অধিকারের শামিল হয়ে গেছে। যদি খোঁজখবর মিলে যায়, আর খোঁজখবর না মিললেও কোনো লতাপাতায় সম্পর্ক খুঁজে পেলে একেবারে তখন মৌরসীপাট্টা—থাকা খাওয়া, দেশের গল্প, এমন সোনার দেশ মানুষকে ছাড়তে হয় কত বড় পাপ করলে সে সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ তাঁর বক্তৃতা। বাবার কথাবার্তা শুনলে সবার বোধহয় মানুষটার ওপর মায়া পড়ে যায় এবং সহজে ছাড়তে চায় না। এবং বাবা যখন গেছে, আর মানুকাকাকে বলে গেছে তখন খুবই নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

আমরাও ডাল ভাত মাছ খেয়ে বেজায় খুশি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাকার বাড়ি থেকে বের হওয়া দরকার। পেট ভরে খাওয়ার আনন্দটা ঠিক উপভোগ করা যাচ্ছে না। কারণ কাকার ছেলে-মেয়েদের বিরূপ কথাবার্তা খুবই খোঁচা দিচ্ছে পেটে। কাকা এবং কাকীমাকে যত দ্রুত সম্ভব টুপটাপ প্রণাম সেরে বের হয়ে পড়া গেল। এবং শহরের রাস্তায় কতসব অলৌকিক ঘটনা দেখা গেল ক্রমে। রিকশা চড়ে মানুষেরা যায়। জানলায় সুন্দর মতো মেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অর্জুনগাছটার নিচে একটা চায়ের দোকান। সবাই চা খাচ্ছে। বিকেল পড়ে আসতেই শহরে ঠাণ্ডা ভাব। সিনেমাহাউসে রামের সুমতি বই হচ্ছে। বাদ্য বাজছিল। বইয়ের কত দোকান, জেলখানার পাঁচিল পার হয়ে গেলে জলের ট্যাঙ্ক। টাউন ক্লাব। পাশে পুলিসের ব্যারাক। উর্দিপরা ব্যাণ্ড-পার্টি আগে আগে ব্যাণ্ড বাজিয়ে যাচ্ছে। পুলিসের সব খাকি পোশাক, আর রূপোর বকলেশ নীল আকাশের নিচে এক চিত্রকরের ছবির মতো। তারপরই বালিকা বিদ্যালয়। একই রকমের নীল ফ্রক পরে দলে দলে মেয়েরা বের হয়ে আসছে। একটা সুন্দর দোতলা বাড়ির টবে গোলাপের গাছ। পাশে ইজিচেয়ারে বালিকা নিবিষ্ট মনে

কোনো গল্পের বই পড়ছে। এতসব ঘটনা একটা শহরে রোজ ঘটে। এক জীবনে এতটা দেখা যায় যেন আমার আগে জানা ছিল না।

তারপরই সোজা সড়ক চলে গেছে রেল-লাইন পার হয়ে। দু পাশে বড় বড় সব শিরীষ গাছ। পাতা ঝরছে। শনশন হাওয়া কবরখানা থেকে উঠে আসছে। সাহেবদের কারখানা ডান দিকে। এবং কত সব সমাধি ফলক আর কত প্রাচীন সব ঝাউগাছ। যত শহর শেষ হয়ে আসছে তত নিঝুম পৃথিবী। গাছপালা পাখি তত বেশি। কতশত বছরের পুরনো সেই বাড়িটা যেন, ভাঙা শ্যাওলা ধরা রাজপ্রাসাদের মতো। একটা টগর ফুলের গাছ, চত্বরে আর কিছু নেই। মজা দীঘি, ভাঙা ঘাটলা। আর এ-সব পার হয়ে ডান দিকে গেলেই সেই কারবালা। বনটার আরম্ভ। কোথাও ভিতরে কবে কোন্ আদ্যিকালের ইটের ভাটা। এবং এই বনেই নবমী বলে সেই বুড়িটা থাকে। পিলু বাড়ি ফেরার পথ সংক্ষিপ্ত করার জন্য কারবালার মাঠে নিয়ে এল আমাকে। এবং বনের এক আশ্চর্য মোহ আছে পিলুর। সে ইতিপূর্বে এই বনের ভেতর দুটো আমড়া গাছ, কিছু পেয়ারা লিচু গাছ এবং একটা কাঁঠাল গাছও আবিষ্কার করে ফেলেছে। আর নবমীকে এই ফাঁকে দেখিয়ে নিয়ে যাবে—কারণ আমার মতে নবমী একটা ডাইনি না হয়ে যায় না। আমার ভুল ভাঙাবার জন্যই যেন পিলু এই পথটা ধরে যাচ্ছে।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা সামান্য ক্লান্ত বোধ করছিলাম। পিলু তখন বলল, আমি খুব বেশি খেয়েছি নারে দাদা?

সত্যি কথা বললে যদি পিলু মনে কষ্ট পায়, ভেবে বললাম, কোথায় বেশি খেলি! ওটুকু না খেলে পেট ভরবে কি করে!

পিলু বলল, আয় দাদা, এখানে একটু আমরা গড়িয়ে নি। বড় উঁচু মতো একটা কড়ুই গাছ। নিচে সবুজ ঘাসের মাঠ। বেশ অনায়াসে শোওয়া যায়। বনটার ভেতরে ঢোকার আগে নিরিবিলি জায়গাটাতে বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকা গেল। দূরে রেল-লাইন। একটা গাড়ি যায় সন্ধ্যায়। পাশে কাশের বন দিগন্তব্যাপী। কেবল কারবালার মাঠটা একটু দূরে। দুটো একটা মিনার, ভাঙা মসজিদ এবং একটা কুকুর বাদে কিছুই আর চোখে পড়ছিল না।

পিলু বেশ নিশ্চিন্ত মনে গাছের নিচে শুয়ে আছে। আমিও পাশে। বললাম, তুই এখানে কখনও এসেছিলি?

সে বলল, কত। কতবার এসেছি। জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গরুর গাড়ি যাবার রাস্তা আছে। ও রাস্তাটা ধরেই যাব।

আমার কেমন গা ছমছম করছিল। ভয় লাগছিল। পিলুটা কিন্তু দিনের বেলায়

একদম ভয় পায় না। ওর শুধু ভূতের ভয়। এছাড়া ওর অন্য কোনো ভয় নেই। তার ধারণা দিনের বেলায় ভূত-টুত বের হয় না।

বেশ লাগছিল। শহর ঘুরে দেখা গেল। বাবার খোঁজ পাওয়া গেল। আকণ্ঠ খাওয়া গেল। একজন মানুষের জীবনে আর কি দরকার তখন বুঝতে পারছিলাম না। এবং প্রকৃতির ভেতর আমরা দুই ভাই, এক অন্য জগৎ, শুধু পাতা ঝরছে আর নানা বর্ণের সব পাখিরা উড়ে যাচ্ছিল। গাছে বসে ডাকছিল।

গাছের নিচে শুয়ে দুই ভাই কত কথা বললাম। পিলু আবার বলল, সে বড় হয়ে রানাঘাটে যাবে। বলল, দাদা, তুই লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি। আমি একটা দোকান দেব। দুজনে রোজগার করলে বাবার কোনো দুঃখ থাকবে না। পিলু বাবারও খুব প্রশংসা করল। বলল, বাবা ভাগ্যিস জায়গাটা খুঁজে বের করেছিলেন। পিলুর মতে এমন সুন্দর জায়গা আর কোথায় আছে। আসলে তখন আমি বুঝতে পারি এই বনজঙ্গলের আশ্চর্য একটা টান আছে। ছোট্ট ঘর—মা বাবা, রাতে কখনও বাবার ফিরে আসা, কখনও বনজঙ্গলে পিলুর ভ্রমণবিলাস, সব মিলে জায়গাটার আলাদা মাহাত্ম্য সৃষ্টি হয়েছে। পিলু না থাকলে এ-বনজঙ্গলের সব সৌন্দর্যই নষ্ট হয়ে যায়। যেন এতদিন এই বনটা ঘুমিয়েছিল, পিলু আসায় বনটা জেগে গেছে। শীত-গ্রীষ্মে বনের পাতা ঝরা থেকে আরম্ভ করে সব প্রাণীকুল এক ছোট্ট বালকের কাছে কতকাল পর যেন ধরা পড়ে মহীয়সী রূপ ধারণ করেছে।

পিলু কিছুটা এগিয়ে গিয়ে বলল, ঐ যে ঘরটা দেখছিস ওটার মধ্যে নবমী থাকে।

—ঘর কোথায়! এ তো পুরনো ইটের পাঁজা।

কাছে গেলেই নবমী পিলুকে দেখে বলল, ওমা, পিলু দাদা যে!

আমি তো অবাক। ভারি ভাব বুড়িটার সঙ্গে। শনের মতো সাদা চুল। একটাও দাঁত নেই। একেবারে কঙ্কালসার শরীর। ঘরের বার হতেও কষ্ট। কচুর মূল, বনআলু এবং কাঠের মধ্যে ঘুসঘুসে আগুন এই সম্বল করে বেঁচে আছে। নবমী আমাকে দেখে বলল, এ কেডা পিলু দাদা?

—আমার দাদা। তোমাকে দেখাতে এনেছি।

নবমীর শরীরে শুধু শুকনো কলাপাতার পোশাক। কোমর থেকে হাঁটু অবধি। বোধহয় মানুষের সাড়াশব্দ পেয়েই সে তার মহামূল্য পোশাক পরিধান করে অন্ধকার থেকে বের হয়ে এসেছে। নতুবা বনের মধ্যে তার উলঙ্গ হয়ে ঘোরা-ফেরার অভ্যাস। এবং বয়স খুব কাবু করে ফেলেছে দেখে বললাম, নবমী, তোমার ভয় করে না?

—না দাদা।

—তুমি এখানে আছ একা, ভয় করে না?
—এমন জায়গা কোথায় আর আছে দাদা।
—অসুখ-বিসুখে তোমাকে কে দেখে?
সে ওপরে হাত তুলে দেখাল। কি আশায় এখানে পড়ে আছে ভাবতে খুবই বিস্ময় লাগছিল আমার। কতদিন থেকে আছে কে জানে! এবং যা ভয় ছিল, তা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল ওর কথাবার্তা শুনে। একটা ছাগলের তিনটে বাচ্চা হয়েছে। সে পিলুকে বলল, দাদা তুমি বামুনের ছেলে, বলেছিলে একটা ছাগলের বাচ্চা নেবে। আর নিতে এলে না তো।
পিলু বলল, বাবা বেথুয়াডহরি গেছে। এলে বাবার কাছে পয়সা চেয়ে রাখব।
—পয়সা দিয়ে কি হবে গো দাদা। ওমা আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন যে গো দাঠাকুরের দল। আমার কত পাপ, বলে সে দুটো ইট পেতে দিল। বলল, বসেন।
আমার তখন কত রকমের কূট প্রশ্ন মাথায়। বললাম, নবমী, তোমার আর কেউ নেই?
—কেউ নেই কেন হবে গো। এত বড় একটা সংসার আমার। তার পরে পিলু দাদা শেষ বয়সে এইসে গেল—কি আর লাগে।
—ওরা খোঁজখবর নেয় না তোমার?
নবমীর মুখটা সরল হাসিতে ভরে গেল। বড় জানতে ইচ্ছে হয়, ওর সেই শৈশবের কথা। কত বয়স এখন—মনে হয় সত্তর আশি। তার ওপরও হতে পারে। বললাম, তোমার বয়স কত নবমী? সে বলল তিন কুড়ি বছর হবে এখানটায় আছি। সেনবাবুদের ইটের ভাটিতে আমার মরদ সর্দার ছিল গো বাবু। দশাসই মানুষ। সে পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, পিলু দাদা, আপনার বাবাঠাকুর আসবেন বলেছিলেন। এল না তো। একবার গড় হতাম। গড় হলে মুক্তি মিলে যেত।
নবমীর এত বড় সংসারে কে কে আছে জানতে চাইলে বলল, ছিল তো অনেক দাঠাকুর। বয়স বাড়ছে, তেনারাও ছুটি নিচ্ছেন। ঠিক বুঝতে না পেরে বললাম, তেনারা কারা?
—ঘর বার হতেই কষ্ট। খোঁজখবর করতে পারি না। দু পা হাঁটলেই হাঁটু ব্যথা করে দাঠাকুর। আমি না গেলে ওরাই বা আসবে কেনে বলুন।
কেমন রহস্যময় কথাবার্তা। বললাম, ওরা কারা?
নবমী ঘর থেকে দুটো নারকেল বের করে দিল। বলল, বাবাঠাকুরকে দিবেন।

ফের বললাম, তাহলে তোমার কেউ নেই?

—আছে গো আছে। ওপরে হাত তুলে দেখাল—তিনি আছেন। চারপাশে গাছপালা দেখাল হাত তুলে, তেনারা আছেন। দূরে কোনো বন্যপ্রাণীর-সাড়াশব্দ পাওয়া গেল—বলল, তেনারা আছেন। তারপর গাছের ফল-মূল, ঋতু পরিবর্তন, ফুলের সৌরভ—তার কাছে সবই অমৃতময় এখানকার। চারপাশে ঘুরে ঘুরে দেখিয়ে বলল, এত সব আমার দাঠাকুর। মানুষটা নেই বলে, ইটের ভাটা উঠি গেল বলে, একা ভাববেন না। মানুষটাকে ওই যে দেখছেন শিমুল গাছ তার নিচে রেখেঃদিইছি। তেনার কথাবার্তাও কানে আসে। বলতে বলতে নবমী হাঁপিয়ে উঠল। একটা কংকালসার প্রাণে কত আকাঙ্ক্ষা। ওর চামড়া কুঁচকে স্থবিরতা এসে গেছে শরীরে। তবু এই বনভূমির মাঝে নবমীকে মনে হচ্ছিল বড়ই সুন্দরী। বয়েস কালে সে আমার মার মতো তার মানুষের অপেক্ষায় কত রাত না জানি জেগে থেকেছে। বনটাকে ভালবেসে ফেলেছে। সে আর কোথাও চলে যেতে পারেনি। শেষে নবমী বলল, মানুষের বাড়ি-ঘরের বড় মায়া। কোথায় আর যাব দাঠাকুর।

॥ ছয় ॥

মাকে ফিরে এসে বললাম, বাবা বেথুয়াডহরি গেছে।

—কার কাছে?

—বলে যায়নি কিছু।

—কবে ফিরবে, কিছু বলেনি?

—না।

মার মুখটা কেমন দুশ্চিন্তায় ভরে গেল। এই আবাস তৈরির পর, না অন্য কোনো কারণে, ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, এবারে বাবা চলে যাওয়ায় মাকে খুবই অসহায় দেখাচ্ছিল। বাবা বাড়ি না থাকায় এবং কবে ফিরবে বুঝতে না পারায় একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তির ভিতর যেন পড়ে গেছে। মনে হল, সবাই কাছে আছে, কেবল একটা মানুষ ঘুরছে, কি খায় কোথায় থাকে এ-সব ভেবেই হয়ত মার মুখটা এত করুণ দেখাচ্ছে। সুখে হোক দুঃখে হোক মানুষটা এই নতুন আবাসে একটা বড় গাছের মতো। এটাই বোধ হয় মার ভরসা। আগের মতো আর উদাসীন থাকতে পারছে না। মাটিতে শেকড় ঢুকে যেতে থাকলে বুঝি তাই হয়।

বাবা বাড়ি না থাকলে পিলু সংসারের অভিভাবক গোছের। সে একদিন সকালে উঠে বলল, এই দাদা ওঠ। যাবি না?

মনে পড়ে গেল রাতে পিলু বলে রেখেছে, খুব সকালে উঠতে হবে। ঝাঁকায় যাবে পেঁপে, কিছু মুলাশাক। আপাতত এই বিক্রি করে যা-কিছু উপার্জন। সকালেই উঠে পড়া গেল। সূর্য ওঠেনি। আকাশে বাতাসে বনভূমি থেকে শেষ সবুজ গন্ধ ছড়াচ্ছে। রোদ উঠলেই গন্ধটা কেমন মরে যায়। গাছপালা পাখ-পাখালি তখন জেগে যায় বলে গন্ধটা বুঝি আর থাকে না।

জমিতে সুন্দর সতেজ সব মূলাশাক। শীতের শেষাশেষি বলে এবং অসময়ের প্রায় বলা যায় এই সব্জি দামে বিক্রি হবার খুবই সম্ভাবনা। পিলু রাতে বলেছিল, মা, আমরা কতদিন আবার পেট ভরে ভাত খাইনি। পিলুর যা কাজকর্ম, দেখে মনে হচ্ছে সে আজ পেট ভরে ভাত খাবে। এটা যে সংসারে কত দরকারী কাজ পিলুর মুখখানা দেখলে বোঝা যাবে না। সকাল থেকেই সে একজন বিষয়ী মানুষের মতো গম্ভীর।

শহরে রওনা হবার সময় মা বলল, দাঁড়া। একটা লালপেড়ে শাড়ি ট্রাঙ্ক থেকে বের করে বলল, নিয়ে যা। কোথাও বিক্রি করে টাকা নিস।

পিলু বলল, তুমি এটা কেন দিচ্ছ মা। বাবা জানাতে পারলে কত কষ্ট পাবে।

মা বলল, জানবে না।

মাকেও সকালে খুব খুশী খুশী দেখাচ্ছিল। তবু কেন যে গভীরে তাকালে বোঝা যায় আশ্চর্য এক বিষণ্ণতা আছে মায়ের চোখে। বাবা বাড়ি না থাকাতেই বোধ হয় এটা হয়েছে। আমরা সবাই পেট ভরে খাব, বাবা বাড়ি নেই, বাবা খাবে না, বাবার ছেলেমেয়েরা পেটা ভরে খাচ্ছে, তিনি জানতেও পারবেন না। বোধ-হয় দুঃখটা এ-জন্যই মায়ের এত বেশি।

এবং যেভাবে তাড়া লাগিয়েছে পিলু, যেন বেশ আমরা আগেকার মতো মানুষ। বাজারহাট, মেলা, টাকচাঁদা মাছের ঝোল, ঘোড়-দৌড় কত কিছুতে ভরে ছিল আমাদের জীবনটা। সকাল থেকেই পিলুর হাঁক ডাক—নিপুণভাবে সবকিছু সাজিয়ে নিয়েছে ধামায়। আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল—শহর দু-ক্রোশের ওপর। শহর যেখানে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে এখনও রাতে হ্যাজাক জ্বলে। আলো আসেনি। এবং চায়ের দোকান, মোটর গ্যারেজ, কিছু পাইকার মানুষ বসে থাকে —তাদের কাছে কম দামে সব বিক্রি করে দিতে হবে। ঝাঁকায় নিয়ে যাওয়া মুটে মানুষের মতো ভাবতে খুব খারাপ লাগছিল।

পিলু বলল, কিরে দাদা, আয়। তুলে দে।

পিলু নিজের ঝাঁকাটায় প্রায় বেশিটা নিয়েছে। আর পিলু বুঝি বুঝতে পেরেছিল মাথায় এভাবে মুটে মানুষের মতো বয়ে নিয়ে যাওয়া তার দাদাটা পছন্দ করে না। সে তাড়াতাড়ি বলল, মা, একটা ব্যাগ দাও না? পেঁপে কটা দাদা ব্যাগে নিক। যদিও খুব স্বার্থপরের মতো দেখাচ্ছিল তবু পিলুর ওপর সামান্য সদাশয় হওয়াগেল। পিলুকে আগে আগে যেতে বললাম। পেছনে, বেশ দূরে, দূরে আমি। পিলুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক আছে রাস্তার মানুষেরা, অথবা কোনো লোকালয়ে ঢুকে গেলে বুঝতেই পারবে না কেউ। সবচেয়ে বেশি সেই দোতলা বাড়ি, টবে গোলাপফুলের গাছ, বালিকার ইজিচেয়ারে শুয়ে বই পড়া জায়গাটায় দূরত্ব আমাদের আরও বেড়ে গেল। পিলু আমার মান-সম্ভ্রম সম্পর্কে বেশ সচেতন। সে সারা রাস্তায় এমন কি সেই সুন্দর মতো সোনালী ফ্রক গায়ে মেয়েটার কাছে বুঝতেও দিল না আমি তার দাদা হই। পিলুর ওপর কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। আর পিলু প্রায় রীতিমতো দাম দর করে, কী যে বলছেন, এ দামে দেওয়া যায়। কি পেঁপে দেখেছেন, এক একটা কত বড় দেখেছেন! ভেতরটা কত পুষ্ট, আর যা মিষ্টি হবে সে না বলাই ভাল। একবার খেলে সারাজীবন মনে রাখতে হবে। প্রায় একজন দোকানীর মতো দরদস্তুর করে সবটা বিক্রি করে দিল। তারপর নতুন লাল পেড়ে শাড়িটা বিক্রি করা। সেও ছোট্ট একটা কাপড়ের দোকানে ঢুকে বেশ দামেই বিক্রি করা গেল। এবং গুণে দেখা গেল সবসুদ্ধ বার টাকার কাছাকাছি। এতগুলো টাকা একসঙ্গে আমরা অনেকদিন দেখিনি। প্রায় যেন আমরা জাদুকরের মতো বলশালী মানুষ। আমাদের হাতের মুঠোয় পৃথিবীর যাবতীয় প্রাচুর্য। এত টাকায় কি হবে প্রথমে স্থিরই করা গেল না। কি কিনব, কি না কিনব—বাজারসুদ্ধ সব তুলে নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে আমাদের। মাছের বাজারে ঢুকে খুব বড়লোকি চালে কথাবার্তা বলতে থাকল পিলু।—মাছ তো তোমার ভাল না। এ-মাছ মানুষে খায়! পচে গেছে। দেখি ওটা। আরে দাদা, দেখ, চাপিলা মাছ—কিনব। চাপিলা মাছ এ-দেশে এসে আমাদের কখনও খাওয়া হয়নি। পিলুর লোভ বেড়ে গেল। বেশ দামেই সে কিনে ফেলল পোয়াটাক মাছ। পুরো আট আনা পয়সা তিনবার গুনে পিলু লোকটার হাতে দেবার আগে ফের আমাকে গুনতে দিল। তারপরও পিলুর সংশয় গেল না। হিসাবে সে খুব পাকা।

তারপর শহর ছাড়িয়ে আটাকল ফেলে এবং সেই ভুতুড়ে সাঁকোটার কাছে আসতেই পিলু কেমন দুঃখী গলায় বলল, পেট ভরে ভাত খাব। বাবা দেখতে পাবে না। খুব খারাপ লাগছে।

সাঁকোটার নিচে নেমে আমি বললাম, দুদিন পরে হলে কি হত। বাবাও থাকত। সবাই মিলে খেতাম। পিলু কিছু বলল না। সে ঝাঁকা মাথায় হাঁটছে। ডাল, আলু, মসলাপাতি, আনাজের মধ্যে বড় বড় বেগুন, যেমন দেশবাড়িতে আমাদের হাসিমের মাথায় বাবা হাট ফেরত সওদা করে ফিরতেন, মাছের থলে হাতে আমরাও প্রায় সে-ভাবে ফিরছি। গাছে গাছে রোদ. মানুষজন রাস্তায়, গরুর গাড়ি পাট বোঝাই, ছোট গঞ্জ মতো জায়গা পার হয়ে সোজা মিলের পথ ধরে হাঁটছি। আমাদের বাড়ি ফেরার আর একটা রাস্তা আছে পিলুর সঙ্গে ফেরার সময় টের পেলাম।

পিলু একটা রাস্তা দেখিয়ে বলল, এদিকে গেলে বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি। মাকে নিয়ে একবার আসব। ওদিকে গেলে রাজবাড়ি। তোকে নিয়ে একদিন যাব। সারা রাস্তায় পিলু সব চিনিয়ে নিয়ে গেল। যাবার সময় শহরটার দক্ষিণের রাস্তায় গেছি, ফেরার সময় উত্তরের রাস্তায়। আর সবই দেখছি পিলুর নখদর্পণে। বড় হলে পিলুর গাড়ি ঘোড়া না হয়ে যাবে না। কত কম বয়সে সে কত বেশি অভিজ্ঞ।

আমার হাতে চালের ব্যাগ। এবং যেহেতু বাবা বাড়ি নেই, এ-দিয়ে আমাদের কতদিন যে চালিয়ে নিতে হবে। চাল সামান্য, কিছু বনআলুর কুচি, একেবারে মা নিপুণভাবে কেটে নেয়। আলুর কুচি-সেদ্ধ সরু চালের ভাতের মতো মনে হয়—এ-ভাবে ভাত আর আলু কুচি ভাতের মতো আমাদের পাতে—কোনো-রকমে জীবনধারণ করা, পেট ভরা নিয়ে কথা—যে কোনো ভাবে, যে কোনো উপায়ে। আজ ভাতে আলুর কুচি থাকবে না, সত্যিকারের ভাত মাছ খাব, ভাবতেই মনটা পুলকে ভরে গেল।

পিলু বোধহয় সেই আনন্দেই জোরে হাঁটছে। কতক্ষণে মাকে তার এই সওদা নিয়ে দেখাবে। মা হেসে ফেললেই পিলু দুটো লাফ দেবে—আরে ব্বাস, মাগো মা, একদিন তোমায় আমি কালীবাড়ি নিয়ে যাব। ওখানে মানত করলে সব হয়। আমাদের সব হবে না মা। আমরা বেশিদিন আর গরীব থাকব না।

শীতের রোদ উঠতেও সময় লাগে না। চলে যেতেও সময় লাগে না। দুপুর হয়ে গেল ফিরতে। মা, মায়া রাস্তায় ছুটে এসেছে। যেন মা আমরা কতক্ষণে ফিরব, সেই আশায় পথ চেয়ে বসে ছিল। মাছ দেখে বলল, খুব তাজা মাছ। আনাজপাতি মা কত যত্নের সঙ্গে ঘরে তুলে নিলেন। রাতে আজ পেট ভরে আহার, সত্যিকারের মাছ ভাত। মানুষের জীবনে এর চেয়ে বড় সুখ, বড় আরাম আর কি আছে।

রাতে বাড়িতে ভোজ। চাপিলা মাছের ঝোল সঙ্গে ধনেপাতা। ভাবা যায় না। যেন বাড়িটাতে রাতে উৎসব হবে কিছু। মা পুকুর থেকে চানটান করে এল। পিলু কাঠ সংগ্রহ করছে। রাতে মার রান্না করতে যেন এতটুকু কষ্ট না হয়। মায়া খুব বিনয়ী হয়ে গেছে। যত কাজ কাম, যেমন ঘর ঝাঁট দেওয়া, উঠোন ঝাঁট দেওয়া, সব এক হাতে করে ফেলছে। বাসন-কোসন ধুয়ে রাখছে। মসলা বেটে দেবে মাকে বায়না ধরলে মা বলল, পারবে না। ওটা আমি করে নেব। কেউ রাগ করছে না আজ। বচসা করছে না। পুন্নুকে মায়া আজ আর কোল থেকে নামাচ্ছেই না। গাছ, পাতা, পাখি, কীট-পতঙ্গ যেখানে যা আছে পুন্নুকে সব দেখিয়ে বেড়াচ্ছে। রাতে মাছ ভাত, বেগুন ভাজা, ভাজা মুগের ডাল। মাকে পিলু গাছ থেকে একটা ছোট কচি লাউ পর্যন্ত কেটে দিল। সব দেখে বোঝা যায় দিন দিন যথার্থই বনভূমিটা মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছে। সুতরাং বাড়িটাতে সবাই আমরা উৎসাহী মানুষের মতো যেখানে যা কিছু কাজ সেরে ফেলছি। পিলু একটা কোদাল নিয়ে বের হয়ে গেল। সন্ধ্যার আগে আগে সে ফিরে এল। বনের মধ্যে সারা বিকেল সে কি করেছে আমি জানি। সে বড় একটা বনআলুর লতা ঠিক আবিষ্কার করে ফেলেছে। একটা অতিকায় বনআলু কাল পরশুর মধ্যে বাড়িতে চলে আসবে বোঝা গেল।

পিলু ফিরে এলে মা বলল, কিরে পেলি ?

পিলু বারান্দায় কোদাল রেখে ঠিক বাবার মতো কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল। চোখ মুখ উত্তেজনায় খুব অধীর। সে শুধু বলল, কত বড় মা। সে দু হাত ছড়িয়ে দেখাল।

মার বিশ্বাস হল না। পিলু বলল, দু হাত মাটি তুলেও ওর শেষ নাগাল পেলাম না মা। অর্থাৎ প্রায় মণখানেক ওজন না হয়ে যাবে না। চারপাশে মাটির অভ্যন্তরে আলুর শাখা-প্রশাখা ঢুকে গেছে। সে সবটাই তুলে আনবে বলে, খুব বড় মতো গর্ত করে রেখে এসেছে। কাল বাকি যা আছে গর্ত করে ফেললেই সেই প্রকাণ্ড হাতির দাঁতের মতো, কিংবা তার চেয়েও বড় একটা বনআলু। বাবা ফিরে না আসা পর্যন্ত বনআলুটা গোলায় মজুত শস্যের মতো কিছুদিন পিলুকে অহংকারী করে রাখবে।

সূর্য অস্ত যাবার মুখে, মা আমাদের সবাইকে হাত পা ধুয়ে আসতে বলল কালীর পুকুর থেকে। লণ্ঠন জ্বেলে পড়তে বসতে বলল। দল বেঁধে আমি পিলু মায়া ঘড়া নিয়ে গেলাম সেই মাঠ এবং জঙ্গল পার হয়ে কালীর পুকুরে। হাত মুখ ধোওয়া, সঙ্গে রান্নার জল। পিলু ব্যারাকের টিউকল থেকে খাবার জল নিয়ে এল।

ফিরে আসার সময় দেখতে পেলাম, দূরে বনের গভীরে বাড়িটাতে পিদিম জ্বলছে। তুলসী গাছের নীচে মা রোজ এই পিদিম দিচ্ছে কদিন থেকে। প্রণিপাত করছে ধরণীকে। জীবন ধারণের সব উপায় মানুষের যেমন থাকা দরকার, তেমনি শুভাশুভর জন্য ঈশ্বর বড় প্রয়োজনীয় জীব। মা তাঁর সব প্রার্থনা এই সময় সেরে নেয়। বনের গভীরে অন্ধকার। বারান্দায় লম্ফ জ্বালিয়ে রেখেছে। এখন আর শুধু বাড়িটা নয়, তার চারপাশে যা কিছু আছে, এমনকি আকাশ নক্ষত্র এবং বনভূমি সবটা মিলে আমাদের আবাস। আকাশ থেকে কেউ যদি ছোট্ট একটা নক্ষত্রও তুলে নেয়, টের পাব যেন আমাদের কেউ কিছু চুরি করে নিয়ে গেছে।

রান্নাঘরে মা রান্না করছে এক হাতে। পুনু আমাদের পাশে বসে ঢুলছিল ঘুমে। পিলু খুব পড়াশোনায় মনোযোগ দিয়ে ফেলল। স্লেট এগিয়ে দিয়ে সে পর পর তিনটে মিশ্র যোগ অঙ্ক করে, হাতের লেখা লিখতে বসে গেল। আমি ডেফো-ডিলস কবিতাটা মুখস্থ করতে থাকলাম, টেন থাউজেণ্ড আই স এট্ এ গ্ল্যান্স... তারপর পড়লাম—হোম দি ব্রট ওয়ারিয়র ডেড। এবং এই কবিতা পড়তে পড়তে কখন জন কিটসের টু অটাম পড়ছি খেয়ালই নেই—জোরে জোরে, যেন এই আবাস এবং বনভূমি পার হয়ে আমার কণ্ঠস্বর দূরে কোনো এক অলৌকিক ভুবনে ছড়িয়ে পড়ছে। অ্যাণ্ড গেদারিং সোয়ালোজ টুইটার ইন দি স্কাইজ। আমার মা তখন ভাজা মুগের ডালে সম্বার দিচ্ছে। আশ্চর্য সুঘ্রাণ চারপাশে—আমরা কত সহজে কত বেশি মনোযোগী পড়ুয়া হয়ে গেলাম।

মায়া পড়ছিল, আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। পড়তে পড়তে ঘুমে ঢুলছিল মায়া। পিলু বলল, এই মায়া, ঘুমোচ্ছিস কেন রে?

মায়া বলল, আমার ঘুম পাচ্ছে দাদা।

পিলু খুব গম্ভীর গলায় বলল, চোখে জল দিয়ে আয়। ঘুমিয়ে পড়লে খেতে পাবে না। আমরা সব খেয়ে নেব।

সঙ্গে সঙ্গে মায়া দৌড়ে উঠে গেল। ফিরে এসে পড়ল ফের—আমাদের ছোট নদী চলে বাঁকে বাঁকে, বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে...। সে কিছুতেই আর ঘুমোবে না ঠিক করেছে।

ক্রমে অন্ধকার আরও ঘনিয়ে এল। মাথার ওপরে আকাশ, কিছু নক্ষত্র। বনভূমিতে পাতা পড়ার শব্দ পাচ্ছিলাম। কত সব কীট-পতঙ্গের আওয়াজ এবং দূরে শেয়ালের হাঁক। বাবা বাড়ি না থাকলে, বড় ভয় লাগে। যেন বনটা

ধীর পায়ে খুব কাছে এগিয়ে আসে। সহজেই আমাদের বাড়িটাকে গ্রাস করে নেয়। চারপাশে গাছপালা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তখন চোখে পড়ে না। ভোজ হবে বলে, পিলু কলাপাতা কেটে রেখেছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম, কখন মা বলবে, তোমরা খেতে এস। পিলু পড়া ফেলে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দেখছে—আর কত দেরি। এত বেশি সময় ধরে তার পক্ষে মনোযোগী পড়ুয়া হয়ে থাকা কঠিন। মা কেবল বলছিল আর একটু পড় বাবা। এই তো হয়ে গেল বলে। সে ফের এসে কিম্ভূতকিমাকার গলায় তীব্র আওয়াজে চেঁচিয়ে ফের পড়া শুরু করে দিল। আমি বললাম, 'এই পিলু, এত জোরে পড়িছিস কেন রে। সে কর্ণপাতই করছে না। মাকে বললাম, দেখো মা, পিলু ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। পড়তে দিচ্ছে না।

মা বুঝি বুঝতে পেরেছিল, পিলু আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। রাগে দুঃখে সে এখন পড়ার নামে চেঁচাচ্ছে। হেসে বলল, আসন পেতে তোরা বোস। দিচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে পিলু বইটা মাথার ওপরে ছুড়ে ফের কপ করে ধরে বলল, ওঠ ওঠ। বলে প্রায় টান মেরে মাদুর-কাদুর তুলে আসন পেতে ফেলল। গ্লাসে গ্লাসে জল। কলাপাতা ধুয়ে নুন রাখল পাশে। মা আমাদের ভাত বেড়ে দিচ্ছে। পিলুকে যত দিচ্ছে তত খেয়ে নিচ্ছে। আমার পাতেও ভাত পড়ে থাকছে না। এবং পিলুর খেতে খেতে সহসা মনে পড়ে গেল, সে সবই খেয়ে ফেলছে না তো। সে বলল, মা, তোমার জন্য কিন্তু রেখ।

—আছে। তোরা খা।

—কৈ দেখি।

মা হাঁড়িটা তুলে এনে দেখাল।

—দি আর দুটো।

—তোমার তবে থাকবে কি।

—হয়ে যাবে। নে না।

আমি বললাম, পিলু তোর পেট ভরেনি?

সে তাকিয়ে থাকল। গলা অবধি খেয়ে এখন বোধহয় কানে-টানেও কম শুনছে।

—তুই উঠে দাঁড়া তো দেখি।

পিলু উঠে দাঁড়াল।

—জামাটা তোল। পেটটা দেখি।

সে চাদর সামলে কোনোরকমে জামাটা তুলে পেটটা ভাসিয়ে দিল।

—পিলু করেছিস কি! তোর পেট ফাটল বলে।

পিলু আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। তবু সে গোনোমোনো গলায় বলল, যা!

—নুয়ে দেখ, পেটটা কি হয়েছে তোর!

সে নুতে গিয়ে কেমন হাঁসফাঁস করতে থাকল। বলল, দাদারে, নুতে পারছি না। মাকে বললাম, আর তুমি দিও না। দেখেছ পেটের রগগুলো পর্যন্ত ভেসে উঠেছে। মা এবার লম্ফ তুলে পিলুর পেটের কাছে উঁকি দিয়ে সত্যি দেখল। বলল, কই। তুই যে কি না! ও আরো দুটো খেতে পারবে। বলে মা পিলুর পেটে দুটো টোকা মারল।

—ঠিক আছে থাক। পেট ফেটে গেলে আমি কিছু জানি না।

পিলু সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, না মা, আর লাগবে না। সে ফস্ করে প্যান্টের গিঁট খুলে কিছুটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারপর হাত চাটতে বসে গেল।

মায়ার খাওয়া হয়ে গেছে। আমারও। মায়া শেষ পর্যন্ত মাছটা আস্তই রেখে দিয়েছে পাতে। সবার খাওয়া হলে, সে তারিয়ে তারিয়ে মাছটা খাবে। এটা মায়ার চিরদিনের অভ্যাস। ভাল সুস্বাদু খাবার দিলেই সে হাতে রেখে দেবে। মাঝে মাঝে খাবে, চাটবে। আমাদের শেষ না হলে সে শেষ করবে না।

তখনই মনে হল রাস্তায় অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অথবা এগিয়ে আসছে মতো। বাবা বাড়ি না থাকলে, সাঁঝ লাগলেই আমাদের গা ছমছম করতে থাকে। যত রাত হয় তত ভয়টা বাড়ে। গভীর রাতে কখনও ঘুম ভেঙে গেলে গুটিসুটি শুয়ে থাকি পিলুকে জড়িয়ে। রাতে একা আমরা ঘর থেকে কেউ বের হতে সাহস পাই না। মা পাশে না থাকলে ভীষণ ভয় করে—তখন এমন একটা ছায়া-ছায়া মানুষের অবয়ব অন্ধকারে এগিয়ে আসতেই কেমন আমরা সবাই গুটিয়ে গেলাম। ছায়াটা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় চিৎকার করে উঠতাম সবাই—তখনই লম্ফের আলোতে দেখলাম—সেই হাবিলদার লোকটা। লম্বা জুলফি, গোঁফ ঝুলে পড়েছে। দশাসই একটা দৈত্যের মতো। উঠোনে দাঁড়িয়ে বলছে, ঠাকুরমশাই আছে?

মা আমার কেমন ঠাণ্ডা গলায় বলল, পিলু বলে দে, তিনি বাড়ি নেই?

—কোথা গেছেন?

অন্ধকারেও লোকটার চোখ জ্বলছিল। লম্বা মোটা গোঁফ, নাক থ্যাবড়া অতিকায় এক পাষণ্ডের মতো চেহারা। হাবিলদার লোকটা ব্যারাকে থাকে। এত রাতে বাবার সঙ্গে এমন কি কাজ বোঝা গেল না।

ধীর পায়ে খুব কাছে এগিয়ে আসে। সহজেই আমাদের বাড়িটাকে গ্রাস করে নেয়। চারপাশে গাছপালা অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তখন চোখে পড়ে না। ভোজ হবে বলে, পিলু কলাপাতা কেটে রেখেছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলাম, কখন মা বলবে, তোমরা খেতে এস। পিলু পড়া ফেলে মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দেখছে—আর কত দেরি। এত বেশি সময় ধরে তার পক্ষে মনোযোগী পড়ুয়া হয়ে থাকা কঠিন। মা কেবল বলছিল আর একটু পড় বাবা। এই তো হয়ে গেল বলে। সে ফের এসে কিম্ভূতকিমাকার গলায় তীব্র আওয়াজে চেঁচিয়ে ফের পড়া শুরু করে দিল। আমি বললাম, 'এই পিলু, এত জোরে পড়ছিস কেন রে। সে কর্ণপাতই করছে না। মাকে বললাম, দেখো মা, পিলু ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছে। পড়তে দিচ্ছে না।

মা বুঝি বুঝতে পেরেছিল, পিলু আর ধৈর্য ধরতে পারছে না। রাগে দুঃখে সে এখন পড়ার নামে চেঁচাচ্ছে। হেসে বলল, আসন পেতে তোরা বোস। দিচ্ছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে পিলু বইটা 'মাথার ওপরে ছুড়ে ফের কপ করে ধরে বলল, ওঠ ওঠ। বলে প্রায় টান মেরে মাদুর-কাদুর তুলে আসন পেতে ফেলল। গ্লাসে গ্লাসে জল। কলাপাতা ধুয়ে নুন রাখল পাশে। মা আমাদের ভাত বেড়ে দিচ্ছে। পিলুকে যত দিচ্ছে তত খেয়ে নিচ্ছে। আমার পাতেও ভাত পড়ে থাকছে না। এবং পিলুর খেতে খেতে সহসা মনে পড়ে গেল, সে সবই খেয়ে ফেলছে না তো। সে বলল, মা, তোমার জন্য কিন্তু রেখ।

—আছে। তোরা খা।

—কৈ দেখি।

মা হাঁড়িটা তুলে এনে দেখাল।

—দি আর দুটো।

—তোমার তবে থাকবে কি!

—হয়ে যাবে। নে না।

আমি বললাম, পিলু তোর পেট ভরেনি?

সে তাকিয়ে থাকল। গলা অবধি খেয়ে এখন বোধহয় কানে-টানেও কম শুনছে।

—তুই উঠে দাঁড়া তো দেখি।

পিলু উঠে দাঁড়াল।

—জামাটা তোল। পেটটা দেখি।

সে চাদর সামলে কোনোরকমে জামাটা তুলে পেটটা ভাসিয়ে দিল।

—পিলু করেছিস কি! তোর পেট ফাটল বলে।

পিলু আমার কথা শুনে ঘাবড়ে গেল। তবু সে গোনোমোনো গলায় বলল, যা!

—শুয়ে দেখ, পেটটা কি হয়েছে তোর!

সে শুতে গিয়ে কেমন হাঁসফাঁস করতে থাকল। বলল, দাদারে, শুতে পারছি না। মাকে বললাম, আর তুমি দিও না। দেখেছ পেটের রগগুলো পর্যন্ত ভেসে উঠেছে। মা এবার লম্ফ তুলে পিলুর পেটের কাছে উঁকি দিয়ে সত্যি দেখল। বলল, কই। তুই যে কি না! ও আরো দুটো খেতে পারবে। বলে মা পিলুর পেটে দুটো টোকা মারল।

—ঠিক আছে থাক। পেট ফেটে গেলে আমি কিছু জানি না।

পিলু সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেল। সে বলল, না মা, আর লাগবে না। সে ফস্ করে প্যাণ্টের গিঁট খুলে কিছুটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। তারপর হাত চাটতে বসে গেল।

মায়ার খাওয়া হয়ে গেছে। আমারও। মায়া শেষ পর্যন্ত মাছটা আস্তই রেখে দিয়েছে পাতে। সবার খাওয়া হলে, সে তারিয়ে তারিয়ে মাছটা খাবে। এটা মায়ার চিরদিনের অভ্যাস। ভাল সুস্বাদু খাবার দিলেই সে হাতে রেখে দেবে। মাঝে মাঝে খাবে, চাটবে। আমাদের শেষ না হলে সে শেষ করবে না।

তখনই মনে হল রাস্তায় অন্ধকারে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অথবা এগিয়ে আসছে মতো। বাবা বাড়ি না থাকলে, সাঁঝ লাগলেই আমাদের গা ছমছম করতে থাকে। যত রাত হয় তত ভয়টা বাড়ে। গভীর রাতে কখনও ঘুম ভেঙে গেলে গুটিসুটি শুয়ে থাকি পিলুকে জড়িয়ে। রাতে একা আমরা ঘর থেকে কেউ বের হতে সাহস পাই না। মা পাশে না থাকলে ভীষণ ভয় করে—তখন এমন একটা ছায়া-ছায়া মানুষের অবয়ব অন্ধকারে এগিয়ে আসতেই কেমন আমরা সবাই গুটিয়ে গেলাম। ছায়াটা উঠোনে এসে দাঁড়িয়েছে। বোধহয় চিৎকার করে উঠতাম সবাই—তখনই লম্ফের আলোতে দেখলাম—সেই হাবিলদার লোকটা। লম্বা জুলফি, গোঁফ ঝুলে পড়েছে। দশাসই একটা দৈত্যের মতো। উঠোনে দাঁড়িয়ে বলছে, ঠাকুরমশাই আছে?

মা আমার কেমন ঠাণ্ডা গলায় বলল, পিলু বলে দে, তিনি বাড়ি নেই?

—কোথা গেছেন?

অন্ধকারেও লোকটার চোখ জ্বলছিল। লম্বা মোটা গোঁফ, নাক থ্যাবড়া অতিকায় এক পাষণ্ডের মতো চেহারা। হাবিলদার লোকটা ব্যারাকে থাকে। এত রাতে বাবার সঙ্গে এমন কি কাজ বোঝা গেল না।

—কখন আসবে ?

মা আবার ভেতর থেকে বলল, পিলু বলে দে, কবে ফিরবেন কিছু বলে যাননি।

পিলু হঠাৎ মুখিয়ে উঠোনে নেমে বলল, কেন, কি দরকার ?

পিলুর সাহসে আমিও সাহসী হয়ে উঠলাম। এতক্ষণ বারান্দা থেকে কিছুতেই উঠোনে নামতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। পিলুর পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে বললাম, বাবা ফিরলে কিছু বলতে হবে ?

—না কিছু বলতে হবে না। শেষে বলল, তোমার পিতাঠাকুর কেমন লোক আছে।

পিলু বলল, ভাল লোক আছে।

লোকটার এত কি দায় বোঝা গেল না। পিতাঠাকুর ভাল কি মন্দ আছে আমরা বুঝব। আর লোকটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। পিতাঠাকুর বাড়ি নেই, আর কি কাজ কার সঙ্গে লোকটার থাকতে পারে। মা ভেতর থেকে কিছুতেই বের হচ্ছে না। এত ভয় মার আমি কখনো দেখিনি। এমন এক বন-জঙ্গলে কেউ খোঁজখবর নিতে এলে ভাল লাগারই কথা।

পিলু বলল, বাবা কাজে বেথুয়াডহরি গেছে।

মা খুব সন্তর্পণে বলল, বলে দে, তোর বাবা এলে যেন আসেন।

লোকটা তখন খুব আপনজনের মতো বলল, ইতো ঠিক নেহি আছে। ইসান বন-জঙ্গলে রাখকে চলা গিয়া!

বাবার নামে' কেউ খারাপ কিছু বললে, পিলুর মাথা গরম হয়ে যায়। সে কেমন চোয়াড়ে গলায় বলল, কাজ থাকলে যাবে না! বাবা এলে কিছু বলতে হবে ?

—কুছ বুলতে হবে না। একবার কি ভি মোনে হল, যাই ঠাকুরমশাইর সাথ দেখা করি।

লোকটা যেন কি খুঁজছে। কথা বলছে, আর ধূর্ত চোখে ঘরের দিকে তাকাচ্ছে। চারপাশের এই নির্জনতা, গভীর অন্ধকার আর জোনাকি জ্বলছিল বলে লোকটার মতলব খুব ভাল ঠেকছে না। মা ঘরেই বসে আছে। মায়া এঁটো বাসনকোসন খুব দ্রুত ঘরে তুলে রাখছে।

এই লোকটা আরও দুবার আমাদের বাড়ি এসেছিল। বাবা বাড়ি না থাকলেই চলে আসে। কি করে যে টের পায়, বাবা বাড়ি নেই। অন্য দুবার দিনের বেলায় এসেছিল বলে, আমাদের তত ভয় ছিল না। মাও সহজভাবে দুটো একটা কথা বলেছে। কিন্তু আজ মাও কেমন দুর্ব্যবহার করছে লোকটার সঙ্গে। বলছে, পিলু বলে দে, তোর বাবা এলে খবর দিবি।

—বাবা এলে জানাব। তখন আসবেন।

তবু লোকটার যাবার নাম নেই। কিছু করলে শত চিৎকারে কেউ কিছু টের পাবে না। অনায়াসে আমাদের সুন্দর ঘরবাড়ি লোকটা লণ্ডভণ্ড করে দিতে পারে। এই প্রথম একজন মানুষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকলে কি ভীষণ এবং ভয়াবহ টের পেলাম। লোকটা অথচ এমন কিছু করছে না, বরং লোকটার যেন দরদের শেষ নেই—তবু মার ভয়ার্ত মুখ দেখে আমরা ভারি কাবু হয়ে যাচ্ছি। এমনিতে মা ভীষণ সাহসী। কোনো ভূত-প্রেত, সাপখোপে মা এতটুকু ভয় পায় না। এ-সময়ে আমরা কি করব ঠিক বুঝতে পারছিলাম না।

মা তখন কেমন শক্ত গলায় ঘর থেকে বলল, আপনি যান। উনি বাড়ি নেই। এলে বলব, আপনি এসেছিলেন।

লোকটা তারপর আর দাঁড়াল না। চলে গেল। কেমন রাহুগ্রাস থেকে সমস্ত পরিবারটা যেন রক্ষা পেয়েছে। বাইরে থাকা আর নিরাপদ নয় ভেবে মা আমাদের সবাইকে ঘরে ঢুকে যেতে বলল। পিলু গেল না। সে উঠোনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় লোকটাকে দেখল। বনজঙ্গলে কীট-পতঙ্গের আওয়াজ, কিছু শেয়ালের হাঁক এবং ক্রমে দূরাগত কোনো নিথর শব্দ বনভূমির অভ্যন্তরে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে যেন। রাতে আর মা বের হতে সাহস পেল না। কেবল বাবাকে গালমন্দ করতে থাকল। রাতে মা আর খেলও না। পিলু সকাল হলে কিছু একটা প্রতিবিধানের জন্য কোথায় যে না বলে না কয়ে বের হয়ে গেল।

॥ সাত ॥

সকালে উঠেই দেখি মার মুখ ভার। বাবার ওপর অভিমানে মা কারো সঙ্গে একটা কথা বলছে না। পিলু কোথায় গেল, দুপুর হয়ে গেল, এখনও ফিরে আসছে না—অন্য সময়ে মা স্থির থাকতে পারতো না। অথচ আজ সব জ্বলে পুড়ে যাক, কি হবে ঘরবাড়ি দিয়ে—যেমন বাবা, তার ছেলে আর ভাল হবে কোত্থেকে, একটা চিঠি দিয়েও তো জানাতে পারে, তা না। যেন আমরা সব ভেসে এসেছি। এ-সব থেকেই বোঝা গেল মার মন-মেজাজ খুব খারাপ। আর মন-মেজাজ খারাপ হলেই আমাদের কপালে দুর্ভোগ বাড়ে। খুব ভয়ে ভয়ে আছি। কার পিঠে কখন কি পড়বে কিছুই বলা যাচ্ছে না। মার কাছেপিঠে থাকা আজ আর খুব নিরাপদ নয়।

তখনই রাস্তায় একটা লোক সাইকেল থেকে নেমে ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজাচ্ছে। ডাকছে আমাকে—এই ছেলে, এটা অমুকের বাড়ি ? আমি দৌড়ে চলে গেলাম। পোস্টাফিসের লোক। গায়ের জামা প্যান্ট সাইকেলের থলে দেখেই বুঝে ফেলেছি। লোকটাকে বললাম, হ্যাঁ।

—সুপ্রভা দেবী বলে কেউ আছেন ? মনিঅর্ডার আছে।

মাকে দৌড়ে গিয়ে বললাম, মা তোমার নামে মনিঅর্ডার এসেছে। মা তো খুব হতবাক হয়ে গেল। বলল, সত্যি !

লোকটা তখন সাইকেলটা গাছে হেলান দিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে গেল। মায়া তাড়াতাড়ি আসন পেতে দিল একটা। লোকটা বসেই বলল, এক গ্লাস জল দিন আগে খাই। এখানে বাড়িঘর হয়েছে কি করে জানব বলুন। তিন-চার দিন ব্যারাকে ঘুরে গেছি, ও-নামে কোথায় এখানে কে আছে কেউ বলতে পারে না। ভাগ্যিস একটা চিঠি এসেছে আজ। এবং চিঠিটার ওপর ঠিকানা লেখা, পরম কল্যাণীয়া সুপ্রভা দেবী, গ্রাম নিমতলা। তারপর লিখেছেন, পুলিস ব্যারাকের অদূরে দক্ষিণমুখী বাড়ি। পোঃ কাশিমবাজার। চিঠিটা না এলে আপনাদের মনিঅর্ডার ফিরে যেত।

মা একটা কথাও বলছে না। সামনে একটা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। এত বড় সুখ কপালে কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। মনিঅর্ডারে টাকা আসবে, মা স্বপ্নেও ভাবেনি। চিঠি আসবে সেটাও যেন বিশ্বাস করা যায় না। মাসাধিক হয়ে গেছে বাড়ি ছেড়ে গেছে বাবা—টাকাই বা পাবে কোথায়! পিয়ন দেখিয়ে দিল, এখানে টিপ দিন। মা হয়ত টিপই দিত, কিন্তু আমি মনে করিয়ে দিলাম, এখানে তুমি মা সই কর। মার হস্তাক্ষর ভারি সুন্দর। এবং মা যখন সই করল, পিয়নটাও হতবাক হয়ে গেল। কেমন নিজের মানুষের মত বলল, দেশ ভাগে কত মানুষের যে কপাল পুড়েছে।

আমার আর সহ্য হচ্ছিল না। বললাম, চিঠিটা দিন।

—দিচ্ছি দিচ্ছি। আগে টাকা কটা গুনে নাও। তুমি এখানটায় আর একটা সই করে দাও। দেখ চল্লিশ টাকা আছে। সবই এক টাকার নোট। গুনে বললাম, ঠিক আছে। তারপর সেই লোকটা দেবদূতের মতো একটা নীল খাম বের করে দিল। কল্যাণীয়া সুপ্রভা দেবী। মার চিঠি। তাকিয়ে দেখলাম, মার চোখ জলে ভরে গেছে। মা টাকা কটার দিকে ফিরেও তাকাল না। চিঠিটা নিয়ে কোথায় মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল।

পিলু ফিরে এল, বেশ বেলা করে। কদিন থেকে শীত পড়েছে খুব। সকালে অল্প

সব দিনে খড়কুটো সংগ্রহ করে পিলু আগুন দেয়। আমরা তখন আগুনের পাশে গোল হয়ে বসি। রোদ না উঠলে, শীত না কমলে কেউ নড়ি না। মা কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে হাত সেঁকে নেয়। ঠাণ্ডা জলে মার হাত তখন সাদা দেখায়। মনে হয় কেমন রক্তশূন্য হাত। সকালবেলায় এত কি কাজ, একটু বেলা হলে সহজেই কাজ করা যায়—কিন্তু রোদ না উঠতে সব বাসি থালাবাসন ধুয়ে রাখা, গোবরছড়া, ঘরের দাওয়া লেপে দেওয়া মার বড় জরুরী কাজ। মানুষের ঘরবাড়ি হলে যে যে স্বভাব—মারও তাই। পিলু সকালেই বের হয়ে গেছিল বলে আগুন জ্বালানো হয়নি। অন্য দিনের মতো আগুনের উত্তাপে আর আজ আমাদের ঘুম ভাঙেনি। যখন ভাঙল, তখন দেখলাম বেশ বেলা হয়ে গেছে। গাছের মাথায় শীতের রোদ চিকচিক করছে। তারপর কত সুখবর সংসারে—ডাকপিয়ন এসেছিল—বাবার চিঠি এসেছে, টাকা এসেছে। পিলু কিছুই জানে না। সেই পিলু শীতের চাদর গায়ে যখন ফিরল তখন মনে হল বগলের নিচে কিছু একটা কুঁই কুঁই করছে। কি কোথা থেকে ধরে এনেছে কে জানে।

বললাম, জানিস পিলু, ডাকপিয়ন এসেছিল। মার নামে মনিঅর্ডার, নীল খামে চিঠি।

সে কানেই তুলল না কথাটা। খুব সতর্ক চোখে রাস্তার দিকে কি দেখছে। আমি বললাম, তোর চাদরের নিচে কুঁই কুঁই করছে কে রে? সে খুব ভারিক্কি চালে ঘরে ঢুকে গেল। পিছু পিছু আমরা গেলে দেখলাম, একটা কুকুরছানা সে বগলের নিচ থেকে বের করছে। আশ্চর্য কি নরম তুলোর বলের মতো একটা কুকুরছানা পিলু কোত্থেকে নিয়ে এসেছে।

ভয়ে বাচ্চাটা লেজ গুটিয়ে আছে। এক ফাঁকে পালাতেও চাইছিল কিন্তু পিলু খপ করে ফের ধরে ফেললে—ত্রাহি চিৎকার শুরু করে দিল তুলোর বলটা। মা এসে দেখে তাজ্জব। বলল, হ্যাঁরে তুই এটা আবার কোত্থেকে নিয়ে এলি! দুধের বাচ্চা বাঁচবে কেন? সারাটা সকাল টোটো করে ঘুরে বেড়ালি। একটু পড়াশোনা করলি না। তোরা আর আমার হাড়মাস কত পুড়িয়ে খাবি।

কারো কোনো কটু কথায় পিলুর যেন এখন কিছুই আসে যায় না। সে খুব সন্তর্পণে চারপাশে কিছু খুঁজছে। আর যেন কান খাড়া করে রেখেছে। মায়া কুকুরের ছানাটাকে কোলে তুলে নিতে গেলে এক ধমক—রাখ বলছি। ঘাঁটবি না। সে বোধহয় কোথাও থেকে বাচ্চাটা চুরি করে এনেছে। সে তাড়াতাড়ি বাচ্চাটাকে নিয়ে ঘরের পেছনে চলে গেল। এবং রাস্তা থেকে দূরে আড়াল মতো

একটা জায়গায় এসে শেষ পর্যন্ত কিছুটা সে নিশ্চিন্ত হল। বলল, দাদা একটা দড়িটড়ি আন তো।

আমি বললাম, ছেড়ে দে না। ওটুকু বাচ্চা কোথাও আর পালাতে পারবে না।

—ছেড়ে দিলেই চলে যাবে। ওর মাটা ভীষণ পাজি। আমার পেছন পেছন এসেছিল। ঢিল ছুঁড়তেই কোথায় পালাল। ও মা, বাড়ির কাছে এসে দেখছি, আবার মাটা পেছনে।

—কোত্থেকে আনলি?

—বাগদীপাড়া থেকে।

—ওর মাটা কোথায়?

—ঠ্যাঙানি খেয়ে পালিয়েছে। তবু মা তো আবার ঠিক চলে আসতে পারে।

মা তখনও কাজকাম করতে করতে চেঁচাচ্ছিল, পিলু বাচ্চাটা দিয়ে আয়। দুধের বাচ্চা, বাঁচবে না। এটুকু বাচ্চা মা ছাড়া থাকবে কি করে। ঘরে দুধ নেই যে দুধ দেব।

আমারও ইচ্ছে ছিল না—ওটা আবার পিলু রেখে আসে। রাতে যে-ভাবে হাবিলদার লোকটা আমাদের ভয় ধরিয়ে দিয়ে গেল, তাতে করে পিলুর এমন কাজকে প্রশংসা না করে পারা যায় না।

লোকটা ভয় দেখিয়ে চলে যাবার পর বোধহয় পিলু সারা রাত ভেবেছে কি করা যায়। রাতে বোধহয় ওর ভাল ঘুমও হয়নি। বাবা নেই, বাবা মাঝে মাঝে এভাবে থাকে না, বনের অন্ধকারটা তখন রাতে দাঁত বের করে হাসে। যে বনটা দিনের বেলায় পিলুর সঙ্গী রাতে সেটাই কেমন তার শত্রু হয়ে যায়। তারপর চোর-ছ্যাচোড়ের মতো যদি আবার সেই বাটপাড় লোকটা রাতে চলে আসে তখন কি হবে? সে এত সব ভয়ের কথা ভেবেই শেষ পর্যন্ত একজন তার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজে এনেছে।

সে ফিরে এসে ভেবেছিল, কুকুরের এমন সুন্দর বাচ্চাটা দেখে মাও খুব খুশী হবে। কিন্তু মাকে তেমন খুশী দেখাল না বলে সে বেশ মুষড়ে পড়েছে। বাচ্চাটার ভাল করে চোখ ফোটেনি। ঠিকমতো দেখতে পায় না। দুধ না পেলে বাঁচবে না। মা তখনও পাঁচালী পাঠ করে যাচ্ছে—দুধের বাচ্চাটা তুলে নিয়ে এলি, তোর মায়াদয়া কিছু নেই রে পিলু। মা এমন সব হরবখত বলে যাচ্ছিল।—দিয়ে আয়। এমনিতেই কি পাপে যে পড়েছি, দেশ ছাড়া, দু-মুঠো পেট ভরে খেতে দিতে পারি না—আর পাপ বাড়াস না বাবা। বড় হলে আনবি। যা লক্ষ্মী তো বাবা, দিয়ে আয়। পিলু এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। সে আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য

ভরসা খুঁজছে। অন্তত একজনও যদি তার এই দুঃসময়ে পিছনে না দাঁড়ায় তবে সে যায়টা কোথায়! মায়া ততক্ষণে কোলে নিয়ে বাচ্চাটাকে আদর করতে বসে গেছে। পেটের কোথায় লুকিয়ে আছে বাচ্চাটা টেরও পাওয়া যাচ্ছে না।

মা রেগে গেলে ভারি মুশকিল আমাদের। সারাদিন পাঁচালী পাঠ চলবে। রাজা শ্রীবৎস থেকে আরম্ভ করে পুরাণের সব দুঃখী মানুষদের গল্প এক এক করে কপালে করাঘাত করার মতো শোনাবে আমাদের।

এ-সব সময়ে আমার মধ্যস্থতা খুব কাজ দেয়। তখন আমি পিলুর পক্ষেও না, মায়ের পক্ষেও না। একেবারে নিরপেক্ষ মানুষ। পিলুকেই প্রথম আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। বললাম, তুই যে আনলি, ওর মা-টা কোথায় থাকে জানিস?

—ঐ যে তোর বড় শিশুগাছটা আছে না, একটা চালতা গাছ, আরে ঐ যে তোর বাগদিপাড়ার মুখে একটা ঝুপসি মতো ছিটকিলার জঙ্গল আছে—বুঝতে পারছিস না, খড়ের গাদা আছে একটা তার নিচে মা-টা থাকে।

বুঝতে পারলাম, বেশ খানিকটা পথ হেঁটে যেতে হবে। বাদশাহী সড়ক পার হয়ে মাঠের ওপর দিয়ে কিছুটা পথ হেঁটে যেতে হবে। সকালে বিকেলে দুবার দুধ খাওয়ানো দরকার। এবারে মাকে একটু বাজিয়ে দেখা যাক। বললাম, ওর মা-টা কাছেপিঠেই থাকে।

মা বিছানা রোদে দিচ্ছিল। শুনতে পেল কি না কে জানে। বেশ চেঁচিয়ে বললাম, ওর মা-টা কাছেপিঠেই থাকে মা!

—তা কাছেপিঠেটা কোথায়?

—ঐ তো রাস্তাটা আছে না!

রাস্তায় কখনও কুকুর বাচ্চা নিয়ে থাকে? তার বাড়িঘর থাকবে না।

বাড়িঘরের কথায় আসতেই বললাম, ব্যারাক বাড়িতে থাকে।

বাড়িঘরের কথা শুনে মা বেশ খুশীই হল। মা বলল, পুলিস ব্যারাকে থাকে বলছিস?

পিলু চোখ টিপে দিল। বললাম, হ্যাঁ।

কাছেপিঠে যখন থাকে মা-টা তখন আর ভাবনা নেই। মারও বেশ আগ্রহ বাড়ছে বাচ্চাটার জন্য। মা বলল, দু দিন বাদে আবার কেউ না নিয়ে যায়!

মা এবার পুন্নুকে কোলে নিয়ে বাচ্চাটার কাছে এসে বসল। পুন্নু দুহাতে বাচ্চাটাকে চটকাতে চাইছে। আমরাও তখন গোল হয়ে ফের একজন অতিথি, ঠিক অতিথি বলা চলে না, একেবারে আর একজন এই সংসারের ভেবে আনন্দে

যেতে গেলাম। সংসারের আর পাঁচটা কাজের মতো এই বাচ্চাটাকে বড় করার দায়িত্বও আমাদের পড়ে গেল।

পিলু তখন বলল, মা, বাবা সত্যি চিঠি লিখেছে?

মা বলল, হ্যাঁ লিখেছে। চিঠি লিখেছে, টাকা পাঠিয়েছে।

—কবে আসবে বাবা?

—তা কিছু লেখেনি। এখন জলপাইগুড়িতে আছে। সেখান থেকে কোথায় আসামে অভয়াপুরী আছে সেখানে যাবে। দু-দশ ঘর শিষ্যের খোঁজ পেয়েছে। আরো পাবে বলেছে। ওদের প্রণামী টাকা সব একসঙ্গে করে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বোঝা গেল বাবার ফিরতে আরও মাসাধিককাল।

মা ফের বলল, তোমাদের পড়াশোনা করতে বলেছে মন দিয়ে।

মায়া বলল, আমার কথা কিছু লেখেনি মা?

—সবার কথাই লিখেছে।

তাছাড়া মার কাছে আরও জানা গেল, বাবা শিলচর কাছাড় হয়ে ফিরবে। দেশ থেকে হরমোহন জ্যাঠামশাইরা চলে এসেছে। আসার সময় হরমোহন জ্যাঠা-মশায়ের কাছে বাড়ির বিগ্রহ রেখে এসেছিলেন বাবা। বিঘে দুই ভুঁই ঠাকুরের নামে রেখে এসেছিলেন। সব বিক্রি করে নগদে বাবা যা পেয়েছিলেন, সবটা আনতে পারলে, আমাদের এখানে পাঁচ-সাত বছর রাজার হালে চলে যেত। কিন্তু ঐ তো দোষ বাবার, বাই উঠলে রক্ষা নেই—দেশ ভাগ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাবার এক দণ্ড সবুর সইল না। জলের দরে তারক মাঝির কাছে সব বিক্রি। তাও তারক মাঝি বলল, কর্তা, এত টাকা নিয়ে তো যেতে পারবেন না, দর্শনায় সব কেড়েকুড়ে নেবে। বরং বাকিটা আমি হুণ্ডি করে পাঠিয়ে দেব। সেই দেব বলে আর দিল না। চিঠি দিলে লিখত, সব ফিরিয়ে নিন কর্তা। আমার আগাম টাকা আর আপনাকে ফেরত দিতে হবে না!

বাবা খুব উত্তেজিত হলে বলতেন, তারক আমাকে এমনভাবে ডোবাবে ভাবিনি।

মা বলত, আসলে লোকটা বিষয়ী মানুষ। ধূর্ত। তুমি ওর কথা বিশ্বাস করলে

—কত বললাম, নিয়ে নাও। রাস্তায় যা হবার হবে।

বাবা খুব চড়া গলায় বলতেন, মেয়েছেলের বুদ্ধি আর কাকে বলে! রাস্তায় কেড়ে নিলে একেবারেই যেত। তবু তো আশা আছে, তারকের সুমতি হলে টাকাটা পাঠিয়েও দিতে পারে।

—আর দিচ্ছে।

—বামুনের টাকা কেউ মারে!

বাবার এমন ধরনের কথা শুনে শুনে মা শেষ পর্যন্ত মাথা ঠিক রাখতে পারত না। বলত, ত্যাখো তোমার কি হয়। নিজের ভালটা একটা কুকুর বেড়ালও বোঝে, তুমি তাও বোঝ না। লোকের কথায় কেবল নাচ। !
—লোকের কথায় নাচব না, তোমার কথায় নাচব! বাবা তারপর ধৃতরাষ্ট্র থেকে দশরথের কৈকেয়ী পর্যন্ত নির্বিঘ্নে নারীবুদ্ধি সংসারে কত বিপত্তিকর সব উদাহরণসহ এক এক করে তুলে ধরত। আমরা ঐ সময়ে কার কত বেশি রামায়ণ মহাভারতে দৌড় টের পেতাম। বাবা শেষ পর্যন্ত পরাস্ত হলে মাকে মহারোষে চণ্ডীপাঠ আবৃত্তি করে শোনাতেন। মার হাজার কথার এক বর্ণও আর যেন কানে না ঢোকে। বলতেন:

যা দেবী সর্বভূতেষু সৃষ্টিরূপেন সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

মা তখন আমার আরও রেগে যেত। চেঁচিয়ে বলত, তোমার বুদ্ধিনাশ হয়েছে। তোমার মতিভ্রংশ হয়েছে। তুমি আমাকে আর কত জ্বালাবে। হাড়মাস তো কিছু আর রাখনি। সব গেছে আমার।
বাবার চণ্ডীপাঠ তত দ্রুত বাড়ত। প্রায় পাল্লা দেবার মতো, কেউ কম যায় না, একদিকে বাবার উদাত্ত কণ্ঠে স্তোত্র পাঠ অন্য দিকে মায়ের সারাজীবনের জ্বালা সারা বাড়িটায় তখন খোল-করতাল সহ হরিসংকীর্তনের মত্তো। আর আমরা তখন একেবারে স্বাধীন নাগরিক। খুশিমতো পেলে খাই, না পেলে খাই না, যা পাই তাই খাই। উদাহরণ দেবার মতো স্বাধীন নাগরিক অধিকার রক্ষা করে যাচ্ছি। যেখানে সেখানে চলে যেতে পারি।
এখন সে-সব খণ্ড-যুদ্ধের মলিন দিনগুলি আর ভাসে না চোখে। বাড়িঘর হয়ে যাওয়ায় আমরা মা বাবার খুবই অনুগত হয়ে উঠেছি। মা দেখছি সব কিছু সময় মতো মনে করিয়ে দেয়। টাকাটা দিয়ে মোটামুটি আমাদের বেশ কিছু দিন খুব ভালভাবে চলে যাবে বলে, একটা হিসাবপত্রও হয়ে গেল। এক মণ চাল, সতের টাকা দশ আনা, মায়ার ফ্রক, তিন টাকা ছ আনা, পিলু এবং আমার প্যাণ্ট শার্ট সাত টাকা চোদ্দ আনা, বাকি টাকায় মজুত ভাণ্ডার গড়ে উঠবে—এত সব পরিকল্পনার পর মা মনে করিয়ে দিল, মনার দুধ খাবার সময় হয়ে গেছে, কৈ রে পিলু যা বাবা, দেখ ওর মা-টা কোথায় আছে, একটু দুধ খাইয়ে আন।
তখন হয়ত সকালের রোদ উঠে গেছে। আমরা দু ভাই সেই নেড়ি কুকুরটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোলে তুলোর বলের মতো বাচ্চাটা চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। কোথাও নেড়ি কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। আস্তানায় নেই। মাঠঘাট এবং

গাছপালার অভ্যন্তরে কুকুরের আভাস পেলেই ছুটছি। আস্তানায় অন্য বাচ্চাগুলি সারারাত দুধ খেয়ে অঘোরে জড়াজড়ি করে ঘুমোচ্ছে। মনা রাতে দুধ খায়নি। ভোর রাতে কেঁদেছে। খিদেয় মাঝে মাঝে কোলের মধ্যে কোঁ কোঁ করেছে। সারারাত মনা থাকে পিলুর লেপের নিচে। তারপর কিছুদিনের মধ্যে পিলু বনবাদাড়ে গেলে বাচ্চাটাও যায়। পিলু ঘাটে গেলে বাচ্চাটাও হেলতে দুলতে চলতে থাকে। পড়তে বসলে দু পা সামনে রেখে হিজ মাস্টারর্স ভয়েস হয়ে যায়। কান খাড়া রেখে আমাদের পড়াশোনা মন দিয়ে শোনে। আমরা তখন আরও মনোযোগী ছাত্র হয়ে যাই বাচ্চাটার জন্য। মা বাটিতে করে সবার জন্য ভাগে ভাগে তেল পেঁয়াজ মাখা মুড়ি রেখে যায়। পুন্নু বারান্দায় উঠোনে হেঁটে বেড়ায় তখন। কখনও হাঁটতে হাঁটতে পড়ে যায়। আমরা মুড়ি খাই, পড়ি। মনা মুড়ি খায়, পড়া শোনে। পুন্নু মা মা করে তখন ফ্যাক করে কাঁদে। আর তখনই মায়ার পড়া থেকে ছুটি—সে পড়ার চেয়ে ভাইকে আদর করা, কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো সংসারে বেশি দরকারী কাজ মনে করে থাকে। মারও বোধহয় এতে সুবিধা হয়। মায়া পড়ছে না বলে তার বাড়ির কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। পিলু এতটা সহ্য করতে পারে না। সেও পড়া ফেলে তখন উঠে পড়ে এবং কুকুরের বাচ্চাটার সঙ্গে তু-তু খেলা শুরু করে দেয়। পড়া ছেড়ে উঠার আমার কোনো অছিলাই থাকে না। মনটা ঘরবাড়ির উপর বেজায় ক্ষেপে যায়। মাস শেষ হতে না হতেই বাচ্চাটা সেয়ানা হয়ে গেল। অচেনা ঘ্রাণে চিৎকার করে উঠতে শিখে গেল এক সময়। গাছ থেকে পাতা পড়লে দৌড়ে যায়, কোনো শব্দ পেলে ঘেউঘেউ করে ওঠে। রাস্তায় লোকজন দেখলে তাড়া করে যায় মানুষকে।

বনভূমির অভ্যন্তরে আমাদের বাড়িটার প্রায় রক্ষাকারী বাচ্চাটা। বাচ্চাটারও নিজস্ব একটা নাম হয়ে যাওয়ায় বিলু, পিলু, পুন্নুর মতো সে সংসারে বেশ একজন হয়ে গেল।—মনা কোথায়, মনাকে খেতে দে। তোরা স্নান করতে যাচ্ছিস, মনাকে নিয়ে যাস। গায়ে খুব ময়লা পড়েছে।

আমার মা সবার সঙ্গে মনার ভাল মন্দ নিয়ে ভাবে। যা শেয়ালের উপদ্রব, কিছুতেই রাতে বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। সে ঘরেই থাকে রাতে। আর যখন তখন এলোপাথাড়ি চিৎকার। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে পিলু বিছানা থেকে নেমে কান মুচড়ে দিয়ে বলে, হয়েছে। খুব হয়েছে। এখন ঘুমোতে দে। আসলে বোধহয় কুকুরটার রাতে লেপের তলায় থাকা অভ্যাস ছিল বলে নিচে একা থাকতে কিছুতেই রাজি না। ক্ষোভে দুঃখে বোধহয় সারারাত ঘেউ ঘেউ

করত। তারপর একা থাকা অভ্যাস হয়ে গেলে আর কুঁই কুঁই করত না। সত্যিকারের ঘ্রাণ টানে সে যখন ভাল মন্দ বুঝতে শিখে গেল, তখনই এই ঘর-বাড়ির আসল চোরের ঘ্রাণ পেয়ে একদিন গভীর রাতে ত্রাহি চিৎকার। আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। দরজায় সত্যি খুট খুট শব্দ করছে কে। মাও উঠে পড়েছে। লম্ফ জ্বেলে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর কুকুরটা একেবারে লাফিয়ে, সত্যি বাঘা কুকুর, বাঁচলে হয়—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, আঁচড়ে কামড়ে ফালা ফালা করে দিতে চাইছে খলপার দরজা। বারান্দায় দাঁড়িয়ে কে কথা বলছে, কি বলছে, বোঝা যাচ্ছে না। তখন মা আমার না পেরে অত্যন্ত সরল গলায় বলছে, থাম বাপু, খুব হয়েছে। আলো হাতে মা দরজা খুলে দিলে দেখলাম, বাবা আমার ফিরে এসেছেন। হাতে কাঁধে কত সব ছোট বড় মাঝারি পোঁটলা-পুঁটলি। আর তখনই বুঝি পিলুর মনে হল, কুকুরের স্বভাব কামড়ানো। যে-ভাবে বাবার দিকে একবার এগোচ্ছে পিছোচ্ছে, কখন না কামড়ে দেয়! সে প্রায় সার্কাসের রিং মাস্টারের মতো কুকুরটাকে গম্ভীর গলায় বলল, এদিকে এস। আমার বাবা। বেয়াদবি করবে না।

কে কার কথা শুনছে! কুকুরের বাচ্চাটা পিলুকে আমলই দিচ্ছে না। বাবাও খুব বিব্রত বোধ করছেন। গলায় আবার একটা গামছা বাঁধা বাবার। গামছার মধ্যে ভারি কিছু পাথরটাথর ঝুলছে গলায়। একটা বড় সাইজের মাদুলির মতো লাগছিল পুঁটলিটাকে। এক গাল দাড়ি। বাবাকে ঠিক চেনাই যাচ্ছে না। পিলুর মতো কুকুরের বাচ্চাটাকে সাহসের সঙ্গে বলতে পারছিলাম না—হ্যাঁরে আমাদের বাবা। সত্যিকারের বাবা। একা পিলু বললে কুকুরের বাচ্চাটা বিশ্বাস করবে কেন!

পিলু ফের গম্ভীর গলায় বলব, মনা ভাল হচ্ছে না। বাবা কত দূরদেশ থেকে এসেছে। বাবাকে বসতে দাও।

বাবাও কুকুরটাকে দেখে ভারি ভীতবিহ্বল হয়ে পড়েছে। এক পা এগোচ্ছে না, পিছোচ্ছেও না। কি বলবে যেন ঠিক করতে পারছে না। আর গলায় যা আছে সেটাও একটা যেন বাবার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তখন আমি বললাম, এই মনা, আমার বাবা, সত্যিকারের চোর-ছ্যাঁচোড় না। থাম বলছি।

তবু যখন থামল না, পিলু বেজায় চটে গেল। রিং মাস্টারের মতো ঘুরে দাঁড়াল। তারপর ধাঁই করে ফুটবলের মতো সজোরে লাথি, বেশ উঁচুতে উঠে টপকে পড়ে গেল। এবং সঙ্গে সঙ্গে লেজ গুটিয়ে কুঁই কুঁই করতে করতে ঘরের কোণায় গিয়ে

বসে পড়ল। বাবা বললেন, আহা মারছিস কেন, ওর কি দোষ। না বলে না কয়ে এসেছি, চোর-ছ্যাচোড় তো ভাববেই।

বাবার দিকে তাকিয়ে মা আর একটা কথাও বলতে পারছিল না। বাবার চেহারাটা সত্যি খুব খারাপ হয়ে গেছে যেন। খুব বড় অসুখ-বিসুখ থেকে উঠলে যেমন দেখায়—লণ্ঠনের আলো তুলে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে মা। তখন ক্ষীণ গলায় বাবা বললেন, একটা মাদুর পেতে দাও। বিছানায় বসব না। গলায় ব্রহ্মাণ্ড।

মা ঠিক বুঝতে না পেরে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করল কথাটাতে। বলল, তোমার কিছু হয়েছে?

—আরে না না।

—বড় অসুখ-টসুখ? তারপরই বুঝি মনে হয় মার, বাবা আর দু দণ্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবেন। তাড়াতাড়ি মাদুর পেতে বলল, বোস।

বাবা নিস্তেজ গলায় বললেন, জল দাও। তিন দিন থেকে জল খেয়ে আছি। আজও থাকতে হবে। নিরম্বু উপবাস করতে ভরসা পেলাম না। সবই তাঁর ইচ্ছে। এবং গলায় এত বড় পুঁটলিটা নিয়ে বাবার কতটুকু অস্বস্তি হচ্ছিল জানি না, কিন্তু আমাদের কেমন হাঁসফাঁস লাগছিল। বললাম, বাবা ওটা খুলে ফেল। ওতে কি আছে?

বাবা বললেন, ওতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে।

বাবার হেঁয়ালি বুঝতে না পেরে পিলু বাবার মুখের ওপর ঝুঁকে বলল, কি বললে বাবা? বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

—হ্যাঁ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আছে। বলছি না বিশ্বব্রহ্মাণ্ড—বুঝলে ধনবৌ, আর রাত জেগে কি হবে, নিচে শুয়ে থাকছি। সকালে তোমাদের কাজের অন্ত থাকবে না। লোকজন ডাকতে হবে।

আমরা বাবার কথায় খুবই ভয় পেয়ে যাচ্ছিলাম। লোকজন ডাকতে হবে কেন! কিছু একটা তবে সকালে হচ্ছে। সেটা কি—কিন্তু বাবা একে নিস্তেজ তায় আবার গম্ভীর, গলায় গামছা ঝুলিয়ে তদুপরি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বয়ে বেড়াচ্ছে—সুতরাং কিংকর্তব্য বিমূঢ়ের মতো আমাদের রা সরছিল না।

মা কেমন অসহায় বালিকার মতো কেঁদে ফেলল। বলল, কি হয়েছে বলবে তো? বাবার মুখে সুমধুর হাসি ফুটে উঠল। বললেন সব। কোথায় হরকুমার জ্যাঠারা বাড়ি করেছেন, কোথায় দাদুর শিষ্যরা কে কি ভাবে বেঁচে আছেন, কে কত

টাকা দিয়েছে—সব। হরকুমার জ্যাঠার কাছ থেকে বাড়ির গৃহদেবতা চেয়ে নিয়ে এসেছেন। দুটো রাধাগোবিন্দের মাঝারি সাইজের পেতলের মূর্তি, শালগ্রামশিলা—এবং ওজনে সের দশেক হবে। তেনারা গলায় ঝুলছেন একটা ছোট মাপের ঢোলের মতো। তিন দিন তিনি অনাহারী, গলায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঝুলিয়ে আহার করেন কি করে। কালই দেবতাদের জন্য ঠাকুরঘর উঠবে। সকালে সবাইকে তুলে নিয়ে যাবেন নদীতে। গঙ্গাস্নান করবেন। ভিজে কাপড়ে ফিরে আসতে হবে সবাইকে। দুলে-বাগদিকে ডাকতে হবে। সে তালপাতা দিয়ে ছোট মতো ঠাকুর ঘর বানাবে, ১লা বৈশাখ ঠাকুরের অভিষেক। লোকজন খাবে, চণ্ডীপাঠ হবে। দু-দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন। এতসব শুনে আমরা হাঁ হয়ে গেছি। কুকুরের বাচ্চাটাও লেজ নাড়ছে। আনন্দ প্রকাশের কোনো ভাষা আমাদের জানা নেই। শুধু নিঝুম এক অন্ধকারে এই বাড়িঘর বড় বেশি সজাগ হয়ে উঠেছে। আর আমার মনে হল আজ থেকে আকাশের ছোট একটা নক্ষত্র সারাক্ষণ রাতে বাড়িটার মাথায় পাহারায় থাকবে। বাড়িটার ভেতর কোনো দুঃখ ঢুকতে দেবে না। বাবার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একটা তালপাতার ঘরে, সত্যি ভাবা যায় না! জীবনে কত বড় সুখ কত সহজে বাবা আমাদের জন্য মাঝে মাঝে যে নিয়ে আসেন।

॥ আট ॥

সকালে ঢাকের বাদ্যিতে বনভূমিটা জেগে গেল। ঠাকুরের নতুন ঘর উঠছে। দু বান টিন কিনে এনেছেন বাবা। এক বান টিন দিয়ে ঠাকুরের দোচালা ঘর, বাঁশের চাটাই-এর বেড়া। ছোট্ট একটা কাঠের সিংহাসনও রাজু মিস্ত্রি বানিয়ে দিয়ে গেছে।

বাবা ফেরার পর এ ক'টা দিন আমরা দিনের বেলায় দম ফেলার ফুরসত পাচ্ছি না। মাঝে মাঝে বাবা কথাবার্তায় সাধু ভাষা প্রয়োগ করলে টের পেতাম, বসে থাকার সময় আর নেই। শুধু কাজ। কাজই মানুষকে বড় করে দেয়। সুতরাং লিস্টি মিলিয়ে সওদা এল শহর থেকে। জীবনে প্রথম বাবার সঙ্গে রিক্শয় চড়ে সওদা করে ফিরলাম। অবশ্য এই নিয়ে একটা গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল—রিক্শয় ফিরব শুনে পিলু এবং মায়া বায়না ধরেছিল, তারাও যাবে। কিছুতেই যখন বাবা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না, তখন কথা দিতে হল, একদিন বাবা ওদের দুজনকে নিয়ে রিক্শয় চড়বে। এবং যখন ফিরলাম, আমার সৌভাগ্যে পিলু ভীষণ

'হতাশ গলায় বলল, সে কোনো কিছুই বাড়ি অবদি বয়ে নেবে না। বড় রাস্তা থেকে বেশ দূরে বাড়িটা—বড় বড় ব্যাগ, চালের বস্তা। এবং আলু, পটল, ঝিঙে, আতপ চাল, মুগের ডাল, সব মিলে একটা বেশ বড় রকমের উৎসবই বাবা যখন করছেন, তখন পিলুর এই বাঁদরামো আমার কাছে ভীষণ অসহ্য ঠেকল। ইচ্ছে হল বলি তোর ঘাড় নেবে, কিন্তু পিলুকে জানি বলেই অমন রূঢ় গলায় কিছু বলতে সাহস হল না।

বাবা রিক্‌শ থেকে নেমেই বললেন, পিলু ধর বাবা। ব্যাগটা ধর, পিলু যখন ভাল করে চেয়ে দেখল, রিক্‌শ ভর্তি—ছোট বড় ব্যাগ, হাঁড়ি পাতিল, চালের বস্তা, তখন সে আর স্থির থাকতে পারল না। ব্যাগ নিয়ে দৌড়ল। আমিও দুটো ব্যাগ নিয়ে ফিরলাম। মায়া খবর পেয়ে ছুটে এল বড় রাস্তায়। সে হাঁড়ি পাতিল যতটা পারল নিল। বাবা বাকিটা। চালের বস্তাটা রিক্‌শওয়ালা মাথায় নিয়ে যখন এল মা তখন গাছের নিচে বাড়ির রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

ক'দিন ধরে বাবা পড়াশোনার কথা একদম বলছেন না। কুলদেবতাকে নিয়ে এসেছেন, এবং কত বড় ভরসা এখন তার এই বাড়িতেই আছে, ছেলেরা এখন ঠাকুরের কৃপাতেই সব পার হয়ে যাবে। বাবার কথাবার্তায় বোঝা যাচ্ছিল, মাথায় তাঁর ঠাকুরের অভিষেক ভিন্ন অন্য কোনো ভাবনা নেই। ঠাকুরঘর, তেপায়া দুটো, তামার পাত্র, কোষাকুষি, পেতলের থালা দুখানা—গজ খানেক নতুন গরদ এবং লাল সিল্ক অর্থাৎ ঠাকুরের পোশাক-আশাক, তারপর শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসি, একটা জল-শঙ্খ দরকার—বাবা সারাক্ষণ মার সঙ্গে পরামর্শ করছেন, আর কি লাগবে ছাখো। কিছু বাদ গেল না তো।

মা কি বলবে। একেবারে মুহ্যমান মা। মানুষটা ঈশ্বর ভরসা করে আছে, তার ঈশ্বর দুটো পয়সার মুখ দেখিয়েছেন। তিনি দিচ্ছেন। এবং মার কাছে বাবা একসময় সবই খুলে বললে, মা বলল; শেষ পর্যন্ত দেবে তো।

—দেবে না কেন? ওরাই তো বলল, কর্তা, বাড়ির ঠাকুর, বাড়ি নিয়ে যান। আমরা তো আছি। ঈশ্বরের সেবায় কিছু দিলে 'পুণ্যটা আপনার হবে না। আমাদের হবে।

এবং বোঝা গেছিল আমার দাদুর বড় বড় শিষ্যদের বাবা ঠিক খুঁজে বের করেছেন। দেশের সব যজমান, কে কোথায় আছে খুঁজে খুঁজে বের করেছেন। কেউ বোধহয় বাদ যায়নি। তারাই বাবাকে ঠাকুরের নামে মাসোহারা পাঠাবে বলেছে। এবং সঙ্গে যে কিছু দিয়েও দিয়েছে খরচ-পত্তরের বহর দেখেই তা আমরা টের পাচ্ছিলাম।

কে কে খাবে, তারও একটা লিষ্ট হয়ে গেছে। মানুকাকা আসবেন, ছেলেরা মেয়েরা আসবেন তাঁর। নিবারণ দাসের বাড়িতে সবাইকে বলা হয়েছে। শহর থেকে আসবেন দুজন পণ্ডিত। বাবা এ-সব ব্যাপারে মানুকাকার পরামর্শ ছাড়া চলেন না। এবং সকালে উঠে পিলু চলে গেছে গোবর আর ষাঁড়ের চনা সংগ্রহ করতে। দুটো বড় গর্ত করা হচ্ছে উনুনের জন্য। মা ঘর, দরজা, উঠোন লেপে বাড়িটাকে ঝকঝকে করে তুলেছে। পুনুও বুঝেছে বাড়িতে কিছু একটা হচ্ছে। সে বেশ একা একাই খেলছিল। আর ঢাকের বাদ্যি বাজতেই মায়া পুনুকে কোলে নিয়ে ঢাকির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। আর বেশ বাজাচ্ছিল লোকটা। ঘুরে ঘুরে আর নেচে নেচে বাজাচ্ছিল। কাঁসি বাজছিল ট্যাং ট্যাং করে। দুলে বাগদি খুব খাটছে। সে-ই প্রায় এক হাতে সামিয়ানা টাঙিয়েছে—সকালেই সব লোকজন চলে আসবে। তাদের বসার জায়গা চাই। এবং আমাদের পরিবারে এমন একটা দিন আসবে আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি। নিবারণ দাস এলে বলেছিলেন বাবা, দাসমশাইকে বসতে দে।

—তা হলে কর্তা সব ঠিকমতোই হয়ে যাচ্ছে।

বাবা নতুন ধুতি পরেছেন। দুলে তামাক সেজে দিচ্ছিল। কে বলবে, আমরা এখানে এসে একটা প্ল্যাটফরমে পড়ে থেকেছি দিনের পর দিন। কি করে যে মানুষ তার বাড়িঘর ঠিক এক সময় বানিয়ে ফেলে। বাবার হয়ে আজ নিবারণ দাস সব দেখাশোনা করবে। কারণ বাবা তো সারাটা দিন ঠাকুরঘরেই থাকবেন। এবং নিবারণ দাস বেশ নিজের বাড়ির লোকের মতো বলল, কর্তা মা, উনুনে কটা কাঠ ফেলে দিই। আগুন ধরিয়ে দিই। কাকিমা এলে মা বঁটি দিয়ে বলল, বসে যা নেরু। পটলের ঝুড়ি এগিয়ে দিল মা। নিবারণ দাসের লোক গেছে বাজারে। সে পছন্দমতো মাছ কিনে আনবে বলেছে।

এক একজন আসছে আর আমি পিলু মায়া হৈ-চৈ করে খবর দিচ্ছি বাড়িতে। মা আরতিদিরা আসছে, মা সুজয়দারা আসছে। যাদের চিনি না, বাবাকে বলছি ঠাকুরঘরে গলা বাড়িয়ে—বাবা কে এসেছেন ছাখো। এবং বেশ বোঝা গেল বাবা এখানে আসার পর পরিচিত ব্যক্তি বলতে আর কাউকে বাদ রাখেননি। যেখানে যার সঙ্গে দু দণ্ড কথা হয়েছে, পরিচয় হয়েছে, সুখ-দুঃখের দুটো কথা হয়েছে তারা সবাই আজ আমাদের উৎসবে আমন্ত্রিত।

দুপুরের মধ্যেই বাড়িটা লোকজনে ভরে গেল। দুলে রাশি রাশি কলাপাতা কেটে রেখেছে। পিলু মায়া কলাপাতার মুখোস পরে সবাইকে ভয় দেখাচ্ছে। কাক-পক্ষিদেরও যেন জানতে বাকি নেই। সবাই টের পেয়ে গেছে আজ আমার বাবা

তাঁর কুলদেবতার অভিষেক করছেন। সারা রাস্তায় রেলগাড়িতে ঠাকুর গলায় ঝুলেছে…বাছ-বিচার কিছু ছিল না, শোধন করে নিচ্ছেন সে-জন্য।

নিবারণ দাসের বড় মেয়ে আরতি এসে বলল, সাধন মামা আসছে। বড় ঝুড়িতে বিরাট একটা রুই মাছ। সবাই রাস্তায় ছুটে গেছি। মাছটা নামালে আমরা ঘিরে বসলাম। পিলু খুঁটে দুটো আঁশও তুলে ফেলল। সাধনদা নিবারণ দাসের শ্যালক। সে বড় বঁটি নিয়ে এল। মাছ কাটা দেখার জন্য আমাদের উৎসাহের শেষ ছিল না। বড় গামলা কেউ টেনে আনছে। কেউ ড্রামে জল ভর্তি করছে। রান্না হচ্ছে দুটো বড় উনুনে। মুগের ডাল, তিতের ডাল, বেগুন ভাজা, শাক হয়ে গেলে সব মা আর কাকিমা ঘরে নিয়ে সাজিয়ে রাখছে। তখনই পিলু বলল, মা নবমীর জন্য দুটো ভাত নিয়ে যাব। সবাই খাবে, এই বনভূমির কাক পক্ষিরাও যখন বাদ যাচ্ছে না, তখন নবমী খাবে না সে হয় না। পিলু বোধহয় সেই ভেবে কথাটা বলেছে।

অন্যদিন হলে নিজেই দেওয়া যাবে কি যাবে না মা সাফ বলে দিতে পারত। সংসারে আমার মার ওপর আর কারো কোনো কথা নেই, কিন্তু মা কেন জানি আজ বড় বেশি বাবার অনুগত। বলল, তোর বাবাকে বলে দেখ কি বলে।

পিলু ঠাকুরঘরের দরজায় এসে বলল, বাবা নবমী কতদিন কিছু খায় নি। দুটো ভাত দিয়ে আসব?

বাবা তখন তদগদচিত্তে ঠাকুরের দিকে তাকিয়েছিলেন। কেমন বাহ্যজ্ঞানশূন্য মানুষ। পিলুর মনে হল বাবা ইচ্ছে করেই তার কথা শুনছেন না। এবং এ-সব সময়ে পিলুর যা হয়, মেজাজ চড়ে যায়, সে হেঁকে ডাকল, বাবা!

বাবা ঘাড় ফিরিয়ে পিলুকে দেখল।

—নবমীকে দুটো খেতে দেব?

বাবা বললেন, নবমী!

—ইঁটের ভাটার ওদিকটায় একটা বুড়ি থাকে না!

—দাও। যখন ইচ্ছে হয়েছে দেবে বৈ কি। সংসারে সবাই খাবে নবমী খাবে না সে কি করে হয়!

আশ্চর্য এক সুঘ্রাণ। ফল বাতাসা, ধূপ দীপের গন্ধে বাড়িটা ভরে আছে। সকালে মা বাড়ির আঙিনায়, ঠাকুরঘরের মেঝেতে আলপনা এঁকে দিয়েছিল। মানুষজনের হাঁটাহাঁটিতে সব মুছে যাচ্ছে। ঠাকুরঘরে পূজা-আর্চা চলছে সেই কখন থেকে, ঢাকের বাদ্য বাজছে সেই কখন থেকে। বাবা কাপড়ের খুঁট থেকে এটা ওটা আনার জন্য মাকে টাকা পয়সা বের করে দিচ্ছিলেন কখনো। সাধন

এবং মানুকাকা এবং আর যারা যারা এসছে সবাই প্রণিপাত হচ্ছে, ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে। নিবারণ দাস কিছুক্ষণ ঠাকুরঘরের বাইরে থম মেরে বসেছিল। দেব-দেবীর মুখ দেখতে দেখতে কখনও মা মা বলে চিৎকার দিয়ে উঠছিল। কেউ কেউ বাবার বাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখছে। আশ্রমের মতো মনে হচ্ছে, একটা আগাছা নেই, জমি উঁচু নিচু নেই—দুটো চারটা ফলের গাছ মাথা বাড়িয়ে দিয়েছে আকাশে।

কুকুরটা আরও বড় হয়েছে। মানুষজন দেখে প্রথমে ক্ষেপে গিয়েছিল, পরে বোধহয় বুঝতে পেরেছে—ওরা বাড়িরই লোক, কিছু আর বলছে না। লেজ নাড়ছে আর পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করছে। মাঝে মাঝে পিলুর খবরদারি, ওদিকে যাবে না। এদিকে এস। ওখানে রান্না হচ্ছে। কথা না শুনলে বেঁধে রাখবে ভয় দেখাচ্ছে।

এত সবের মধ্যে সবই হয়ে যাচ্ছিল। সামিয়ানার নিচে শতরঞ্চ পাতা। বাবা সবাইকে ঠাকুরঘর থেকেই বসতে বলছেন। বিকেল হলেই খেতে বসবে সবাই। দূর দূর থেকে যারা এসেছে সন্ধ্যার মধ্যেই রওনা হয়ে যাবে। দুটো প্যাট্রোম্যাক্স আনিয়ে রেখেছে নিবারণ দাস। বড় আপনজনের মতো সে কোনো কিছুর ত্রুটি রাখছে না।

এবং নিবারণ দাসই বলল, কর্তা, পূজো শেষ হতে আর কত দেরি?

বাবা বললেন, এর শেষ নেই দাসমশাই। যতদিন আছি ততদিন শুধু তাঁর সেবা করে যেতে হবে।

ধার্মিক মানুষের কথাবার্তা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবা এবং অন্য সকলের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পারতাম, জীবনে সব কিছু বলতে আমার বাবা এর চেয়ে বেশি কিছু বোঝে না। বাবা এতদিন একটা ছিন্নমূল, ছন্নছাড়া মানুষ ছিলেন। এই বাড়িঘর এবং দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা করে বাবা ফের তার শেকড়-বাকড় মাটিতে ছড়িয়ে দিতে দিতে কখন দেখি বাবার মুখে ভারি প্রসন্নতা বিরাজ করছে। বাবার এমন সুন্দর মুখ কখনও আর এর আগে দেখিনি। অকারণে আমার চোখ দুটো জলে ভার হয়ে এল। বাবার মুখ দেখে এই প্রথম বুঝি টের পেলাম জীবন কত বড়।

॥ নয় ॥

বাড়িতে ঠাকুরের অভিষেক হয়ে যাবার পর গাছপালা বনের মধ্যে আমাদের অনেকটা ভয় কেটে গেল। কাছেপিঠে নতুন আবাস এখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। তেমনি মাঠ পার হলে পুলিসের ব্যারাক, কালীর দীঘি, বাদশাহী সড়ক—কেবল সেই চৌমাথায় নিমতলার কাছে নিবারণ দাসের বাড়ি এবং তার আশেপাশে আরও সব বাড়ি উঠছে। নতুন কলোনির পত্তন হচ্ছে। সাপ-খোপের উপদ্রব তেমন একটা কমেনি। বৈশাখ শেষ না হতেই জ্যৈষ্ঠ। খরা। ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুর, মাঠ-ঘাট ঘাস সব হেজে গেছে। মাটি ফেটে চৌচির। মনে হত দুপুরটা এক গনগনে আঁচের আগুনের কুণ্ড। এরই মধ্যে পিলু কোথা থেকে কোঁচড় ভর্তি করে আম সংগ্রহ করে আনত। ঝড় বৃষ্টি রোদ্দুর সবই সে সহজে সহ্য করতে পারে।

এখন এই বাড়িতে আমার বাবার সাধ বলতে আর কিছু ফল টলের গাছ লাগানো। পাঁচ বিঘে জমির সবটা এখনও সাফ হয়নি। উত্তরের দিকে একটা বড় জঙ্গল রয়েই গেছে। বছরের ওপর হল আমাদের এই নতুন আবাস। এখন আর এ জায়গাটাকে মনেই হয় না অচেনা-অজানা, ভূতুড়ে সাপখোপ অথবা শেয়াল-খাটাশের একমাত্র আস্তানা। ঠাকুরঘরটা হয়ে যাবার পর বাবা একদিন দুটো জবা ফুলের ডাল নিয়ে এলেন। তিনি গেছিলেন বেলডাঙার কাছে মহুলা গাঁয়ে। নিবারণ দাসের বড় শ্যালকের বিয়ে। বিয়ের কাজ সেরে ফেরার সময় দুটো জবা ফুলের ডাল সঙ্গে এনেছেন। বিয়ে দিয়ে পেয়েছেন প্রণামীর টাকা আর একটা পুরোহিত বরণ। কিছু চাল-ডাল। অন্য সময় বাবা যখন এ-ভাবে ফিরে আসেন তখন উপার্জনের নিমিত্ত কতদূর যেতে হয়, এমন সব সাধুবাক্য সংকল্পের মতো পাঠ করেই থাকেন। এবারে অন্য রকম। সব কোনো রকমে নামিয়ে রেখে হাঁকতে থাকলেন—ও ধনবৌ, তোমার সুপুত্ররা সব কোথায়? কাউকে দেখছি না। বাবা ফিরেছেন বিকেলে, তখন কী আর বাড়ি থাকা যায়। এবং বাড়ির পাশে, কোথাও কোনো বাড়ি ছিল না বলে, শুধু বন-জঙ্গল ছিল বলে, বনের গাছপালা, লতাপাতা, সরু পথ, বুনো ফলের সন্ধান অথবা কোথায় এখন একটা এই গভীর বনে লিচু গাছ আবিষ্কার করা যায় সেই নেশায় বিকেল হলেই আমি পিলু কখনও মায়া সঙ্গে থাকত—বের হয়ে পড়তাম, কারণ আমরা কয়েক-

বারই এমন কিছু আবিষ্কার করেছি এই বড় বনটাতে যাতে বাবা পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেছেন। এবং আমাদের কাছে বাবাকে স্তম্ভিত করার আনন্দ ছিল পৃথিবী জয় করার মতো। বাবা দু'দিন বাড়ি নেই, বাবা ফিরে এলে তাঁকে নতুন কোনো খবর দিতে পারব না, সেটা কেমন আমাদের কাছে খারাপ লাগত। এটা লিচুর সময়। আম, কাঁঠাল, লিচু, গোলাপজাম, জাম, জামরুল সবই এ সময়টাতে হয়। কাঁঠাল গাছ এবং দুটো আনারসের গাছ প্রথম আবিষ্কার করেছিল পিলু। আমি একবার একটা সরু পথ ধরে যাবার সময় প্রথম একটা আম গাছ তারপর আরও বনের গভীরে ঢুকে গেলে বুঝলাম, ওটা আমেরই বাগান, তারপর পিলু খবর নিয়ে এল বনটায় একটা বাতাবী লেবুর গাছও আছে, তখন আমি আর কি আবিষ্কার করব—একটা বাঁশ বাগানের মধ্যে যে ছোট্ট ঢিবি ছিল, সেখানে একটা কচ্ছপ আবিষ্কার করে এসে বাবাকে খবরটা দিলাম। বাবা বাড়ি না থাকলে যথার্থ স্বাধীন, খাও-দাও ঘুরে বেড়াও। তারপর মায়া আমি কখনও কোনো গভীর বনের মধ্যে ঢুকে নিরিবিলি গিমা শাক খুঁজে বেড়াই। বাবা আমার খুব গিমা শাক খেতে ভালবাসেন।

এ-হেন দিনে বাবা বাড়ি ফিরে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের তাঁর স্বগৃহে উপস্থিত থাকতে না দেখে খুব ক্ষেপে গেলেন। মাকে বোধহয় দুটো মন্দ কথাও বলে ফেললেন। আগের মতো আর তো মার প্রতি বাবার শংকাভাবটা নেই। নানা জায়গায় ঘুরে বাবা তাঁর খেরোপাতার লিস্টি মিলিয়ে সব যজমান এবং শিষ্যদের পুরো একটা তালিকা রচনা করে ফেলেছেন। এ-দেশে আসার পর দুটো বছর লিস্টি ঠিক করতেই চলে গেছে। যে-জন্য বাবা আমাদের অচেনা প্ল্যাটফরমে, অথবা কোনো ভাঙা মন্দিরে ঠাঁই করে দিয়ে মাঝে মাঝেই নিরুদ্দেশ হতেন। তখন কি খাব কি খাব না তিনি আদপেই সেটা ভাবা পছন্দ করতেন না। ঈশ্বর, পৃথিবী, জলবায়ু এবং লতাপাতা যখন আছে সংসার ঠিক একভাবে না একভাবে চলে যাবেই। অকম্মা মানুষেরাই এটা ভেবে থাকে এবং বাবা মার কাছে এজন্য ফিরে এসে খুব ভালমানুষ সেজে থাকতেন। মা যত গালমন্দই করুক, রা করতেন না।

এখন আমাদের অবস্থা ফিরে গেছে, মা'র এবং বাবার আচরণে এটাই মনে হত। এবং অবস্থা ফিরে যাওয়ার মূলে বাবা, তিনি তাঁর গাছের শেকড়-বাকড় সত্যি মাটিতে এবার পুঁতে দিতে পেরেছেন। বনের শাক, কচু লতাপাতার ওপর আর যেহেতু সংসারটা নির্ভরশীল নয়, তখন তাঁর ছেলেমেয়েরা যখন-তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে যাবে, বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়াবে, এটা তিনি আর সহ্য করতে পারছেন

না। বাবা জবা ফুলের ডাল দুটো নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন। ঠাকুরঘরের পাশে লাগাবেন, না একটি সুন্দর ফুলের বাগান তৈরি করবেন, ফুলের বাগান তৈরি করতে হলে এলোমেলোভাবে লাগালে চলবে না। ক'হাত বাই ক'হাত বাগানটা হবে, রাস্তা থেকে কিভাবে বাগানের সবটা দেখা যাবে এ-সব ভাবনায় পীড়িত হচ্ছিলেন। তাছাড়া যার ওপর ভরসা করে সব তিনি লাগাবেন, সেই মেজ পুত্রটি এখন বাড়ি নেই। মেজ পুত্রটি তাঁর তো পুত্র নয় সাক্ষাৎ দেবতা। পছন্দমতো জায়গায় গাছ লাগানো ঠিক না হলে তিনি সেটি তুলে তাঁর পছন্দমতো জায়গায় লাগাবেন। তাতে গাছ বাঁচুক-মরুক কিছুই আসে-যায় না। আর কাজটি এমন নিখুঁত সতর্কতার সঙ্গে করা হবে যে বাড়ির কাক-পক্ষিটি পর্যন্ত টের পাবে না। এভাবে দামী দামী কটা গাছের চারাই তিনি বিনষ্ট করেছেন। সুতরাং বাবার সমস্যার শেষ নেই। তিনি তাঁর স্ত্রী সুপ্রভা দেবীকে খুব মোলায়েম গলায় বললেন, আপনার মেজ পুত্রটির কি এখন আসার সময় হয়েছে?

মা বুঝতে পারে বাবা তাঁর সন্তান-সন্ততিদের বাড়ি ফিরে না দেখতে পেয়ে খুব রেগে গেছেন। আজকাল যজমান এবং শিষ্যরা মাসান্তে ঠাকুরের নামে দু-পাঁচ-দশ টাকা মনিঅর্ডার করে থাকে। অন্যান্যবার এসেই প্রথম বাবা সাধারণত বারান্দায় বসে হুঁকো সাজতে না সাজতেই বেশ মধুর স্বরে বলতেন, ও ধনবৌ, টাকা-পয়সা কিছু এল? সাধারণত কিছু এসেই থাকে। দু টাকা পাঁচ টাকা মাঝে মাঝেই এসে থাকে। তাতে খুব একটা সমারোহে সংসার চলে যায় না—কোনো রকমে ডালভাতের সংস্থান হতে পারে—এই ডালভাতের সংস্থান করতে পারাটা একটা উদ্বাস্তু পরিবারের পক্ষে কত কৃতিত্বের ব্যাপার সেটা বাবার হুঁকো খাওয়ার সময় মুখ না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। এবারে তিনি হুঁকোটি পর্যন্ত ছুঁলেন না। মা নিজেই হুঁকো সেজে বাবার সামনে এনে দিয়ে বলল, কোথাও গেছে। আসবে। বাবার মাথা ঠাণ্ডা করার এর চেয়ে মোক্ষম দাওয়াই আর কিছুই নেই। এতদূর থেকে এসে স্ত্রীর এমন আপ্যায়নে বিগলিত হয়ে গেলেন। বললেন, গেছে কোথায়?

—কোথায় যাবে আবার। পিলু বোধহয় ব্যারেকে গেছে। মায়া বিলুকে বলেছি, তোর বাবা ফিরবে, দেখ্‌না দুটো গিমা শাক পাস কি না। এখন বর্ষা পড়েছে, কোথাও গজাতে পারে। তুমি তো গিমা শাক খেতে খুব ভালবাস। গাছে দুটো বেগুন হয়েছে। বেগুন দিয়ে রাতে গিমা শাক করব ভেবেছি।

এ-সবই হয়ে থাকে সংসারে এখন। সামান্য চাল ডাল নুন তেল থাকলে আর কোনো উচ্চাশার কথা ভাবা হয় না। বাবা জবা ফুলগাছটা লাগাবার ঠিক আগেই

আমরা পৌঁছে গেলাম। আমি আর মায়া। আমাদের কোঁচড় ভর্তি গিমা শাক। বাবা দেখে তো বেজায় খুশী। বললেন, জবা ফুলের ডাল দুটো কোথায় লাগাবি? যেন আমি যেখানে পছন্দ করব সেখানেই লাগানো হবে। বাবা তাঁর নতুন আবাসটির কোথাও আর কোনো ত্রুটি রাখতে চাইছেন না। এই সুমার বন-বাদাড়ে পূজার ফুলের খুবই অভাব। বিশেষ করে শ্বেত জবা রক্ত জবা এই দুটো ফুল পূজার অপরিহার্য অঙ্গ। পূজায় বসে বাবা সে-সব ফুল পাবেন কোথায়? বাগদি পাড়ার কাছে একটা করবী ফুলের গাছ শেষ পর্যন্ত কিছুটা বাবাকে স্বস্তি দিয়েছে। পুলিস ব্যারাকে ফুলের গাছ বলতে ম্যাগনলিয়া, গোলাপ, বোগেন-ভেলিয়া। এমন সব ফুল যা একটাও পূজায় লাগে না। সেজন্য বাবা রোজ সকালে স্নান করার সময় ল্যাংড়ি বিবির হাতা থেকে দুটো-একটা পদ্ম তুলে আনেন। ভবিষ্যতে যাতে পূজায় ফুলের অভাব না হয়, স্থলপদ্ম গাছ, শিউলি ফুলের গাছ এবং কিছু দোপাটি ফুলের চারা ইতিমধ্যেই লাগিয়ে ফেলেছেন। আর বাবা বাড়ি না থাকলে পূজার ভার আমার ওপর। পঞ্চদেবতার পূজা, গণেশের পূজা, লক্ষ্মীর ধ্যান, এই সব মন্ত্র একটা খাতায় লেখা থাকে। আমি দেখে দেখে মন্ত্র আওড়াই আর 'এষ দীপায় নম, এষ ধূপায় নম' করি। তখনই সংসারে পিলু সব চেয়ে বেশি খাপ্পা হয়ে যায় আমার ওপর। যেহেতু আমাদের খুব শৈশবে পৈতা হয়েছে—পিলুর ধারণা পূজা করার এক্তিয়ার তারও আছে। কিন্তু বাবা বাড়ি থেকে যাবার আগে পূজার ভার যেমন আমার ওপর অর্পণ করেন, তেমন বাড়িঘর দেখাশোনার ভার পিলুর ওপর অর্পণ করে যান। এতে পিলু বাবার ওপর খুব রুষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু মুশকিল পিলু সকাল হলেই পেট ভরে খেতে চাইবে। পুজো করার কথা থাকলে সে না খেয়ে পুজোয় বসবে না, আসলে অত বেলা পর্যন্ত আজকাল আর না খেয়ে একেবারেই সে থাকতে পারে না। আর ওর ঈশ্বরে বিশ্বাসও খুব একটা প্রবল নয়। যদিও ঈশ্বরের প্রতি ভূতের ভয়ের মতো একটা ভয় তার সব সময়ই আছে।

বাবা বললেন, আমার মেজ পুত্রটি না এলে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যাচ্ছে না। এবং এক সময় মেজ পুত্রটি এক বোঝা কাঠ মাথা থেকে নামিয়েই বাবার কাছে ছুটে এল। পিলু কাছে এলে হুঁকোটি ওর হাতে দিয়ে বললেন, এখন অনেক কাজ। পিলু হুঁকোটি যথাস্থানে রেখে এলে বাবা বললেন, দুটো জবা ফুলের ডাল এনেছি। একটা শ্বেত জবা, একটা রক্ত জবার। কোথায় লাগাবি?

পিলু এত বড় গুরুদায়িত্বের কথা ভেবে প্রথমে সামান্য হকচকিয়ে গেল। বাবা গাছটাছ তাঁর মর্জিমতোই লাগান। তারপর দ্বিতীয়বার আবার সেই গাছটাছ

পিলুর মর্জিমতো লাগানো হয়। কোনোটা বাঁচে কোনোটা মরে। কিন্তু জবা ফুলের ডাল্ দুটিকে দু'বার দুজন দুজনের মর্জিমতো লাগালে ধকল সইতে পারবে না। এবং এমন মহার্ঘ ডাল দুটোকে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য বাবা বাধ্য হয়ে তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের শরণাপন্ন হলেন।

বাবার দ্বিতীয় অথবা মেজ পুত্রটি পেছনে দু'হাত রেখে প্রথমে ঠাকুরঘরের চারপাশটা ঘুরে দেখল। যেসব গাছটাছ আছে, যেমন একটা স্থলপদ্মের গাছ, পাশে দুটো গোলাপের গাছ, টগর এবং জুঁই ফুলের গাছ, তার পাশে সুন্দর মতো একটা করবীর চারা বেশ সতেজ ডাল মেলে দিয়েছে, পিলুর জায়গাটি কেন জানি লাল জবাফুলটির জন্য পছন্দ হয়ে গেল। সে উঠোনে গিয়ে বলল, বাবা, দাও লাগাচ্ছি।

বাবা ওই লাগাক, ওর মর্জিমতো কাজটা হলেই শেষ পর্যন্ত গাছটা বাঁচবে ভেবে বললেন, কোথায় লাগাবি ঠিক করেছিস?

—করবী গাছটার পাশে।

মেজ পুত্রটি এমনিতে তাঁর বেশ বুদ্ধিমান। কিন্তু জায়গা নির্বাচনে কাজটি যে ঠিক হয়নি এবং সোজাসুজি ঠিক হয়নি বললেও মেজ পুত্রটির শেষমেষ যদি নিজের জেদ বজায় রাখার নিমিত্ত আবার দু'বারের ঠেলা সামলাতে হয় গাছটাকে তবেই গেছে। তিনি ডালটি এবং একটা খুরপি নিয়ে ওর সঙ্গে এলেন। বললেন, সত্যি জায়গাটা খুব ভাল। গরু-ছাগলে খেতে পারবে না। কিন্তু করবী গাছটা খুব বড় হয়ে গেলে তোর জবার ডালটা আলো-বাতাস একেবারেই পাবে না।

এমন একটা সাধারণ সত্য-জ্ঞানের অভাব ভেবে পিলু কেমন বাবার ওপরই কাজের ভারটা ছেড়ে দিল। তারপর আমাকে, মাকে ডাকল। আমরা প্রায় বাড়ির সবাই, এমন কি কুকুরটা পর্যন্ত যতক্ষণ ডাল দুটো লাগানো না হল দাঁড়িয়ে থাকলাম। এবং বাবা এবারে যেন নিশ্চিত মনে বললেন, যাক ধনবৌ, তোমার লাল জবা, শ্বেত জবাও হয়ে গেল।

আসলে বাবা আমার তাঁর সেই দেশ বাড়ির কথা বুঝি এতদিনেও এক বিন্দু ভুলতে পারেননি। বাড়িটার জন্য বাবা কী যে না করছেন! ফলের গাছের একটা লিস্টিও বাবা এক রাতে বসে কুপির আলোতে বানিয়ে ফেললেন। মানুষের ঘরবাড়ি করতে যা যা লাগে তার কোনো ত্রুটি থাকুক বাবা সেটা একদম পছন্দ করতেন না।

মা একদিন বাবার এত উৎসাহের মধ্যে বলে ফেলল, সবই হচ্ছে, খুঁজে-পেতে সব শিষ্য যজমানদের ঠিকানা নিয়েছ, সব খেরো খাতায় লিখে রেখেছ, ছেলে ক'টাও

বড় হচ্ছে। শুধু তোমার ঘর-বাড়ি বানালেই চলবে, বিলু পরীক্ষাটা দেবে না? পিলুকে শহরের স্কুলে দেবে না? মায়া বাড়িতেই পড়তে পারে। ছোটটার না হয় বয়স হয়নি…।

বাবা নিশ্চিন্ত মনে বললেন, ও হয়ে যাবে। মানুষের বাড়িঘর হয়ে গেলে সব হয়ে যায়। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বাক্স থেকে বইগুলো বার কর। বসে থাকলে তো পেট ভরবে না।

বাবা তাঁর পছন্দমতো কাজ না হলে নির্বিঘ্নে সব ভুলে যেতে ভালবাসেন। তিনি বই বাক্স থেকে কবেই বের করে দিয়েছেন। যখন দু-চার দিনের মতো খাবার মজুত ঘরে থাকত, তখনই আমাদের পড়ার কথাটা বাবার মনে পড়ত। প্রায় সকালে উঠে বাবা হুড়োহুড়ি লাগিয়ে দিতেন। নিজেই মাদুর পেতে বলতেন, পড়তে বোস। বইটই নিয়ে এস, দেখি কে কতটা এগোলে। মাসাধিককাল পর পর তিন-চার দিনের বাবার এই প্রচেষ্টা সম্পর্কে আমরা খুবই ওয়াকিবহাল ছিলাম। আমরাও তখন উচ্চস্বরে পড়তাম। সবচেয়ে উচ্চস্বরে পড়ত তাঁর মেজ পুত্রটি। সে রাজ্যবর্ধনের বোন রাজশ্রীর সেই আগুনে ঝাঁপ দেবার মুখের দৃশ্যটি খুব মনোযোগসহকারে পড়ত। গ্রহবর্মার মালবরাজ দেবগুপ্ত আর বাংলার রাজা শশাঙ্কের মিলিত সৈন্যবাহিনীর কাছে পরাজয়ের পাতাগুলিও সে পড়ত গলা ফাটিয়ে। আর মাঝে মাঝে নিজের বোন মায়া দেবীকে কিল চড় ঘুষি বাবার অলক্ষ্যে যখন যেটা সুবিধা ব্যবহার করে চলত।

আমাদের এই তিনজন পড়ুয়ার মধ্যে মধ্যমণি হয়ে বসে থাকতেন বাবা। বাবার কোলে যিনি থাকতেন, তার প্রতাপ সবার চেয়ে বেশি। সে খুশিমতো যার তার বই টেনে নিত, চিবুত, কখনও কোনো বই-এর পাতা ছিঁড়ে ফেলত। তার সব অধিকার ছিল। বাবা মাঝে মাঝে তার ছোট পুত্রটির কাণ্ডকারখানায় বিব্রত হয়ে বলতেন, আহা কী করলি! দিলি তো ছিঁড়ে। ধমক দিলেই ছোট ভাইটির ভারী বদ অভ্যাস ছিল। নির্ঘাত সে বাবার কোলে পেচ্ছাব করে দেবে। বাবাও সেই ভয়ে খুব জোরে কিছু বলতে সাহস পেতেন না। কোল থেকে তুলেও দিতেন না। কারণ মা'র তো সকাল থেকে কাজের অন্ত থাকে না। মাকে গিয়ে জ্বালাতন করবে ভয়েই বাবা সব উপদ্রব সরল মানুষের মতো সহ্য করে যেতেন। ছোট সন্তানকে তাঁর শাসন করার কোনো অধিকারই মা বাবাকে দেয়নি। এছাড়া এ-সব ব্যাপারে বাবার ভীষণ আপেক্ষিক তত্ত্বে বিশ্বাস ছিল।

আমি প্রথমে কিছু ইংরেজি কবিতা পড়লাম। কবিতাগুলি ক'দিন পড়লে বেশ মুখস্থ হয়ে যায়, না পড়লে আবার সহজেই ভুলেও যাওয়া যায়। বাবার সামনে

কখনই বাংলা সংস্কৃত পড়ি না। কারণ বাংলা এবং সংস্কৃত পড়লেই তার অধীত বিদ্যার মধ্যে পড়ে যায়। তিনি তখন এমন সব অদ্ভুত প্রশ্ন করতে থাকেন যে, আমার আসল পড়াটাই আর হয়ে ওঠে না। অর্থাৎ বাবা আমার সংস্কৃতে এবং বাংলাভাষায়, এমন কী ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের বহর বোঝাতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত সকালটা কীভাবে যে নষ্ট করে দেন! তাঁর মেজ পুত্রটি বাবার এই দুর্বলতা বিলক্ষণ টের পায় বলেই প্রথমে ইতিহাস ধরেছে। বাবা একটা কথাও বলেননি। তারপর বাংলা—বাবা তেমনি চোখ বুজে শুনে যাচ্ছেন। উচ্চারণে ত্রুটি ঘটলে কেবল সেটা ধরিয়ে দিচ্ছেন। বাবা কিছুদিন আগে তাঁর জ্ঞানের বহর বোঝাতে গিয়ে যে শেষ পর্যন্ত একবিন্দু আমাদের কারো পড়া হয়নি, মা সেটা ধরিয়ে দিতেই মৌনীবাবা সেজে এখন ছেলে কোলে নিয়ে প্রায় মহাদেবের মতো বসে আছেন।

আর সেই বাবা সহসা বলে উঠলেন, ওরে বিলু অঙ্ক করছিস না কেন?

বললাম বইটার হাফ নেই বাবা।

—জ্যামিতি?

—ওটা আনতে হবে।

বাবা তারপর মোটামুটি হিসাব নিয়ে 'বুঝতে পারলেন, আমার বই-এর সংখ্যা যথার্থই কম। এবং বাবা যেন এটা আজই জানলেন, তেমনভাবে বললেন, তবে শহরে চল, মানুকে বলে-কয়ে কিছু পুরনো বইটই পাওয়া যায় কিনা দেখি। কি কি নেই একটা লিস্টি করে ফেল।

এই লিস্টি আজ নিয়ে মোট পাঁচবার করা হল। কে. পি. বসুর অ্যালজাব্রা আছে। তবে সবটা নেই। জ্যামিতির হাফ আছে। কারণ দু' বছরের টানা হ্যাঁচড়া। এবং আমার আর কখনও পড়াশোনা হবে ভাবিনি। যতই বাবা বলুন, বাড়িঘর হয়ে যাক তখন দেখা যাবে। কখনও প্ল্যাটফরমে, কখনও পোড়ো বাড়িতে থাকতে থাকতে ভাবতেই পারিনি, এ দেশে এসে কখনও আমাদের শেষ পর্যন্ত বাড়িঘর হবে। সুতরাং বেশ নিশ্চিন্তই ছিলাম। কিন্তু বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পর পরীক্ষাটা না দিলে যেমন বাবার সম্মান থাকে না, তেমনি এই বাড়িঘর বানানোরও কোনো অর্থ হয় না।

বিকেলেই বাবা শহরে মানুকাকার কাছে নিয়ে গেলেন। রাস্তায় বললেন, কাকাকে বলো তোমার কী কী বই নেই। যখন পুরো লিস্টি দিলাম, তখন সেই কাকাটি হতবাক্। বললেন, কি করে পরীক্ষা দিবি? চার মাসও তো বাকি নেই। কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাস্টারমশাই কাকার বন্ধু লোক। কাকা আবার আমাকে

তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি একটি চিরকুট লিখে তাঁর এক শিক্ষকের কাছে পাঠালেন। তিনি তাঁর দুই ছাত্রের ঠিকানা দিলেন। ওদের বাড়তি বই-টই যদি থাকে। ওরা পাঠালো খেলোয়াড় বিনয় দাসের কাছে। সে এবারে পরীক্ষা দিচ্ছে না। তার বইগুলি যদি পাওয়া যায়। কিছু পাওয়া গেল, কিছু পাওয়া গেল না। বইগুলি যে নেই বলল না। বললে, বিনয় দাসের বাবা মুদিখানার মালিক তাকে আর আস্ত রাখত না। যাই হোক এই করে যখন কিছু বই নিয়ে শেষ পর্যন্ত অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম, মা আমার খুবই আশ্বস্ত হলেন। যে মা, কখনও জানেই না, কোন্ বই-এর কি নাম সেও লণ্ঠন জেলে উবু হয়ে বসল। সব বই দেখে বলল, এর তো দেখি ভেতরে সব পাতা কাটা রে। কেমন সুন্দর করে কেটেছে দেখ!

বাবা বললেন, সত্যি তো!

আমি বললাম, বাবা বিনয় দাস চারবার চেষ্টা করে পারেনি। বোধহয় সেজন্য মা সরস্বতী রাগ করে সব ভাল ভাল জায়গাগুলি বই থেকে চুরি করে নিয়েছেন। বাবা বললেন, তবু তো বই। এই বা কে দেয়। মন দিয়ে পড়লে ওতেই পাস করে যাবে।

বাবা বলতে কথা। বাবার কথা ফেলা যায় না। তখন সেই বই সম্বল করেই আমার পড়াশোনা আরম্ভ হয়ে গেল। প্রাইভেট পরীক্ষার্থী আমি। বাবা এক ফাঁকে নিবারণ দাসের আড়তেও চলে গেলেন। বলে এলেন, দাসমশাই বড় ছেলে আমার এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিচ্ছে। শুধু নিবারণ দাস কেন, যার সঙ্গেই দেখা হত একথা সেকথার ফাঁকে বাবা বলতেন, বিলুটা এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে। বাবার বাড়িঘরের সঙ্গে তাঁর বড় ছেলের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়াটা বড়ই গৌরবের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল শেষ পর্যন্ত। ম্যাট্রিক পরীক্ষার চেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষাটা আরও যেন গম্ভীর শোনায়। বাবা সব সময় খুব জরুরী কথাবার্তায় খুব সাধুভাষা ব্যবহারের পক্ষপাতী। এবং এভাবেই এই বাড়িতে শীতকালও এসে গেল। এখন পিলু পর্যন্ত আমাকে সমীহ করতে শুরু করেছে। আমার পড়ার জন্য বাবা শেষ পর্যন্ত একটা হ্যারিকেনও কিনে ফেললেন।

আর আমি জানি, বাবা যেখানেই এখন যাচ্ছেন বিয়ের কাজে অথবা কোনো পুজো-আর্চার ব্যাপারে ঠিক কথায় কথায় তাঁর বড় ছেলে কত লায়েক, কী পরীক্ষা দিচ্ছে সে-সম্পর্কে বিশদ আলোচনা না করে ছাড়ছেন না। বাড়ি ফিরলেই বাবা বলতেন, জগদীশ বলল, প্রবেশিকাটা পাস করলেই কর্তা আপনার আর কোনো ভাবনা নেই। অফিসে চাকরি হয়ে যাবে। বাবার ছেলে অফিসবাবু হবে শুনে

মা খুব অমায়িক হয়ে যেতেন। মা বলতেন, হাত-মুখ ধুয়ে একটু কিছু খাও। কোন সকালে তো বের হয়েছ।

এই বাড়িঘর, গাছপালা এবং বনভূমির মধ্যে রাতে আমার উচ্চস্বরে পড়া বাবার চোখে-মুখে এক আশ্চর্য প্রশান্তি এনে দিত। তিনি মাঝে মাঝে গুড়ুক গুড়ুক করে তামাক টানতেন। আর কখনও সকালে সেই পড়াশোনার মধ্যেই পিলু খবর দিত এই বিরাট বনভূমির কোন দিকটার সব গাছপালা কেটে লোকে নতুন আবাস তৈরি করছে এবং আমার মনে হত পিলুর ভারি কষ্ট হত এতে। এই বনভূমিটা যেন পিলুর সাম্রাজ্য—সবাই কে কোথা থেকে এসে সব গাছপালা কেটে ফেলছে। বনভূমির সেই আদিম আশ্চর্য রহস্যটা মরে যাচ্ছে বলে পিলুকে প্রায়ই খুব ম্রিয়মাণ দেখাত। কুকুরটাকে নিয়ে সে আগে যেমন এই বনভূমির অভ্যন্তরে ঢুকে অদ্ভুত সব খবর নিয়ে আসত আমাদের জন্য এখন আর তেমন পারে না। গাছপালা কেটে ফেলায় একটা উষর জমির মতো দেখায় এবং সেখানে মাঝে মাঝে শোনা যায় বাঁশ কাটার শব্দ। বাবার খুব তখন আনন্দ। পূজা শেষ করে বাবা যত জোরে সম্ভব শঙ্খে ফুঁ দিতেন। কাঁসর ঘন্টা বাজাতেন। পিয়ন আসত ঠাকুরের নামে আসা যজমান অথবা শিষ্যদের মনিঅর্ডার নিয়ে। কেউ পাঁচ টাকা, কেউ দশ টাকা মাসোহারা দেয়। আর বাবার কিছু যজমান নিবারণ দাসই ঠিক করে দিয়েছে। শহরের মানুকাকাও ভাল পুরোহিতের খোঁজে কেউ এলে বাবাকে খবর পাঠায়। আর যারা বাবার মতো নতুন ঘরবাড়ি করছে, দিনখন দেখতে এলে বলে দেন, ঠাকুরের ফুল-তুলসী নিয়ে যাও। ওতেই হয়ে যাবে। জায়গাটার কথা বললে বলেন, মাটি মাটি। তার তুলনা নেই ভুবনে। সেখানেই আবাস, সেখানেই মানুষের সবকিছু। বাবার এমন সুন্দর কথা ওদের খুব ভাল লাগত। পূজা-পার্বণে দিন দিন যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে এটা বোঝা যাচ্ছিল সবই বাবার স্বভাবগুণে।

এ-ভাবে শীতকাল শেষ হয়ে গেল এই বনভূমিটায়। এখন আর আগের মতো একে আমরা ঠিক বনভূমি বলতে পারি না। কারণ বাদশাহী সড়কের ধারে ধারে সর্বত্রই মানুষের নতুন বাড়িঘর উঠে যাচ্ছে। ভেতরের দিকে, অর্থাৎ যে সুমার বনটা প্রায় মাইলব্যাপী কারবালা পর্যন্ত চলে গেছে এবং যেখানে কবে কোন আদ্যিকালে একটা ইটের ভাঁটাও কেউ করেছিল—কেবল সে জায়গাটা কেন জানি মানুষ এখনও ঠিক পছন্দ করছে না। ফলে ওদিকটার বড় বড় শিরিষ গাছগুলি থেকে পাতা ঝরতে লাগলো ঠিক আগের মতই; কিছু শাল গাছ অথবা পিটুলি গাছের পাতাও ঝরছে। রোদের তাত বাড়ছে। মাঠে অথবা কোনো শস্যক্ষেত্রে

আগে যে খরগোস সজারুর উপদ্রব ছিল তাও ক্রমে কমে আসতে লাগল। কিছু বড় বড় গো-সাপ ছিল বনটাতে, ওদেরও আর বিশেষ দেখা পাওয়া যেত না। রাতে শিয়ালের সেই তীব্র চিৎকার ক্রমে দূরবর্তী শব্দের মতো মিহি হয়ে যেতে থাকল। এবং এত সবের মধ্যেই আমায় একদিন শহরে যেতে হল পরীক্ষা দিতে। মা কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দিল। বাবা-মাকে প্রণাম করতে হল। ঠাকুরের ফুল বেলপাতা বাবা পকেটে দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ পরীক্ষায় কৃতকার্য হবার জন্য বাবার বিশ্বাসে যা কিছু দরকার সবই করা হল।

পরীক্ষার কটা দিন বাড়ি থেকে বাবা কোথাও গেলেন না। পূজার সময় বেড়ে গেল। শালগ্রামের মাথায় বোঝা বোঝা তুলসী পাতা চাপাতে থাকলেন বাবা। শহরে আমি পরীক্ষা দিচ্ছি। বাড়িতে বাবা ঠাকুরের কাছে পরীক্ষা দিচ্ছেন। ধৈর্যের পরীক্ষা বোধহয়। কারণ বাবার জানা যত দেবতা আছেন সবার উদ্দেশেই ফুল চন্দন দিতে দিতে বিকেল হয়ে যেত বাবার। কেউ বাদ গেলে ষড়যন্ত্র করে বাবার সব ভণ্ডুল করে দিতে পারে। শেষ পরক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরতে সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দেখি মা খুব উদ্বিগ্ন চোখে-মুখে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। মায়া ভাইকে কোলে নিয়ে রাস্তার গাছপালা দেখাচ্ছে। পিলু রাস্তায় দাঁড়িয়েছিল আমি কখন ফিরব! কেবল বাবা নেই। ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ। মাকে বললাম, বাবা কোথায়?

ঠাকুর ঘরে সেই সকালে ঢুকেছে এখনও পুজোই শেষ হচ্ছে না।

বুঝলাম, তাঁর বড় পুত্রের জন্য বাবা আজ তেত্রিশ কোটি দেবতাকেই খুশী করতে ব্যস্ত। তাঁর নিজের এত সখের বাড়িঘরের কথা মনে নেই। প্রিয় কুকুরটার কথা মনে নেই। দেবতাদের তুষ্ট করতে গিয়ে দিনশেষে বেলা যায় তাও তিনি বুঝি ভুলে গেছেন।

ঠাকুর ঘরের দরজার সামনে এগিয়ে গেলাম। খুব সতর্ক গলায় ডাকলাম,—বাবা।

বাবা রা করলেন না!

আবার ডাকলাম, বাবা, আমার পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

বাবা কেমন ধ্যানমগ্ন গলায় বললেন, শেষ বলো না। পরীক্ষা সবে শুরু হল। কী অর্থে কথাটা বললেন, বুঝতে পেরে খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাবা তখন ডাকলেন, হাত-পা ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম কর এবং এ-সবে আমার কিঞ্চিৎ বিশ্বাসের অভাব ছিল। তবু বাবার কথা। ঘরে ঢুকে ঠাকুর প্রণাম করলে সামান্য চরণামৃত দিলেন খেতে। এত সবের পর বাবার পুজো শেষ ধরতে পারলাম।

তিনি উঠে দাঁড়ালেন। পরীক্ষার ভালমন্দের কথা তিনি আজ পর্যন্ত একবারও জিজ্ঞেস করলেন না। সবই ঠাকুরের কৃপা, ভাল-মন্দ বলে যেন কিছু নেই। শুধু নিজের কাজটুকু করে যাও। বাবার এমন সব কথা আমরা অনেকবার শুনেছি। মা মাঝে মাঝে একই কথা শুনে রেগে যেত। কিন্তু পরীক্ষার কটা দিন বাবার পূজো আর্চায় মা সাংসারিক অনটনের কথা বলে এতটুকু বিব্রত করল না। বাবার সঙ্গে মাও এ-ক'টা দিন খুবই ঈশ্বরবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে বুঝতে পারলাম।

ফল বের হবার আগ পর্যন্ত বাবা আমাকে কোথাও গেলে সঙ্গে নিতে শুরু করলেন। শহরে মানুকাকার বাড়ি গেলে বললেন, সব তাঁরই ইচ্ছে। বিলু তো এবারে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিল। তোর তো জানাশোনা আছে অনেক। দেখিস যদি কিছু করতে পারিস। নিবারণ দাসের আড়তে নিয়ে গেলেন একদিন। বললেন, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে বিলু।

এই প্রবেশিকা পরীক্ষা বাবার জীবনে তাঁর বাবার জীবনে কখনও ঘটেনি। অত বড় পরীক্ষা দিয়েছে ছেলে, তাকে দশজনের কাছে নিয়ে যাওয়া বাবার খুবই দরকার। তাঁর বড় ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছে, কত বড় কথা!

ফল বের হবার দিন শহরে গেলাম। মানুকাকা বললেন, তুমি এক বিষয়ে ফেল করেছ। স্কুলের মণ্টু মাস্টার খবরটা দিয়ে গেছে। খুব দমে গেলাম। তিনি ফের বললেন, দু' মাস পরে পরীক্ষা হবে। তখন পরীক্ষাটা দিতে পারবে। অঙ্ক পরীক্ষা। দুটো মাস আর সময়। মন দিয়ে পড়াশোনা করলে পাস করে যাবে।

কিছুই ভাল লাগছিল না। বাড়ি ফেরার পথে সাহেবদের একটা নির্জন কবরখানা পড়ে। বড় বড় সব ঝাউগাছ। সেখানে সারাটা দুপুর শুয়ে থাকলাম। কেবল বাবার মুখটা আমার চোখে ভেসে উঠছে। তাঁর কত বিশ্বাস আমার ওপর। এখন মুখ দেখাব কী করে! কী করি। ফেরার হলে কেমন হয়। তখনই মার সেই বিষণ্ণ মুখ ভেসে উঠল। বাবার সব আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর পুত্র-গৌরব নিমেষে কেউ হরণ করে নিয়ে গেল। তবু কেন জানি পিলু মায়া ছোট ভাইটার কথা ভেবে ফেরার হতে ইচ্ছে হল না। সাঝ লাগার আগে গুটি গুটি বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলাম। রাস্তাটা যেন আজ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। পুলিস ব্যারাক পার হতেই বড় মাঠ। মাঠে পড়েই দেখলাম, সবাই বাড়ির রাস্তায় গাছের নিচে আমার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পিলু ছুটতে ছুটতে আসছে। মায়া ছুটতে গিয়ে পড়ে গেল। অন্য দিন হলে ভ্যাক করে কেঁদে দিত। আজ তার কান্নার কথা মনে পড়ল না। কতক্ষণে আমার কাছে পৌঁছবে। ওরা কাছে এলে কীভাবে যে বলব, পরীক্ষায় পাস করতে পারিনি পিলু। পিলু এ-কথায় সবচেয়ে বোধহয়

বেশি ভেঙে পড়বে এবং বনভূমিটা থেকে আমরা যে ঘরবাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছি, আমার মনে হল খবরটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই বনভূমি বাড়িটাকে গ্রাস করে ফেলবে। পিলু চিৎকার করে বলল, দাদা, পাস করেছিস ?

কিছু বললাম না। কারণ বলতে পারছিলাম না কিছু। আমার চোখ ফেটে জল আসছে! বাবা এগিয়ে এসে বললেন, পাস করলি ?

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না, কেঁদে ফেললাম।

বাবা বললেন, কান্নার কী আছে ? সবাই বুঝি পাস করে!

বাবার কথায় ভেতরের দুঃখটা সহজেই কত লাঘব হয়ে গেল।

বাবা আবার বললেন, ক' বিষয়ে পাস করেছিস ?

এটাই বোধহয় বাবার শেষ সান্ত্বনা। বললাম, ন' বিষয়ে পাস। অঙ্কে ফেল!

বাবা বিজয় গৌরবে এবার আমার হাত ধরে ফেললেন। বললেন, দশটা বিষয়ের মধ্যে ন'টা বিষয়ে পাস—কম কথা হল! এটা তো পাসই। জীবনে ক'টা লোক কবে সব বিষয়ে পাস করেছে! বড় হলে বুঝতে পারবি।

এবং তারপর থেকে আমার সেই নির্দিষ্ট অঙ্ক পরীক্ষার দিনটি পর্যন্ত যার সঙ্গে দেখা হত বাবা বলতেন, বিলুটা দশটা বিষয়ের মধ্যে নটাতেই পাস করেছে। একদিন নিবারণ দাসের পাটের আড়তেও খবরটা দিতে চলে গেলেন বাবা। বললেন, কম বড় কথা না! কী বলেন দাসমশাই!

দাসমশাই আড়তে বসে হুঁকাটি বাবার হাতে দিয়ে বললেন, সত্যি ভারি গৌরবের কথা। বাবা আনন্দে তখন তন্ময় হয়ে গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানছেন। পুত্র-গৌরবের হাসিটি তাঁর মুখে লেগেই আছে।

॥ দশ ॥

দেশ ছেড়ে আসার পর, দু-তিন বছর আমাদের কারো কোনো অসুখ হয়নি। এমন কি সামান্য সর্দিকাশিতে কেউ ভুগিনি। মানুষের অসুখ বিসুখ থাকে আমরা প্রায় ভুলতেই বসেছিলাম। গাছপালা আর মাটির সঙ্গে লেপ্টে থাকলে তাই বুঝি হয়। শীতের চাদর থাকত না, খালি গায়ে দিন দুপুরে ঘুরে বেড়ানো, গাছ পাতা বনআলু খেয়ে আমাদের আশ্চর্যভাবে জীবনীশক্তি বেড়ে গিয়েছিল। ঠাকুর প্রতিষ্ঠার পর আমাদের এখন প্রায় সুদিনই বলা চলে। শীতের চাদর পর্যন্ত বাবা কিনে দিয়েছেন। আর তখন থেকেই আমরা কেউ কেউ সর্দি কাশির

শিকার হতে থাকলাম। সর্দি কাশিতে বাবা গা করতেন না। হয়েছে সেরে যাবে। মানুষের ঘরবাড়ি হবে অসুখ বিসুখ হবে না সে আবার কেমনতর কথা! আমার মা, বাবার হাভবাব কিছুদিন শুধু লক্ষ্য করেই গেল। পিলুর সর্দি-কাসি, মায়ার আমাশয়, আমার ক'দিন জ্বর, মাও কিছুদিন অম্বলের রোগে ভুগে উঠল। সবই বিনা অষুধে ছেড়ে যাওয়ায় বাবা বললেন, নিজের মধ্যেই আছে, সঞ্জীবনী সুধা। তাকে ধনবৌ বাঁচিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু বর্ষা পড়তেই একদিন পিলু খুব জলে ভিজে বাড়ি ফিরে এল। পুকুর ডোবা খাল বিল জলে ভেসে গেছে। পিলু ব্যারেকের পুকুরে উজানী মাছের খোঁজে গিয়েছিল। কটা কৈ, মাগুর, সিংগি মাছ সে জলে ভিজে ধরেছে। আকাশটাতে ছিল প্রচণ্ড কালো মেঘ। আর ঝড়ো বাতাস। গাছপালা জলে ভিজে চুপসে যাচ্ছিল। এরই মধ্যে পিলু বৃষ্টি মাথায় করে মাছ নিয়ে যখন ফিরল, তখন মা ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জেলে দিচ্ছে। বাবা বাড়ি নেই। ঠাকুরের বৈকালির কাজ আমাকেই সারতে হবে। সে সময় পিলু গামছা খুলে বলল, দাদা দেখবি আয়। বারান্দায় বের হয়ে দেখলাম, সত্যি কত বড় সব সিঙ্গি, কৈ, মাগুর। সে বলল, কী মাছরে দাদা। আবার যাবি? এমন ঝড় বৃষ্টিতে আমার যেতে সাহস হল না। আর মাও দেখলাম বেশ চুপচাপ। পিলু আবার বলল, মাঠে মাছ উঠে আসছে। কত মাছ ফসকে গেল। মা কুপি জেলে মাছ দেখতেই সহসা চিৎকার করে উঠল, ওরে পিলু, তোর প্যাণ্টে এত রক্ত কেন রে!

পিলু হাসতে হাসতে বলল, সিঙ্গি মাছের কাণ্ড মা। হাত ফুঁড়ে দিয়েছে।

কিন্তু পিলুর মুখ দেখে আমার ভাল লাগল না। কেমন সাদাটে আর নীল দেখাচ্ছে মুখটা। মা তাড়াতাড়ি কিছুটা হলুদ গরম করে আনতে গেল। পিলু এত সবের মধ্যেও মাছগুলি নিয়ে রাখল হাঁড়িতে। প্যাণ্ট ছেড়ে একটা খোট পরে নিল। বলল, খুব শীত করছে রে দাদা। বলে সে মার একটা শাড়ি দু ভাঁজ করে গায়ে দিয়ে কেমন ঝিম মেরে বসে থাকল।

মায়া তখন কাছে গিয়ে বলল, এই ছোড়দা ঝিমুচ্ছিস কেন?

—খুব শীত করছে।

—শীতে কেউ ঝিমোয়?

—মেলা কথা বলবি না। যা তো।

ঝিমুনোর কথায় আমারও খুব একটা ভাল লাগছিল না। বললাম, সত্যি সিঙ্গি মাছে ফুঁড়েছে না অন্য কিছু।

—অন্য কিছু আবার হতে যাবে কেন।

—তুই দেখেছিস ?

—জলে দেখা যায়। ঘাসের মধ্যে অন্ধকারে হাত দিতেই ফুঁড়ে দিল। লম্বা। ধরতে পারলাম না। কত বড় যে না! বলেই ওর চোখ বুজে আসছিল। আমার কেমন ভয় ধরে গেল। মাকে তাড়াতাড়ি ডেকে বললাম, পিলু কেমন করছে!

মা দৌড়ে এল। বলল, কি হয়েছে ?

পিলু ঝিমোচ্ছে।

মা তাড়াতাড়ি গরম হলুদ আঙুলে লাগিয়ে বলল, ব্যথা করছে ?

—না।

—জ্বালা করছে ?

—না।

—তোমার কিছুই করছে না। তবে ঝিমোচ্ছ কেন ?

—ঘুম পাচ্ছে।

—পোকামাকড়ে কাটেনি তো ?

পিলু বলল, না।

আমি বললাম, যখন ফুঁড়ে দিল, তখন ব্যথা করছিল ?

—টের পাইনি।—কত মাছ! মাছ ধরব, না, ব্যথা টের পাব'

মা কেমন হাউমাউ করে কাঁদতে বসে গেল। পিলু ঝিম পায় কেনরে! সিঙ্গি মাছে ফুঁড়ে দিলে ব্যথা করবে। তুই কী ধরতে কী সে হাত দিয়েছিস রে! মহা জ্বালা দেখছি। মা কাঁদতে কাঁদতে ওর হাতের কব্জিতে মশারির দড়ি বাঁধতে গেলে, পিলু মহারোষে উঠে দাঁড়াল। বলল, বলছি তো পোকামাকড়ে কামড়ায়নি। এবং আমার সামনে তখন একটা মহাভুজঙ্গ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে—দেখতে পাচ্ছি, পিলুর সর্বনাশ হয়ে গেছে। সংসারে মহা সর্বনাশ। বাবা কাল ফিরে এসে কি দেখতে পাবেন বুঝতে পারছি না। কিছু ভেবেচিন্তে ঠিক করতে পারছি না। আর মার এই হাউমাউ কান্না বনটার মধ্যে কেউ শুনতে পাবে না—মানুষের এটা কত বড় বিপদ এই প্রথম টের পেয়ে এক দৌড়ে নিবারণ দাসের বাড়ি যাব ভাবতেই মা বলল, বিলু অন্ধকারে কোথায় যাচ্ছিস! শুধু সেই অন্ধকার এবং ঝড় বৃষ্টি থেকে চিৎকার করে বললাম, নিবারণ দাসের বাড়িতে যাচ্ছি মা। জ্যাঠাকে খবরটা আগে দিই।

পাল্লা দিয়ে ঝড়ো বাতাস আর বৃষ্টি। শাঁ শাঁ শব্দ। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। পথের যখন যেখানে পা দিচ্ছি, মনে হচ্ছে কেবল সাপ। যেন হাঁটলেই

পাটা সাপের মাথায় পড়বে। আর এ-সময়ে মনে পড়ল বাবার সেই মহাবাণী, উচ্চারণ করলাম, দোহাই আস্তিকমুনি। আমরা এই বনভূমি সাফ করার সময় কত বড় বড় গোখরো সাপ দেখেছি। বাবা একটাও মারতে দেননি। দেখলেই তিনি বলতেন, দোহাই আস্তিকমুনি। সাপেরা তখন মাথা নিচু করে ঝোপে জঙ্গলে ঢুকে যেত। এবং এসবে আমার এবং মার তাছাড়া পিলুর কোনই বিশ্বাস ছিল না। কেবল মনে হত বাবাকে ভালমানুষ পেয়ে নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে সাপগুলো। অথচ এখন ঝড় বৃষ্টিতে অন্ধকারে হাতের কাছে এমন মহাসম্বল পেয়ে আরও বেগবান হয়ে গেলাম। মানুষের কি যে থাকে! আকাশ ফালা ফালা করে দিচ্ছে তখন বিদ্যুতের শেকড়বাকড়।
একবিন্দু আর ভয় নেই। যেন সেই আস্তিকমুনির দোহাই শুনে সব আস্তিকেরা আমাকে দেখলেই পালাচ্ছে। এবং মহাভারতের পুণ্যশ্লোকের মতো আকাশ ধরণী নিমেষে বড় পবিত্র হয়ে গেল। বুঝলাম বাবার সব বিশ্বাসই বড় পবিত্র ইচ্ছের দ্বারা চালিত। বুঝতে পারলাম মানুষের ঘরবাড়ির সঙ্গে এমন সহায় সম্বল না থাকলে সে খুবই অসহায়। এবং কখন নিবারণ দাসের বাড়ি পৌঁছে গেছি খেয়ালই করিনি। এত বড় একটা দুর্যোগের মধ্যে এতটুকু ক্লেশ নেই শরীরে। রাস্তার দু-পাশে আকাশে বাতাসে কি ছিল টের পায়নি। সামনে নিবারণ দাসের বাড়ি আর মুখে দোহাই আস্তিকমুনি, এতক্ষণ এই ছিল আমার অস্তিত্ব।
দাসের মা বলল, আড়ত থেকে তো ফেরেনি। এই ঝড় বাদলায় ভিজে! কি খবর কর্তা!
কেবল কোনরকমে বললাম, পিলুকে কিসে কেটেছে।
নিবারণ দাসের মা হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। ওর ছোট মেয়ে বলল, ঠাকুর ছাতা নিয়ে যান।
আমি আর কিছুই শুনতে পাইনি। কারণ শরীর তখনও ভারি বেগবান। একটা পাগলা ঘোড়ার মতো দৌড়চ্ছি। দু-বার আছাড় খেয়েছি। সারা শরীর কাদায় লেপ্টে গেছিল, আবার যেতে যেতে কখন তা বৃষ্টিতে ধুয়েও গেছে। পেছনে একবার তাকাতেই মনে হল, বাড়িটা বৃষ্টির ঝাপটায় কুয়াশার মধ্যে যেন আবছা হয়ে গেছে। নিবারণ দাসের আড়ত সামনে। জল বৃষ্টির জন্য পাল্লা ভেজানো। ফাঁক দিয়ে হ্যাজাকের আলো বাইরে এসে পড়ছে। সামনে দুটো গরুর গাড়ি। গাড়িগুলোর ওপর দিয়ে লাফ মেরে নেমে গেলাম। একটা গরুর পিঠে পা পড়ল, এবং পাল্লা ফাঁক করে হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম, জ্যাঠা বাবা বাড়ি নেই, পিলুকে কিসে কেটেছে। মা কাঁদছে।

নিবারণ দাস বলল, কী বলছেন, কিসে কাটবে।

—মাছ ধরতে গেছিল। শীতে শরীর কাঁপছে পিলুর। আর ঝিমুনি। কিছুতে যদি কেটে থাকে, কি করব?

নিবারণ দাস সাহস দেবার জন্য বলল, কিচ্ছু হয়নি। দাঁড়ান। সব তো ভিজে গেছে। ছাতা আনেননি কেন? এই গোপাল, টাকাগুলো তুলে রাখ। চাবিটা দে। শিগগির কর।

গরীব মানুষের ঈশ্বর বিশ্বাস ছাড়া কিছু সম্বল থাকে না। বাবারও তাই সম্বল। অথচ আমরা, বিশেষ করে মা এবং পিলুর ঈশ্বর বিশ্বাসে ঘাটতি ছিল খুব। সারাটা রাস্তা ভারি দুর্গম। ঝড় জলে সাপখোপের উপদ্রব বাড়ে। এতটা পথ একা অন্ধকারে ঝড় জলের মধ্যে কী করে এলাম! নিবারণ দাসের কথায় যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছি। শীত করছে। জানি একা এতটা পথ আর অন্ধকারে যেতে পারব না। ভূতের ভয় এবং সাপখোপের ভয়। কি করব বুঝতে পারছিলাম না। নিবারণ দাসের জন্য অপেক্ষা করব না আবার যেমন এসেছিলাম তেমনি ঝড় জলে বের হয়ে পড়ব! বাবা বাড়ি নেই। মা একা। বনভূমির মধ্যে মার অসহায় চোখ মুখ একদণ্ড স্থির থাকতে দিচ্ছে না। সম্বল বলতে আমার গলায় পৈতা আছে আর সাপখোপের জন্য আছেন, আস্তিকমুনি। এবং এই সম্বল করে আবার বের হয়ে ছুটব ভাবছি, খবরটা যখন দিয়েছি, নিবারণ দাস ঠিক যাবে, ওর দেরি হতে পারে, আমার দেরি হলে মা আরও ভেঙে পড়বে। বললাম, জ্যাঠা আপনি আসুন। আমি যাচ্ছি।

নিবারণ দাস রে রে করে উঠল।—আরে না না। আমি যাচ্ছি সঙ্গে। গোপাল, বাবা তাড়াতাড়ি কর।

তাড়াতাড়ি বললেই তো আর হয় না। পাটের আড়ত। কত কাজ গোপালের। দুজন দেহাতী লোক পাটের গাঁট সব তুলে ভিতরে নিয়ে রাখছে। সব রাখতে দেরি হবারই কথা। তারপর দরজা বন্ধ করা, গোটা দশেক তালা, ঝোলানো, এতসব কাজের জন্য দেরি হতেই পারে। আমার কাছে একদণ্ড কত অমূল্য সময় এই প্রথম টের পেলাম।

রাস্তায় নিবারণ দাস ছাতা মাথায় বড় ঠুকে ঠুকে হাঁটছিল। টর্চ মেরে গোপাল আগে আগে যাচ্ছে। আমি আরও আগে। নিঝুম অন্ধকার, গাছপালার সাঁই সাঁই শব্দ আর কড়াৎ করে বাজ পড়ার মাঝে মাঝে বিকট আওয়াজ। সব কিছুই কত সহজে এক নিমেষে তুচ্ছ করতে শিখে গেলাম। কেবল আশঙ্কা ভেতরে, পিলু এখন না জানি কেমন আছে। পিলু তোর এত মাছ ধরার বাই কেনরে!

পিলুর ওপর অভিমানে চোখ কেটে জল আসছিল—কিছু যদি ওর হয়ে যায় দেখ তোমাকে আমি কি করি। তারপরই মনে হল বাবার যখন ভগবান আছে, তখন খুব একটা কিছু হবে না। শুধু দুর্ভোগ কিছুটা ওর। মনে মনে বললাম, ঠাকুর পিলুকে ভাল করে দাও। ও খুব দুষ্ট ছেলে। ওকে কষ্ট দিও না ঠাকুর। ও সংসারে না থাকলে আমাদের কিছুই থাকবে না। এবং যতভাবে দরকার ঈশ্বরকে ডাকতে ডাকতে কখন যে বাড়ির রাস্তায় হাজির টেরই পাইনি। দু-লাফে একেবারে উঠোন ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললাম, জ্যাঠা আসছে। পিলু, এই পিলু। কোন সাড়া দিচ্ছে না।—এই পিলু জ্যাঠা আসছে রে। আর কোন ভয় নেই।

পিলু খুব ক্ষীণ গলায় বলল, দাদা তুই খুব ভীতু। আমার কিছু হয়নি রে।

পিলুকে তো জানি। সে দশটা কথা বললে পাঁচটা মিছে কথা বলে। এখন দাদাকে ঘাবড়ে যেতে দেখেও মিছে কথা বলছে।

নিবারণ দাস ঘরে ঢুকতেই মা উঠে দাঁড়াল। মা একটা কথা বললে না। এতক্ষণ পিলুকে জাগিয়ে রাখার জন্য জোরজার করে বসিয়ে রেখেছে। ঘুমিয়ে পড়লেই সব শেষ। দাস লাঠিটা বেড়ার পাশে রেখে পিলুর কপালে হাত দিল। বলল, ও কি তাত? খুব জ্বর হয়েছে দেখছি! জলে কাদায় ঘুরে বেড়ালে তো জ্বর হবেই কর্তামা। ওকে শুইয়ে দিন।

মা ঘোমটা সামান্য আরও টেনে বলল, কিসে কেটেছে। ও দেখেনি। হাত বেঁধে দিয়েছি।

নিবারণ দাস হা হা করে হেসে দিল। বলল, কর্তামা পোকামাকড়ে কাটলে শরীরে তাপ ওঠে না। কৈ দেখি হাতটা মেজ ঠাকুর? বলে টর্চ জ্বেলে আঙুলের কড়া দেখল। টিপে টিপে বলল, বেশ জাঁদরেল মাছ ছিল দেখছি! ধরতে পারলেন না!

পিলু কেমন সাহস পেয়ে গেছে। সে বলল, খুব বড় ছিল। এই বড় জ্যাঠা। মাছটা না……।

নিবারণ দাস দড়ির গিঁটগুলি খুলে দিতে দিতে বলল, ও কি বেঁধেছেন হাতে দাগ বসে গেছে। এতক্ষণ বোধহয় হাতটা পিলুর ভীষণ টনটন করছিল, বাঁধন খুলে দিতেই পিলু যেন প্রাণ পেয়ে গেল। বলল, জ্যাঠাকে দেখা না দাদা, কত বড় বড় সিঙ্গি মাগুর ধরেছি। যেন ওর কিছুই হয়নি। মারও মনে জোর এসে গেছে। মা তাড়াতাড়ি মাছগুলি টেনে নিয়ে এনে দেখাল, দেখুন কী কাণ্ড, কত বড় মাছ।

নিবারণ দাস বলল, মেজ ঠাকুর আপনার কিছু হয়নি। জলে কাদায় ভিজে জর হয়েছে, সেরে যাবে। এত বড় মাছ ধরেছেন একটু জর জ্বালা হবে না সে কি করে হয়।

এই বলে নিবারণ দাস গোপালের সঙ্গে বের হয়ে গেল। মা বসতে বলল একটু। আমাকে তামাক সেজে দিতে বলল, নিবারণ দাস জানাল, বাবা এলে বসবেন। তামাক খাবেন। কেমন থাকে পিলু, সকালে একটা খবর দিতেও বলে গেল। মানুষের ঘরবাড়ির সঙ্গে একজন ভাল প্রতিবেশী কত দরকার এই প্রথম আমরা টের পেলাম। নিমেষে সব ভয় আতঙ্ক কত সহজে দূর হয়ে গেল। আমার মা দেখলাম আবার বীরাঙ্গনার মতো চলাফেরা করছে। বলছে, বিলু, ঠাকুর শোওয়ানো হয়নি। যা বাবা বৈকালিটা দিয়ে আয়। পিলু তুমি আর বসে থেক না। মায়া কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। ও বাড়িঘরে এমন একটা আতঙ্ক এসে ভর করেছিল টেরই পায়নি।

কাপড় ছেড়ে ঠাকুরঘরে ঢুকতে গিয়ে দেখি প্রদীপটা ঝড়ো হাওয়ায় কখন নিভে গেছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সাঁ সাঁ শব্দ খড়ের বাড়িটার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। জোরে কথা না বললে, ও-ঘর থেকে কিছুই শোনা যায় না। ডাকলাম, মা দেশলাইটা দাও। প্রদীপ জ্বালাতে হবে। অন্ধকারেই দেখলাম দরজায় একটা লম্বা হাত। মা আলো জ্বালাবার জন্য দেশলাই বাড়িয়ে ধরেছেন। আলো জ্বালা হলে দেশলাইটা আবার নিয়ে যাবে। বললাম, তুমি আবার বাইরে দাঁড়িয়ে জলে ভিজছ কেন মা। তোমরা সবাই দেখছি একরকমের।

মা হেসে বলল, আমার কিছু হবে না। তুই আলোটা ধরা তো।

প্রদীপটা জ্বাললে দেখলাম, মা আমার প্রণিপাত করছেন। জল ঝড়ে কার উদ্দেশ্যে এই প্রণিপাত জানি। সামান্য ছুটো পেতলের মূর্তি সাক্ষাৎ দেবতার মতো মিটি মিটি হাসছেন তখন। শালগ্রাম-শিলার মাথায় তুলসীপাতাটি চন্দনের গন্ধ ছড়াচ্ছে। বাবার কথা মনে হল। দূর থেকে তিনি কি সব টের পান। তিনি বুঝতে পারেন, আমরা কেমন আছি। বাবা গলায় ঝুলিয়ে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে এসেছিলেন, এখন আমার তালুতে সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কত সহজে তাকে ধারণ করে আছি। পিলু তখন, চেঁচিয়ে বলছে, দাদা, বাতাসা সব তুই একা খেয়ে ফেলবি না। আমার জন্য রাখিস। বৈকালির গোনাগুনতি তিনটে বাতাসা। এবং আমার পূজার পালা থাকলে, পূজা শেষে চুরি করে সবটাই খেয়ে ফেলার স্বভাব আছে। প্রসাদ কণিকা মাত্র, এক কণিকা প্রসাদ দিলে পিলু চিৎকার করে বলত, দেখ মা দাদাটা কি রাক্ষস। সব একা একা খেয়ে আমাদের শুধু

হাত ছোঁয়াচ্ছে। বৈকালি শেষে, তিনটে দুর্লভ বাতাসাই ঘরে ঢুকে পিলুর হাতে দিয়ে বললাম, পিলু ওঠ। প্রসাদ নে। বলে তিনটে বাতাসা ওর হাতে দিলে সে খুব অবাক হয়ে গেল। বলল, কিরে দাদা, সবই আমাকে দিলি। তুই নে মাকে দে। প্রসাদ সবাইকে খেতে হয়। বলে পিলু নিজের জন্য একটা রাখল, মাকে একটা দিল, আমাকে একটা। অন্যদিন আমি জানি, পিলু কিছুই পেত না, কণিকা ছাড়া, আজ পিলুর চেয়ে আমি সদাশয়। পিলুকে বললাম, আমারটা তুই খা পিলু। আসলে মানুষের ঘরবাড়ির মায়া এমনিতেই বাড়ে। পিলুর মতো আমার একটা ভাই আছে বলেই বাড়ে। কিছুক্ষণ আগে টের পেয়েছি, বাবার ঘরবাড়িতে পিলুর বেঁচে থাকা কত দরকার। সে না থাকলে অন্ধকার কি গভীর তাও জানি। সামান্য একটা বাতাসা দিয়ে তা কেনা যায় পিলুর আশ্চর্য অকৃত্রিম হাসিটুকু না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

॥ এগার ॥

সকালেও পিলুর জ্বরটা সারল না। মা গায়ে হাত দিয়ে বলল, দেখি। পিলু হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, বলছি তো জ্বর নেই। মা তবু কপালে হাত রেখে বলল, জ্বর আছে। বের হবে না কোথাও। সকালে কিছু খাবে না। দুপুরে বার্লি। পিলু রেগে গেল। বলল, কিছু খাব না। জ্বর আছে। সে মুখ ভেংচাল মাকে।— আমার শরীর, আমি বুঝি না, তুমি বোঝ।

অগত্যা আমার পালা। হাত দিয়ে দেখলাম, গায়ে জ্বর বেশ। বললাম, যা শুয়ে থাকগে। ঘোরাঘুরি করলে জ্বর বাড়বে।

বেশ রোদ উঠেছে। আকাশ পরিষ্কার। গাছপালা সকালের হাওয়ায় তিরতির করে কাঁপছে। কুকুরটা দু' দিন হল বাড়ি ফিরছে না। বাবার মতো কেমন বাউণ্ডুলে স্বভাবের। এক দণ্ড বাড়ি ঘরে তিষ্ঠোয় না। কেবল সারা মাঠ, এবং সড়কে ঘুরে বেড়াবে।

গতকাল আমাদের এমন একটা আতঙ্কের দিনেও কুকুরটা রাতে ফিরে আসেনি বলে পিলু বসে বসে গজগজ করছিল। আসলে আমরা বুঝতে পারি কুকুরটা কোথায় আছে .খুঁজে দেখার নাম করে পিলু এখন একটু মাঠঘাটে অথবা গাছপালার অভ্যন্তরে ঘুরে আসতে চায়। আমি বললাম, ঠিক আসবে। যাবে কোথায়।

—এলে দেখ না কি করি। খেতে পাবে না ভেবে পিলুর মেজাজ চড়ে যাচ্ছে। কাউকে সকালে খেতে দেওয়া হোক পিলু এখন সেটাও চাইছে না। পিলুর জ্বরের সঙ্গে সামান্য সর্দি কাশি আছে। সামান্য বাসক পাতার রস দিলে খুব কাজে আসত। বাবা থাকলে কোন ঝামেলা ছিল না। ঠিক জঙ্গল থেকে এটা ওটা খুঁজে এনে রস করে দিতেন। অবশ্য বাবা অসুখের তিন-চারদিন না দেখে কিছু করার পক্ষপাতী নন। আমরা গত শীতে যে সামান্য জ্বর জ্বালায় ভুগেছি তাতে টের পেয়েছি, অসুখ-বিসুখে আমার বাবা বড়ই নিস্পৃহ। কেবল পাঁচদিনের মাথায় যখন সর্দি কফ বুক থেকে নড়ানড়ি করার নাম করছে না তখনই বাবা বলেছিলেন, বাসক পাতার একটা গাছ লাগানো দরকার। বাসক পাতা, তুলসীপাতা, শিউলীপাতা আর আদার রস, একটু সোহাগা পুড়িয়ে দেব। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মা বলেছেন, বাসক গাছ কোথায়?

—আরে লাগালেই হবে।

—গাছ লাগাবে, বড় হবে, পাতা হবে, তবে রস হবে। সে তো এ-জন্মে হবে বলে মনে হচ্ছে না।

বাবা বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, ধনবৌ তোমার জিভ বড়ই ক্ষুরধার। মা, বাবার এই উক্তিতে খুবই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। জ্বরজ্বালা হলে লোকে ডাক্তার ডাকে। একটা কিছু করে। তা না করে মানুষটা কেবল বসে বসে হিতোপদেশ ঝাড়ে। কিছু বললেই জিভ ক্ষুরধার হয়ে যায়! উচিত কথা বলা যাবে না। মা আর অসুখ-বিসুখ নিয়ে বাবাকে একটা কথা বলেনি। ছ'দিনের মাথায় আমার বুকের কফ নড়ে উঠল। সাতদিনের মাথায় বেশ তরল হয়ে গেল। বাবা স্নান করতে বললেন। অবগাহন স্নান এবং অবগাহন স্নানের পরই শরীর কেমন ঝরঝরে হয়ে গেল। তারপর তিন দিন তিন রাত মানুষের শরীর সম্পর্কে প্রাচীন আয়ুর্বেদ চিকিৎসকরা কে কি বলে গেছেন, ফাঁকে ফাঁকে তা মার প্রতি সামান্য কটাক্ষ হেনে বলতেন, শরীরের নাম মহাশয়, বাকিটা বলতেন না। যেন ভাবটা এই বুঝে নাও আর সব।

বাবার চিকিৎসা শাস্ত্রে বেশ ব্যুৎপত্তি আছে এটা বোঝা গেল বিকেলবেলায়। বাবা বিকেলের ট্রেনে ফিরে এসে পিলুকে বাড়ি দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেলেন। পিলু এমন নিরীহ শান্ত-শিষ্ট হয়ে জলচৌকিতে বসে আছে, আসলে পিলু না অন্য কেউ, যেন চশমা থাকলে খুলে দেখতেন। বাবার পোঁটলা-পুঁটলি এবার খুবই ছোট সাইজের। বাবা সামান্য নুয়ে বারান্দায় উঠে এলে পিলু বেশ ক্ষীণ গলায়

বলল, মা, বাবা এসেছে। আমি ঘরে অঙ্ক করছিলাম। বাইরে বের হয়ে এলাম। মায়া রান্নাঘর থেকে, আর মা রান্নাঘর থেকেই বলল, বসতে দে। বাবা বুঝতে পারলেন এবারের দোষ ত্রুটি একটু বেশি মাত্রায় হয়ে গেছে। মার অতিথিপরায়ণতা দেখেই বুঝি সেটা টের পেয়েছেন। বের হলে ঘরে ফেরা কবে হবে যেন তিনি নিজেও ঠিক জানেন না। ঘোরাঘুরি করার সময় মানুষজন, ট্রেনে ভ্রমণ, শিষ্যবাড়ির গুরু ভোজনে মনে থাকে না, বনভূমিতে একটা তাঁর আবাস রয়েছে। চিঠিপত্র দিতেও ভুলে যান। না কি তাঁর মনে হয়, কালই তো ফিরছি, কাল আবার যে কি ঃ লে গ্রাস করে ফেলে, কারণ রোজই তাঁর বাড়ি ফেরার উদ্যোগ আয়োজন করার সময়ই বুঝি মনে পড়ে যায়, লক্ষ্মণ মল্লিকের সঙ্গে কতদিন দেখা নেই, যখন এসেছেন, তখন ঘুরেই যাবেন। এমন সব বহুবিধ লক্ষ্মণ মল্লিক বাবার ঝোলায় রয়েছে। ফলে প্রতিদিনই একবার করে বাড়ি ফেরার তাগিদ, একবার করে লক্ষ্মণ মল্লিকদের তাগিদ। ফলে দুই তরফের ঠোকাঠুকিতে বাবার শেষ পর্যন্ত বুঝি চিঠি লেখাটাও হয়ে ওঠে না। বাড়ি ফিরেই বাবা টের পেলেন, মা আর ধনবৌ নেই, সুপ্রভা দেবী হয়ে আছেন। তখন সামান্য গলা খাকারি দিলেন। মেজ পুত্রটিকে বললেন, তোমরা সবাই ভাল আছ তো? মাকে জ্বালাওনি তো? তবু যখন ভেতর থেকে কোনো উচ্চবাচ্য নেই, আমাকে বললেন, মামুর কাছে গেছিলি? পরীক্ষা কবে জেনিছিস? আমি গেছিলাম কি গেছিলাম না ওটা বড় কথা নয়। আসলে বুঝি বাবা কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। মায়া তখন বলল, জান বাবা, ছোড়দাকে সিংগি মাছে আঙুল ফুঁড়ে দিয়েছে। দাদার জ্বর হয়েছে।

পিলু বলল, হ্যাঁ বলেছে, আমার জ্বর হয়েছে। না বাবা, কিছু হয়নি। মা আমাকে কিছু খেতে দিচ্ছে না।

বাবা এবারে বললেন, দেখি কোথায় ফুঁড়েছে।

মা ভেতর থেকে খুবই নিরুত্তাপ গলায় বলল, দেখা, সাক্ষাৎ ধন্বন্তরী এসেছেন, দেখা।

বাবার মুখটা খুবই অসহায় দেখাল। পিলুর আঙুলটা খুবই ফুলে আছে। বাবা মার বিদ্রূপ এতটুকু গায়ে মাখলেন না। আঙুলটা বিশিষ্ট চিকিৎসকের মতোই টিপে টিপে দেখলেন। তারপর বললেন, ভয় নেই সেরে যাবে। মায়া, একটা ছোট বাটি দিতে পারবি। কারণ বাবা এবং মায়ের মধ্যে অদৃশ্য খোঁচাখুঁচি আরম্ভ হলেই আমরা সংসারে ভীষণ গুরুত্ব পেয়ে যাই। বাবা এখন সব কথাই আমাদের সঙ্গে বলবেন। মাও। যেন বাবা মাকে চেনেন না। অথবা দুজনই

দুই বিপরীত মেরুতে বসে অদৃশ্য সুতো জুড়ে আমাদের দিয়ে টরে টক্কা বাজাচ্ছে।

পিলু বলল, বাবা, কাল আমি ভাত খাব?

—খাবে।

বাবা এখন কল্পতরু। সুপ্রভা দেবী বুঝোক সংসারে তাঁর দাম কম নয়। পিলু বুঝি ভাবছে, আর কি চাওয়া যায়। মায়া তখন ছোট্ট একটা বাটি এনে দিলে বাবা কোথা থেকে অনেকটা ভেরেণ্ডার কষ নিয়ে এসে হাতে লেপ্টে দিলেন। বললেন, রাতে শোবার সময় আর একবার। সকালেও দেবে। আঙুলের ফোলা কমলে জ্বরও সেরে যাবে। পরদিন পিলুর জ্বর সেরে যাওয়ায় সুপ্রভা দেবী আবার সংসারে ধনবৌ হয়ে গেল। বাবাকে বলল, কিগো চানটান করবে না! কত বেলা হল? কখন ঠাকুরঘরে ঢুকবে!

বাবা জমিতে গাছপালা লাগাবার সময় কথা কম বলেন। আজ সকাল থেকেই গাছপালা লাগাবার কাজে ব্যস্ত। কত সব শেকড়-বাকড় নিয়ে এসেছেন তিনি। পোঁটলাপুঁটলি খুললে টের পেয়েছিলাম একটাতেও প্রণামীর কাপড় কিংবা চাল ডাল বলতে কিছু নেই। ছোট ছোট অঙ্কুরের মতো গাছ আর শুধু শেকড়-বাকড়। বাবা একটা মূল তুলে রোপণ করছেন আর কাঠি পুঁতে দিচ্ছেন। বলছেন এটা হল হরতকী গাছের চারা। এখানে পুনর্ণবার ঝাড়, এদিকটায় থানকুনিপাতা, এখানে থাকল গন্ধপাদাল। বাসকের ডাল লাগাবার সময় জায়গাটার উর্বরা সম্পর্কে সংশয় দেখা দিল। বাবা ডালটা তুলে একটু অন্তত্র সরিয়ে নিয়ে গেলেন। অর্থাৎ কাঠা খানেক জমি জুড়ে তিনি আজ যাবতীয় ভেষজ রোপণে ব্যস্ত। কারো কথায় কর্ণপাত করার সময় এটা নয় বুঝে মা সটকে পড়েছে। কেবল পিলু পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল। কুকুরটা রাতে ফিরে এসেছে। সে পিলুর পায়ের কাছে বসে লেজ নাড়ছে।

বাবা গাছ লাগাবার সময় কোন গাছে কি ফল দেবে বলে যাচ্ছেন। আর কি-ভাবে সংগ্রহ করেছেন, তিনি এই শেকড়-বাকড়ের জন্য কতদূর গিয়েছিলেন তার আদ্যোপান্ত বিবরণ। সব জায়গায় সব গাছ হয় না। কিন্তু এখানকার যা মাটি তাঁর ধারণা সব গাছই ফলবতী হবে। একটা অর্জুনের বিচি পুঁতে বললেন যদি গাছটা হয়, দেখবে কি সুন্দর তার ডালপালা। গাছের ছাল হৃদরোগের মহৌষধ। হালিশহরের পঞ্চানন কবিরাজ বীজ দিল। পঞ্চানন কবিরাজ বলল, কর্তা নিয়ে যান, সব সময় পাওয়া যায় না। সব বীজ থেকে গাছও হয় না। আমার কাছে এই অমূল্য রত্নটি পড়ে আছে এখন কাকে দিই ভাবছিলাম। আপনার মতো

সদাশয় মানুষের হাতে বীজ কথা বলতে পারে। নিয়ে যান যদি কথা বলে।
পিলুর দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, তোর কি
মনে হয়, গাছটা হবে তো?
পিলু বলল, তুমি লাগালে সব হয় বাবা।
পিলু এই কথাটা যেন আরও জোরে বলে, এমন ইচ্ছাতে বাবা বললেন, তুই কি
শরীরে জোর পাস না?
পিলু বলল, পাই তো।
না, ভাল মনে হচ্ছে না। তোমার শরীরটা ঠিক হচ্ছে না পিলু, ভেতরে ভেতরে
ঘুসঘুসে জ্বর হচ্ছে হয়তো। খাওয়া দাওয়া ভাল দরকার। দুধ খেতে হবে।
দুধ খেতে হবে বললেই আর খাওয়া হয় না। মানুষের ঘরবাড়িতে একটি সবৎসা
গাভী কত দরকার, পিলুর দিকে তাকিয়ে যেন সেটা মনে পড়ে গেল। বাবা
তারপর কি ভাবলেন, দুপুরে খেতে বসে বললেন, বুঝলে ধনবৌ, সবই তো হয়ে
গেল, চাঁপাকলার গাছও বড় হচ্ছে। এবারে কার্তিক অঘ্রানে ছড়া পড়বে।
চাঁপাকলা দুধ হলে বেশ হয়। বারান্দায় খেতে বসে বাবার দুধ খাবার বাসনার
কথা ভেবে মার চোখে কি যেন সংশয় দেখা দিল। বলল, এই তো ঘুরে এলে।
কটা দিন অন্তত বাড়ি থাক। কারণ মা বুঝি বুঝতে পারে ঠিক সবৎসা গাভীর
সন্ধানের অজুহাতে বাবা আবার বাড়ি থেকে উধাও হবার ধান্ধায় আছে।
—পিলুর দুধ খাওয়া দরকার। বাবা নিজের প্রয়োজনের কথা না বলে পুত্রদের
প্রয়োজনের ওপর গুরুত্ব দিতে চাইলেন।
মা বলল, পাবে কোথায়?
সত্যি কথাটা ভেবেই বাবা খাবার ব্যাপারে অত্যধিক মনোযোগী হয়ে গেল।
এতগুলো টাকা একসঙ্গে—না ভাবা যায় না।
পিলু বলল, নবমী বলেছিল, একটা ছাগলের বাচ্চা দেবে বাবা। নিয়ে আসব?
এই নিয়ে বছরখানেক ধরে একটি ছাগলছানা আনার জন্য কতবার বাবার কাছে
পিলু আর্জি পেশ করেছে। বারবারই বাবার প্রত্যাখ্যানে পিলু চেয়ে আনতে
সাহস পায়নি। মোক্ষম সময় বুঝে আবার পিলু কথাটা পাড়ল।
বাবা বললেন, বামুনের বাড়ি এটা। বামুনের বাড়িতে ছাগল পোষে না।
সুতরাং যতই দুধের প্রয়োজন থাকুক একটা ছাগলছানা তার জন্য এনে হাজির
করা যায় না। পিলু কি ভাবল কে জানে, ক'দিন পর ঠিক একটা ছাগলছানা
বগলে করে নিয়ে এল। বাবা হয়ত প্রথম বকাঝকা করবে, পরে সব ঠিক হয়ে
যাবে।

এখন দরকার আপাতত ছাগলছানাটিকে বাবার চোখের সামনে থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে রাখা। আমাদের পাঁচ বিঘে ভূঁইর শেষ দিকে, যেখানে একটা ইটের ভাঙা পাঁচিল আবিষ্কৃত হয়েছে, যেখানে এখনও গাছপালার জন্য রোদ আসে না, তার পাশে নিরিবিলি একটা জায়গায় ভাঙা ইটের খুপরি বানিয়ে ফেলল পিলু। ছাগলের বাচ্চাটাকে কিছু ঘাস দিল খেতে। বাবা সারাদিন ওদিকটায় বড় যায় না।

কেন যায় না রহস্যটা অবশ্য অনেকদিন পর আবিষ্কৃত হয়েছিল। এবং যেহেতু সেদিকে যায় না, পিলুর কাছে সব চেয়ে নিরাপদ মনে হয়েছিল জায়গাটাকে। সে আর বাড়ির দশটা কাজের কথা ভুলে গেল। কখন ডেকে উঠবে কে জানে। এই ভয়ে সারাদিন ঘাসপাতা খাওয়াল গোপনে। বাবা যখন সন্ধ্যায় নিবারণ দাসের আড়তে জম্পেস করে আড্ডা দিতে রওনা হল তখনই পিলু ছাগলের বাচ্চাটাকে বগলে করে একেবারে বাড়ির মধ্যে।

এবং আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম, আপাতত বাচ্চাটাকে রান্নাঘরে রাখা যাক। ও-ঘরটায় বাবা পারতপক্ষে ঢোকেন না। কারণ এ এলাকার সবটাই সুপ্রভা দেবীর একান্ত নিজস্ব। ভেতরের দিকে ছোট বারান্দায় খাওয়া-দাওয়ার পাট। বাবা শুধু দরজায় উঁকি দিলে দেখতে পাবেন। এতসব ভেবে বাচ্চাটাকে রাখা গেল ঠিক, কিন্তু হলে কি হবে, ছাগলের বাচ্চা, বুদ্ধি আর কতটা হবে, দুপুর রাতে সহসা ত্রাহি চিৎকার। বাবা ধড়ফড় করে উঠে গেলেন। আমরা সবাই। শেয়ালের উপদ্রব হতে পারে ভেবেও পিলু টু শব্দটি করছে না। কারণ বাবার কি মর্জি হবে কে জানে। তখনই বাবা বললেন, কিসে ডাকে।

মা বলল, তাই তো!

বাবার জীব-জন্তুর প্রতি মমতা এমনিতে একটু বেশি। সাপ-খোপের বেলায় এটা যথার্থ টের পেয়েছি। তিনি খুব উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, তাড়াতাড়ি লম্ফটা জ্বাল ধনবৌ। মনে হচ্ছে শেয়ালে ছাগলের বাচ্চা ধরেছে। বাইরে বের হয়ে লম্ফের আলোতে কোথায় বাচ্চাটা খোঁজাখুঁজি করতে থাকলেন। কোথা থেকে এল, অথবা এখানে ব্যারাকে যে সুবাদার সাবের ছাগল রয়েছে, বাচ্চাটা তারও হতে পারে, পথ ভুলে চলে আসতে পারে, অন্ধকারে কোথাও ডাকছে—তিনি হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজি করতে থাকলেন।

আশ্চর্য, পিলু আগের মতোই লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। সে উঠছে না, নড়ছে না। পিলু জোরে জোরে নাক ডাকতে থাকল।

বাবা বললেন, কোথায় দেখছি না তো! রান্নাঘর থেকে বাচ্চাটা মানুষের সাড়া

পেয়ে আরও জোর গলায় ব্যাঁ ব্যাঁ করতে থাকল। দু-তরফের ডাকাডাকিতে বাবাকে সত্যি কথাটা বলে দিলে এখন বেশ হয়, পিলুকে জব্দ করা যায়। পিলুর নাক ডাকানি বন্ধ করা যায়—তখনই মা বলল, দাঁড়াও। মনে হচ্ছে রান্নাঘরে আছে। মা রান্নাঘরে ঢুকে গেলে বাবাও ঢুকে গেলেন। বাচ্চাটা দেখে কিছুক্ষণ বিমূঢ় হয়ে থাকলেন বাবা। মেজ পুত্রটির কাজ, ছাগলের জন্য কত হরেক রকমের কচি ঘাস, ছেঁড়া আসন, জলের পাত্র—সাদা রঙের একটা কচি বাচ্চার সেবা-যত্নের বহর দেখে বাবা বোধ হয় ধীরে ধীরে সংবিৎ ফিরে পেলেন। কিছু বললেন না। সোজা শোবার ঘরে ঢুকে বললেন, হয়েছে, এবারে নাক ডাকা বন্ধ কর বাবাধন। সঙ্গে সঙ্গে পিলু কেমন নির্জীব হয়ে গেল। নাক ডাকল না আর।

বললেন, ওঠ। কথা আছে।

পিলু উঠে বসল।

বললেন, নাম এবার।

পিলু নেমে এল।

—কোথা থেকে চুরি করেছিস?

—চুরি না তো বাবা।

—তবে লুকিয়ে রেখেছিস কেন?

—তুমি দেখলে যদি কষ্ট পাও। বামুনের বাড়িতে ছাগল পুষতে হয় না যে বলেছিলে।

—সত্যি, তবে নবমী দিয়েছে? না বুড়িটাকে ঠকিয়েছিস? না বলে কয়ে নিয়ে এসেছিস?

পিলু আমার দিকে তাকাল। পিলুর সাংঘাতিক বিপদের সময় আমি তার বড়দা হয়ে যাই। সেই একবার নবমীর কাছে আমাকে নিয়ে গেছিল। পিলুর প্রতি নবমীর ভক্তি স্বচক্ষে দেখেছি। পিলু আমার দিকে তাকিয়ে আছে—যদি আমি ওর হয়ে কিছু বলি।

বাবা ফের বললেন, একটা গরীব ভিখিরি বুড়ি, তিন কুলে কেউ নেই, জঙ্গলে থাকে, কত কষ্টে থাকে আর তুই না বলে না কয়ে…

পিলু বলল, আমাকে সত্যি দিয়েছে বাবা। চুরি করে আনিনি।

পিলুর অসহায় মুখ দেখে আমারও কষ্ট হচ্ছিল। বাড়িঘর হয়ে যাবার পর বাবা মাঝে মাঝে দু-এক ঘা আজকাল পিলুকে দিয়ে থাকেন। এই পুত্রটির উপদ্রবে দু-একজন পড়শী ইতিমধ্যেই নালিশ জানিয়ে গেছে। এখন বাবা বাড়িতে কিছুদিন আছেন বলে, মার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই এবং এই সূত্রে বাবার শাসনের অধিকার

বোঝাই যাচ্ছে আজ একটু বেশি। মাও যে বলবে, হয়েছে থাক, নিয়ে যখন এসেছে থাক, নবমীকে জিজ্ঞেস করলেই হবে—সেই মাও কেমন চক্রে জড়িত হয়ে পড়ায় পিলুর হয়ে সাফাই গাইতে সংকোচ বোধ করছিল। অগত্যা আর কি করি, বললাম, না বাবা, পিলু, সেই ছেলেই নয়। নবমী ওকে দাঠাকুর ডাকে। নবমীকে পিলু ফল পাকুড় দেয়। পাতা কেটে দেয়। শুকনো কাঠ দিয়ে আসে। শীতে মরে যাবে ভেবে পিলু মাকে না বলে নবমীকে একটা পুরনো শাড়ি পর্যন্ত দিয়ে এসেছে। মারবে ভেবে মা তোমাকে কিছু বলেনি।

বাবা পিলুকে আর একটা কথাও বললেন না। সহসা পুত্রগৌরবে বাবার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে দু-চোখ বাবার জলে ভার হয়ে গেল। বললেন, তোদের একটু ভাল কিছু খাওয়াতে পারি না। ছাগলের বাচ্চাটা বড় হয়ে যদি একটু তবু দুধ দেয়। তারপর কেমন দুঃখী মানুষের মতো নিজেকে মশারির মধ্যে গুটিয়ে নিলেন। আর বোঝাই গেল না, বাবা আমার এ-বাড়ি-ঘরেই আছে; এ-বাড়িঘরেই থাকে।

॥ বারো ॥

এই বনভূমিটা তার জঙ্গল গাছপালা নিয়ে আগে একরকমে ছিল, মানুষের বাড়ি-ঘর হয়ে যাওয়ায় এখন অন্যরকমের। দূরে দূরে দরমার বেড়া দিয়ে মানুষজন ঘরবাড়ি কেবল তুলছেই। বনভূমিটা ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছিল। তবু বাবা তার বাড়িঘরে নিয়ে আসছেন যাবতীয় ফুল ফলের গাছ। যেমন বাবা এর মধ্যে গোটা কয়েক আমের কলম পুঁতেছেন। নারকেল গাছ দুটো। একটা সফেদা ফলের গাছ, পেয়ারা তিনটে, লেবুর কলম কিছু রোপণ করেছেন বাড়িটাতে। আর পেঁপে গাছগুলি বুড়ো হয়ে যাওয়ায় নতুন কিছু পেঁপের চারা। করমচা লাগিয়েছেন টক ডাল খাবেন ভেবে। অর্থাৎ দেশ বাড়িতে বাবার যা কিছু ছিল, এই আবাসে প্রায় তার সবই তিনি এনে হাজির করার চেষ্টা করছেন। কিছুই বাদ দিচ্ছেন না। এক একদিন বাবা ফিরতেন এক এক রকমের গাছের সংবাদ নিয়ে। একবার মাঝে বাবা দশ ক্রোশ দূরে হেঁটে গেছিলেন, শুধু শহরে মানু কাকার এক বন্ধু বলেছিল, বাড়িতে তার একটা জামরুল গাছ আছে। গাছটার কলম বাঁধার জন্য একবার যেমন দশ ক্রোশ হেঁটে গেছিলেন, আবার কলমটি আনার জন্যও তাঁকে দশ ক্রোশ ভাঙতে হয়েছিল।

জঙ্গল সাফ করে যত এগিয়েছি, তত গাছগুলো বাবা পুঁতে গেছেন। শুধু বিঘা দুই ভুঁই শাক-সব্জীর জন্য আলাদা রেখে দিয়েছেন। আর বাবার গাছপালা-অন্ত প্রাণ ছিল বলে, এক একটা গাছের পরিচর্যায় বড় সময় দিতেন। ঋতু বদলের সঙ্গে গাছের গোড়া কুপিয়ে সামান্য শেকড়-বাকড় আলগা করে বর্ষার জল খাওয়াতেন। কোন গাছে কি সার দরকার বাবার চেয়ে কেউ ভাল জানত না। ফলে এই বছর দুই যেতে না যেতেই জমির রুক্ষ ভাবটা কেটে গেছে। ছায়া শীতল এক সুষমা বাড়িটার চারপাশে গড়ে উঠেছে, আমরা ধীরে ধীরে টের পাচ্ছি। আর বাবার সঙ্গে এই গাছপালা, কুকুর, ছাগলছানা বাড়িঘর আমাদের নতুন এক সাম্রাজ্য। দূরে রাজবাড়ি। যেখানে পূজায় মেলা বসে, যাত্রাগান হয়। হাতী দেখা যায়। শহরে গেলে সুন্দর সুন্দর মেয়েদের দেখা যায় ফ্রক পরে স্কুলে যাচ্ছে। নিমতলায় গেলে আজকাল মানুষজনের অনেক মুখ দেখা যায়। আর রয়েছে মাঠ, বাদশাহী সড়ক, ল্যাংড়া বিবির হাতা, বিষ্ণুপুরের কালীবাড়ি। পৌষে মেলা বসে। এইসব মিলে আমাদের ঘরবাড়ির চারিদিকে বেঁচে থাকার এক আশ্চর্য রহস্যময়তা গড়ে উঠেছিল। বাবা কত সহজে আমাদের একটা নতুন পৃথিবী উপহার দিলেন।

যারা বাড়িঘর করছে, অথবা নতুন বাড়িঘর করে চলে এসেছে, তারা অনেকেই সপরিবারে আজকাল আমাদের বাড়ি আসে। মা তাদের বসতে দেয়। বিকেল-বেলায় মা মায়াকে নিয়ে কখনও নতুন নতুন বাড়িতে বেড়াতে যায়, গল্প করে এবং কখনও দেখা যায়, ওদের কেউ দিয়ে গেছে বড় একটা লাউ। পঞ্চানন চন্দ, কাঙ্গালী আইচ সকাল হলেই আসে। ঠাকুরঘরের দাওয়ায় মাথা ঠোকে। চরণামৃত নেয়। মুখে মাথায় মাখে। ওদের ছেলেরা মেয়েরা মাকে মাসিমা ডাকে। বাবাকে মেসোমশাই। কত দূর দেশে সবার বাড়িঘর ছিল। অথচ সব কিছু ফেলে আসার শোক ক'দিনেই মানুষের বুঝি উবে যায়। নতুন এক জীবন, মানুষেরা বেঁচে থাকার জন্য তৈরি করে নেয়। বাবা ট্রেনে এখন কোথাও গেলে টিকিট কাটেন। বিনা টিকিটে ভ্রমণ করা আজকাল পছন্দ করেন না।

এরই মধ্যে একদিন বাবা একটি খবরের কাগজ নিয়ে এলেন। এই কাগজ আমরা বাড়িতে বসে গোল হয়ে প্রথম পড়ি। বাবা কাগজটা সারাদিন পড়লেন। পরদিনও পড়লেন। বাবার কাছে খবরের কাগজ পড়াটা একটা সম্ভ্রমের ব্যাপার। বাবা কাগজের খবরগুলি নিয়ে নিবারণ দাসের আড়তে সন্ধ্যায় ঘুরে এলেন। এবং সব খবর দিয়ে ভাব দেখালেন—বাবা খুব হেজিপেঁজি মানুষ আর নন।

পুজার মাস আসছে, একটা দুর্গাপুজার বায়না পাওয়া যায় কিনা, সেই আশায় তিনি প্রায়ই বহরমপুরে গিয়ে মানুকাকার বাসায় আজকাল বসে থাকছেন।

আর আসা যাওয়া করতে করতে একদিন বাবা খুব বড় একটা খবর নিয়ে এলেন। বললেন, বুঝলে ধনবৌ, কালুবাবুর মার কাজ। খুব দেবে থোবে মনে হয়। বেলডাঙা স্টেশনে নেমে যেতে হবে। খুবই ধনী ব্যক্তি কালুবাবু। একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের খোঁজে এসেছিল মানুর কাছে। তা কালই রওনা হয়ে যাব। মানুকে বলে রেখেছি, শহরেও তো অনেক সার্বজনীন পূজা হয়—একটু খোঁজখবর রাখিস। বিলুটা তো বড় হয়ে গেছে। ওকে তন্ত্রধার করে নেব। কিরে বিলু পারবি না?

তন্ত্রধারের কাজ কি আমি জানি। ধুতি পরতে হবে। নামাবলী গায়ে দিতে হবে। দেবীর সামনে আসনে বসে পুরোহিতদর্পণ আওড়ে যাব। কথা শুনে শুনে বাবা দেবীর নামে মন্ত্রপাঠ করবেন। বাবাকে কি বলব বুঝতে পারছিলাম না। এতসব মানুষের মধ্যে আমি বাবার পুত্র, আমার খালি গা, জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ, দেবীর মুখে গর্জন, ধূপ ধুনোর গন্ধ, চন্দনের গন্ধ আর আমি বাবার পুত্র হয়ে বসে আছি ভাবতেই ভারি বিভ্রমে পড়ে গেলাম। বাবাকে ঠিক আগের মতো আর অত সহজে বলতে পারলাম না, হ্যাঁ পারব বাবা। কি যেন একটা সংকোচ অথবা লজ্জা বলা যেতে পারে মনের মধ্যে তিরতির করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

বাবা ফের বললেন, অন্য তন্ত্রধার নিলে সে তো ভাগ নেবে। পুরোহিত-বরণ পাবে। পাঁচ দশ টাকা দক্ষিণা পাবে। সেটা তুই গেলে ঘরেই আসবে। কোনো অসুবিধা হবে না। যেখানে ঠেকে যাব, সেখানে একটু ধরিয়ে দিবি।

মা বলল, পূজার দেখা নেই। হবে কি হবে না এখন থেকেই···

—এই তো ধনবৌ, সবটাতেই আগ বাড়িয়ে বাধা। হবে না কে বলেছে! কী হয়নি! তারপর কালুবাবুর মতো ধনী ব্যক্তির বাড়িতে বাবার চণ্ডীপাঠে আমন্ত্রণ—কোথায় ওঠা গেছে, ধনবৌ বুঝেও কেন যে বোঝে না বাবার মুখ দেখে এমন মনে হল আমাদের।

বাবা ফের বললেন, বিগ্রহের কৃপায় সবই হচ্ছে, বাকিটুকু হবে। একটা গরু হয়ে গেলে দেখবে, তোমার আকাঙ্ক্ষার কত নিবৃত্তি।

আমরা বুঝতে পারলাম, বাবার মনে শুধু এখন একটাই দুঃখ, সন্তানদের পাতে সামান্য দুধ দিতে পারছেন না। দুঃখটা ঘোচাবার তালে আছেন সেটা ক'দিন থেকে বাবার কথাবার্তা থেকেই বুঝতে পারছি। এখন শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কতদূর গড়ায় সেটাই দেখার বিষয়।

পিলু পাশেই ছিল। ছাগলের বাচ্চাটার জন্য একটা খোঁয়াড় তৈরি করছে। সে বলল, দাদা না গেলে আমি যাব বাবা। আমি ঠিক পারব।

আমি বললাম, তুই গেলেই হয়েছে। পরের বারে বাবা আর পূজাই পাবে না।

পিলু বলল, কেন পাবে না ?

মা বলল, লোকে ভাববে ছানাপোনা দিয়ে কি কাজ হয়। আর তন্ত্রধার পেল না। ঠাকুরমশাই-এর কি ভীমরতি হয়েছে!

বাবা খুব গম্ভীর গলায় বললেন, পারলে পিলুই পারবে। তোকে পিলু আমি সব শিখিয়ে দেব। এবং কথা হল, একটা পুরোহিতদর্পণ বাবা যে-করেই হোক সংগ্রহ করবেন। কোথায় পাওয়া যেতে পারে, পঞ্জিকাটা না হয় প্রতিবছর নিবারণ দাসই এনে দেয়, কিন্তু পুরোহিতদর্পণ। বাবার বোধহয় মনে হল, কালুবাবুর কাছে তাঁর এই বাসনা নিবেদন করলে তিনি দয়াপরবশে দিয়েও দিতে পারেন। মানুষই তো দেয়। তবে আর ভাবনা কেন।

অবশ্য বাবার কাছে একটা পুরনো পুরোহিতদর্পণ থাকার কথা। দেশ বাড়িতে দুর্গাপূজা বাঁধা ছিল। আসার সময় ওটা আনতে ভুলে গেছেন, না হারিয়ে গেছে বাবার কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল না। শুধু বললেন, কাল চণ্ডীপাঠ। বোধহয় বাবা এখন মনে মনে হেঁকে উঠবেন, কাল চণ্ডীপাঠ। কতবড় একটা ঘটনা এটা ছেলেরা যদি বুঝতো। ধনবৌ যদি বুঝতো। বাবা সকাল সকাল স্নান করলেন। ঠাকুরঘরে আরও সকালে ঢুকে গেলেন। একটা নতুন গামছায় বাবার সব অমূল্য গ্রন্থাদি সযত্নে বাঁধা। ঠাকুরের সিংহাসনের ওপর ওটা রাখা থাকে। বাবার যা কিছু জরুরী কাগজপত্র, সবই ঐ গামছায়। এমন কি দলিল দস্তাবেজ। তাছাড়া বাবার ধারণা, ঠাকুরের মাথার ওপর থেকে হাত দিয়ে কেউ কিছু সরাবার তালে থাকলে, অপহরণকারী ধনে জনে মারা পড়বে। ফলে টাকা পয়সা ঐ একটা গামছায়। ঠাকুরঘরে যেহেতু আমার প্রবেশ করার অনুমতি আছে, সিংহাসনের সবটাই ঘেঁটেঘুঁটে দেখার সৌভাগ্য হয়। বাবার গামছার পুঁটলি খুলে যা যা দেখেছিলাম—একটা তালপাতার পুঁথি। কতকালের জানি না। স্বহস্তে লিখিত কার সেটা বাবা নিজেও জানেন না। বাবার বাবার, না তস্য বাবার, কোন বাবার জানা ছিল না বলে, আমার পিতৃদেব সেটি লাখ টাকার শামিল ভাবতেন। ওতেই পুরো চণ্ডীর বর্ণনা আছে। নিবারণ দাসের দেওয়া পঞ্জিকা, একটা রুদ্রাক্ষের মালা আর নানারকম গাছগাছালির গুণাগুণের একটি বই। দুটো তামার পয়সা। কাশীর কোন এক সাধু বাবাকে দিয়েছিল। এই পয়সার গুণে সংসারে কোনো অপমৃত্যু ঘটবে না। একটা আসন, ওটা

কার দেওয়া বাবা আজ পর্যন্ত বলেননি। আসনটাতে বাবা বসেন না। সব সময় তোলা থাকে। আর কিছু লাল নীল পাথর। এগুলি দিয়ে কি হবে বললেও বাবা ভীষণ অহংকারী হয়ে যেতেন। রেখে দাও। তোমাদের একদিন বলেছি, আমার জিনিসে হাত দেবে না। কিছু ভূর্জপত্র। সঙ্গে আমার আর পিলুর ঠিকুজী কুষ্ঠি। গামছার পুঁটলিটাতে যখন পুরোহিতদর্পণটা নেই, তখন ওটা খোয়া গেছে ধরে নেওয়া গেল। থাকলে ওটা পুঁটলিতেই থাকত।

কোথাও পূজা-আর্চা থাকলে বাবা খুব সকাল সকাল ঠাকুরঘরে ঢুকে যান। সূর্য উঠতে না উঠতে কোনো দিন পূজাও শেষ হয়ে যায়। সকালে প্রাতঃস্নান সেরে নেন তাড়াতাড়ি। জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ করেন। এবং গলায় পৈতার যে কী মাহাত্ম্য বাবাকে এই সময়টায় না দেখলে বোঝা যাবে না। একেবারে পরম নিষ্ঠাবান মানুষ। পৃথিবীতে হিংসা-দ্বেষ আছে, চুরি-চামারি, কোর্ট-কাছারি আছে, যুদ্ধ আছে, সিনেমা-বায়স্কোপ আছে, নাটক-নভেল আছে কিছুতেই বিশ্বাস করা যেত না। শুধু ঠাকুরঘর, আমরা ক'জন আর মার ব্যস্ততা বাবার ব্যস্ততা, ফুল, জল, তিল, তুলসী, দূর্বা প্রভৃতির মধ্যে বাবা একসময় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজিয়ে শাঁখে ফুঁ দিয়ে কাঁসি বাজিয়ে যখন বের হতেন, তখন হয়তো পিলু দুলে দুলে পড়ছে। বাবা বাড়ি থেকে তাড়াতাড়ি বের হচ্ছে সুবাদে পিলুর পড়ায় এত উৎসাহ : যত খুশী থাকবেন, তত তাড়াতাড়ি হবে কাজকর্ম। বের হতে সময় লাগবে না। পিলু সুপুত্র হওয়ার তখন প্রাণপণ চেষ্টা করত।

আজ বাবার কোথাও যাবার কথা নেই। পূজাআর্চা থাকলে, ঘটা করে আগের দিনই সবাইকে বাবা জরুরী খবরটা দিয়ে রাখেন। মায়া খুব সকালে উঠে ফুল দূর্বা তুলে রাখে। ভাইটা মার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বে ভেবে, আমার পাশে রেখে যায়। বাবাকে জলখাবার যা হোক কিছু, এই মুড়ি খৈ অথবা যবের ছাতু। বাবা যবের ছাতু জলে ভিজিয়ে গুড় দিয়ে খেতে খুব ভালবাসেন। মাকে তার আগে ঘরদোর লেপে ফেলতে হয়। ঠাকুরঘরের বাসনপত্র মেজে রাখতে হয়। বাবার সঙ্গে মারও কাজের তখন অন্ত থাকে না। অথচ আজ এত সকালে কেন বাবা ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন বোঝা গেল না। পিলু মাদুর বিছিয়ে পড়তে বসে, দেখে বাবা ঠাকুরঘরে পদ্মাসনে বসে আছেন। সে ভেবে পেল না, সুপুত্র হবে, না ছাগলটাকে নিয়ে ঘাস খাওয়াবে এখন। বাবার তো যাবার কথা নেই কোথাও। সে তবু খুব ভাল ছেলের মতো বলল, বাবা, তুমি কোথাও যাচ্ছ ?

—কেন রে ?

—না এমনি, এত সকালে ঠাকুরঘরে তুমি···

বাবা বললেন, পড় পড়। লেখাপড়া করে যে গাড়িঘোড়া চড়ে সে। কেবল আমি কখন বের হব সেই তালে থাকে।

পিলু ধরা পড়ে গিয়ে খুব লজ্জায় পড়ে গেল। সে পড়তে থাকল গলা ফাটিয়ে। ছাগলের বচ্চাটা কি মরে গেছে! কোনো সাড়াশব্দ নেই। সে দু-পাতা পড়ে মাকে বলল, বাচ্চাটা ম্যা করছে না কেন মা?

বাবা ঠাকুরঘর থেকেই বললেন, বাচ্চাটা ম্যা করছে না কেন তা তোমার মা কি করে বলবে!

—আমি একবার দেখে আসব?

বাবা বুঝতে পারলেন বুঝি পুত্রটি বাচ্চাটা সম্পর্কে নাছোড়বান্দা। বললেন, দেখে আয়। না দেখলে তো শান্তি হবে না। দেখে এস। তারপর একটু পড়ে আমার ঘরবাড়িকে উদ্ধার কর।

বাচ্চাটা দেখে এসে পিলু বলল, খুব খিদে পেয়েছে বাবা।

কার খিদে পেয়েছে, পিলুর না বাচ্চাটার ঠিক বোঝা গেল না। বাবা তখন পূজায় মগ্ন হয়ে পড়েছেন। এখন পিলু পড়ল কি পড়ল না, সংসারে কোথায় কি হচ্ছে জানার কোনো উৎসাহ নেই। তিনি আচমন করার পর কোনো কথাই বলবেন না। তারপর গণেশের পূজা আরম্ভ হবে। বাবা জোরে জোরে বললেন, খর্বং স্থূলতং গজেন্দ্র বদনং লম্বোদর সুন্দর এবং আরও সব মন্ত্রপাঠ আরম্ভ হলে পিলু বইটই ভাঁজ করে প্রথম কুকুরটাকে ডাকল, মনা মনা। মনা তো ছুটে এসে পায়ে গড়াগড়ি। সে এবার বাচ্চাটাকে বগলে নিল। পিলুকে বের হয়ে যেতে দেখে মা আর চুপ করে থাকতে পারল না—পিলুরে তোর কি হল? সাত সকালে কিছু মুখে না দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিস। তোর বাবাকে ডাকবো! পড়াশুনা লাটে ওঠালি!

পিলু জানে সব অহেতুক। বাবা আর কথা বলছেন না। যতই মা চেঁচামেচি করুক বাবা পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন বাক্য নয়। কটু বাক্যও নয়। বরং মার চেঁচামেচি যত আরম্ভ হবে, বাবার মন্ত্রপাঠের স্বরগ্রাম তত উঁচুতে উঠবে। ততক্ষণে মাও আরম্ভ করে দিয়েছে যেমন বাপ, তেমন ছেলে। একটা কথা বলছে না! হ্যাঁগো শুনতে পাচ্ছ, পিলু ছাখো কোথায় বের হচ্ছে!

—কোথায় বের হব আবার! বাচ্চাটার খিদে পায় না! একটু ঘাসপাতা ছিঁড়ে খাওয়াব তাও তোমার সহ্য হয় না মা। বাচ্চাটাকে না খাইয়ে শেষ পর্যন্ত তোমরা সবাই মারবে।

অকাট্য কথা। বাচ্চা খেল কি খেল না সংসারে আর কারো দেখার অবসর

নেই। সেই দেখে থাকে। বাচ্চাটাকে নিয়ে এসে না খাইয়ে মেরে ফেলে সে তো পাপের ভাগী হতে পারে না। সুতরাং সে সোজাসুজি কিছু গ্রাহ্য না করে বের হয়ে গেল। বগলে ছাগলের বাচ্চা, পায়ে পায়ে কুকুরটা। পিলু এখন সোজা হেঁটে চলে যাচ্ছে। ঘরবাড়ির প্রতি তার এখন এতটুকু আকর্ষণ নেই। বাবা যতই মন্ত্রপাঠ করুন, যতই রাগে দুঃখে স্বরগ্রাম একবার উঁচুতে একবার নিচুতে নামিয়ে আনুন, পিলুর কিছু আসে যায় না। আসলে সে বাবাকে বোবা বানিয়ে রেখে চলে যাচ্ছে। ফিরে আসার পর এই বাবা আর সেই বাবা থাকবেন না। এইটুকুই পিলুর ভরসা। সে এখন পরিত্যক্ত বনভূমিতে, নবমীর ইটের ভাটায়, ঝোপ জঙ্গলে রাজার মতো ঘুরে বেড়াবে। আমরা বুঝে নিয়েছি, বাবা বিদেশে, পিলু স্বদেশে—দু'জনই সমান। দুজনে কোন ফারাক নেই। পিলু ফিরে এলে মার সামনে বাবার তখন কোন সাহসও নেই কিছু বলার। কারণ কোথাকার জল কতদূর গড়াবে কেউ বলতে পারে না। বোবার শত্রু নেই। এই মহামন্ত্র সম্বল করে বাবা তখনকার মতো সব সামলে নেবেন।

॥ তেরো ॥

এইভাবে আমাদের দিন যায়। বাবা কালুবাবুর মার কাজে চণ্ডীপাঠের জন্য সকালে রওনা হয়ে গেলেন। বেলডাঙ্গা থেকে বাবাকে সাত ক্রোশের মতো পথ হেঁটে যেতে হবে। সকালের ট্রেনে স্টেশনে নামলে, রাতে রাতে পৌঁছে যাবেন। পরদিন কাজ। বাবা নামাবলী গায়ে বগলে পুঁথি, হাতে ব্যাগ। আমরা বাবাকে বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছি। বাবা যেতে যেতে পিলুকে অমৃতবাণী শোনাচ্ছিলেন। পিলু এক কান দিয়ে শুনছে, অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছে।

বাবা বললেন, তোমরা ভাল হয়ে থেকো।

পিলু বলল, থাকব বাবা।

—মার কথা শুনবে।

পিলু বলল, তুমি কবে ফিরবে বাবা?

বাবা খুবই বিস্মিত গলায় বললেন, কাজ হলেই ফিরে আসব।

—কবে কাজ শেষ হবে বাবা?

—কালই হবে।

—কতদিন লাগবে ফিরতে ?

মনে হল বাবা হাঁটতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। বললেন, কালই ফিরে আসতে পারব বোধহয়।

আমি বললাম, বোধহয় কেন বাবা ?

আসলে এত সব প্রশ্ন করার সাহস আমার কিংবা পিলুর কারো নেই। বাবা আমার দিকে তাকালেন। পিলুটা না হয় বেয়াদপ হয়ে গেছে, মায়ের আসকারাতে জাহান্নমে যেতে বসেছে, তাই বলে তুমিও। বাবা আমার দিকে তাকিয়েই কিছু আঁচ করতে পারলেন। বললেন, তোমার মাকে বল, কাল রাতেই ফিরব।

সকাল থেকেই মার সঙ্গে বাবার বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। কেন বাক্যালাপ বন্ধ থাকে আমরা দু ভাই আজকাল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। বাবার কোথাও যাবার সময় হলেই মা আজকাল কিছুটা যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে যায়। কেবল গজগজ করে। কথা দিয়ে বাবা কথা রাখে না, একটা মানুষ বাইরে বাইরে ঘুরলে, খবর না পাওয়া গেলে কত চিন্তা হয়, মানুষটার যদি সেই আক্কেল থাকে! ছেলেরা বড় হয়ে গেল, এই ধরনের অজস্র কথা, আর যত অভাব তখন মার বেড়ে যায়। মা খুব সামান্য উপকরণ সম্বল করে বাবার সঙ্গে কুরুক্ষেত্র বাধিয়ে দিতে পারে তখন।

বাবাকে বাদশাহী সড়ক পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম আমরা। বাবা হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছেন। আমাদের দিকে হাত তুলে বললেন, বাড়ি যা। রাস্তায় অন্য সব অনেক কাজের কথাও বলেছেন। তার মধ্যে আমার বড় কাজ মানুকাকার কাছে যাওয়া। বাবার জন্য কার কি হয় জানি না, আমার ভারি কষ্ট হয়। গতকাল বাবা সারাদিন চণ্ডীপাঠ করে ঝালিয়ে নিয়েছেন। সংসারে কি হল না হল, একবারও মুখ বার করে দেখেননি। পিলু কখন ফিরে এল, কখন কে খেল, ভাইটা এখন হাঁটতে পারে, দৌড়তে পারে, সেই ভাইটা দুবার ঠাকুরঘরে মুখ বাড়িয়ে ডেকেছে, বাবা, বাবা, কোনো উত্তর দেননি। চণ্ডীপাঠের মধ্যে এতই নিমগ্ন ছিলেন যে মা না পেরে আমাকে বলল, দেখ তো তোর বাবার বাহ্যজ্ঞান আছে কি না ? আমি মার কথায় কোনো গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু মা না খেয়ে বসে আছে। বাবা বাড়ি থাকলে যতই বেলা হোক মা খায় না। বাবার খাওয়া হলে মা পাতেই বসে যায়। বেলা পড়ে গেছে কখন, গাছের ছায়া লম্বা হতে শুরু করেছে এবং যখন সাঁজ নেমে আসার দেরি নেই, তখনই মা না পেরে কথাটা আমাকে বলেছিল। মার কথায় গুরুত্ব না দেওয়ায়, পিলু দেখলাম দায়িত্বটা সহজে নিয়ে নিল। সে সোজা ঠাকুরঘরে গলা বাড়িয়ে ডাকল, বাবা।

বাবা চোখ উন্মীলন করে সামান্য তাকালেন। তারপর ফের চোখ বুজে পড়তে গেলে, সে বলল, বাবা।

বাবা সোজা হয়ে বসলেন।

পিলু বলল, মা জানতে চেয়েছে···

বাবা তাকিয়েই আছেন। বোধহয় সামান্য বাকি আছে। সেটুকু শেষ করে কথা বলবেন।

পিলু শেষ করল কথাটা, মা জানতে চেয়েছে, তোমার বাহ্যজ্ঞান আছে তো!

বাবার মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য। ছেলেটার কোনো দোষ দিয়ে লাভ নেই।

পিলু বলল, সাজ লেগে যাচ্ছে।

বাবা চণ্ডীপাঠ অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়লেন। শুধু বাইরে এসে বলেছিলেন, চণ্ডীপাঠে ঘরবাড়ির সব অকল্যাণ দূর হয়। জীবনে খাওয়াটাই সব নয়।

মা খোঁচা হজম করে গেল। তখনকার মত কিছু বলল না, পরে বাবাকে খেতে দিয়ে নিজে আর খেল না। খাওয়া নিয়ে খোঁটা শেষ পর্যন্ত! বাবা তারপর সাধ্য সাধনা করলেন অনেক। মার দিক থেকে সাড়া পাওয়া যায়নি। এবং আজ সকালেও অভিমানবশে মা জলগ্রহণ করেনি। বাবার অনেকদূর পর্যন্ত যেতে হবে বলে জলগ্রহণ না করলে চলে না। বাবার জন্য মা সবই রান্নাবান্না করেছে। বরং অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশিই করেছে, নিজে খায়নি। বাবা বলেছে, কপাল। দুর্ভাগ্য বলতে পার। আমাকে বলেছে, তোমার মার সবই ভাল, তবে বড্ড জেদ। যাই হোক, আমি তো কাজে যাচ্ছি, খেতে বল। না খেয়ে যেন থাকে না। গৃহলক্ষ্মী অভুক্ত থাকলেও ঘরবাড়ির অকল্যাণ হয়। কথাটা বুঝিয়ে বল।

বাড়ি ফিরতেই মা বলল, কবে ফিরবে কিছু বলে গেল?

পিলু বলল, কালই।

—আর কাল! মা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

আমি বললাম, বাবা বলেছে তোমাকে খেয়ে নিতে। না খেলে সংসারের নাকি অকল্যাণ হয়।

বাবা বাড়ি নেই বলে মার কাজে কর্মে কোনো তাড়াহুড়ো নেই। প্রথম দাওয়ায় বসে রাস্তায় বাবার সঙ্গে আমাদের কি কি কথা হল সব শুনল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হরেন মল্লিক এসেছিল। মঙ্গলচণ্ডী পূজা।

বাবা বাড়ি না থাকলে সাধারণ পূজাআর্চার কাজ এখন আমাকেই করতে হয়।

পালা-পার্বণে বাবা আজকাল একা পেরে ওঠেন না বলে, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতী পূজার সময় বাড়ি বাড়ি আমিও যাই। প্রথম প্রথম খুবই ভুল হত। বাচ্চা ঠাকুর বলে যজমানরা ক্ষমাও করে দিত।—ও কর্তা সংকল্প করলেন না। ও কর্তা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন না। মূর্তি পূজা থাকলে প্রায়ই ভুল হত চক্ষু দানের সময়। কাজল যেমনকার তেমন পড়ে আছে। একটুও আঁচড় পড়েনি। মাঝে মাঝে মন্ত্রপাঠ গুলিয়ে ফেলতাম—মনে থাকত না, বাবার কথামত তখনই গায়িত্রী জপ করে সংকট থেকে ত্রাণ পেতাম। বাবার মতে গায়িত্রী পাঠের মতো মহামন্ত্র আর কিছু নেই। বামুন ঠাকুরের ওটা ব্রহ্মাস্ত্র বলতে পার। সুতরাং পূজায় অসুবিধায় পড়লেই বাবার ব্রহ্মাস্ত্রটি প্রয়োগ করতাম। ফলে পূজাআর্চায় ভয় ভীতির চেয়ে, খেয়ে না থাকার কষ্টটাই বেশি। যেমন এই এখন, আমাকে স্নান-টান সেরে সড়কের ও-পাশে যে নতুন কলোনি হয়েছে, যেখানে হরেন মল্লিকরা থাকে সেখানে ছুটতে হবে। তারপর বাড়ি ফেরা বাড়ির বিগ্রহে ফুল জল দেওয়া এবং এত সবের পর খাওয়া। দুপুর গড়িয়ে যাবে। মেজাজটা খুবই বিগড়ে গেল। বললাম, পিলুকে বলো করতে। আমি পারব না।

পিলু এক পেট খেয়ে এক পায়ে খাড়া। কারণ দ্বিতীয়বারের সময় হতে হতে সে দুটো পূজাই শেষ করে ফেলতে পারবে। পূজা করার সময় সে বিধি বিধান গ্রাহ্য করে না। মোটামুটি গণেশের পূজা আর পঞ্চদেবতার পূজা জানা আছে। বাকিটা তো এষ গন্ধ পুষ্প, অথবা দীপায় নম, নৈবেদ্যায় নম—আর বামুন ঠাকুর যা বলবে—সবই ঈশ্বর দু হাত পেতে করজোড়ে গ্রহণ করবে—সুতরাং তার ভয় ভাবনা এত কম যে, মঙ্গলচণ্ডীর ধ্যানের সময় সে অত্যন্ত তদ্গতচিত্তে গণেশের ধ্যান জপ করে যাবে। বিন্দুমাত্র সংশয় থাকবে না কারো যে সে এক দেবতার পূজা করতে এসে অন্য দেবতার পূজা সেরে উঠে যাচ্ছে।

চুল বড় চোখ বড় পিলুর। চোখ দুটোতে ওর আশ্চর্য এক ভালবাসা। সব কিছুতেই সে পা বাড়িয়ে থাকে। পেট ভরা থাকলে, সব কাজই সে কত সহজে করে আসতে পারে। চারপাশে তাকালে বোঝা যায় পিলু সব সময় এই বাড়ি-ঘরের জন্য ঠিক বাবার মতো অহংকারী।

আমি বললাম, তুই তো ঠিক মন্ত্র পড়িস না।

—কে বলেছে!

—তুই লক্ষ্মীর ধ্যান জানিস?

—হ্যাঁ।

—বল তো।

—ওম পাশাঙ্ক মালিকাভুজ···এইটুকু বলেই বলল, তারপর কিরে বাদ্য ?

—ঐ তো !

—কেন বাবা তো বলেছে না পারলে, গায়িত্রী পাঠ করতে।

—তাও তুই করিস না।

—দক্ষিণা কম দিলে কি করব ?

—দক্ষিণার সঙ্গে পূজার কি সম্পর্ক রে!

—বারে সব জিনিসের দামদর থাকে, খাঁটি জিনিসের এক দাম, ভেজাল জিনিসের এক দাম, দক্ষিণা কম দিলে কম মন্ত্র, বেশি দিলে বেশি মন্ত্র।

আমি মার দিকে তাকিয়ে বললাম, শুনছ মা, পিলু কি বলছে!

মা বলল, ঠিকই তো বলছে। তোমার বাবার মতো হলে সংসার চলে না।

সুতরাং ঠিক হল, পিলুই যাবে হরেন মল্লিকের পূজা সারতে। আমি যাচ্ছি না। সে কিছুক্ষণ ঘাসপাতা সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকল। ছাগলের বাচ্চাটা এই পরিবারের আর একজন হয়ে গেছে। তার নামকরণ পর্যন্ত করে ফেলেছে পিলু। অনেক ভেবেচিন্তে নাম রেখেছে রত্না। গতকাল থেকেই সংসারে পিলু, বিলু, মায়ার মতো, মনার মতো বাচ্চাটা আমাদের এক পরিবারভুক্ত জীব। পিলুকে যদি কেউ বলে সংসারে তোমরা ক'জন প্রাণী, সে গর্বের সঙ্গে বলবে আটজন। দেশ থেকে আসার পর আরও দুজন বেড়েছে।

এবং পিলু বাচ্চাটাকে ঘরবার করে থাকে। একটা বস্তা বিছিয়ে দেয়। হেগে মুতে বস্তাটা নোংরা করে ফেলে বলে, সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল পিলু রত্নাকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। রত্নাকে বলছে, তোমার বড়ই স্বভাব খারাপ। মুতে নাও বলছি। রত্না যত ঘরের দিকে ছুটতে চাইছে, তত শক্ত হাতে দড়ি ধরে রেখেছে। বলছি না মুতে নিতে। মুতে দিলে রান্নাঘর নোংরা হয় না।

দুদশবার বলার পর সত্যি রত্না শিরদাঁড়া লম্বা করে দিল। এবং মুতে দিল। পিলুর অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির হাসি। এই সংসারে মনার মতো রত্নাও তার কথা-বার্তার মানসম্মান রাখছে। সে ঘরে নিয়ে রত্নাকে শুধু বেঁধেই রাখল না, রাতে খিদে পেলে যাতে খেতে পায়, সেজন্য কিছু ঘাসপাতা দড়িতে বেঁধে মুখের সামনে ঝুলিয়ে রাখল। ঘুম ভাঙলে চেঁচামেচি করার সুযোগ পাবে না। সামনে দেখতে পাবে কচি ঘাসপাতা। শুধু একটাই ভয় পিলুর, শিয়ালে না নিয়ে যায়। এ জন্য সে মনাকে কয়েকবার শাসিয়েছে। পাহারা দেবার জন্য রান্নাঘরের ঠিক দরজার সামনে শুয়ে থাকতে বলেছে। এবং রাতে যখন পড়াশোনা সেরে খেতে বসেছি, দেখি, ঠিক রান্নাঘরের দরজার এক পাশে মনা মুখ তুলে বসে আছে। পিলু কিছু

খেয়ে বাকিটা তুলে নিয়ে গেল। মনাকে খাইয়ে বলল, কোথাও যাবে না। তোমারও দেখছি বাউণ্ডুলে স্বভাবে পেয়েছে। যখন খুশি যেদিকে চলে যাও। ঘরবাড়িতে ফেরার কথা মনে থাকে না।

মা বলল, তোমরা সবাই একরকমের। শুধু মনাকে দোষ দিয়ে কি হবে।

তারপর আমাদের এই বাড়িঘরে রাত ক্রমে গভীর হতে থাকে। টের পাই রত্না চোখ বুজে জাবর কাটছে, মনা ঘরের দাওয়ায় মুখ গুঁজে শুয়ে আছে, একটা পাতা পড়ার শব্দে সতর্ক, কান খাড়া হয়ে উঠছে। বাড়িঘরের গাছগুলি বর্ষার জল পেয়ে সতেজ—বনভূমিটা পায়ে পায়ে সরে যাচ্ছে। আর ইচ্ছে করলেই হাত বাড়িয়ে টোপরের মতো বাড়িটা তুলে নিতে পারছে না। মা শুয়ে শুয়ে কেবল সারাক্ষণ আমাদের সুসময়ের গল্প বলতে বলতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। গল্পে সারাক্ষণ বাবার কথাই ঘুরে ফিরে আসছিল। বুঝতে পারি মা বাবার কথা ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে না। মা হয়ত ঘুমিয়েও বাবার স্বপ্নই দেখছে। স্বপ্নে বোধ হয় এই ঘরবাড়ির মাথার ওপর রয়েছে তেমনি আকাশ, দূরবর্তী নীহারিকাপুঞ্জ। বাবা নীলবাতি হাতে মাঠ পার হয়ে ক্রমে বাড়িঘরের দিকে এগিয়ে আসছেন।

॥ চোদ্দ ॥

যথারীতি বাবা তাঁর কথামত রাতে ফিরে এলেন না। মানুষটা আসবে ভেবে মা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসেছিল। আমি রাত জেগে অঙ্ক কষছিলাম। বাকি সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। মা দরজায় হেলান দিয়ে—কেমন নিরুপায় রমণীর মতো মুখ তাঁর। মাঝে মাঝে উঠোনের দিকে চোখ সরে যাচ্ছে। কোনো শব্দে মা সতর্ক হয়ে উঠছে। এবং সারা মাঠঘাট জ্যোৎস্নায় ডুবে। উঠোনে জ্যোৎস্না। গাছের মাথায় বনভূমিতে জ্যোৎস্না। যেন জ্যোৎস্না নিরিবিলি আকাশে বাতাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। শুধু বাবা ফিরে আসেনি বলে সবই কেমন অর্থহীন মায়ের কাছে।

একসময় বললাম, তুমি খেয়ে শুয়ে পড় মা।

মা বলল, দেখি আর একটু।

সুতরাং আবার দুটো ঐকিক নিয়মের অঙ্ক করে বর্গমূলে চলে এলাম। মা এক-সময় কেমন ছোট্ট বালিকার মতো উবু হয়ে বসল। আমার বইগুলির পাতা

উল্টে গেল অবস্থা। বইয়ের ছবি দেখল। এক একটা ছবির নিচে কি লেখা আছে পড়ল। যেহেতু বইয়ের তাকটা সামনে, বইগুলি নামিয়ে আবার সুন্দর করে ভাঁজ করে তাকে সাজিয়ে রাখার সময় কেমন ছোট্ট বালিকা হয়ে গেল। মার পাশে বসে থাকতে এখনও আমার ভাল লাগে। মায়ের শরীরে এক আশ্চর্য ঘ্রাণ। অঙ্ক কষতে খুবই ভাল লাগছিল। বুঝতে পারি মা আমাকে মাঝে মাঝে সহসা চুরি করে দেখছে। মুখে সামান্য গোঁফের রেখা, আমি বাবার মতো বড় হয়ে যাচ্ছি, বোধহয় মার কোথাও ভেতরে সন্তান বড় হলে যে সুখ অথবা বাবার মতো একজন পুরুষমানুষ আমার মধ্যে জেগে উঠছে ভেবে কেমন মুহ্যমান। জননী গো বলতে ইচ্ছে হল একবার। আর তখনই মার দু ঠোঁট কেমন ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি মার দু চোখ কি এক বেদনায় ভার হয়ে গেছে। বললাম, বাবা ঠিক আসবে।

মা উঠে পড়ল। উঠোনে নেমে রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকল। এমনটা তো আমার মা ছিল না। বাবা ফিরে না এলে কখনও এমন বিচলিত বোধ করেনি। উঠোনে নেমে বললাম, বাবা তো প্রায়ই দেরি করে আসে। তবে এত ভয় পাচ্ছ কেন?

মা বলল, তোরা বড় হয়ে যাচ্ছিস বিলু।

বড় হয়ে যাচ্ছি বলে মার ভয়টা কোথায় বুঝতে পারলাম না। আমরা বড় হব না, কাজ করব না, বাবার দুঃখ ঘোচাব না—তবে মানুষের ঘরবাড়ি দিয়ে কি হবে!

মা লালপেড়ে শাড়ি পরেছে! মাথায় ঘোমটা। আকাশ নীল এবং কোথাও ঝিঁঝি পোকা ডাকছিল। বাবার গাছপালা মার চারপাশে কেমন প্রহরীর মতো সজাগ। তখন মা বলল, বড় হলে তোরাও তো তোদের বাবার মতো হবি। যাবি আর ফিরতে চাইবি না।

তখন বাড়িঘরে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি কেউ আমায় দূরে ডাকে। সংগোপনে শহরের সেই ব্যালকনিটা মগজের মধ্যে ভরা থাকে। পায়ের কাছে গোলাপের টব। ইজিচেয়ারে বালিকা ফ্রক গায়ে দিয়ে শুয়ে থাকে। শীতের পাখিরা আকাশে বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। এক একটা পালক নেমে আসে এবং জীবনের অর্থ পাল্টে যায়। বালিকার জন্য বুকে আমার কোথায় যেন টান ধরে গেছে। নিশীথে লণ্ঠনের আলোতে মা আমার মুখ দেখে ধরে ফেলেছে সেটা। বড় হয়ে যাচ্ছি ভেবে দুঃখটা কোথায় মার টের পেয়ে বললাম, মা তুমি ভেব না, আমরা এই বাড়িঘরেই থাকব।

মার মুখে অদ্ভুত কূট হাসি ফুটে উঠল। জ্যোৎস্নায় সেই হাসিটুকু আমাকে সত্যি কষ্টের মধ্যে ফেলে দিল। একটা কথাও আর মাকে বলতে পারলাম না। চুপচাপ ঘরে ঢুকে মাথা গুঁজে বসে থাকলাম। যেন আমি সত্যি এখন আগের মতো এই বাড়িঘরের জন্য টান অনুভব করি না। কেউ নদীর পাড়ে, অথবা গাছপালার অভ্যন্তরে এখন আমাকে নিয়ে হারিয়ে যেতে চায়। মা সেটা টের পেয়ে ভারি নিঃসঙ্গ বোধ করছে।

তারপর মাও আর আমার সঙ্গে কোনো কথা বলল না। খেয়ে নিল। দরজা বন্ধ করে দিল। মশারির ভেতর ঢুকে যাবার সময় শুধু বলল, শুয়ে পড়ার সময় আলোটা কমিয়ে রাখিস। নিভিয়ে দিস না।

মার আশা যে কোনো মধ্যরাতে বাবা ফিরে আসতে পারে। আলোটা সে-জন্য কমিয়ে রাখতে বলল।

শুয়ে পড়ার সময় মনে হল, খুবই নিস্তব্ধ ধরণী। এমন কি কোনো কীটপতঙ্গের আওয়াজ পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে না। মা ঘুমিয়ে পড়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মা যে ঘুমোয়নি টের পেলাম, কারণ শুয়ে পড়ার সময় মা বলল, দরজায় খিল দিয়েছিস তো।

বললাম, হ্যাঁ মা দিয়েছি। খুব সকালে ডেকে দিও।

—সে দেব। তুমি এখন ঘুমোও।

রাত থাকতে উঠে আবার অঙ্ক নিয়ে বসব ভেবেছি। আসলে এখন বুঝতে পারছি, অঙ্কটা আমার আদৌ করা হয়নি। পরীক্ষার দেরি নেই। দু-একদিনের মধ্যেই ঠিক খবর আসবে কোথায় কবে পরীক্ষা। হপ্তা দুই হয়ত সময় পাব আর। যে করেই হোক দশটা বিষয়েই পাস করতে হবে। নটা বিষয়ে পাস বাবার আমলে চলতে পারে, এই আমলে দশটা বিষয়ে পাস খুবই জরুরী।

পরদিনও বাবা এলেন না। সকাল সকাল বহরমপুরে কাকার কাছে গেলাম। পরীক্ষা কবে, কোথায় জানা হয়ে গেল। পরীক্ষার সিট পড়েছে কলকাতায়, দ্বারভাঙা হলে। কলকাতা খুবই বড় শহর, মানুকাকা এমন বলেছে। সেখানে কোথায় উঠব, কার কাছে উঠব এই নিয়ে কাকা কিছুক্ষণ সমস্যা বোধ করলেন। তারপর কি ভেবে বললেন, নীলমণির দাদা তো কলকাতায় থাকে। শেষ পর্যন্ত বোধহয় ওখানেই তোমাকে উঠতে হবে।

বাড়ি ফিরতে ফিরতে বেলা হয়ে গেল। পিলুর সোজা পথটায় না এসে ঘুরে এলাম। ও-পথটায় সেই ব্যালকনি, টবে, গোলাপের গাছ, সামনে ছোট্ট বাগান, এবং জানালায় বালিকার মুখ। ওদিক দিয়ে গেলে শুধু একবার সেই বালিকাকে

দেখতে পাব ভেবে ঘুরে এসেছি। সে নেই। তাকে দেখতে না পেয়ে মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল। মানুষের বড় হতে হতে কি যে সব হয়। সারা রাস্তাটা বড়ই দীর্ঘ মনে হয়েছিল। মা বাবা ভাই বোন বাদে কোথায় যেন আরও একটা ছোট্ট পৃথিবী বাবার মতো আমি এখন কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বাড়ি এসে দেখলাম, মা বেশ উগ্রচণ্ডা। মা ভীষণ গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। পিলুকে সকালে বেদম প্রহার করেছে। মায়া ভয়ে ভয়ে মার কাছে ঘেঁষছে না। ছোট ভাইটা পড়ে গিয়ে রক্তপাত ঘটিয়েছে। সকালে যারা দিনক্ষণ তিথি-নক্ষত্র, দেখতে বাবার কাছে আসে তাদের সবাইকে বলে দিয়েছে, বাড়ি নেই। কবে ফিরবে বললে জানিয়েছে, সে তেনার মর্জি। অন্যদিন সকালে বাবার এ-সব কাজ আমিই করে থাকি। তিথি নক্ষত্র শুভদিন পঞ্জিকায় লেখা থাকে। কেউ ফিরে যায় না।

ফিরতেই মা বলল, তোর মামুকাকা কিছু বলল ?

—কলকাতায় সিট পড়েছে।

—তোর বাবার কথা কিছু ?

বুঝতে পারলাম, মা এখন বাবার খবরের জন্য খুব উদ্বিগ্ন। আমার পরীক্ষা নিয়ে মার কোনো মাথাব্যথা নেই। কি বলি!

একটু ঘুরিয়ে বললাম, কালুবাবু খুব সদাশয় লোক। বাবার মতো মানুষকে পেয়ে ছাড়তে চাননি। দু-একদিন হয়ত ঘুরেফিরে কালুবাবুর ঘরবাড়ি, চাষবাস দেখছেন।

—মামুকাকা তোমায় কি বলল ?

—এই তো বলল।

—বেশ। তাহলে তোমরাও এবার সদাশয় কালুবাবুর বাড়ি গিয়ে ওঠ। সংসারে আমার কারো দরকার নেই।

বাবার ওপর এই প্রথম কেন জানি আমারও ভীষণ রাগ হল। সত্যি তো, আগে একরকমের দিন ছিল, কোথায় কে থাকছে, খুব একটা ভাববার ছিল না। বরং বাবা কোথাও গেলেই কিছু তখন হয়ে যেত। এখন কেন জানি মার এবং আমাদেরও সময় মতো বাবা না ফিরলে চিন্তা হয়। বাবা সেটা কেন যে বোঝে না। মানুষের বাড়িঘরও হবে, বাউণ্ডুলে স্বভাবও থাকবে সে হয় না। দুটো একসঙ্গে মানায় না। মা বোধহয় সে-জন্যই বাবার ওপর এবার হাড়ে হাড়ে ক্ষেপে গেছে।

মা বলল, তুমি বেলডাঙা স্টেশনে নেমে যেতে পারবে ?

—কোথায় যাব ?

—সদাশয় কালুবাবুর বাড়ি।

—কত দূ…র।

—স্টেশন থেকে সাত ক্রোশ দূর হয়ে গেল!

অগত্যা আর কি করা! বললাম, যাব।

—কালই সকালে রওনা হয়ে যাবে।

এ-সময়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। পিলুটা মার খেয়ে বাড়িঘরের কাছেপিঠে নেই। মায়া রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাইটা মায়ার কোলে। সবাইকে মা সকালে বাড়িছাড়া করেছে। কেবল আমি বাকি। এ-সময় কিছু বুঝিয়ে বলাও নিরর্থক। সব কিছুরই মা এখন অন্যরকম অর্থ দাঁড় করাবে। বললাম, ঠিক আছে, যাব।

তারপরই বাবাকে উপলক্ষ করে সেই গজগজ করা, ছেলেরা মানবে কেন! ছেলেরা ভাল হবে কোত্থেকে! সব একরকমের। আমি না হয় কেউ না। ছেলেদের কাছে পর্যন্ত কথা রাখলে না!

মার আঘাতটা কোথায় এতক্ষণে ধরা গেল। আর তখনই দেখি দূরে পিলু চিৎকার করছে, মা বাবা আসছে। মা বাবা একটা গরু নিয়ে আসছে।

মা রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে গেছে। আমিও। পিলু মাঠ পার হয়ে জোরে ছুটে আসছে। আর চিৎকার—বাবা গরু নিয়ে আসছে।

বাবা অথবা গরু কিছুই রাস্তা থেকে দেখা গেল না। পিলু খবরটা দিয়েই ফের উল্টো মুখে ছুটতে থাকল। মুহূর্তের মধ্যে পিলু মাঠঘাট পার হয়ে বাদশাহী সড়কে উঠে গেল। আশ্চর্য দ্রুতগামী পিলু। তাকে দৌড়ে নাগাল পাওয়া খুবই অসম্ভব। মুহূর্তের মধ্যে সে অন্তর্হিত হয়ে যেতে পারে, আবার দেখা দিতে পারে। আর এত বড় একটা খবর, একটা সত্যি সত্যি আস্ত গরু বাবা নিয়ে আসছে, সে স্থির থাকে কি করে! ডাকলাম, পিলু দাঁড়া।

আমার ডাকে সে সহসা ঝোপঝাড়ের ফাঁক থেকে উঁকি দিল। বলল, আয়। তারপরেই ডুব। রাস্তার দিকে না গিয়ে সে লেংড়ি বিবির হাতার দিকে ছুটছে। আবার ডাকলাম, দাঁড়া পিলু।

মা সেই বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। মায়া কিছুটা মাঠের মধ্যে আমি কালীর পুকুর পার হয়ে গেছি—পিলু আরও আগে। সে কোথায় বাবাকে দেখেছে, কতদূরে বোঝা যাচ্ছে না। না কি পিলুর সংশয় আছে, বাবা এই ফাঁকে না আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। বাবা যে একবারে [illegible]। আবার এত সকালে [illegible]

আলায় সে বাড়িছাড়া, সেই বাবাকে যখন কোথাও একটা আস্ত গরুর সঙ্গে আবিষ্কার করা গেছে তখন আর কিছুতেই ছাড়ছে না। সেই জন্যেই মনে হয় পিলু উর্দ্ধশ্বাসে ছুটছে। গরুটাকে নিয়ে সে তার বাবাসহ মায়ের কাছে ফিরবে।

—ওরে পিলু দাঁড়া।

আর দাঁড়া! সে একবার মুখ ফিরিয়ে বলল, আয় না। ছুটতে পারছিস না! সত্যি আমি আর ছুটতে পারছিলাম না। সড়কে এসে ভীষণ হাঁপিয়ে গেছি। দেখি, মায়া আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। বলছে, বাবা কোথায় রে দাদা?

—দেখছি না তো।

—গরুটা কোথায়?

—কিছুই দেখছি না।

—ছোড়দা কোন দিকে গেল?

—লেংড়ি বিবির হাতায় ঢুকে গেল।

আর তারপরই মূর্তিমান তিনজন, বাবা আগে, পিছনে গরুটা তার পিছনে মায়ার ছোড়দা। বাবা একবার ভেসে উঠছে, গরুটা একবার উঠছে, মায়ার ছোড়দা একবার ভেসে উঠছে মেস্তা ক্ষেতের মধ্যে, উঁচু নিচু বলে তিনজনেই আবার মেস্তা পাটের জমিতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আমরা খুবই অধীর। কতক্ষণে বাবা এবং গরুটা দূরে আবার ভেসে উঠবে। ভেসে উঠেই আবার ডুবে গেল। এবং এ-ভাবে আমার বাবা মায়ার ছোড়দা আর বাবার গরুটা মেস্তা ক্ষেতের মধ্যে এগিয়ে আসতে থাকল। পেছনে দিগন্ত, তার মধ্যে একটা প্রাণীর দুদিকে দুজন, এবং আমরা সড়কে ভাই বোন, অনেক পেছনে, বাড়ির রাস্তায় মা, আর ভাই,—বোঝাই যাচ্ছিল, বাড়িঘরে এটা কত বড় সুখবর। আমি যে আমি, যে একটু সব তাতেই ইয়ে ইয়ে ভাব সেও, শেষ পর্যন্ত খুশীতে মেস্তা ক্ষেতের মধ্যে ছুটে ঢুকে গেল। আর গরুটা নিয়ে যখন সে উঠে এল, তখন অবাক।

গরুটা কালো রঙের। শিং ভীষণ লম্বা। শিরদাঁড়া হাড়গোড় বের করা, এ পর্যন্ত সহ্য করা যায়। গরুটা খোঁড়া। চারটে পায়ের মধ্যে একটা নড়বড়ে। পাটা মাটিতে পড়ে না। ঘুরে ঘুরে নড়ে চড়ে বেড়ায়। কিন্তু রাস্তায় বাবাকে ঘাবড়ে দিতে মন চাইল না। কেবল পিলু একবার কি ভেবে বলল, বাবা গরুটার একটা পা ঠিক নেই, না বাবা?

পিলু খোঁড়া শব্দটি উচ্চারণ [illegible] না। যাতে বাবা মনে আঘাত না পান, সেজন্য সে পা ঠিক নেই বলল। [illegible] চেহারা, হাঁটু অবধি কাদা উঠে গেছে, সারা রাস্তা হেঁটে এসে বাবা [illegible] দেখে খুবই গম্ভীর—বাবা এমনটা [illegible]

থাকেন না, বোঝাই যাচ্ছিল, সারা রাস্তায় বাবা গরুটাকে নিয়ে বেশ ধকল সয়ে তবে পুত্র কন্যাদের জন্য দুধের বন্দোবস্ত করতে সক্ষম হয়েছেন।

পিলু শুধু বললেন, বাবা আমাকে দড়িটা দাও।

বাবা বলল, না পারবি না।

—পালাতে পারবে না, দাও না।

বাবা বলল, তুই ধরলেই শুয়ে পড়বে। ওঠানো যাবে না।

আমরা লক্ষ্য করলাম, বাবা গরুটার গলার কাছে বেশ টান রেখেছেন। গরুটাকে বাবা টেনে টেনে নিয়ে আসছেন, আর কি যেন ভয়ে ভয়ে আছেন। বাড়ির কাছে এসে নেতিয়ে পড়লে, শুয়ে পড়লে কেলেঙ্কারির এক শেষ। এত টেনে টেনে বাবা কতক্ষণে নিয়ে যাবে, পিলুর তর সইল না। মা কতক্ষণ ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, ভাইটা—সে লেজটা মুচড়ে দিল একটু তাড়াতাড়ি হাঁটবে বলে। সেই যেমনকে তেমন, পাটা ঘুরে ফিরে পড়ছে, এক পা এগুলে দু পা পিছিয়ে যায় মনে হচ্ছে। ততক্ষণে পিলু বুঝতে পারল, এমন একটা গরু নিয়ে তাদের বাবার পক্ষেই সম্ভব এতটা পথ হেঁটে আসা। কিন্তু এখন পিলু এবং আমাকে যে ভয়টা সব চেয়ে বেশি কাবু করছিল, সেটা আমাদের মা। আজ বাবার না জানি কি হবে!

বাবা আমাদের সাহস দেবার মতো করে বললেন, অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে তো, একটু নেতিয়ে পড়েছে। লেজ মুচড়ে কিছু হবে না।

বাবা এবং গরুর দুরবস্থা দেখে পিলু খুবই সংকটে পড়ে গেল। বলল, জল আনব বাবা, গরুটার জলতেষ্টা পেয়েছে! বলেই সে ছুট লাগালে বাবা বিষম খেলেন। ডাকলেন আর তো দূর নেই। জলটল বাড়ি গিয়ে দেখানো যাবে। টানাটানিতে গরুর ছাল চামড়া উঠে আসতে পারে ভেবে বাবা বললেন, বিলু ধর তো। দড়িটা টান করে ধর। যতটা সম্ভব টেনে ধরতে গেলে বললেন, আহা লাগবে। ফাঁস লেগে যাবে। অত জোরে নয়। বলে পেছন থেকে বাবা যতটা জোরে পারলেন ঠেলে ঠেলে নিয়ে আসতে থাকলেন।

সুতরাং বাবা পেছনে, আমি আগে। পিলু কি করবে বুঝতে পারছে না। সে একবার ছুটে বাড়িতে চলে গেল, এক বালতি জল নিয়ে আসতে দেখে বাবা কেমন ক্ষেপে গেলেন। বললেন জলটা গরুকে না দেখিয়ে আমাকে খাওয়াও, কাজে লাগবে। পিলুর এই আচরণ বাবার পছন্দ না বোঝা গেল। সে বলল, কোথা থেকে আনলে বাবা?

বাবার তখন কাছা কাপড় সব খুলে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে বললেন, গরুর মতো গরু। কত দুধ দেবে দেখ।

পিলু বলল, ল্যাংড়া গরু বেশি দুধ দেয় বুঝি বাবা ?

বাবা কপালে দুর্গতি আছে অনেক ভেবে বললেন, তা দেয়। তোমাদের জননী কি বলে ?

—কিছু বলেনি।

—খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো করেছে তো ?

—তুমি কাল আসবে বলে গেলে, কৈ এলে না তো।

—কপালে এমন একটা গরু জুটবে কে জানত। বাবা কথা বলছিলেন আর গরুটাকে হেঁইয় মার মার টান বলে ঠেলছিলেন। পিলু মাঝে মাঝে বাবাকে সাহায্য করছে। সেও শীর্ণকায় গরুটাকে যতটা সম্ভব বাবার সঙ্গে ঠেলতে ঠেলতে মার এজলাসে হাজির করতে চাইল।

গরুটাকে নিয়ে বাড়ির রাস্তায় উঠতেই মা সহসা হাউমাউ করে উঠল, ওমা একি গো, হাড়মাস বের করা গরু, একটা ল্যাংড়া গরু।

বাবা এ-সব সময়ে খুবই রাশভারি হয়ে যান। মার কাছে এসে বাবা আরও গম্ভীর। এতটা পথ হেঁটে জ্যান্ত একটা গরু নিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছানো গেল সে-জন্য এদের যদি এতটুকু কৃতজ্ঞতা বোধ থাকে। বাবা ভীষণ ঘর্মাক্ত কলেবরে গরুটাকে উঠোনে দাঁড় করিয়ে বারান্দায় সোজা বসে পড়লেন। তারপর ক্লিষ্ট গলায় বললেন, জল।

বাবার কাছে যেতে কেউ আমরা সাহস পাচ্ছিলাম না। বাবা কখনও বিষয়ী মানুষ হয়ে গেলে ভয় পেতাম। যেন আঙুল উঁচিয়ে বলা, বসে নেই। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এত করছি তবু সুখ পাই না। তিনি সে-সবের কিছু বললেন না। মাও বুঝতে পারছিল না, সেবাশুশ্রূষা কার আগে দরকার। বাবার না গরুটার। মায়া ইতিমধ্যে ছুটে এক গ্লাস জল এনে দিলে সবটা বাবা এক নিশ্বাসে খেয়ে ফেললেন। মা তাড়াতাড়ি তালপাতার পাখা এনে বাবাকে বাতাস করতে লাগল। আমরা উঠোনে গরুটার সঙ্গে ঠায় দাঁড়িয়ে। পিলু ফাঁক বুঝে গরুটার তেজ দেখার জন্য বাঁটে হাত দিলে বাবা তেড়ে উঠলেন, লাথি-কাতি খেয়ে মরবে দেখছি সব।

গরু পা তোলা তো দূরে থাক, এতটুকু নড়ল না পর্যন্ত। পিলু বলল, ভারি ঠাণ্ডা গরু বাবা।

আমার মনে হল ঠাণ্ডা গরু না বলে সভ্রান্ত গরু বলা ভাল। বাবা হয়ত এখন তাই বলতেন। কিন্তু মা কেমন বিমূঢ়ের মতো বলল, হ্যাগা দেখছ গরুটা তো নড়ছে-টড়ছে না।

—নড়বে নড়বে। অত তপ্ত খোলা হলে হয়! কতটা পথ হেঁটে এসেছে।

—তাই বলে গরুর লেজ নাড়া বন্ধ থাকে কখনও!

—সবই নাড়বে। সময় দিতে হয়। এই বিলু, বাবা গরুটাকে একটু জল দেখা তো।

এতটা পথ হেঁটে এসে সত্যি গরুটা জীবিত না মৃত বাবারও বোধহয় সংশয় দেখা দিল। বাজপড়া প্রাণীর মতো উঠোনে দাঁড়িয়ে। যার ভয়ে কিছুতেই বুঝি সত্যি কথাটা বলতে পারছেন না। জল দিলে বোঝা যাবে। এক বালতি জলও গরুটার সামনে রাখা গেল। তবু সে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। পিলু ছুটে গিয়ে আহ্লাদে এক আঁটি ঘাসও তুলে এনেছে। তাও দৃকপাত নেই।

মা বলল, ওমা কি গরু গো, ঘাস খায় না, জল খায় না। নড়ে না চড়ে না।

বাবা প্রায় উঠে বসলেন এবার।—আরে খাবে খাবে। ঠাণ্ডা হয়ে নিক খাবে।

—আর খেয়েছে। মা বোধহয় দু হাত ছুঁড়েটুড়ে বাবার কাণ্ড দেখে কাঁদতে বসে যাবে এবার।

বাবা তেমনি আমাদের সবাইকে সাহস দিয়ে যাচ্ছেন।—ভাল গরু। জাত ভাল। দুধ দেবে। গেরস্থ বাড়িতে গরু না থাকলে মা লক্ষ্মী থাকেন না। কতটা পথ হেঁটে এসেছে। গরু বলে কি আরাম বিরাম থাকতে নেই।

মানুষটাও অনেকটা পথ হেঁটে এসেছে। সঙ্গে গরুটা। হাঁটু অবধি কাদা। চোখমুখ কোথায় ঢুকে গেছে। সারারাত গরুটাকে নিয়ে রাস্তায় হাঁটাহাঁটির চিহ্ন। দু দিন আগে বের হয়ে গিয়েছিলেন। ফিরছেন আজ। চণ্ডীপাঠের নাম করে শেষপর্যন্ত সোজা একটা ভাগাড়ের গরু নিয়ে হাজির। কার এত কৃপা হল মানুষ-টার ওপর! মা বাবাকে দেখতে দেখতে বোধহয় এ-সবই ভাবছিলেন। রাগে দুঃখে চোখ ফেটে বোধহয় এবারে জল বের হয়ে আসবে মা'র।

মার চেহারা দেখে বাবা ঘাবড়ে গিয়ে পায়ের ওপর পা রেখে নাচাতে থাকলেন। খুবই তেজী অহংকারী মানুষ। ভেঙে পড়লেই গেছে। সংসারে আগুন জ্বলে উঠবে। বলছিলেন, হবে হবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। গরুটা দুধ দিতে থাকলেই তোমার আর দুঃখ থাকবে না ধনবৌ!

এবং এবারে দেখা গেল গরুটা সত্যি লেজ নাড়াচ্ছে। বাবা লাফিয়ে উঠলেন। ওগো ভাখো লেজ নাড়াচ্ছে। বাবার বুকে যেন দুগুণ বল এসে গেল।—বললাম, গরু লেজ নাড়াবে না সে হয়। দে রে জল দে।

জলের বালতিটা আবার মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। গরুটা নাক টানল দুবার। মুখ খানিকটা জলে ডুবিয়ে ফের তুলে নিল। খেল না।

বাবা বললেন, ক্যান আছে ধনবৌ, থাকলে দাও না। একটু নুন মিশিয়ে দাও। মা ক্যান এনে নুন মিশিয়ে দিল। না, খাচ্ছে না। পশু হলেও গরু, একটু আদর যত্ন চায়। মা গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে বুঝল, রুক্ষ কাঠ, কঙ্কাল বাদে গরুটার আর কোনো সম্বল নেই। মা অগত্যা বলল, খাবে কি? শরীরে কিছু নেই।

—বাঁধা খাওয়া সইবে কেন? ছেড়ে খাওয়ালে দেখবে দু দিনে ঠিক হয়ে যাবে।

মা এতক্ষণ যা বলতে চেয়েছিল, এবারে তা বলে ফেলল, কে দিল গরুটা? বের হলে তো চণ্ডীপাঠের নাম করে। আর নিয়ে এলে একটা মরা গরু। কার এমন কৃপা হল কর্তার ওপর। আর লোক পেল না! ভয়ে বাবা মার দিকে না তাকিয়েই বললেন, কালুবাবুই দিল। সবৎসা গাভীর কথা পাড়তেই ওনার দয়া হল। বলল, গোয়াল থেকে রাইমণিকে নিয়ে যান। ভাল জাতের গরু। বয়স হয়েছে। তবে কার বয়স না হয় বলুন!

বাবা দেখছি আসলে গরু নিয়ে আসেনি, নিয়ে এসেছেন রাইমণিকে।

মা কেমন স্বগতোক্তি করল—কি যে তার এত দায় ছিল, এমন অবলা জীবকে এমন একজন অবলা মানুষের জিম্মায় তুলে দেওয়া।

আমরা যে ঝড়ের আশঙ্কা করেছিলাম, দেখলাম সেটা কেটে গেছে। মা গরুটার জন্য দুর্বো তুলতেও বলল মায়াকে। বুড়ো হোক, গায়ে কিছু না থাক, সাক্ষাৎ ভগবতী। রাইমণির জন্য বাবা আমাদের নিয়ে একটা নতুন দড়িও পাকালেন। খালের জলে ঘষে ঘষে স্নান করানো হল সাক্ষাৎ ভগবতীকে। বেশি জোরে ঘষা গেল না, ঘষতে গেলেই রাইমণির ছাল চামড়া উঠে যাচ্ছে। স্নান-টান সেরে রাইমণি ঘাস এবং জল দুই খেয়ে ফেলল।

রাইমণিকে বাবা আমি এবং পিলু মিলে যখন ঠেলাঠেলি করে জল থেকে তুলে আনছিলাম, শেষবারের মতো মা বলেছিল, গরুটাকে দিয়ে কালুবাবু ভাল করেনি। ভোগাবে। বাবা তখন কেমন শোকসন্তপ্ত গলায় বললেন, দানের গরু আর কত ভাল হবে ধনবৌ? সংসারে এত করেও কিছু করা গেল না। তোমাকে সুখী করতে পারলাম না। খুব ভালমানুষের মতো বাবা রাইমণিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে ভারি দুঃখী মানুষ কিছুতেই কাউকে টের পেতে দিচ্ছেন না। তখন বাবার জন্য আমার কেন জানি চোখে জল আসছিল। বললাম, রাইমণি কি সুন্দর দেখতে, না?

বাবা আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, সত্যি বলছিস?

—হ্যাঁ বাবা। রাইমণি সত্যি ভাল। নিরীহ।

বাবা বললেন, এখন কত কাজ। দাঁড়িয়ে থাকিস না। রাইমণির একটা ঘর

করতে হবে। তুলেকে ডেকে আনতে হবে। তুলে এলে সবাই মিলে সাঁজ লাগতে না লাগতেই রাইমণির পাতার ঘর বানিয়ে ফেললাম। বাঁশের বন থেকে বাঁশ এল। কাশের বন থেকে কাশ। পাটের দড়িতে বাতা বেঁধে দিলাম। বাবলা গাছের খুঁটিতে রাইমণিকে বেঁধে বাবা বাড়ির কোণায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কি দেখছেন। সাঁজ লেগে গেছে। সারাটা দিন বাবা একদণ্ড বসে নেই। এখনও এই সন্ধ্যার অন্ধকারে দাঁড়িয়ে এত কি দেখছেন।

ডাকলাম, বাবা।

অন্ধকারে সংবিৎ ফিরে পাবার মতো বললেন, বিলু।

—হ্যাঁ বাবা।

—এদিকে আয়।

কাছে গেলাম বাবার।

—ছাখ তো।

ঠিক কিছু বুঝতে না পেরে বললাম, কি দেখব বাবা?

—বাড়িটা ছাখ। ঠিক এতদিনে এটা মানুষের ঘরবাড়ি মনে হচ্ছে না? থাকার ঘর, খাবার ঘর, ঠাকুরঘর, গোয়ালঘর—সব মিলে মানুষের ঘরবাড়ি।

আমি বললাম, হ্যাঁ, সত্যি মানুষের ঘরবাড়ি।

—তোর মা বোঝে না। রাইমণিকে এনে ভাল করিনি?

—খুব ভাল হয়েছে।

—রাইমণি না থাকলে বাড়িটা ঠিক বাড়ি মনে হত না। দুধ না দেয় গোবরটা তো পাওয়া যাবে। বামুনের বাড়ি গোবর ছাড়া চলে!

—দুধও দেবে বাবা।

বাবাকে আর কি বলে সুখী করব বুঝতে পারলাম না। অন্ধকারে পিতাপুত্র আমাদের এতদিনের গড়ে ওঠা আবাস দেখছিলাম। সত্যি ধীরে ধীরে রাইমণির প্রতি ঠিক অন্য সবের মতো আমারও মায়া পড়ে যাচ্ছে। রাইমণি অন্ধকারে ঘাস চিবুচ্ছিল—তার শব্দ, এবং দূরে ব্যারেক বাড়িতে বিউগিল বাজছে। গাছপালার ভেতর মানুষের ছোট্ট একটা ঘরবাড়ি ক্রমে গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছিল। জোনাকির আলোতে বাবার মুখে অস্পষ্ট সুখের আভাস। গাছপালা ঘরবাড়িটাতে সতর্ক প্রহরীর মতো বড় হয়ে উঠেছে।

বাবা বাড়ির দিকে একসময় যেতে যেতে শুধু বললেন, বেঁচে থাকার জন্য মানুষের আর কি লাগে।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

খোঁড়া গরুটাকে নিয়ে আসার পর বাবার ঘরবাড়ি ষোলকলা ঠিক হয়ে গেল। কারণ অভাব বলতে তাঁর তখন সন্তান-সন্ততিদের পাতে একটু দুধ দেওয়াই ছিল প্রাণাধিক ইচ্ছা। ইচ্ছা-পূরণে বাবা আমার ক'দিন থেকে ভারি মেজাজী মানুষ। তারপর এল বাবার জীবনে আরও বড় সুখবর—তাঁর প্রথম সন্তান বিলু সব বিষয়ে পাস। বিলু অর্থাৎ এই অধম জীবনে ন'টা বিষয়ে পাস করে বসে আছে—বাবা আমার তাতেই খুশি ছিলেন। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করে! বাকি একটা বিষয়ে পাসের খবর আসায় বাবা আমার একবারে হতভম্ব।

তাঁর ছেলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে। এটাই ছিল বড় খবর। তল্লাটের কাউকে বাদ রাখেন নি খবরটা দিতে। চেনাজানা কাউকে দেখলেই বলতেন, বিলুটা তো এবার প্রবেশিকা পরীক্ষা দিচ্ছে। সেই ছেলে, পরীক্ষার ফল বের হলে, ন' বিষয়ে পাস। আমি দমে গেলেও বাবা দমে যাবার পাত্র নন। বাবা গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, কটা বিষয়ে পরীক্ষা? আমতা আমতা করে বলেছিলাম, দশটা বিষয়ে বাবা বাবা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, যেন বড়ই আহাম্মক আমি দশটা বিষয়ের মধ্যে নটা বিষয়ে পাস—কম বড় কথা! জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করেছে? দেখাও কে জীবনে সব বিষয়ে পাস! এর পরে আমি বাবাকে সত্যি আর কিছু বলতে পারিনি।

বাবা আমার দেশে থাকতে জমিদারী সেরেস্তায় আদায়পত্র করতেন। আর ছিল যজন-যাজন। পৈতৃক সম্পত্তি মন্দ ছিল না। ভালভাবে চলে যেত। বাবার জীবনে পরীক্ষায় পাস করার কোন দায় ছিল না, এ দেশে এসে অথৈ জলে পড়ে গেলেও খুব একটা ঘাবড়ে যান নি। আমার সব বিষয়ে পাস করার কথা শুনে কেমন হয়ে গেলেন! ঠাকুরঘরে ঢোকার আগে ডেকে বললেন, সত্যি তুমি সব বিষয়ে পাস করেছ?

বললাম, হ্যাঁ বাবা।

মা রান্নাঘর থেকে বললেন, ওটা কি আবার হাতি-ঘোড়া নাকি, পাস করতে পারবে না।

—না, বলছিলাম, সব বিষয়ে পাস ভাবা যায় না।

আসলে আমাদের পরিবারে জীবনে কেউ কোন বড় পাস দেয় নি। আমিই প্রথম, এবং এতে বাবা খুব অহংকারী ছিলেন—বাবার কাছে পাস করাটা কোন কৃতিত্বের বিষয় নয়, এমনই জানতাম। কিন্তু আজ দেখছি অন্যরকম। পিলু তখন তাড়া লাগাচ্ছিল, চল না দাদা? ঠাকুরঘর থেকে বাবার গম্ভীর গলা, না, দাদা যাবে না। বিলু তুমি চান করে এস। আমার পাশে বসে থাক। ঠাকুর সুপ্রসন্ন না হলে মানুষ কখনও এত বড় কাজ করতে পারে না।

আমরা বাবাকে ভয় করি কি সমীহ করি, ঠিক বুঝি না। এই ভয় কিংবা সমীহ সবটাই নির্ভর করত মার উপর। তিনি বাবার উপর প্রীত থাকলে বুঝতে পারতাম, পিতৃদেবের উপর কোন কথা নেই। প্রীত না থাকলে বুঝতাম, নির্দেশ অমান্য করাই বিধেয়। কিন্তু বাবা দীর্ঘ তিন চার মাস বাড়ি ছাড়া হন নি বলে, মার এখন বাবা ছাড়া কথা নেই। আমরা মায়ের সন্তান। বাবা সংসারী মানুষ হয়ে গেছেন প্রমাণ করার জন্য শেষ পর্যন্ত একটা দানের গরু পর্যন্ত সংগ্রহ করে এনেছিলেন। এ-হেন সময়ে পিলুর সঙ্গে বন-বাদড়ে ঢুকে যাব না বাবার ঠাকুর ঘরে বসে স্তোত্র পাঠ শুনব, বুঝতে পারছিলাম না।

পিলু অবশ্য বাবার কথা খুব গ্রাহ্য করে না। মার কথাও না। তার উপর দাদা প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করে যাওয়ায় কিছুটা দিগবিজয়ী আলেকজাণ্ডার সে আজ। বাতা কেটে তরবারি বানিয়ে ইতিমধ্যেই কোমরে গুঁজে ফেলেছে। মাথায় পাতার টুপি পরে পড়শীদের বাড়ি বাড়ি খবর দিয়ে এসেছে দাদা পাস করেছে। কারণ এত বড় খবরটা পৃথিবীর কেউ জানবে না, সে হয় না। বাকি আছে, নবমী বুড়ী, সে থাকে ইটের ভাটা পার হয়ে, কারবালার রাস্তার ধারে। এখনও সে দিকটায় মানুষের বসতি হয়নি। কবরভূমি বলেই হয়ত মানুষের ভয়। দলে দলে যে সব ছিন্নমূল মানুষ আসছে তারা তো খালি জায়গা দেখলেই বাঁশ পুতে খুপরি বানিয়ে আস্তানা গেড়ে নিচ্ছে। বাবাও নিজের ঘরবাড়ির জন্য হন্যে হয়ে কত জায়গায় না তাদের নিয়ে ঘুরেছেন। শেষ পর্যন্ত সুমার বনটায় বাবা তাঁর ঘরবাড়ি বানাতেই এসে গেল নিবারণ দাস, মাখন মাল, ধীরেনের মা গোপাল-নেপালের বাবা। এবং কেবল আসছেই। কে বলবে এখানে একটা বড় গভীর বন ছিল দু'বছর আগে? ওদিকে রাজবাড়ি, সামনে বাদশাহী সড়ক, মাইলখানেক দূরে রেল-লাইন, আর এদিকটায় কারবালা। রেল-লাইন পার হয়ে গেলে শহরের ঘরবাড়ি চোখে পড়ে। আগে অনেকটা হেঁটে গেলে শহরের ঘরবাড়ি দেখা যেত, এখন রেল-লাইন পর্যন্ত এসে যাওয়ায় বাবা আরও স্থিতিশীল মানুষ হয়ে গেছেন। কারণ জমির দাম যে ভাবে বাড়ছে তাতে কবে না হাজার

টাকা বিষে হয়ে যায়—আজকাল এমন স্বপ্ন বাবা প্রায়ই দেখতে পেতেন বলে বোধহয় এখন আর ঘরবাড়ি ছেড়ে ডুব দিচ্ছেন না কোথাও।

এ-সব মুহূর্তে পিলুই আমার ত্রাণকর্তা। সে হাত ধরে টানতে থাকল, চল না দাদা! ও দাদা, যাবি না?

বাবা পাটায় চন্দন ঘষছিলেন, হাত থামিয়ে বললেন, কোথায় যাবে শুনি? তুমি ওকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও? সে তো তোমার মতো বাউণ্ডুলে নয়।

পিলু বলল, আমার কী দোষ?

বাবা এ সময় প্রশ্ন করতে পারতেন, তবে কার? কিন্তু তিনি জানেন, উত্তরটা সুখের হবে না। পিলুর যা একখানা স্বভাব, বলেই না ফেলে, তোমার। বাবার বাউণ্ডুলে স্বভাবের জন্য মা আমাদের গালাগাল দিয়ে বলতেন, যেমন বাপ, তেমনি ছেলে। সেই থেকে পিলু জেনে ফেলেছে, আসল দুরাত্মা সংসারে বাবা। বাবার স্বভাব সে পেয়েছে, এটা তার কাছে বড়ই অহংকারের বিষয়। চন্দন ঘষতে গিয়ে বাবা টের পেয়েছেন, দ্বিতীয় পুত্রটির মাথা তার মা চিবিয়ে খেয়েছেন। সুতরাং কিছুটা ইতস্তত করে বললেন, তোমার মাকে জিজ্ঞেস কর।

কি জিজ্ঞেস করবে পিলু বোধহয় বুঝতে পারেনি। বাবার বাউণ্ডুলে স্বভাব সম্পর্কে সত্যাসত্য যাচাই করবে, না সে এ সময় কোথাও দাদাকে নিয়ে যেতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করবে মাকে—কোনটা? সে মাকে ডেকে বলল, মা, বাবা আমাকে বাউণ্ডুলে বলছে। দাদাকে নিয়ে যাব?

মা রান্নাঘর থেকে আঁচলে হাত মুছে বের হয়ে আসছে। বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল মাকে। লাল পেড়ে শাড়ি পরনে, শরীরে মা মা গন্ধ। আমি বললাম, পিলু বলছে নবমী বুড়ীর কাছে আমাকে নিয়ে যাবে।

—তা যা না, ধরে রেখেছে কে?

—এই তো ধনবৌ, সংসারের ভাল-মন্দটা তুমি বোঝ না! যার কৃপায় সব হয়, এই যেমন ধর ঘরবাড়ি, গাছপালা, দুধালো গাই, তার কাছে না বসে তুমি বিলুকে নবমীর কাছে পাঠাচ্ছ। বাবা যে বিষয়ী মানুষ সেটা প্রমাণ করার জন্য বললেন, রোদে ঘুরে জরজ্বালা হলে ওকে মানুর কাছে নিয়ে যাব কী করে? একটা কাজ-টাজ হয়ে গেলে, তোমার হাতে দুটো পয়সা বেশি পড়বে।

মা বললে, দুধালো গাই!

বাবা মার কথায় ভড়কে গেলেন।

দুধালো গাই বলার অর্থ গরুটার পর সংসারে আর একজন আমি, যাকে নিয়ে সাশ্রয়ের স্বপ্ন দেখছেন বাবা।

দানের গরুটি যে অস্থিচর্মসার এবং বুড়ো তা ছাড়া তিন পা অবলম্বন করে যার বেঁচে থাকা সে সংসারে উৎপাত ছাড়া আর কি। তবু বাবা পুজো আর্চার নাম করে বের হয়ে পড়ছেন না, এবং খোঁজখবর না দিয়ে দেশের মানুষের খোঁজে ঘুরে বেড়ানোর বাতিক কমে গেছে বলে গরুটির প্রতি সদয়ই ছিলেন মা। দুধালো গাই বলাটা বাড়াবাড়ি। দুধ না হয়, গোবরটুকু তো হয়, এই আপ্তবাক্য সার করে মা মুখ বুজে সব সয়ে গেছেন। তা ছাড়া দানের গরু আর কতটা ভাল হতে পারে, এমনও একটা সংশয় তিন মাস ধরে মার মধ্যে কাজ করছিল। তার সেবাযত্ন একটু অধিক মাত্রাতেই চলছে। পিলু কচি ঘাসের খোঁজে একটু বেলা বাড়লেই বের হয়ে যায়। মা জল গরম করে ভাতের মাড় সহ কিছু খোল মিশিয়ে দেয়। সন্ধ্যায় পিতা, পুত্র এবং জননী মিলে সাধ্য-সাধনা চলে—যদি শরীরে ভগবতীর মাংস লাগে। কিন্তু তিনি যেমন ছিলেন, তার বেশি এক পা নড়ছেন না। এই নিয়ে মহাভারত পাঠ যে কোন সময় শুরু হয়ে যেতে পারে। প্রতিদিনই আমরা এমন একটা প্রবল আশঙ্কায় ভুগছিলাম—এখন পর্যন্ত পাঠ শুরু হয়নি। মা বরং আজকাল সাংসারিক বিরোধে বাবার পক্ষই নিয়ে থাকেন। মা বাবার পক্ষ নিলে আমার পিলুর সংসারে গুরুত্ব কমে যায়, বিশেষ করে পিলুর স্বাধীনতা খর্ব হয়। বাবার সংসারী মানুষ হয়ে যাওয়াটা পিলুর পক্ষে খুবই বিপজ্জনক।

মা শুনে বললেন, তাই তো। এই দুপুরে বাবার কী হল?

পিলুর প্যাণ্ট কোমরে থাকে না। হড়হড় করে নেমে যায়। নাকে সর্দি স্থায়ী বন্দোবস্ত করে নিয়েছে। যতবার প্যাণ্ট নেমে যায় ততবার তাকে ওটা তুলে পরতে হয়, নাক মুছতে হয় বারবার। এজন্য সে কিছুটা সময় নিয়ে বলল, মা, তুমি বুঝছ না দাদা পাস করেছে খবরটা না দিলে নবমী বুড়ী খারাপ যাবে। ওকে ভাল খবর দেবার তো কেউ নেই।

এমন কথায় বাবা ভিতরে কেমন চমকে উঠলেন। দ্বিতীয় পুত্রটির কথাবার্তাই এই রকমের। নবমীর কেউ নেই, বাড়ির ভালমন্দ হলো কলাপাতায় বনজঙ্গল ঠেঙিয়ে দিয়ে আসার মধ্যে পিলুর কী যেন এক আলাদা জগৎ আছে। যা তিনি ঠাকুরঘরে বসে টের পাবার চেষ্টা করেন, পিলু সেটা টের পায় বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে। তিনি বললেন, যাও, তবে ওখানে আটকে থেকো না।

সঙ্গে সঙ্গে মাও বললেন, হ্যাঁ, যাও—তবে ওখানে আটকে থেকো না।

এত সহজে ছাড়পত্র মিলে যাবে, অনুমান করতে পারি নি। মনে হল বাবা-মা আমাদের কত ভাল। আমরা হাঁটতে থাকলাম। বাড়িটা আম জাম কাঁঠালের চারাগাছে ভর্তি। বাবার সংসারে এখন একটাই কাজ, গাছপালা পুঁতে যাওয়া।

কত যে গাছের খবর নিয়ে আসছেন। আমলকী গাছটা ঘরবাড়ির উপর দু'-বছরেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আশ্রমের মতো বাড়িটার জন্য দিন দিন মায়া বেড়ে যায়। হাঁটতে হাঁটতে সব কেমন টের পাচ্ছিলাম। আমরা, বাবার ঘরবাড়ির সব। আমরা না থাকলে বাবার কিছু থাকে না। বাবা না থাকলে আমাদের কিছু থাকে না।

শরৎকাল বলে সূর্যের তাত কম। চারপাশে সবুজের সমারোহ। যেতে যেতে বন-জঙ্গলের সুঘ্রাণ পাচ্ছিলাম। তখনই কেউ যেন ডাকল, দাদা, দাঁড়া, আমি যাব। দেখি পেছনে মাঠের ভেতর দিয়ে দৌড়ে আসছে মায়া। পিলু মায়াকে দেখে ভারি গম্ভীর হয়ে গেল।

বন-জঙ্গলের ভেতর তার দুই দাদা যাচ্ছে, সে বাড়িতে একা থাকে কি করে! আর সঙ্গে আসছে হেমন্তের কুকুর। সংসারে সেও আমাদের একজন। মায়া, হেমন্তের কুকুর, আমি, পিলু এই মিলে যাত্রা, মন্দ না। কিন্তু পিলু মায়ার ছোড়দা। শাসন করার সুবর্ণ সুযোগ—সে বলল, বাড়ি যা বলছি। মার কত কাজ।

মায়া বলল, না, আমি যাব।

—যাবে না! পিলু ধমক লাগাল।

মায়া আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দাদার সঙ্গে যাব। তোর সঙ্গে যাচ্ছি না।

পিলু ক্ষেপে গেল—যা, যা না। দাঁড়ালি কেন? আমি যাচ্ছি না।

পিলুকে অগত্যা বললাম, আসুক না। নবমী আমাদের সবাইকে দেখলে খুশি হবে। এমন কথায় পিলুর মনটা নরম হয়ে গেল। বলল, দাদা, তুই চাকরি করলে, নবমীকে বাড়িতে নিয়ে আসব, কেমন।

পিলুর এই স্বভাব। আমাদের ভারি অভাব-অনটনের সংসার। সম্বল বলতে ক' বিঘা উড়াট জমি, কিছু শিষ্য আর বাবার বাড়ি বাড়ি পূজা-আর্চা। পিলুর বড়ই অভিযোগ, এ-দেশে এসে আমরা কত গরিব হয়ে গেলাম। অভিযোগটা আমারও। আমাদের বাবা এ-দেশে এসে বড় গরিব হয়ে গেলেন, এ-কথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারছি না।

তবু একটা আশ্রয় মানুষের জন্য কত দরকার, আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে গেলে টের পেলাম। আমরা যে অন্য একটা পৃথিবীতে এসে উঠেছি, এখন আর মনেই হয় না। উঁচু নীচু মাঠ, কাঁটা গাছ, কোথাও ঢিবি, কোথাও অজানা ফুলের গন্ধ, পাখির ডাক, নীল আকাশ মিলে আমাদের যেন সেই পুরনো অস্তিত্ব। কোথাও একটা খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে, যেন কতকালের চেনা। কোথাও বাবলার বন, তারপর সেই প্রাচীন ইটের ভাটা। অনেকটা জায়গা জুড়ে। বড় মজা

দীঘি, শান বাঁধানো পরিত্যক্ত ঘাটলা, পাড়ে পাড়ে অজস্র দেবদারু গাছ। জনহীন গভীর নির্জনতা তখন আমাকে গ্রাস করে! দূরের স্বপ্ন দেখতে পাই। কেউ যেন আমার সামনে ফুলের টব হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সে কে, এখনও বুঝতে পারি না। মা-বাবা ভাই-বোন ছাড়া আরও কেউ পাশাপাশি পথ হাঁটছে, শুধু এইটুকু টের পাই।

পিলু, মায়া, অজস্র কথা বলছিল।

পিলু বলছিল, দাদা, তুই চাকরি করলে, একদিন পেট ভরে রসগোল্লা খাব।

মায়া বলল, দাদা কলেজে পড়বে। কি মজা!

পিলু বলল, বাবা যে বলল, মানুকাকাকে চাকরির কথা বলে এয়েছে।

সংসারে বাবার দু'জন মানুষ সম্বল। দেশে থাকতে বাবার জমিদার দীনেশবাবু। আর এখানে এসে মানুকাকা। তিনি যা বলবেন তাই হবে।

পিলুই বলল, মানুকাকা বলেছে, পড়িয়ে আর কি হবে! একটা কাজেটাজে ঢুকে যাক।

কবে বলেছে? মজা দীঘির ধারে কেমন একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়লাম। গাছপালা, নীল আকাশ নির্জনতা ভেঙে কেমন খানখান হয়ে গেল। চিৎকার করে ফের বললাম, কবে বলেছে? বল কবে বলেছে! আমার স্বভাব নয় জোরে কথা বলা। কেন যে এত রেগে গেলাম! কার উপর রাগ, তাও বুঝতে পারছি না। বাবার উপর, না মানুকাকার উপর। না দেশ ভাগ—কারণ দেশ ভাগ না হলে আমরা এত গরিব হয়ে যেতাম না। পিলু দাদার চণ্ডমূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল। তার দাদাটি বড় শান্ত স্বভাবের। মায়া বলল, দাদা, তুই কলেজে পড়বি। কারো কথা শুনাব না।

নবমীকে খবর দেবার আমার আর কোন ভরসা থাকল না। আসলে যে ফুলের টব হাতে নিয়ে আমার সামনে মাঝে মাঝে এসে দাঁড়ায়, কেমন ভ্রূ কুঁচকে বলল, ও মা, তুমি আর পড়বে না! তালে তুমি মানুষ হবে কী করে? বড় হবে কী করে?

বড় হওয়াটা যে আমার খুবই দরকার। পিলুকে বললাম, আমি যাব নারে। তোরা যা!

তবু পিলু ছাড়ল না। বন-জঙ্গলের মধ্যে নবমী থাকে। ট্যানাকানি পরে। না থাকলে পরে না। শণের মতো চুল, শীর্ণ হাত-পা—কোন্ আদ্যিকাল থেকে যেন সে এই বনটা পাহারা দিয়ে যাচ্ছে। একমাত্র তার পিলু সেখানে ঢুকতে ভয় পায় না। আমরা আগে ডাইনী বুড়ী ভেবে ভয়ে ওদিকটায় যেতামই না। ছোট্ট

খুপরি ঘর, একটা ছাগল, আর বনের ফল-পাকুড় তার সম্বল। এখানে আসার পর পিলুর সাম্রাজ্যের মধ্যে নবমী বুড়ীও পড়ে গেছে। বাড়িতে ভালমন্দ হলে আগে নবমীর জন্য চুরি করত, এখন করে না। বাবার ছাড়পত্র মিলে গেছে। অভাবের সংসারে মা গজগজ করলে বলতেন, আরে দিলে কখনও ফুরায় ধনবৌ? যতটুকু দিতে পারলে, ততটুকুই আখেরের কাজ করলে। তেনার মাপা জিনিস। তাঁর সব। তুমি দেবার কে ধনবৌ?

পিলু মজা দীঘির পাড়ে দাঁড়িয়ে হাঁক পাড়ল, ন—ব—মী! কারণ সে জানিয়ে দিল, নবমীর দাঠাকুর এই বনের মধ্যে হাজির। যেন তাড়াতাড়ি গায়ে ট্যানা-কানি না থাকলে পরে নেয়! আগে বোধ হয় কখনও পিলু বন-বাদাড়ে ঘুরতে গিয়ে দেখেছে—উলঙ্গ এক বুড়ী বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। পিলুর কেমন লজ্জা লেগেছে। আবার পূজা-পার্বণের দানের কাপড় একটা চুরি করলেই হয়ে যায়। এবং তা দিতেই পিলু বোধ হয় নবমীর দা-ঠাকুর হয়ে গেছিল। দা-ঠাকুরের জন্য নবমীও কিছু রেখে দেয়। এই সেদিন একটা ঝুনো নারকেল নিয়ে গেছে পিলু। গাছতলায় কুড়িয়ে পেয়েছে নবমী। দা-ঠাকুরকে না খাইয়ে সে খায় কী করে? এই বনটার মধ্যে আমরা এখন তিনজন প্রাণী: আর আমাদের হেমন্তের কুকুর। পিলুর পার্টনার। কুকুরটাও মুখ তুলে ঘেউঘেউ করে উঠল। পিলু ডাকছে, সে ডাকবে না, কী করে হয়? আর তখনই খসখস শব্দ। খুব ক্ষীণ গলায় সাড়া দিচ্ছে নবমী, আসেন গ দা-ঠাকুর!

মণীন্দ্র কাঁটাগাছের জঙ্গলে জায়গাটা ভরা। ইচ্ছে করলেই ছোটা যায় না। পিলু ছুটতে চেয়েছিল, কাঁটায় জামা আটকে গেছে। মায়া উবু হয়ে জামাটা ছাড়িয়ে দিচ্ছে। তার অবশ্য হুঁশ নেই। চিৎকার করে বলছে, আমার দাদা পাস করেছে নবমী। দাদাকে নিয়ে এসেছি। মায়া এয়েছে।

এবং যখন কাঁটা গাছ এবং আগাছা মাড়িয়ে ভিতরে ঢুকে গেলাম, নবমীর কি আনন্দ। যেন তার কত নিকট আত্মীয়স্বজন আমরা। নবমী বলল, কি পাস গ?

পিলু বলল, ওমা তোমাকে বলেছি না, দাদা এ বছর একটা পাস দেবে। মেট্রিক পরীক্ষা। সে তুমি বুঝবে না। তোমার কিছু মনেও থাকে না। কত বার বলেছি, দাদা ন'টা বিষয়ে পাস করে গেছে। আর একটা বিষয়। ব্যস, তাও পাস। বাবা তো বিশ্বাসই করেন না, সব বিষয়ে মানুষ পাস করতে পারে। জীবনে নাকি সেটা হয় না।

বাবার কথায় নবমী কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল, তিনি দেবতা আছেন গ।

তারপরই নবমীর যা স্বভাব গড় হয়ে গেল। পিলু এটা তার প্রাপ্যই মনে করে থাকে। কিন্তু আমার বড় সংকোচ হল। বললাম, ছি ছি, নবমী, কী করছ? বলে পা সরিয়ে নিতেই শীর্ণ হাতটা কেমন কেঁপে গেল। যেন সে কি অপরাধ করে ফেলেছে। খোনা গলার স্বর স্পষ্ট নয়। এখন তার চলতে ফিরতেও কষ্ট। একদিন পিলু তাকে ধরে ধরে নিয়ে গেছিল, বাবার ঠাকুরঘরে সে মাথা ঠেকিয়ে আসতে পেরেছে—আর এই যে আমাদের দর্শন, সেটা তার নিতান্ত পুণ্যফল। এ-হেন সময়ে আমার এমন বলা বোধহয় উচিত হয় নি। নবমী কেমন শুকনো গলায় বলল, দা-ঠাকুর, কত ভাগ্যিমানী হলে পায়ের ধুলো পড়ে। ছান চরণখানা মুঠা করে লই।

ওকে বঞ্চনা করতে কেন জানি আর মন চাইল না। পা দু'খানা পিলুর মতো আমিও বাড়িয়ে দিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলাম।

আসলে এ সবই আমায় কোন দূরবর্তী নক্ষত্রের খবর দিচ্ছিল। সেটা কোথায় খুঁজে বের করতে হবে। নবমী আমার দিকে কিছুটা হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ভাল দেখতে পায় না। একটা পাস দেওয়া মানুষ তার সামনে। সে কোন রকমে উঠে, সারা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, বাপের মুখ উজ্জ্বল করেন গ দা-ঠাকুর।

মায়া বলল, জান নবমী, আমার দাদা কলেজে পড়বে।

নবমী এ সব কিছুই বোঝে না। মুখে তার আশ্চর্য সরল হাসি। যেন এটা এমন কাজ, যা আমিই একমাত্র পারি। কম্পার্টমেণ্টালে পাস করার মত এত বড় কাজ আমার পক্ষেই সম্ভব। সে বলল, একটা শীতের চাদর দেবেন গ দা-ঠাকুর? বড় হয়ে গেলে দিতে হয়।

নবমীর পক্ষে এত দিন বেঁচে থাকা সম্ভব না। এই শীতে অথবা আগামী শীতে সে মরে যাবে। তবু মানুষের মরণ বাঁচন বলতে—কথা দিলাম, বড় হয়ে তাকে একটা শীতের চাদর দেব। এই আমার কাউকে প্রথম কথা দেওয়া।

বাবার ফিরতে বেশ রাত হল। শরতের শেষ বেলা বলে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। মা বারান্দায় হারিকেন জালিয়ে বাবার প্রতীক্ষায় বসে আছেন। মানুষটা ফিরলে তাঁর অনেক কাজ। আমারও ঘুম আসছিল না। বাবা কি খবর নিয়ে আসবে কে জানে? কারণ মামুকাকার ইচ্ছা না হলে আমার কলেজে পড়া হবে না জানি। ঈশ্বরের কাছে কেবল প্রার্থনা করছি, হে ঠাকুর, বাবা-মামুকাকার

সুমতি দাও। ওঁরা যেন এখনই আমার পড়াশোনা বন্ধ করে না দেন। রাস্তা থেকেই বাবার গলা পাওয়া গেল।—বেড়াটা কে ভেঙেছে? তিনি বাড়িঘরে যখন থাকেন, খুবই সংসারী মানুষ। গাছের একটা পাতা খসে পড়লেও তিনি টের পান। মা বললেন, দানের গরু ভেঙেছে। মানু ঠাকুরপো কি বলল? দানের গরু ভেঙেছে যখন সাত খুন মাপ। বাবা খুব সদাশয় ব্যক্তি হয়ে গেলেন। অবলা জীব বলে কথা।

বারান্দায় উঠে এলে ফের মা বললেন, ঠাকুরপো কি বলল?

—খুব সুখবর।

আমার ভেতরে উল্লাস। তবে ঈশ্বর মানুকাকার সুমতি দিয়েছে।

বাবা আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন, মা মাঝপথে থামিয়ে বললেন, পরে শুনছি। আগে হাত-মুখ ধুয়ে নাও। ঠাকুরের বৈকালী হয় নি।

—কেন, বিলুটা?

—দেয় নি তো! কিছু নাকি ওর ভাল লাগছে না।

—পিলু!

—সারাক্ষণ ঝগড়া করেছে মায়ার সঙ্গে। আমার কথা কে শোনে?

বাবা ওসব কথা একদম শুনতে চাইছেন না।—সব হবে ধনবৌ। তোমার বাড়িঘর যখন হয়ে গেছে, সব হবে। মানু যা আমাদের জন্য করছে!

মা বললেন, তাই হয়, করবে না?

—না করলেও পারত। বাড়িঘর সব তো বলতে—

—তোমার আবার বাড়াবাড়ি।

আসলে বুঝতে পারছিলাম, বাবাকে মানুকাকা খুব, বড় খবর দিয়েছে। বাবা এজন্য মানুকাকার ওপর খুবই প্রসন্ন। বাবা প্রসন্ন হলে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেন। আগের দুর্ব্যবহারের কথা মনে রাখতে পারেন না। মার সব মনে থাকে। কারণ দেশ থেকে এসে মানুকাকার বাড়িতে উঠলে কাকা যে খুব বিরক্ত বোধ করেছিল, সেটা চোখ বুজলে এখনও টের পাই। আমাদের ক্যাম্পে পাঠাবার জন্য সে অনেক হাঁটাহাঁটিও করেছে। কিন্তু বাবার এক কথা। জাত খোয়াব মানু! ও তো হয় না। মা তখন তাঁর শেষ সম্বলটুকু মানুকাকার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, একটু জমি, আর কিছু চাই না। ক'দিনেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম, আমরা মানুকাকার সংসারে উচ্ছিষ্ট। অবশ্য বাবার স্বভাব কিছুই গায়ে না মাখা। সুতরাং এ-হেন বাবা আজ কি না জানি খবর নিয়ে এসেছেন। বিছানা থেকে লাফিয়ে নামতেই শুনলাম, বাবার বেশ ক্ষুণ্ণ গলা—

ধনবৌ, মানুষের খারাপটা মনে রাখতে নেই। ভালটা মনে রাখলে কষ্ট পাবে কম। মানুষ এতে বেশি সুখী হয়, ঈশ্বর প্রসন্ন থাকেন।

বাবা তারপর খাটো গলায় বললেন, বিলুটা ঘুমিয়ে পড়েছে?

মা বললেন, বোধ হয়।

ভেতর থেকে বললাম, না বাবা, ঘুমাই নি।

এবং সঙ্গে সঙ্গে পিলুর গলা, আমিও ঘুমাই নি বাবা।

মায়া বলল, আমার খুব ভয় লাগছিল তুমি আসছ না, চিন্তা হয় না?

মায়া আজকাল পাকা পাকা কথা বলে। আসলে সবাই জেগে আছে। বাবা আমার কি ভাগ্যফল লিখে আনছে জানার জন্য কেউ ঘুমোতে পারছে না।

অনেকক্ষণ হয়ে গেল, বাবা আর মানুকাকার কথায় যাচ্ছেন না। বাধ্য হয়ে বললাম, মানুকাকা কি বলেছে?

—বলেছে। অনেক কথা বলেছে। তোমার তা শুনে দরকার নেই। তোমার একটা কাজও ঠিক করে ফেলেছে।

—কাজ!

—হে, যে সে কাজ নয়, বড় কাজ। মানু বলল, কলেজে পড়লে ত, কেরানীগিরি করতে হয়, মাথা ঠিক থাকে না। তোমার পাসটাও খুব ভাল না বলল। বললাম কত, দেখ মানু, আমাকে পাস নিয়ে বোঝাস না। সব বিষয়ে পাস কে করে রে? তুই করেছিস? করলে তোকে কেরানীগিরি করতে হত?

আমি জানি, আসলে বাবা এসব কিছুই বলেন নি। তবে মনে মনে হয়তো বলেছেন! মনে মনে বলাটাকেও তিনি ভাবেন বলাই হল। আমার সব কেমন গোলমাল ঠেকছে। বললাম, কি কাজ?

—খুব বড় কাজ। এ কাজ করে মানুর বন্ধু শহরে তিনটে বাড়ি করেছে, গাড়ি করেছে। বাসরুট করেছে। জলঙ্গী ডোমকল বাস যায়, সব ওদের। কত বড় কথা!

মা বললেন, কাজটা কি বলবে তো!

—মোটর মেকানিকের কাজ। এই যে গাড়ি দেখছ, বেগড়বাই করলে বিলু কান মলে দিতে পারবে। তোমার ছেলে কত দূরে যেতে পারবে জান। একটু-আধটু কালি-ঝুলি মাখতে হবে, তা বড় কাজে মাখতেই হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা ছাইভস্ম মাখেন, সে কি খুব খারাপ কাজ?

বাবা জলচৌকিতে বসে অনর্গল কথা বলছেন—কোথায় কবে মানুকাকার বন্ধু এমন একটা কাজেই প্রথম হাত দিয়েছিল। গাড়ি চালাতে শিখল। দূর দূর

জায়গায় চলে যেত। যখন খুশি তুমিও যেতে পারবে, ইচ্ছে হলে একটু পদ্মাপাড়ে ঘুরে আসবে, বিলু তোমাকে গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে যাবে। মাকে বাবা খুশি রাখবার জন্য বললেন, এখন তুমি যা বলবে তাই হবে।

—বিলু তো বলছিল কলেজে পড়বে।

—কলেজ! না না ধনবৌ, তোমাদের সবারই দেখছি মতিভ্রম হয়েছে। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই। একটা আস্ত গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া কি কম বড় কথা। গাড়িতে কত মানুষ, কত কাজ, অফিস কাছারি সব সে টাইম মতো করাবে। ওর মর্জির ওপর সব।

আমার রা সরছিল না। বুঝতে পারছিলাম, মানুকাকা আমার যে কাজটি ঠিক করেছে, তা তার বন্ধুর গ্যারেজে। প্রথমে হেল্পার নাম দিয়ে সব রকমের কাজ চালিয়ে নেওয়া। মানুকাকা আমাদের দুরবস্থার কথা ভেবে, তাড়াতাড়ি কাজে লাগিয়ে দিতে চান। যা বিদ্যে হয়েছে, ওতেই ও কাজ চলে যাবে। আমরা গাঁয়ের মানুষ, দেশের বাড়িতে ঠাকুরদার টোল ছিল, সেই সুবাদে বাবার মন্ত্রপাঠ, পূজা-আর্চা নিখুঁত। প্রথমে এ দেশে এসে বাবা ভেবেছিলেন, তাঁর হাতের সম্বল-টুকুই যথেষ্ট। গ্রাসাচ্ছাদনের পক্ষে খুব বেশি আর কিছুর দরকার নেই। কিন্তু তাঁর যে মন্ত্রপাঠের ঠিকুজী কুষ্ঠি ঠিক আছে, এই নিয়েই বড় সংশয় মানুষের। মানুকাকাই পূজা-পার্বণে শ্রাদ্ধে বাবার হয়ে পার্টি ঠিক করে দিতেন। ঠাকুর প্রতিষ্ঠার সময় কিছু লোকজনও বাবা খাইয়েছিলেন। তাঁর খেরো খাতায় দেশের মানুষজনের সব খবর লেখা আছে। তারা কোথায় কে থাকে, তিনি চোখ বুজে বলে দিতে পারেন। অভাবের তাড়নায় পূজা-পার্বণের নাম করে বের হলে আর বাড়ি ফিরতে চাইতেন না। সেই বাবার ছেলের এ-দেশে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছে মানু, তাতেই আমার সুমহান পিতৃদেব গদ্‌গদ।

আমি বললাম, বাবা।

বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুটা স্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমার চোখে মুখে কি লেখা ছিল জানি না, বাবা কি পড়লেন জানি না—তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। মাথা নীচু করে বসে থাকলেন। আর ঠিক এ সময়েই বাবা আমার কত অসহায় উপলব্ধি করলাম। কলেজে পড়ানো বাবার ক্ষমতার বাইরে। পিতার এই চোখ-মুখ আমাকে বড় পীড়া দিল। বাবাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য বললাম, সেই গাড়ি চালিয়ে নেওয়া কত বড় কাজ না বাবা!

বাবা খুব প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন, তালে তুই বুঝেছিস। কথায় বলে না, বড় যদি হতে চাও, ছোট হও তবে। ছোট কাজে কোন লজ্জা রাখতে নেই বিলু। সব

কাজই মানুষ করে। আসল কথা স্বভাব। স্বভাব ঠিক থাকলে সব কাজ বড় কাজ।

আমাদের স্বভাব ঠিক আছে, এটাই বাবার এখন আপ্তবাক্য। তাঁর কথা পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে অপহরণ করা হয়। আমি এ বিষয়ে পিতার মতোই শুচিবাইগ্রস্ত। অবশ্য পিলুটা অন্য রকমের। তার এতটা শুচিবাই নেই। বাবা একবার স্টেশনে ফেলে রেখে আমাদের উধাও হয়েছিলেন। পিলু তখন সংসারের স্বাধীনতা সংগ্রামী। যত্র তত্র তার বিচরণ। সে যেখানে যা পেত, তুলে নিয়ে আসত। শসা চুরি করতে গিয়ে সে মারও খেয়েছে। অবশ্য অতটা দৈন্যদশা এখন আমাদের আর নেই। মানুষের ঘরবাড়ি হয়ে গেলে যা হয়। আকাশ মাটি শস্যক্ষেত্র সব এখন পাপপুণ্যের কথা বলে। বাড়িঘর করার পর পাপপুণ্য বোধ সংসারে বাড়ে। বাবা বললেন, বুঝলে না, এ সব কাজে বিশ্বাসী মানুষদের দরকার। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই কিন্তু বংশের মান রাখিস। মানুর মুখ রক্ষা করিস।

পিলু বলল, না দাদা, তুই এ কাজ করবি না।

মায়া বলল, দাদা আমার কলেজে পড়বে না বাবা ?

মা খুবই নিরুপায় চোখেমুখে তাকাচ্ছিলেন। লণ্ঠনের আলোটা দপদপ করে জ্বলছে। শরতের গাছপালা বাতাসে দুলছিল। অন্ধকার অরণ্যে একটি ছোট্ট ঘরের বারান্দায় আমরা চার জন মুখোমুখি বসে। কেউ আর কোন কথা বলছিলাম না। আমার কেমন কান্না পাচ্ছিল। কারণ কোন দূরবর্তী নক্ষত্রে কে যেন ডাকে। বড় হই, গাছপালা মাঠের সঙ্গে সেও আমার পাশাপাশি হাঁটে। গোপনে কত কথা বলি। কখনও সুদূরের মাঠ পার হই হাত ধরে। কখনও শস্যক্ষেত্র মাড়িয়ে যাই দুজনে। কেউ পৃথিবীর এই গোপন খবর টের পায় না। রাতে ঘুম হয় না। ছটফট করি। মাথার ঝিলু পোকায় কাটে। এবং সেদিনটি এসে যায়। বাবা আমাকে মানুকাকার দোকানে বুঝিয়ে দিয়ে আসেন। মানু-কাকা একটা স্যাতসেঁতে পুরনো ভাঙা চালাঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, গোবিন্দ, ওকে দেখে-টেখে রাখিস। লোহালক্কড়ে ভর্তি ভাঙা গাড়ি, মানুষের ভিড়-ভাড়াক্কা দিনের বেলায়। নাট-বোল্ট খোলা, রেঞ্চ আর হাতুড়ি সম্বল, সকালে একখানা পাঁউরুটি দুপুরে ডাল ভাত, রাতে তড়কা আর রুটি। খিস্তি-খেউড় আর দাবানলের মতো অনন্ত জ্বালা। দশটায় দেখি লালদীঘির পাড় ধরে ছেলেরা যায় মেয়েরা যায়। কী সুন্দর নীল রঙের পোশাক শরীরে। মনে হয়, ওঁরা কোন স্বপ্নের জগতের বাসিন্দা। আমার বুঝি সেখানে আর কোনকালে যাওয়া

হবে না। গাড়ির ফুটবোর্ডের নীচে মাথা, ভিতরে গাড়ির কলকব্জা, তার নীচে জীবনে সব বিষয়ে পাস বাবার নিরীহ এক কৃতী ছেলে।

সবই সহ্য হচ্ছিল। কেবল খিস্তি-খেউড় বাদে। গোবিন্দ-পঞ্চানন আমার মনিব। তাঁর মনিব গোলক দাস। বাসে ঘন্টি বাজায়। বাস মালিক কিংবা কাকার সেই বন্ধুটির সাক্ষাৎ আর পাই না। পেলে একটা আর্জি ছিল। কারণ সহনীয় নয়, এমন কিছু কাজ গোবিন্দ আমাকে দিয়ে করাতে চায়। আইন অমান্য করি বলে তার সহ্য হয় না। না পেরে ছুতোয়-নাতায় কিল ঘুষি। ভাবি বাড়ি পালাই, কিন্তু বাবার বংশের মুখ রক্ষা না হয় ভেবে পড়ে থাকি। কিন্তু জীবন মানবে কেন, সে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ থেকেই আমার প্রথম নিরুদ্দেশে যাত্রা।

সেটা কৃষ্ণপক্ষের রাত-টাত ছিল। শহরের রাস্তায় আলো ছিল না। আমাকে স্টেশনে যেতে হলে মাঠ ভাঙতে হবে। সাহেবদের কবরখানা পার হয়ে যেতে হবে। ভূতের ভয় বড় প্রবল। অনেকটা পথ ঘুরে, ফলে স্টেশনে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। ভেতরে প্রচণ্ড অভিমান সবার উপর। বাবা, মা, মাসুকাকা সবাই যেন সংসারে ষড়যন্ত্র করে চলেছে। সব তছনছ করে দিয়ে পালাচ্ছি। রেল-গুমটি দেখা যাচ্ছে। সিগনালের নীল বাতি। গাড়ি আসছে। গাড়িতে উঠে পড়লেই মনে হল, আমার নতুন জীবন শুরু। সম্বল বলতে এখন আমি একজন উদ্বাস্তু বাবার সন্তান। তবে সাত খুন মাপ। গাড়িতে টিকিট লাগে না। চেকার হলে শুধু বাবার পুরনো স্বভাবটা খালিয়ে নেওয়া। আমাদের বেড়ালছানার মত নিয়ে যখন তিনি ট্রেনে এখানে সেখানে আশ্রয় খুঁজছিলেন, তখন বাবার স্বাভাবিক বুদ্ধি আমাদের কত অপমান থেকে যে রক্ষা করেছে! বাবা দিলখোলা মানুষ। আমি একেবারে বিপরীত। মুখচোরা স্বভাবের বলে ঠিক কথার পৃষ্ঠে ভাল কথাও যোগাতে পারি না।

ট্রেন ছেড়ে দিতেই হু-হু করে কান্না উঠে এল বুক থেকে। আমি আমার প্রিয় গাছপালা, হেমন্তের কুকুর পিলু মায়াকে ছেড়ে চলে যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না। ফিরলেও মানুষ হয়ে ফেরা দরকার। বাবার যেন বংশের মান রক্ষা হয়। এমন কিছু করব কি করে, তাও জানি না। কেন জানি সব সময় মনে হয়, আমার দুরবস্থা দেখে কেউ আমায় ঠিক আশ্রয় দেবে। আর কিছু না পাই, বাবার আকৃতি পেয়েছি। বাবা আমার বড় সুপুরুষ মানুষ। দীর্ঘদেহী, উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ এবং বড় পুষ্ট গোঁফ আর মজবুত শরীরের খানিকটা আমার মধ্যে ইতিমধ্যে এসে গেছে। চোখ বড় বড়। যে চোখ দেখলে মানুষের মায়া হবার কথা।

রাতের ট্রেন ছুটছে। রাতের ট্রেন বলে যাত্রী কম। শুয়ে বসে থাকা যায়। এক কোণে ঘাপটি মেরে বসে আছি। অপরিচিত মানুষজনের মধ্যে আছি, কেউ একবার জিজ্ঞেসও করছে না খোকা কোথায় যাবে? এ সময় কেউ দুটো কথা বললেও যেন সাহস পেতাম। সব যাত্রীদের দিকেই চোখ বুলিয়ে নিলাম। আমার সমবয়সী মেয়েটি মাত্র দুবার তাকিয়েই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। এতক্ষণে লক্ষ্য করলাম, গায়ে আমার কোন ভদ্রলোকের বাচ্চার ছাপ নেই। হাফ প্যান্ট, কালি-ঝুলি মাখা, মুখটা কেমন দেখাচ্ছে তাও জানি না। পা খালি। এই সম্বল করে আমি আপাতত কলকাতা যাচ্ছি। শুনেছি, শহরটাতে মাটি নেই। যেখানে মাটি নেই, সেখানে মানুষের পাপপুণ্য বোধও কম। কলকাতার নামে বাবা সব সময়ই ক্ষেপে থাকতেন। সেই শহরে আমি গেছি জানলেই বাবা ভারি মনোকষ্টে ভুগবেন। কিন্তু যাঁর সঙ্গে আমার আপাতত দেখা হওয়া দরকার, তাঁকে পেতে হলে শহরটা না মাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। তিনি দিল্লীতে থাকেন। মানুষের জন্য তাঁর ভারি কষ্ট। কাগজে পড়েছি, তিনি যে কোন মানুষকে ইচ্ছে করলে অর্ধেক রাজত্ব এবং রাজকন্যা দিতে পারেন। আমার এতটা দরকার নেই, একটু আশ্রয় আর খাদ্য আর নীল মলাটের বই। সঙ্গে ভদ্রগোছের কাজ। বাবার জন্য মাসে মাসে কিছু টাকা, ফেরার সময় পিলু-মায়ার জন্য জামাপ্যান্ট। ছুটি-ছাটায় বাড়ি ফিরব যখন, মার জন্য জামদানি একখানা শাড়ি।

গ্যারেজে তাঁর ছবি কাগজে দেখেছি, আর মনে মনে কথা বলেছি। তাঁর কোটে লাল গোলাপ ফুল। শিশুদের তিনি গলা জড়িয়ে ধরে আদর করছেন। এই দেশবাড়ির কাকা জ্যাঠার মতো—তিনি আমায়ও বুকে জড়িয়ে যেন কথা বলছেন, বিলু তোমার খুব কষ্ট। বলতাম, হ্যাঁ, এই দেখুন না, গোবিন্দ আমাকে শুধু শুধু মারে। আমার খুব পড়াশোনা করতে ইচ্ছে হয়। আমি কি ইচ্ছে করে অঙ্কে ফেল করেছিলাম? বাবা বলতেন, বাড়িঘর না হলে মানুষের পড়াশোনারও দরকার হয় না। যাও বাড়িঘর হল, বই নেই। পরীক্ষার আগে একটা কাটাছেঁড়া অঙ্কের বই—ও পড়ে কেউ পাস করতে পারে? ১৬-র উপপাদ্যটা পর্যন্ত উপড়ে নিয়েছে। আঃ, যদি ওটা থাকত, ফেল করতাম না অঙ্কে। কিন্তু আমার বাবা যখন জানলেন, দশটা বিষয়ের মধ্যে ন'টা বিষয়ে পাস করেছি, তখন কি খুশি! আমার কাঁদো কাঁদো মুখ দেখে বললেন, বিলু, জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করেছে রে? মন খারাপ করছিস কেন? দেশের যে অত বড় মানুষ আপনি, আপনার নাকি ন'টা বিষয়ে পাস। বাবার কাছে সব বিষয়ে আপনি পাস করতে পারেন নি কেন? দেশ ভাগে আপনার মদত না থাকলে বাবা

বোধ হয় আপনাকে সব বিষয়েই পাস-মার্ক দিয়ে দিতেন। আমি কিন্তু বাবার কাছে জীবনে সব বিষয়ে পাস করা ছেলে। আমার কিছু একটা হিল্লে করে দিতেই হবে।

এসব কথগুলিই ঘুরে-ফিরে আমার মাথায় আসছে। মাঝে মাঝে দরজায় শব্দ হলেই তাকাচ্ছি। চোর-বাটপাড়ের মতো বসে থাকা। চেকারবাবু কোন্ দরজা দিয়ে ঢুকবে কে জানে? মাঝে মাঝে জানালায় উঁকি মেরে দেখছি। গোটা দুই-চার স্টেশন পার হয়ে গেলে বড় একটা স্টেশনে গাড়ি এল। এখানে এত বিলম্ব কেন বুঝতে পারছিলাম না। তবে কি দেশের সব পুলিস আর চেকারবাবুরা দেখে ফেলেছে, ট্রেনে একজন বিনা টিকিটের যাত্রী আছে? বুকটা গুরগুর করছে। উপরে বাঙ্ক। পা ঝুলিয়ে বেশ নির্বিঘ্নে ঘুমাচ্ছে কেউ। টিকিট কেটে যেদিন আমি ট্রেনে চড়ব, ঠিক এভাবে একটা ঘুম। অনেক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে আরও একটা আকাঙ্ক্ষা জীবন আমার এ মুহূর্তে পকেটে পুরে ফেলল। ট্রেনে যেতে যেতে কত সুন্দর সব গাছপালা শস্যক্ষেত্র শহর গঞ্জ চোখে পড়ে—কিছুই তারিয়ে তারিয়ে দেখতে পারছি না। সাত খুন মাপ ঠিক, কিন্তু আমি যে উদ্বাস্তু তার প্রমাণ? কথা বলি বাঙাল ভাষায়, ওটা একটা বড় রকমের সার্টিফিকেট—আর যদি নাই শোনে, বলে দেব বাবার আমি জীবনে সব বিষয়ে পাস করা কৃতী ছেলে—কাজের খোঁজে বের হয়েছি। আমার মা-বাবা বড় গরিব। আমি কলেজে পড়ব, ভাইবোনেদের কত আশা! যখন বড় হব, আমার টাকা হবে, মান যশ হবে, কড়া ক্রান্তি মিটিয়ে দেব।

মনে মনে নানা ভাবে সাহস সঞ্চয় করে যাচ্ছি। আর সারাক্ষণ চে... মতো এ দরজায় ও দরজায় পালাচ্ছি। কখনও উঁকি মারছি, কখনও র... এ কামরা ও কামরা করছি। যতক্ষণ সম্মানের সঙ্গে ট্রেনযাত্রা শেষ করা যায়। ও মা, কখন আমি এ সব করতে করতে বাঙ্কের নিচে ঘুমিয়ে পড়েছি জানিই না। সকালবেলায় ঝাড়ুদার এসে পা টানতেই জেগে গেলাম। ও বাবা, মরা মানুষ নাকি!

খুব কাঁচুমাচু মুখে তাকালাম। কথা বললাম না। টেনে বের করে দিয়েছিল কতকটা আর কিছুটা বের করে দিলে কামরার বাইরে। সেটা দয়া করে করে নি। করলে রক্ষা পাওয়া যেত। ট্রেনে যে এসেছি, তার আর কোন চিহ্ন থাকত না। ফলে কামরাটা পার হতে হল নিজেকে। আর নেমেই দেখি, কি পরিচ্ছন্ন আকাশ, শরতের মিষ্টি রোদ। রেলের অজস্র লাইন বাড়িঘর পেছনে ফেলে কত দূরদূরান্তে ছুটেছে। আর তখনই দেখলাম পায়ের কাছে একটা ডাইরি

কার পড়ে আছে। কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস নিতে নেই। বাবার শিক্ষা। কিন্তু আমার ইতিমধ্যে নানাভাবে নিয়মভঙ্গ হয়েছে। কাজেই ডাইরিটা পকেটে পুরে ফেললাম। কেউ না আবার দেখে ফেলে। একা মানুষ, সব কিছুই এখন জীবনে বড় দরকারী বস্তু হয়ে গেছে। আর সবচেয়ে বিস্ময়, কত গাড়ি, কত ইঞ্জিন, এটা যে কোন স্টেশন নয়, বুঝতে অসুবিধা হল না। শান্টিং করছে গাড়ি। ঝমঝম শব্দ। খুব সন্তর্পণে লাইনগুলি পার হয়ে ছোট্ট একটা নিমের ছায়ায় বসা গেল। এবং মনে হল ডাইরিতে সব লিখে রাখা দরকার। কারণ সব আবার ভুলে যাব। বিশেষ করে ধার-দেনা যার কাছে যা জমছে। প্রথমেই লিখলাম, গোবিন্দ—বিশ টাকা। পরে লিখলাম, রেলগাড়ি—তিন টাকা দশ আনা। গোবিন্দের কৌটায় রাখা কুড়িটা টাকা না বলে নিয়ে এসেছি। একটা চিরকুটে লিখে এসেছি, গোবিন্দদা, তুমি আমাকে মার কেন? আমি তোমার কুড়ি টাকা নিলাম। যখন বড় হব, মান যশ হবে, তখন টাকা ফেরত দেব। বাবার নামে চিরকুট—বাবা, আমি আপনার কাছে ন' বিষয়ে পাস করা লোকটার সঙ্গে দেখা করব বলে বের হয়ে পড়েছি। আমার জন্য ভাববেন না। আর যাই মানাক, আপনার সব বিষয়ে পাস করা ছেলেটির কিন্তু গ্যারেজে লাথি-ঝাঁটা খাওয়া মানায় না। গোবিন্দদা আমাকে অনর্থক মারধোর করতো। আমরা গরিব বলেই ও এতটা সাহস পায়।

তা হলে মোটামুটি ধার-দেনার হিসাব লেখা হয়ে গেল। এখন কিছু খাওয়া দরকার। দিল্লীর গাড়িটা কোথা থেকে ছাড়ে খোঁজখবর নিতে হবে।

একটা লোককে জিজ্ঞেস করে জানা গেল, সামনে কিছুটা হেঁটে গেলেই শিয়ালদা স্টেশন। স্টেশনেই গাড়ি ছিল। শেষ মাল খালাস করার জন্য আবার বুঝি নিয়ে এসেছিল এখানটায়। সেটা খালাস পেয়ে যাওয়ায় গাড়ি হালকা হয়ে গেছে। চলেও গেছে। এখন খালাস মালের বিড়ম্বনা। সে কি করে?

খালাস মালটি আসলে খুবই ভাবাচাকা খেয়ে গেছে। কি সব বড় বড় বাড়ি, যেদিকে চোখ যায় গিজগিজ করছে টিনের চাল, অজস্র রাস্তা। দালান কোঠার মেলা বসে গেছে। খালাস মালটির পেটে খিদের উদ্রেক হয়েছে। চোখে-মুখে জল দিয়ে কিছু খাওয়া দরকার।

খালাস মালের খিদেটা একটু বেশি। যাকে বলে খিদে সম্পর্কে নাড়ি তার টনটনে। কিন্তু এখানে সবই গোলকধাঁধা। লোহার রেলিং দু'ধারে। সুতরাং কাউকে অনুসরণ করা ভাল। শেষ পর্যন্ত যেখানটায় আসা গেল, ওটার নাম তার জানা নেই। পিছনের দিকে তাকাতেই বুঝল জায়গামতই এসে গেছে। বড় বড় হরফে

লেখা স্টেশনের নাম। চা-বিস্কুটের দোকান। ডিম ভাজা, মাছ ভাজা, মানুষজন, মলমূত্র গাদাগাদি। ভারি দুর্গন্ধ। স্টেশন চত্বরে শুয়ে বসে কালিমাখা সব মুখ। হোগলা চাটাই পাতা, মুড়ি চিড়া ভাত যে যা পারছে খাচ্ছে।

বুঝতে কষ্ট হল না, এরাও আমার মত খালাস মাল। বুকে সাহস এসে গেল। এক আনার চিনাবাদাম কিনে খাচ্ছি, আর ভাবছি, গাড়িটার খবর কে দেবে? কাকে বলি, দিল্লীর গাড়ি ক'টায় ছাড়ে? বেশি কথাও বলা যায় না, যদি ধরে ফেলে পালাচ্ছে। পুলিস তো না পারে, হেন কাজ নেই। পালাচ্ছে যখন, নির্ঘাত চুরি-চামারি করেছে। তা করেছে, কিন্তু গোবিন্দদার কাছে সে তো চিঠিতে জানিয়ে এসেছে, অর্থ ফেরতযোগ্য। তা ছাড়া যদি পুলিস ধরেও ফেলে, ডাইরি খুলে দেখাবে, এই দেখুন কে কি পাবে, সব লিখে রেখেছি। টাকা মান যশ হলে সব ফেরত। টাকা মান যশ হলে টিকিট কেটে ট্রেনে উঠব। একটা লম্বা ঘুম দেব। কেউ বিরক্ত করলে ধমকে দেব। ওঃ, কি মজা! ট্রেনটা যাচ্ছে আর যাচ্ছে।

তখনই খ্যাঁক করে উঠল একটা মুখ, এই উল্লুককা বাচ্চে। আমাকে ঠেলা দিয়ে একটা গাড়ি চলে গেল। গাড়ি চাপা পড়ি নি, ভাগ্য। এত দিকে নজর রাখি কী করে? কলকাতা শহর—বাবা ঠিকই বলেছেন, এখানে মানুষ থাকে! এখনই বাবার কৃতী ছেলেটা যেত। আসলে বুঝতে পারছিলাম, এই শহরে আসতে হলে আগে থেকে ট্রেনিং দরকার। কিছুতেই রাস্তা পার হতে পারছিলাম না। এত গাড়ি যে কোথায় থাকে! তারপর চোখ বুঝে লম্বা দৌড়। যা হয় হবে। তারপর চোখ খুলে দেখি না সত্যি পার হয়ে এসেছি। যাক্। আর পায় কে? ফিসফিস করে রাস্তাটাকে বললাম, এই বাচ্চে, আটকে রাখতে পারলি? সামনে দেখলাম লেখা, এনকোয়ারি। এই তো সেই জায়গা। ভিড় ঠেলে মুখ বার করে বললাম, দিল্লীর গাড়ি ক'টায় ছাড়বে? লোকটা কি ভাবল, কে জানে? হঠাৎ তেড়ে এল, এই ধর ধর। ধর তো ওটাকে। চ্যাংড়ামো করার জায়গা পায় না। ধরতে বললেই কি আর ধরা যায়? নিজের ভাবনা-চিন্তা না করে দৌড়। একটু আড়ালে এসে দাঁড়াতেই হুঁশ হল, আমি কি অন্যায় বলেছি, লোকটা আমাকে ধরতে বলল? সামান্য ঘাড় তেড়া করে এগিয়ে গেলাম—আমার কি দোষ? আমায় এত অবজ্ঞা করছেন কেন? দিল্লীর গাড়িতে আমি উঠতে পারি না? শেষে মনে হল, যাক গে, বয়স্ক মানুষ! যা ভিড়, মাথা খারাপ হতেই পারে। আর আমার তো এক জামা এক প্যান্ট সম্বল। পায়ে জুতো পর্যন্ত নেই। যার এমন হতশ্রী অবস্থা তার বোধ হয় দিল্লীর গাড়িতে ওঠার নিয়ম নেই। মানুষজন

পঙ্গপালের মত উড়ছে। কাকে বলা যায়? আমারই বয়সী একটা ছেলে লজেন্স বিক্রি করছে। সমবয়সী ভেবে টান ধরে গেল। আপাতত ত্রাণকর্তা ভেবে বললাম, এই যে শুনছ।

—লজেন্স? কটা দেব?

—না। দিল্লীর গাড়ি ক'টায় ছাড়ে?

—এটা তো এখানে ছাড়ে না। হাওড়া যেতে হবে।

—কোন্ দিকে?

—সামনের মোড়ে বাস পাবে।

সামনেটা কোথায়? কারণ যেদিকে তাকাই, মানুষের মিছিল। যাচ্ছে আসছে। গাড়ির মিছিল। যাচ্ছে আসছে। এত সব পার হয়ে সেই সামনেটাকে খোঁজা কত যে দুরূহ এবং মনে হল চড়চাপড় খেয়ে জায়গার মাল জায়গাতেই পড়ে থাকা ভাল ছিল। কি যে দুর্মতি হল। বেলা বাড়ছে। পেটে কামড় বসাচ্ছে। সামান্য ভাত মাছ, আমার একান্ত প্রিয় খাদ্য। সুস্বাদু খাবার বলতে এই বুঝি। নিচে নেমে ট্রাম লাইনও পাওয়া গেল। আর কোথা থেকে আসছে ইলিশ মাছ ভাজার ঘ্রাণ। সব গুবলেট করে দিল। দিল্লীর ট্রেন, হাওড়া, টাকা মান যশ, সব মাথা থেকে ফাঁকা হয়ে গেল। শুধু এক টুকরো ইলিশ মাছ ভাজা—আপাতত, মাছ ভাজা ভাত হলে মন্দ হয় না। সূর্য মাথার উপর কখন উঠে গেছে—এত কি ভাবনা গেল মাথার মধ্যে দিয়ে যে বেলা যায় টের করতে পারি না। ও মা, এই সেই বেরন হোটেল। গোবিন্দদা বলেছিল, কলকাতায় গেলে বেরন হোটেলে খাস। তখন কলকাতার স্বপ্ন বড় শহরে গেলেই নাকি মানুষের হিল্লে হয়ে যায়। এখন আর কিছু খোঁজাখুঁজি না। চটপট ঢুকে বললাম, ভাত দিন।

কাউন্টারের লোকটা তাকাল। আমি যে ভাত মাছ খেতে পারি, আমার যে সে রেস্ত আছে, লোকটার বোধ হয় বিশ্বাস হল না। তাকিয়ে হঠাৎ বলল, যা, ভাগ। বেটা কোথাকার ভিখারী—

খুব রাগ হয়ে গেল। আচ্ছা দেখা যাবে। টাকা মান যশ হোক। দেখা যাবে। তবে এখন কোন গণ্ডগোল করা ঠিক হবে না। সময়টা আমার ভাল যাচ্ছে না। বললাম, টাকা দেব। এই দেখুন, আমার কাছে টাকা আছে। বলে টাকা বের করে দেখাতেই লোকটার মায়া পড়ে গেল।

বলল, বস। কি খাবি?

—ভাত খাব। মাছ খাব। ওদিকের টেবিলে একটা লোক মাছের মুড়ো তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। লোভে পড়ে বলে ফেললাম, মাছের মুড়ো খাব।

সামনের বেসিনে হাত ধোওয়া গেল। মুখে চুরি করে সামান্য সাবান মেখে ফেললাম। আড়চোখে দেখছি, কারণ হাতমুখ ধোবার এমন সুযোগ আর কখন পাব জানি না। মুখটা ধুতেই বাবার মুখশ্রী ভেসে উঠল। আমায় এখন দেখলে লোকটা নিশ্চয়ই আর ভিখিরীর বাচ্চা ভাববে না। জামার আস্তিনে মুখ মুছে যখন খেতে বসলাম, তখন আমার প্রায় জ্ঞানগম্যি লোপ পেল। ঝোল, ভাত, ভাজা, মুগের ডাল, মাছের মুড়ো সব চেয়ে খেতে লাগলাম। চার পাশের টেবিলের লোকগুলি যে হাঁ করে দেখছে, তাও খেয়াল নেই। ওরা তো জানে না, কাল দুপুর থেকে পেটে কোন দানা পড়ে নি। খিদে পেলে মানুষ বোধ হয় কিছুটা আহাম্মক হয়ে যায়। খাবার শেষে বিল দেখে টের পাওয়া গেল, পুরো দু' টাকা পাঁচ আনা বিল। এত টাকা একসঙ্গে খেয়ে মনটা ভারি দমে গেল। হিসাব করে বুঝলাম রেস্ত বলতে এখন সম্বল সতের টাকা এগার আনা। এটা যে কত বড় সম্বল, এই বড় আগাপাশতলাবিহীন শহরে না এলে বোঝা যেত না। কারণ শহরটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না। সব বড় বড় রাস্তা, এত বড় রাস্তা আমার বাপের জন্মে কে কবে দেখেছে? এক সঙ্গে দু' তিনটে গাড়ি রাস্তা ধরে যায় আসে। বড় বড় ট্রাম গাড়িগুলি গলে যায়। আর ভেপোঁ বাজে, ক্রিং ক্রিং শব্দ। যেন পাগলা ঘন্টি—হুঁশিয়ার! সামনে পড়লেই ভোগে লেগে যাবে।
আর যাই হোক, ভোগে লাগছি না। কারো হাত ধরে রাস্তা পার হওয়া যায় না? হাত না হোক, জামার আস্তিন। তাও যখন সাহসে কুলাল না, লোকের পিছু পিছু যাওয়াই ভাল। একজন মুটের পেছনে যেতে গিয়ে রাস্তা পার হবার জ্ঞানগম্যি জমে গেল। একার ভয় অনেক। অনেকের পেছনে থাকলে গাড়িও ভয় পাবে। মোড়ে শরবতের দোকান। কাপড়ের দোকান। মিষ্টির দোকান। পান সিগারেটের দোকান। মানুষের শুধু অগুনতি মাথা। এত লোক কলকাতায় থাকে? এতটুকু নির্জন জায়গা নেই যে এমন সুস্বাদু খাবার খেয়ে টেনে ঘুম দেওয়া যেতে পারে! তার পরই মনে হল, পকেটে টাকাটা থাকতে থাকতে দিল্লীর গাড়ি ধরা দরকার। কোন্‌দিকে গেলে হাওড়া স্টেশন পাওয়া যাবে? শহরের উত্তরে না দক্ষিণে? মুশকিল শহরের উত্তর দক্ষিণও টের পাচ্ছি না। সূর্য আকাশছোঁয়া সব বাড়ির পেছনে লুকিয়ে আছে।
মানুষের সঙ্গে কথা বলা কী যে নিদারুণ বিপত্তিকর, রাস্তায় ট্রেনে সর্বত্র টের পাচ্ছি। সবার যেন টাকার থলে হারিয়ে গেছে। হন্যে হয়ে খুঁজছে। কেউ দু'দণ্ড দাঁড়াচ্ছে না। দাঁড়ালেই অন্য কেউ থলেটা বুঝি গস্ত করবে! মনে অবশ্য প্রশ্নটা কখন থেকে খিকখিক করছে। হাওড়া কোন্ দিকে? হাওড়ার বাস

কোথায় পাওয়া যায়? কখন ছাড়ে? এতগুলি প্রশ্ন শুনে যদি বিরক্ত হয়। পালিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি, সদাশয় মানুষের বড় অভাব পৃথিবীতে। সবারই টাকার থলে হারিয়ে গেলে যা হয়। শরবতওয়ালাকে বললে কেমন হয়? সে তো নিশ্চিন্তে শুধু ঢালাঢালি করছে। আর লাল নীল রঙের বাহারী শরবত এগিয়ে দিচ্ছে। টুক করে মুখ বাড়িয়ে বললাম, হাওড়ার বাস কটায় ছাড়ে? কে বলছে, লোকটির যেন লক্ষ্য করার কথা না। কী বলছে, তার জবাব দেওয়াই সারকথা। গ্লাসে ঢালাঢালি করতে গেলেও গভীর মনোযোগের যে দরকার হয়, অর্থাৎ সারা মাস কাল বছর যুগ যুগ ধরে অনন্ত এই ঢালাঢালি করতে করতেই জীবন যায়, এমন মনে হবার সময় শুনলাম—ঐ তো যায়।

ঐ তো যায় কাকে বলা। তাই তো, বাসটা আমারই সামনে দিয়ে চলে গেল। এটা হাওড়ার বাস! কী যে দুর্গতি এখন। মনে মনে বললাম, শরবতওয়ালা, বাস আবার কখন আসবে? জোরে বলতে পারছি না। যদি মনোযোগ ভঙ্গের দরুন খ্যাক করে ওঠে। আসলে এদেশে আসার পরই বাবার পায়ের তলাকার মাটি সরে যায়। ক্রমে আমরা বাবার সঙ্গে কেমন যেন ভীরু স্বভাবের হয়ে যাই। কেবল পিলুটা অন্য রকমের। ও সঙ্গে থাকলে কখন হাওড়া পৌঁছে যেতে পারতাম।

পিলুর জন্য, বাড়ির জন্য আবার মনে টান ধরে গেল। কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। সকালের মধ্যেই বাড়িতে খবর পৌঁছে যাবার কথা। মা হয়ত হাউ-হাউ করে কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। বাবার স্বভাব অন্য রকমের। তিনি শুধু একটা কথাই বলবেন, ভবিতব্য। পিলুটা গুম মেরে থাকবে। তার দাদাটা হারিয়ে গেছে। বনে-জঙ্গলে তার ঘোরাঘুরিটা হয়ত একটু বেড়ে যাবে। মায়ার যা স্বভাব—সে রোজই আশা করবে, মাঠ পার হয়ে দাদা ফিরে আসছে। ফাঁক পেলেই সে বড় রাস্তায় চলে যাবে।

হাওড়ার বাসের জন্য খুব আর একটা ভাবছি না। আবার ক'টায় হাওড়ার বাস আসবে জিজ্ঞেস করলেই হয়ে যাবে। এখন হাতে কিছুটা সময় যখন আছে, এদিক ওদিক দেখে এলে হয়। এই যেমন চিড়িয়াখানা, জাদুঘর—এই কলকাতাতেই এগুলি আছে। বেশি দূরে যেতে হবে না। তারপরই মনে হল, ফিরে এসে যদি বাস ফেল করি, এই সব ভয়ে জায়গা থেকে কেন জানি নড়তে সাহস হল না।

শরবতওয়ালার নজর আছে বলতে হবে। আমি যে দাঁড়িয়ে আছি—কেন দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তায় কেউ কলকাতায় দাঁড়িয়ে থাকে না, দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু

একটা অপকর্মের ধান্ধা আছে—তার কাঁচা পয়সা কেড়ে নিতে কতক্ষণ? সে বেশ সতর্ক গলায় বলল, এই সামনে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? সরে দাঁড়া।

কথা যখন বলেছে, সাহস আমারও কম না। কিছুটা সরে গিয়ে বললাম, হাওড়ার বাস আবার ক'টায় আসবে?

লোকটা হয়ত আমাকে ত্যাঁদড় ভাবল। আমি যে সত্ব কাঁচামাল, এই কলকাতায়, সে বিশ্বাস করল না। আপদটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে নেই, এটাই তার বোধহয় এখন বড় ভরসা। সে আবার নিজের কাজে মনোযোগ দিতেই কলকাতার শেষ চেনা লোকটা আমার আবার কেমন অচেনা হয়ে গেল।

আমার সামনে একের পর এক বাস চলে যাচ্ছে। বাপস্! বাসের কপালেও যে লেখা আছে কী সব? এতক্ষণ এটা খেয়ালই করি নি। সারাক্ষণ মানুষজন, বাস-ট্রাম আর গাড়িঘোড়া কেবল দেখে যাচ্ছি। স্টেশনের ও পাশটায় সারি সারি ঘোড়ার গাড়ি, একটা ভাড়া করলে সে নিশ্চয়ই হাওড়ায় পৌঁছে দিত। কিন্তু কত দূর কে জানে? হাওড়ার ব্রীজ জানা আছে, তাই বলে রাস্তাটা কত লম্বা, কি করে জানব? শহরে এসে কত কিছু ইচ্ছে হচ্ছে! ট্রামে চড়ে বেশ অনেক দূরে চলে যাব। অথবা গড়ের মাঠ কত দূর? ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, ইডেন গার্ডেন—সব নাম শুনেছি, অথচ বাবার সেই ন' বিষয়ে পাস করা লোকটার সঙ্গে আমার বড় জরুরী কাজ। কখন কোথায় আবার চলে যায়? এবারে স্বাদ আহ্লাদ না মিটুক, পরের বারে হবে। টাকা মান যশ হলে সবাইকে কলকাতা দেখিয়ে নিয়ে যাব। সবাইকে নিয়ে ট্রামে চড়ব। পিলু প্রথম ভড়কে গিয়ে এত ভাল ছেলে হয়ে যাবে যে রাস্তাই পার হতে পারবে না। আমার তখন হাসি পাবে।

বাবা, রানাঘাটের বড় পাবদা মাছ খাবার গল্প করলে, পিলুর বড় বাসনা হয়েছিল রানাঘাট দেখার। সেটা কত দূর, সে বাবাকে বার বার প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছিল। পিলু জানেই না তার দাদা রানাঘাট পার হয়ে আরও কত দূর চলে এসেছে। ফাঁকে ফাঁকে বাসের কপালে নাম পড়ে যাচ্ছে—এই নামগুলিই গন্তব্যস্থল বাসের, এই অনুমান নির্ভরের উপর ভরসা করে শেষ পর্যন্ত হাওড়াগামী বাসে ওঠা গেল। কিন্তু সংশয় প্রবল। কোথাকার মাল কোথায় নিয়ে আবার খালাস করে দেবে কে জানে? বললাম, বাস হাওড়া যাবে? লোকটা ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে বলল, যাবে। ভিতরে ঢুকে মনে হল, স্টেশনের কথা বলা হয় নি। আবার মুখ বাড়িয়ে ভিড়ের মধ্যে প্রশ্ন, হাওড়া স্টেশন যাবে?

—যাবে।

সে তো যাবে। স্টেশনটা আমি চিনব কী করে? ন' বিষয়ে পাস করা লোকটার সঙ্গে দেখা করার এত ফ্যাসাদ আগে জানলে, মাথা গরম করতে সাহস পেতাম না। এমন একটা ব্যস্ত শহরে একই লোককে পর পর দুটো প্রশ্ন করেছি এবং জবাব পেয়েছি—ভাবাই যায় না। গাদাগাদি বাসে দাঁড়িয়ে। বাইরের কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে ঘণ্টা বাজিয়ে লোকটা কি সব হাঁকছে। এই হাঁকগুলি কিসের সংকেত? কারণ পিলুটা যা, সে তো হাঁ করে দাদার অভিযানের প্রতিটি পর্ব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনবে। কি ভাবে হাওড়া পৌছলাম, তাকে কোন বর্ণনাই দিতে পারব না। আসলে মনে হচ্ছিল, টানেলের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। মানুষজন চারপাশে এত ঘন হয়ে দাঁড়ালে পৃথিবীটা গোলকধাঁধা হওয়া স্বাভাবিক। একবার অতি কৌতূহলে মাথা গুঁজে দেখার চেষ্টা করলে কনুইয়ে গুঁতো মেরে জায়গারটা জায়গায় ফিরিয়ে দিল। কোনরকমে টাল সামলে কনুইওয়ালাকে বললাম, দাদা, হাওড়া স্টেশন এলে বলবেন।

লোকটা এবারে খুব ভালমানুষ হয়ে গেল। বলল, বাসটা স্টেশনেই যাবে।

কিছুটা স্বস্তি। লোকটার কনুই সোজা হয়ে আছে, ওটা আরও স্বস্তি। নাকে লেগেছে। টনটন করছে। একবার হাত বুলিয়ে দেখলাম, হাতে রক্ত-টক্ত লাগে কিনা? না, এখন পর্যন্ত হাত-পা-মুখ সবই অক্ষত রাখতে পেরেছি। বাবা-মার আশীর্বাদেই সব। বাবা-মার আশীর্বাদে স্টেশনেও ঠিক পৌছে যাব। কিন্তু লোকটা ভুলে যায় নি তো? আমার কথা মনে রাখার তার কোন দায় নাও থাকতে পারে। এত ভিড় ঠেলাঠেলি, গুঁতোগুঁতির মধ্যে বাবার নাম ভুলে গেলেও দুঃখ করার নেই। সুতরাং ফের প্রশ্ন—স্টেশন আর কত দূর?

লোকটা বলল, অনেক দূর। বাসটা যাচ্ছে না, সেই থেকে হর্ন বাজাচ্ছে। অনেকক্ষণ হয়ে গেল, এত কি রাস্তায় পড়ে আছে যে, বাসটাকে এগুতে দিচ্ছে না? এটা কেমন আজব শহর, যেখানে গাড়িঘোড়া চলে গোযানের মত। বাবার কথাই ঠিক, শহরটায় মাটি নেই, মাটি না থাকলে মানুষের ধর্ম থাকে না। শান পাথর শুধু, গরমে ভ্যাপসা হয়ে যায়। শহর তো নয়, যেন অতিকায় এক উত্তপ্ত তাওয়া। মানুষজন ঘরবাড়ি, তার উপর ভাজাভুজি হচ্ছে।

এখন আমি বাসে নিরালম্ব মানুষ। কোন ভয় নেই। ভেসে আছি যেন। আঠার মধ্যে লেপটে আছি, উড়ে যাবার ভয় নেই। তারপরই বাসটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে কোথাও উঠে গেল। মৃদুমন্দ হাওয়া আসছে। পাশের লোকটা তখনও আমার কথা মনে রাখতে পেরেছে। আমার তৃতীয় বার প্রশ্ন করার

সাহস কম। সে নিজ থেকেই যখন বলল, এসে গেছি, তখন তার কাছে আমার ঋণের শেষ থাকল না।

বাস খালি করে সব নেমে গেল। সামনে অতিকায় লাল রঙের বাড়ি। পিঁপড়ের সারি যেন মানুষজনের মিছিল। এর মধ্যে আমার পা গুটিগুটি চলছে। বড় বড় সাইনবোর্ড, খেজুর, আপেল, আঙুরের দোকান, বইয়ের দোকান। মানুষজন দৌড়াচ্ছে কেন? কোথাও আগুন লাগে নি তো? ভিতরে ঢুকে রহস্যটা ধরা গেল। গাড়িগুলি উগরে দিচ্ছে মানুষজন। আবার উদর ভর্তি করে চলে যাচ্ছে। কি সব এলাহি কাণ্ডকারখানা! একটা বড় ঘড়ি, কত সব ফাঁকা ফোঁকরে মেমসাবের মুখ। আর অজস্র ভিখারী। সবাইকে একটা করে পয়সা যদি দিই, তালেও কুলাবে না। মানুষের আর্ত চিৎকার শুনলে নিজের মধ্যে কেউ যেন আমার কথা বলে ওঠে, বিলু, তুমি পথ হারিয়ে ফেলেছ। এদের মধ্যে মিশে গেলে, তোমার মা-বাবা আর তোমাকে চিনতে পারবে না।

সহসা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ধড়মড় করে উঠে বসলাম। কেউ যেন আমায় ডাকছে। সে কে, বুঝতে পারছি না। চারপাশে গভীর অন্ধকার। কোন আলো জ্বলছে না। কোথায় আমি আছি, ঠিক মনে করে উঠতে পারছি না। ঘুমের জড়তায় মাথাটা বড় নির্বোধ। ভ্যাবলার মতো বসে থাকা ছাড়া যেন আর কোন উপায় নেই। জড়বুদ্ধি, স্থির চোখ, ভেতরে চাপা অসহায়তা। মাথার উপরে আকাশ, নক্ষত্র, গাছপালা আরও দূরে কোন জংশন স্টেশন কিংবা কোন লোকালয়ে আছি বিশ্বাস হচ্ছিল না। মাথার মধ্যে একটা রেলগাড়ি সহসা ঝমঝম করে চলে গেল। মনে পড়ে গেল, ট্রেনে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলাম—এই পর্যন্ত। না, তারপর মনে কিছু আসছে না।

অন্ধকারে টের পেলাম, কেমন আবছা মতো একটা মানুষ যেন এগিয়ে এসে আমাকে দেখছে। আবছা ছায়ামূর্তিটাকে জায়গা করে দেবার জন্য সরে বসলাম। এটা একটা বাড়ির গেট, বসার রোয়াক দু'পাশে। একটা ধাপের সিঁড়িতে এতক্ষণ এক পলাতক শুয়েছিল তবে। নীচে কাঁচা নর্দমা—গুনগুন করছে মশার পঙ্গপাল। আবছা মূর্তিটা এবারে টর্চ জ্বেলে আমার কি দেখল কে জানে? জায়গা বেদখল দেখে লোকটা রাগ করতে পারে। কেউ রাগ করলে আমার বড় খারাপ লাগে। অন্ধকারে সরে পড়াই শ্রেয়—হাঁটা দিলাম। মাথাটা ঘুরছে। তিন-চার দিন অনাহারে থাকলে মাথার কি দোষ! যতটা পারা যায় ঠিক থাকার চেষ্টা করছি।

—এই কোথায় যাচ্ছ?

তাহলে এই লোকটাই আমাকে ডাকছিল। আমাকে ঘুমের নেশায় পেয়ে গেছে। কাল থেকে, যেখানে পারছি শুয়ে পড়ছি। পৃথিবীতে আমার ঘরবাড়ি আছে, মা-বোন আছে, পিলু আছে, কিছুই মনে আসছিল না। আমার পলাতক জীবনে কেউ আজ পর্যন্ত এমন প্রশ্ন করে নি! আমি কোথায় যাচ্ছি, এ নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা ছিল না। থমকে দাঁড়ালাম। অনেকদিন পর কেউ আমায় ডাকল।

লোকটা নেমে এল। কাছে এসে দাঁড়াল। কেমন টলছে। আপাদমস্তক টর্চ মেরে কি দেখে বলল, রাগ ত্যাখ ছোকরার। আমি খুব খারাপ মানুষ। তুমিও। মশারা যে ষড়যন্ত্র করছে, টের পাও নি। যা ঝাঁক বেঁধে বসেছিল, উড়িয়ে নিত। আমার সামনে হাপিস করে দেবে—না, সে হবে না। হতে দেব না। তার পরই লোকটা ওক দিল। মাথার ওপরে হাত তুলে ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো মুখের ওপর দুলতে থাকল।

লোকটা টেনে টেনে কথা বলছিল। সব কথা স্পষ্ট নয়। জড়তা রয়েছে কথায়। লোকটা মাতাল টের পেলাম। কেমন ভয় ধরে গেল। দৌড়ে পালাব ভাবছি। কিন্তু হাঁটুতে জোর পাচ্ছি না। খেতে না পেলে যা হয়। মাথা ঠিক থাকে না। হলে কি হবে, জ্ঞানের নাড়ি টনটনে। মর্যাদার বড় দম্ভ মনে।

সে বলল, রোয়াকে শুয়ে ছিলে কেন? বাড়িঘর নেই? আমার আছে। চিনতে পারছি না। ওক। আবার কথা, কিন্তু শেষ করতে পারল না। তার আগেই পড়ে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি ধরে ফেললাম। পড়লে কাঁচা নর্দমায় ডুবে যাবে। মানুষের এত কষ্ট আমার সহ্য হয় না। বললাম, হাত ধরুন, দিয়ে আসি।

—সেই ভাল। একটা হেঁচকি দিল। তারপর টর্চটা আমার হাতে দিয়ে বলল, খুঁজে দেখ জুঁই ফুলের গাছ।

—জুঁই ফুলের গাছ এত রাতে কোথায় খুঁজব?

লোকটা আমাকে অবলম্বন করে হাঁটছে। টর্চ মেরে মানুষটির অবয়ব দেখার চেষ্টা করতেই, কেমন আর্ত চিৎকার—না না। আলো না। মানুষটিকে বড় সম্ভ্রান্ত মনে হল। পাজামা পাঞ্জাবি গায়।

—কী—পেলে?

—না।

—দুটো পাম গাছ?

—না।

—তবে কোথায় নিয়ে এলে ?

—জানি না।

—আলবত জানতে হবে। তোমার বাপকে জানতে হবে।

—বাবা তুলে কথা বলবেন না। রাগ করব।

লোকটা কেমন চুকচুক করে বলল, আমার মন্থু—

তারপরই পাম গাছ, রোয়াক পার হতেই এটা টের পাওয়া গেল। একটা পেয়ারা গাছ, উঠোন, জুঁই ফুলের গাছ। রঙিন ফুলের ঝাড়। সুঘ্রাণ ফুলের। কি ফুলের এমন ঘ্রাণ হয়। সামনে সিঁড়ি। সিঁড়িতে উঠেই লোকটা কি হাতড়াতে থাকল এবং পেয়েও গেল যেন। ভিতরে সহসা আলো, লণ্ডভণ্ড এক ঘরের ছবি।

লোকটা আমার হাতে চাবি দিয়ে সংকেত করল কিছুর। তারপর ধপাস করে সিঁড়িতে বসে পড়ল। দরজা লক করা, চাবি ঘুরিয়ে দিতেই দরজা খুলে গেল। বললাম, উঠুন। কোন সাড়াশব্দ নেই।—উঠুন।

লোকটা হুঁম শব্দ করল।

—আপনার ঘরবাড়ি ?

ঘরবাড়ির কথা মনে পড়তেই লোকটা হামাগুড়ি দিতে থাকল। এবং ঘরে ঢুকে খাটের ওপরও উঠে গেল হামাগুড়ি দিয়ে। শুধু বলল, বড় সমুদ্র পার হওয়া যায় না ?

এমন প্রশ্নের কি জবাব হবে জানি না। এখানে সমুদ্রই বা কোথা থেকে এল ? তবে খাটটা বড়ই প্রশস্ত। সাদা চাদর জ্যোৎস্নার মতো ফুটফুটে। বালিশ ঠিকঠাক করে দিলে পরিপাটি বিছানা। বিছানাতে উঠেই লোকটা লম্বা হয়ে গেল। মরার মতো পড়ে থাকল।

এ আবার কোন্ ফ্যাসাদ। কথা বললে আর জবাব দেয় না। কেবল হুঁম করে ওঠে। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া দরকার। আর কি কেউ নেই। ভাই-বোন, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-পরিজন—মানুষটার ভূগোল জানতে ইচ্ছে করছে। তবে ক্ষুধার্ত মানুষের যা হয়। অবসাদ—অবসাদ ক্রমেই আমাকে আরও বেশি জড়বুদ্ধি করে তুলছে। খাটের একপাশে আমিও কেমন লম্বা হয়ে গেলাম। রাত অনেক। চোখ আমার আবার জড়িয়ে আসছে।

সকালে ঘুম ভাঙলে দেখলাম, লোকটা নেই। দরজা ভেজানো। আর বসে থাকা ঠিক না। রাতের কাণ্ডজ্ঞান বর্জিত লোকটার ভূগোলে বুঝতে পারছিলাম বড় বেশি পাহাড় জঙ্গল। যে কোন সময় বাঘ লাফিয়ে পড়তে পারে। আর তখনই

লোকটা হাজির। ব্যাগে কি সব ভর্তি করে নিয়ে আসছে। কাঁধে ফ্লাস্ক। হাসি-খুশি মেজাজী মানুষ। কি, ঘুম হল ?

—কথা বলতে পারলাম না।

—কাল খুব জ্বালিয়েছি।

মুখে রা সরছে না। অজ্ঞাতকুলশীল এক লোককে এত বড় বান্ধব কি করে মানুষটা ভাবে ? তারপরই হাসতে হাসতে বলল, তুমি একটা পাগল আছ। দেশ কোথায় ? ঠিক আছে, এখন ওসব থাক। আগে চান করে এস। সামনে গুরুদুয়ারা আছে, কল আছে—এই নাও সাবান। ভাল করে চান করবে। ঘুরে ঘুরে গায়ে খুব গন্ধ লাগিয়েছ।

বসে আছি। এতটুকু জোর পাচ্ছি না। চোখ জ্বলছে। সারা গায়ে এক অপার্থিব যন্ত্রণা। টাকা, মান, যশ—না, আর ভাবতে পারছি না। সব বড় সুদূরের হয়ে যাচ্ছে। কেবল লোকটা সদাশয় হয়ে ওঠায় কোথায় যেন এক কী-লক গেঁথে দিল কেউ। তাতে পা রেখে ওপরে ওঠা যেতে পারে। মনের মধ্যে অদ্ভুত ঘোলা জল, বেনো জল, নদীর জল, জলপ্রপাতের জল ঢুকে যাচ্ছে। সব কেমন গুলিয়ে উঠছে।

লোকটা ফের বলল, কী হল। বসে থাকলে কেন ? যাও। আমার কত কাজ। সামনে গুরুদোয়ারা আছে। রাস্তা পার হলেই পাবে। এই সাবান। জামা-প্যান্ট কাচবে।

তবু বসে থাকলাম। হাই উঠছে।

সদাশয় মানুষটি লুঙ্গি দিল পরতে। ঢোলা ফতুয়া। হাতে তুলে দিয়ে বলল, জলদি যাও। আমায় আবার বের হতে হবে।

এত সকালে মানুষটি স্নান-টান করে ফিটফাট ! কে বলবে, অনেক রাতে মানুষটা তার আবাসে নেশা করে ফিরেছিল। আর যাই হোক, মানুষটিকে ভয় পাবার কিছু নেই। মানুষের আচরণ কত সহজে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে যায় কখনো। স্নান সেরে এসে দেখি, চার পিস পাঁউরুটি, ডিম ভাজা আর ডালমুট সাজিয়ে বসে আছে। আহার শব্দটি এদেশে আসার পরই একটু বেশি মনোরম। আহার শব্দটি মনে এলে মাথা আমার এমনিতেই ঠিক থাকে না। দেরি করলে কোন অদৃশ্য আত্মা কেড়েকুড়ে খাবে, ভয়ে প্রায় হামলে পড়লাম। নিমেষে শেষ করে ফেলতেই মানুষটি হাত মুছতে মুছতে বলল, কত দিন হল ?

মুখে পাউরুটির শেষটুকু। কোঁত করে গিলে বোকার মতো তাকালাম।

—কত দিন পর খাওয়া হল ?

আমার চোখে জল এসে গেল। মাথা নীচু করে ফেললাম। মানুষটি বোধহয় চোখের জল দেখতে পারে না। অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, ঠিক আছে—আর শোন, বের হচ্ছি। পায়ে জুতো গলিয়ে বলল, তোমার কি নাম?

নাম বললে মানুষটা কেমন আঁতকে উঠে বলল, এই রে, তোমার তো ভাই জাত গেল। ছিঃ ছিঃ আগে বলতে হয়—

জাত বিষয়টা আমার বাবার পরম গৌরবের বিষয়। কুলীন ব্রাহ্মণ তিনি। তাঁর কাছে ঘরবাড়ি আশ্রয় সব যেতে পারে—কিন্তু জাত যেতে পারে না। সগৌরবে তাকে টিকিয়ে রাখতে হয়। জন্ম মৃত্যু সব অর্থহীন, জাত ঠিকঠাক না থাকলে। আমার স্বভাবটা অন্যরকমের। বাবার কাছে এজন্য মাঝে-সাজে কুলাঙ্গার। যে মানুষটি আমাকে খাদ্য এবং আশ্রয় দিয়েছে, তার সংস্পর্শে জাত যায় কি করে ভেবে পেলাম না। আমার বাবা তো জাত যাবে বলে দেশ ছেড়ে চলেই এলেন।

মানুষটির পরনে দামী প্যান্ট শার্ট। শৌখিন। যা কিছু অগোছালো ছিল, সব গোছগাছ করে বের হচ্ছে। একটাই ঘর। পাশে পাঁচিল। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে পাঁচিল সংলগ্ন সুন্দর ছিমছাম বাড়িটা দেখা যায়। সামনে বড় পাকা রাস্তা—কোথায় কত দূর চলে গেছে! স্নান সেরে আসার সময় কিছু শিউলি ফুল মাড়িয়ে এসেছি। তখনই মনে হয়েছিল একবার—দুর্গাপূজার সময়—শরৎকালে কাশ ফুল ফোটে শিউলি ফুল ফোটে।

আমি কিছু না বলায় মানুষটিকে গম্ভীর দেখাল। তাড়াহুড়ো করে বের হচ্ছিল। আবার সামনে এসে দাঁড়াল। এখন দেখলে মনে হয় না আর কোন তাড়া আছে। রাস্তায় একটা গাড়ি হর্ন দিচ্ছিল। কি যেন ভাবছে!

মানুষটি এবার কি ভেবে বলল, এ হারামের নাম সামসুর রহমান।

আমি বললাম, এখানে কোন কাজটাজ পাওয়া যাবে না?

—কি কাজ করবে?

—এই যে কোন কাজ।

দুজনই কিছুটা এবারে স্বাভাবিক হয়ে আসছি।

—তোমার বাবা-মা আছেন?

—আছেন।

—পড়াশোনা করেছ?

—করেছি।

—তোমার তো পড়াশোনার বয়স। কাজ করবে কি?

—না, আমাকে একটা কাজ দিন। যে কোন কাজ। বলতে সাহস হল না, ন' বিষয়ে পাস করা লোকটার সঙ্গে দেখা করার জন্য বের হয়েছিলাম। কত বড় আহাম্মক হলে এটা হয়, এখন বুঝতে পারছি। মনের মধ্যে একটা বিড়াল এতদিন বাঘের মতো হালুম ডাক ছিল—ঘুরেফিরে মনে হয়েছে বেড়াল বেশি হলে ইঁদুর মেরে খেতে পারে। হরিণের মাংস সে পাবে কোত্থেকে? আসলে এই প্রথম আমার বোধোদয় ঘটল। মানুষই মানুষকে ভালবাসে। মানুষই মানুষকে বাস্তুচ্যুত করে। আবার আশ্রয় দেয়, খাদ্য দেয়। মানুষ স্বার্থপর, কুটিল, হিংস্র, নিরাভরণ, যখন যা দরকার তার সবই ঘটে।

—যে কোন কাজ তুমি পারবে কেন? চোখ মুখ তো সে কথা বলে না।

আমাকে আবার চুপ করে থাকতে দেখে মানুষটি বলল, ঠিক আছে। এখনকার মতো দশ আনা রেখে দাও। আমার ফিরতে রাত হবে। পাঁড়েজীর দোকানে দুপুরে খেয়ে নেবে। ভাত, মাছ, ডাল। ফ্লাস্কে চা আছে—ও আর খেতে হবে না। খেতে ইচ্ছে হলে দোকানে চলে যাবে। বলেই মুখ বার করে দোকানটা দেখিয়ে দিল।

—চা তো খাই না।

—চা খাও না। অসুখ আছে?

—না। চা খাই না। আসলে আমাদের পরিবারের ভূগোলটাই ছিল আলাদা। বাবা চা, ধূমপান, মদ্যপান—একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ মিলে দুই সমকোণ ধরে নিয়েছিলেন। দেশের বাড়িতে মঞ্জু আমাকে চা খাইয়ে কী না বিড়ম্বনায় ফেলে দিয়েছিল। মঞ্জু শহরে থাকত। গ্রীষ্মের ছুটি, পূজার ছুটি হলেই বাড়ি। স্কুল ছিল আমাদের গঞ্জে। মঞ্জুর বাবা অবিনাশ কবিরাজ প্রতি সোমবার এক প্যাকেট ব্রুকবণ্ড আনতে দিত। সোনালী মোড়কে সেই আশ্চর্য বস্তুটির ঘ্রাণ আমার নাকে লেগে থাকত। ফলে লোভ, লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মঞ্জু লোভ দেখিয়ে গোপনে এক কাপ চা খাইয়েছিল। তার পরই ভয়, বাবা যদি জেনে ফেলে, প্রায় হাঁটু মুড়ে মঞ্জুকে বলেছিলাম, বলিস না। বললে মেরে ফেলবে। আর তারপর থেকেই মঞ্জুর ব্যক্তিগত ফাইফরমাস বেড়ে গেল। চন্দনের গোটা চাই। পুতুলের বিয়েতে কুচফল চাই। জল থেকে সাঁতরে এনে দিতে হবে কলমি লতার ফুল। পুতুলের ঘর ছাইতে হবে। মোটামুটি সে আমাকে যথেচ্ছ ব্যবহারের এত সুযোগ পেয়েও শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। চা না খাওয়াটাই ভাল মানুষের লক্ষণ। আমার পক্ষে বাড়তি বিপজ্জনক কিছু করা এ সময় আর ঠিক হবে না। ফের বললাম, সত্যি বিশ্বাস করুন, চা খাই না।

মানুষটি এবার উঠে বের হয়ে গেল। যাবার সময় শুধু বলে গেল, পাঁড়েজী দশ আনা—দশ আনায় মিল দেবে পেট ভরে খাবে।

দুটো খাঁজকাটা চৌ-আনি, একটা দো-আনি, মোট দশ আনি। দশ আনায় পেট ভরে ভাত। দশ আনা কত বড় ব্যাপার, এ সময় আমার চোখমুখ না দেখলে বোঝা যাবে না। বাইরে রোদ উঠেছে। তারে জামাপ্যাণ্ট মেলা দরকার। কালো রঙের চেক-কাটা লুঙ্গিটা সাইজে বড়। কালো রঙের ফতুয়াটা ঢোলা। বামুনের ছেলের পক্ষে বড় বেশি বেমানান। ওটা পরে বের হতে লজ্জা করছিল। কিন্তু আয়নায় যখন দেখলাম, বামুনের ছেলেকে লুঙ্গি পরে খারাপ দেখাচ্ছে না, তখন নিশ্চিন্তে বের হওয়া যাক। পয়সা ক'টা হাতছাড়া করছি না। সেই ট্রেনে চড়ে যাব, টিকিট কেটে যাব, লাটসাহেবের মত বাঙ্কে পড়ে ঘুমোব এবং চেকার এলে ইদুরছানা ভয়ে মরে করতে হবে না—আসলে পয়সা থাকলে কত না কাব্য হয়—আর কাব্য করতে গিয়ে কাল—টিকিট কেটে যাও বা ছিল, এটা ওটা খেয়ে শেষ। বামুন হলে যা হয়। অভাবী হলে যা হয়। পয়সা হাতে থাকলেই খাই খাই—সব খাই, কমলালেবু খাই, লজেন্স খাই, ঝালমুড়ি খাই—খেতে খেতে কখন ট্রেনে ভিড়ের চাপে উড়ন্ত চাকির মত প্ল্যাটফরমে ভেসে পড়েছিলাম, মনে করতে পারছি না। পেট ভরে খেলে বোধহয় বাকিটা মনে পড়বে। পয়সা কটা মুঠো করা। বাইরে বের হতেই ছিমছাম বাড়িটা থেকে পাখির মতো এক বালিকা উড়ে এল সাইকেলে। একেবারে সামনে।

তাড়াতাড়ি এবাউট টার্ন। আবার ভিতরে। খেতে পাব ভেবে লজ্জা-সরম যা একদিন উবে গিয়েছিল তা আবার ফিরে এসেছে। এতদিন মনেই হয় নি কেউ আমায় দেখে। হাতে দশ আনা পয়সা আসতেই নিজের অস্তিত্ব ফের টের পাচ্ছি। পয়সার এত বড় মাহাত্ম্য। চুপি দিয়ে দেখছি মেয়েটা আবার ভিতরে কখন ঢুকে যায়। আর যাই করা যাক, একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া গায় দিয়ে একজন কিশোরের পক্ষে কোন কিশোরীর সামনে যাওয়া যায় না। মেয়েটা টুক করে ভিতরে ঢুকে গেলে আমিও টুক করে তারে জামাপ্যাণ্ট ফেলে আবার ঘরে। একের পর এক ধাক্কা খেয়ে সকালবেলায়ও চারপাশটা ভাল করে দেখা হয় নি। ছিমছাম সাদা রঙের বাড়ি—বাংলো গোছের—এই পর্যন্ত। বাড়িটার লাগোয়া বেশ বড় একটি ফুল-ফলের বাগান, পুকুর আছে। ঘরের উত্তরের জানলাটা খুলতেই তা দেখা গেল।

মেয়েটা ভেতরে কোথায় যায়, কোন্ রহস্যময় জগৎ থেকে বা ভেসে এল—দেখা দিয়ে আবার উধাও—পালিয়ে চুপি চুপি দেখছি। আশ্চর্য মায়াময় ছায়ায় ঘেরা

এক পৃথিবী। সেখানে মেয়েটা গাছে সাইকেল হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাউকে ডাকছে। সাইকেল পেলে আমিও দু'একবার চেষ্টা করেছি শেখার। পারি নি। মেয়েটি পারে। আমি কেমন মুগ্ধ বিস্ময়ে ফ্রকপরা বালিকাটিকে দেখছিলাম। গাছের মতো ঋজু এক বালিকা দাঁড়িয়ে আছে। আর একটু বাদেই আমি পেট ভরে খেতে পাব। আয়নায় মুখ দেখা যাচ্ছে। লুঙ্গি পরে যাই কি করে? তারপরই দেখলাম, সাদা ফ্রকপরা মেয়েটা কোথায় অদৃশ্য। চিঠি দিলে পিলুকে লিখতে হবে, জানিস পিলু, সার্কাসের একটা মেয়ে এখানে থাকে। সাইকেল চালাতে জানে। স্বচক্ষে দেখেছি, বিশ্বাস ন হয় তুই আসিস, তোকে দেখাব।

মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে যেতেই কেমন জায়গাটা ফাঁকা এবং অর্থহীন হয়ে গেল। বসে থেকে লাভ নেই। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বড় কাজ পাঁড়েজীর দোকান খুঁজে বের করা। স্টেশন রোডে গেলে পাওয়া যাবে। সেটা কত দূর জানা নেই। যা দিন-কাল, সব মানুষ রাক্ষুসে হয়ে আছে, আগে থেকে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই ভাল। কিন্তু মুশকিল, লুঙ্গি আর ফতুয়া। মেয়েটিকে দেখার পর আমি মুশকিলাসান হয়ে গেছি। হাতে সেঁজবাতি আর গলায় পাথরের মালা—ব্যস। ষোল আনা কাজ শেষ। কালো অন্ধকারে কিম্ভূতাকার সেই মানুষের মতো এখন লাগছে নিজেকে। তবে ক্ষুধার তাড়নার কাছে মান-সম্মান বালাই ষাট। লুঙ্গি তুলে খিঁচে এক দৌড় মারব। রাস্তায় পড়লে কে আর কার চেনা। যত অসুবিধা, আম গাছ, জুঁই গাছ, রঙ্গন ফুলের গাছের মাঝখানে। বাংলোবাড়িটা উঠোনে বের হলেই দেখা যায়। ব্যালকনিতে যদি সে দাঁড়িয়ে থাকে। গলা বাড়ালাম। নেই। চুপি চুপি বের হলাম। লুঙ্গি খিঁচে দৌড়। আ-হা-হা আবার সাইকেল। পাক খাচ্ছে। দৌড় দৌড়। সোজা ঘরে। দেখার আগেই দরজার আড়ালে। এ আবার কী বিড়ম্বনা শুরু হল। খেতে যেতে পর্যন্ত দেবে না।

উঁকি দিলাম। সামনের উঠোনটা ফাঁকা। পেয়ারা গাছটা একা দাঁড়িয়ে। নীচে খাটিয়া পাতা, রাস্তায় লোকজন, গাড়ি, রিকশা এবং প্রসন্ন রোদ। গুরুদোয়ারাতে ভজন হচ্ছে। লুঙ্গিটা তুলে দিলাম। লুঙ্গিটা তুলে না নিলে তাড়াতাড়ি ছোটা যাবে না। জড়িয়ে গিয়ে রাস্তাঘাটে চৌপাট হলে আবার দশ রকমের প্রশ্ন—কোন্ বাড়ির ছেলে—আহা লাগল না তো? ওঠো ওঠো, গাড়ি আসছে, এত সবের পর ভাত খেতে লেট হয়ে যেতে পারে। পেট পুরে খাওয়া ভাবা যায় না। এ কদিন বেশ ছিলাম, অনাহারে সয়ে গেলে যা হয়। কেমন বোধগম্যি-হীন এক তরুণ—রাস্তায় হেঁটে বেড়ায়। চোখে ঘোলা ঘোলা দেখা—পৃথিবীতে তখন অন্তরকমের মজা দেখা যায়। সকালে পেটে কিছু পড়তেই পুরনো

রোগটার উদ্রেক হয়েছে। পেটে ক্ষুধার জ্বালা। মেয়েটা বুঝতে পারে না কেন এ-সময় সাইকেলে পাক খেলে ক্ষুধার্ত ছেলেটির পথ আগলে থাকা হয়।

ফাঁকা দেখে বের হওয়া মাত্র সহসা পাঁচিল থেকে মুখ বাড়িয়ে ঘেউ করে উঠল একটা কুকুর। এই রে—আমাকে ধরার জন্য পাঁচিল খামচাচ্ছে। নতুন লোকের গন্ধ পেয়ে ক্ষেপে গেছে! বুঝতে পেরেছে, কাছেই চোর-বাটপাড়ের আস্তানা। মনে মনে আওড়ালাম, সব লিখে রেখেছি। টাকা মান যশ হলে কড়া-ক্রান্তি মিটিয়ে দেব। তুমি একখানা বিলিতি কুকুর। তোমার মান-সম্মানই আলাদা। আমায় ছেড়ে দাও বাছা।

মুশকিল হচ্ছে, এখনও ঘরে আছি। বিলাইতি পাঁচিল টপকালে দরজা বন্ধ করে দেব। বোঝাই যাচ্ছে, বাংলোবাড়ির শখের কুকুর। উঠোনে নেমে গেলে, বিলাইতি পাঁচিল টপকাতে না পারুক, সদর দিয়ে বের হয়ে আসতে পারে। সুতরাং এ বেলার মতো আমার আর খাওয়া হল না বোধ হয়। রহমানদা না ফিরলে কিছু হচ্ছে না।

ঘরে পায়চারি করছি। একটা টেবিলক্লক দেয়াল-আলমারিতে। টিকটিক করছে। দশটা, দশটা এক মিনিট, দু' মিনিট—মিনিটের কাঁটাও এত লম্বা হয়! ভারি অস্বস্তি বোধ করছি। আমাকে নিয়ে তোমরা মজা পেয়ে গেছ! দেখাচ্ছি—দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ফের চাবি দিয়ে সোজা চোখ বুজে দৌড়। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। রোয়াক পর্যন্ত দৌড়ে এসেই টের পেলাম, পেছনে আমার লুঙ্গি কে খিঁচে ধরেছে! পালাতে হলে লুঙ্গি খুলে পালাতে হয়। এমন অব্যবস্থার ভেতর আমি জীবনেও পড়ি নি। পেছনে চোখ খুলতেই অবাক। বিলাইতি আমার লুঙ্গিটা চামড়া ছেঁড়ার মতো টেনে পালাতে চাইছে। বিকট কুকুরের এই অসম্ভ্রান্ত আচরণে মর্মাহত তরুণ ফের চোখ বুজে ফেলল ভয়ে। বাবার ঈশ্বর কত করুণাঘন, টের পেল সে। আর তখনই সাইকেলওয়ালী কোথা থেকে উদয়। খিলখিল করে হাসছে। মা-মা, দেখ টাইগারের কাণ্ড।

দোতলার ব্যালকনি থেকে কারো গম্ভীর গলা, এ কি অসভ্যতা হচ্ছে টাইগার। রুমকি, তুমিই বা কেমন, দাঁড়িয়ে হা-হা করে হাসছ! লোকটা কে রে?

বলতে পারতাম মা জননী, আমি বিলু। বাবার সুপুত্র, জীবনের সব বিষয়ে পাস কৃতী ছেলে। কিন্তু বা অবস্থা, গলা শুকিয়ে কাঠ। দু'হাতে লুঙ্গি চেপে ধরে আছি কোমরে। কথা বের হচ্ছে না। আসলে তোতলাচ্ছি ভয়ে।

—এই, ছেড়ে দে—ছেড়ে দে বলছি। বুঝতে পারছিলাম, আমার মত হতভাগার লুঙ্গি কামড়ে ধরায় বিলাইতির ইজ্জত গেছে। সাইকেলওয়ালী ধমকাচ্ছে কুকুরটাকে।

—কে রে লোকটা ? ব্যালকনি থেকে কের হাঁক।

—এই, ছাড়, কে জানি না তো। ছাড় বলছি। টাইগার, ভাল হবে না—কোন রকমে বললাম, রহমানদা দশ আনা পয়সা দিয়েছে। সত্যি বলছি, চুরি করি নি।

হাতের মুঠোর পয়সা ক'টা খুলে দেখালাম।

—রহমান কে হয় ?

চোখ বুজেই বলছি, কে হয়—কুকুরটাকে বলুন না ছেড়ে দিতে। খুব ভাল কুকুর। ভারি ভদ্র। কে হয় মনে করতে পারছি না।

—ছেড়ে দেবে ? তুমি এখানে কেন ? সময় হলেই দেবে।

—কুকুরটা কি দামী না। কত ভাল। আপনার কুকুর বুঝি। কুকুরের শিক্ষা-দীক্ষা আছে।

রুমকির শাসনের গলা, জানালা খুলে বাগানে কি দেখছিলে ? কুকুরের শিক্ষা-দীক্ষা নিয়ে তোমায় ভাবতে হবে না।

অপরাধ টের পেয়ে গেছে। স্বীকারোক্তি চায়—আর খুলব না।

—রহমান তোমার কে হয় ?

—দাদা হয়।

—কেমন দাদা ?

—কেমন দাদা! তাই তো—কেমন দাদা হয় জিজ্ঞেস করা হয় নি। বললাম, অরে কন ছাইড়া দিতে। বুঝতে পারছিলাম, সম্বিত হারাবার আগের অবস্থা। না হলে আমার মাতৃভাষা মুখ থেকে খসে যাবে কেন!

—মা, ছেলেটা বাঙ্গাল! মিছে কথা বলছে।

—সত্যি কই, বিশ্বাস করেন, আমি বাঙ্গাল না। রহমানদা আমার সত্যিকারের দাদা হয়। আর তখনই মনে হল, গেল, সব গেল। করছি কি! নিজের মাতৃভাষাটিকে কিছুতেই সামলাতে পারছি না। হড় হড় করে যে বমি ওঠার মতো উঠে আসছে। যা এখানে আসার পর চেপেচুপে রেখেছি, বিলাইতির ডরে ফাঁস। আসলে মাথা ঠিক নেই। ববকাটা সুন্দর মতো মেয়েটা যে এত প্রশ্ন করতে জানে, ভাবতেই পারি নি। দাদা বলেছি, বিশ্বাস হয় নি। চাচা বলব। আমার কাছে এখন দাদা চাচা সমান। ছাড়া পেতে চাইছি।

—বাঙ্গাল তো এখানে কেন ?

সেই তো। বাঙ্গাল, বাঙ্গালদের দেশে থাকবে। এখানে কেন ? হক কথা।

—যেখানে সেখানে বাঙ্গাল দেখা যাচ্ছে। দেশটার যে কী হবে!

তাই মা দেশটার বড়ই অধোগতি। আপাতত ছেড়ে দিতে বলুন। এত সব ভেবেই যাচ্ছি। কিন্তু বলতে পারছি না কিছু। একবার ফস করে মুখ থেকে মাতৃভাষা বের হয়ে যাওয়ায় বড়ই করুণ অবস্থা। যাও সহৃদয়তা পাওয়া যাবে ভেবেছিলাম, বাঙ্গাল বলে সেটাও গেল বুঝি!

রুমকি এবার কুকুরটার বকলস ধরে ফেলল। এক হাতে সাইকেল, আর এক হাতে বিলাইতি। হুকুম হল, যাও। জানালা খুলবে না। জানালা খুললে মা রাগ করে।

ছাড়া পেয়ে ছুটতে ইচ্ছে হল। ছুটতে গিয়ে মনে হল কাপুরুষতার লক্ষণ। রুমকি হা-হা করে আবার হাসবে। রুমকি হাসলে আমার খারাপ লাগবে। বেশ একজন সবল মানুষের মতো হাঁটার চেষ্টা করছি। ফতুয়া ঝেড়ে লুঙ্গি ঝেড়ে এই ধুলোবালি লাগার মতো আর কি, কিন্তু ঝাড়তে গিয়েই টের পেলাম, লুঙ্গির পেছনটা খাবলাখানেক বিলাইতি হজম করে নিয়েছে। একজন মানুষের পেছনে খাবলাখানেক নেই ভাবা যায় না। হাঁটছি আর ভাবছি, কি করা যায়—ঘুরিয়ে লুঙ্গিটা সামনে নিয়ে এসেও খাবলাখানেককে হজম করা গেল না। কেবল হাঁটুর উপর লুঙ্গিটা কোঁচার মতো ধরে রাখলে কিছুটা সামাল দেওয়া যায়। কিন্তু হাঁটুর উপর বেশি তুলতে গেলে কি হবে কে জানে? অনভ্যাসের ফোঁটা কপালে চড়চড় করে। ফলে খুবই সন্তর্পণে অঙ্গ ঢাকাঢাকি চলছে। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। পাম গাছগুলি দেখা যায়। স্টেশন রোড বিজ্ঞাপনের গায়ে লেখা। পাঁড়েজীর দোকান একেবারে সামনে। মাছ ভাজার গন্ধ। নিমেষে সব দুঃখ হাওয়া। খাওয়া বাদে মানুষের আর কোন অস্তিত্ব আছে, এ মুহূর্তে বিশ্বাস করতে ভাল লাগল না। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিস্ময়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি—তার নাম খাওয়া। চোখ বড় বড় হয়ে গেল।

খড়ের ছাউনির নীচে পাকা মেঝে। একপাশে ভুঁড়িয়ালা একজন মানুষ ক্যাশ-বাক্স আগলে বসে আছে। উপরে টিনের পাতে লেখা, 'রামভরসা হোটেল'। নীচে স্বাক্ষর পাঁড়েজীর। এবং এক কোণায় ঝুড়ির মধ্যে ভাজা মাছ—হাঁড়িতে ডাল সেদ্ধ হচ্ছে। খদ্দের এখনও লাগে নি। আমি বোধ হয় প্রথম খদ্দের। ঢুকতেই বলল, হোয়া নেহি।

কি হয় নি, বোঝা গেল না। আমাকে চিনতে পেরেছে যেন। রোজকার খদ্দের যেমনটা হয় আর কি। দাঁড়িয়ে আছি দেখে কিছুটা অস্বস্তি। তালপাতার পাখায় হাওয়া খাচ্ছে। মাছি ভনভন করে উড়ছে। কারণ পাশেই কাঁচা নর্দমা। মাঝে মাঝে ভাজাভুজির গন্ধ বেমালুম হাপিস করে দিচ্ছে পচা নর্দমার দুর্গন্ধ। তবে

ক্ষুধার্তের নাক কান চোখ বোধহয় বেশি খোলা থাকে। অনেক দূর থেকেই টের পাচ্ছিলাম সেদ্ধ ভাতের ঘ্রাণ। এখন বুঝতে পারছি, আসলে ছলনা। সব কিছুর মতো নিজের বিবেককেও ছলনা করছে। সব সময় খাব বলে বুঁদ হয়ে থাকলে বিবেকেরই বা আর দোষ কি। পাঁড়েজী তখন বলল, ঘুমকে আও। রহমান সাব বোলে গেছে।

যে সাব রাতে এত কাণ্ডজ্ঞানশূন্য থাকে, সকালে তার চারপাশে এত সতর্ক নজর! যাবার আগে বলে গেছে। কোথায় যায়, কী করে মানুষটা। মানুষটা সম্পর্কে কেমন ধন্দের মধ্যে পড়ে আছি। ঘুমকে আও যখন বলেছে, তখন পেয়ারা গাছটার কথা মনে পড়ল। নিচে খাটিয়া পাতা। সেখানে ফিরে লম্বা হয়ে থাকতে পারি। তাছাড়া ঘুমকে আও কতটা সময়ের মধ্যে—পাঁড়েজী আবার বলল, ঘুমকে আও। ভাত ডাল মাছ সব্জি—দেখলাম বাবার মতো লোকটার কাছেও একটা লম্বা লাল মলাটের খেরো খাতা আছে। তাতে কিছু লেখা। এই খেরো খাতাটা না থাকলে বুঝি জীবন সম্পূর্ণ হয় না।

লোকটা এবার বিরক্ত হয়ে বলল, বুলছি না ঘুমকে আও। আর দেরি করা গেল না। মানুষ আমাকে দেখলে বিরক্ত হয় কেন? পাছে রাগ করে, বের হয়ে পড়লাম। বলতে সাহস হল না, কখন? কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করে আবার ফিরে আসতেই পাঁড়েজীর পাথার হাওয়া খুব বেড়ে গেল। হাঁটু নাচাচ্ছে। এখনও তবে ঘুমকে আও। রোদ মাথার উপর—খাটিয়া বেশ মন্দ না, কিন্তু যেই না ব্যালকনিটা মাঠ থেকে চোখে ভেসে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে এবাউট টার্ন। ওখানে জানালা খুললে কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়।

পালাবার সময় মনে হয়েছিল, পৃথিবীর সবাই আত্মীয়। শুধু মা-বাবাই আমার সঙ্গে শত্রুতা করে গেল। এখন বুঝতে পারছি, পৃথিবীতে আত্মীয়ের বড় আকাল। সবাই স্টেশনে তল্পিতল্পা নিয়ে বসে আছে। গাড়ি এলেই উঠে যাবে। আমার মতো মানুষ সামনে ঘোরাফেরা করলে কখন কি না জানি খোয়া যায়। যেভাবে বাসে ট্রেনে সর্বত্র লেখা, পকেটমার হইতে সাবধান—মানুষের আর দোষ কি। শুধু বাড়ি ফিরে গেলেই আবার বিলু হয়ে যেতে পারি—কিন্তু চিরকুটে যে লেখা আছে, আমি ফিরছি না। মানুষ না হয়ে ফিরছি না। সাত-আট দিন পর ফিরে গেলে মনুষ্যত্বের অবমাননা। হেরে যাবার লজ্জা! পিলু পর্যন্ত বলবে, তুই না দাদা, একটা কি! বাড়িঘর ছেড়ে কেউ পালায়। মা-বাবার মতো নিজের মানুষ আর কে আছে রে?

সবই বুঝি রে পিলু। জাঁতাকলে পড়ে গেলে বুঝতিস। রহমানদাকে বলেছি,

একটা কাজের কথা। এটা একটা জংশন স্টেশন। সব ঘুরে দেখা হয় নি। ফাঁকা ফাঁকা ঘরবাড়ি। দূরে পাহাড় দেখা যায়। তুই এলে একদিন আমরা পাহাড়টায় ঘুরে আসব।

আবার পাঁড়েজীর দোকান। পা দুটোও বলি, ঘুরে-ফিরে আর কোনদিকে যেতে জানে না। যেন গণ্ডি এঁকে দিয়ে গেছে কেউ। এবারে নিজেই বললাম, হোক না। দাঁড়িয়ে আছি। হলেই বসে পড়ব। কেউ কেউ খাচ্ছে। আমায় দিচ্ছে না কেন! অবশ্য প্রশ্নকর্তার আর বেশি কথার হক নেই। কারণ পাঁড়েজী বড়ই সদয় এবার—সবজি হোয়ারে?

—থোড়া বাকি হ্যায়।

—থোড়া বাকি হ্যায় তো কিয়া হ্যায়? হামকো বৈঠনে দিজিয়ে না। আসলে মেহমান আমি, সবজি না দিলে আপ্যায়নে ত্রুটি থেকে যাবে।

—না বেটা, রহমান সাব বহুত গোঁসা করবে। বহুত মেজাজী আদমি আছে। তিন কিসিম নেই দেনে সে হুজ্জোতি করবে।

তাহলে রহমানদাকে পাঁড়েজী ভয় পায়। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছিল! অহংকারী হয়ে গেলাম। বেশ গম্ভীর গলায় বললাম, পাত্ত লাগাইয়ে, ভাত-ডাল পয়লা দিজিয়ে তো। বলে আর অপেক্ষা করা গেল না। একটা চাটাই পেতে সোজা নিজের গরজেই পদ্মাশন।

পাঁড়েজীর লোক শালপাতা দিল। সেটার গন্ধ শুঁকে নিচে বিছিয়ে রাখলাম। খুরিতে জল। জল ছিটিয়ে যতটা পারা যায় সাফসোফ করে ভাতের ঝুড়ির দিকে তাকিয়ে আছি। আসছে। আমার পাশের লোকটি ওম ব্রহ্মনেভ্য নমঃ করে গণ্ডূষ করছে। ভাত মাখছে ডাল দিয়ে। রসনা বড় বেশি সিক্ত। তাড়াতাড়ি জল খেলাম। এভাবে ক্ষুধার দুর্বলতাকে কিছুটা পরিহার করা। আসলে আমার তর সইছিল না। শালপাতায় ভাত পড়লে ডাল দেবার ফুরসত দিলাম না। শেষ। লোকটা ডালের হাতা নিয়ে সামনে থ। নিজেকে সামলে নিলাম। ক্ষুধায় এতটা বুঁদ হয়ে থাকা ঠিক না। স্বাভাবিক মানুষের আচরণ ভুলে যাচ্ছি। এবারে ডাল দিলে, একটু চেটে দেখলাম। ভাত আসছে। ভাতের সঙ্গে ডাল, তারপর গোগ্রাসে হাত চালাচালি—শেষ। হঠাৎ খটাস শব্দ। পাঁড়েজীর পাখা হাত থেকে পড়ে গেছে। আমি বোকার মতো বললাম, না এই খাচ্ছি, খাওয়া তো। অনেক দিন পর খাওয়া তো আর বলা হল না। রহমানদার সম্মানে লাগতে পারে। বললাম, বেশ রান্না। সবজি এসে গেল। ভাত নেই। পাঁড়েজী কি রাগ করছে! এক বেলায় আর কতটা রাগ বাড়তে পারে। সুসময় তো

মানুষের সব সময় আসে না। যখন এসেছে, তার সদ্ব্যবহার করাই ভাল। বাবা বলেছেন, হাতের পাঁচ ছাড়তে নেই। যখন সুযোগ এসে গেছে, তাকে অবহেলা করা ঠিক না। ভাতের অপেক্ষায় সোজা হয়ে বসলাম।

পাঁড়েজী এবং ঠাকুরের মধ্যে ইশারায় কিছু কথা হল। চোখ তুলতেই সেটা লক্ষ্য করলাম। ভাত দিতে এত দেরি হয় কেন। ছুটো না হয় বেশিই খাচ্ছি। খেতে দিয়ে বসিয়ে রাখলে নিন্দা হবে। হোটেলের বদনাম হবে। বললাম, ঠাকুর, ভাত। ভাত মাছ এল। মেখে মনে হল, ভাত আর একটু লাগবে। হাতায় ঠাকুরের ভাত উঠতে চাইছে না। আবার ভাত চাইলাম। পাঁড়েজীর হাঁটু নড়া বেড়ে যাচ্ছে। আমার কী দোষ, রহমানদা বলে দিয়েছে, পেট ভরে খেতে। পেট না ভরলে আমি কী করব। আমি তো আর শত্রুতা করে বেশি খাচ্ছি না। কারো অনিষ্ট হয়, এটা আমি কখনও চাইও না। খেতে বসে কম খেয়ে উঠি কী করে?

ভাত মাখতে গিয়ে মনে হল, একটু ঝোল হলে বেশ হয়। ঠাকুর, তোমার ঝোল একটু বেশি হবে?

পাঁড়েজী বলল, ঝোল মাংভারে?

ঠাকুর আমার কথা শুনতে পায় নি। দোষ নেই। এক হাতে সব খদ্দের সামলাচ্ছে। আমার দিকে নজর দেবার ফুরসত কম হতেই পারে। আপাতত খেয়ে নেয়া যাক। ঝোল দিলে ফের ভাত চেয়ে নেব। না দিয়ে পারবে না। ঝোল আছে, ভাত নেই, খদ্দের বলতে কথা। কী হল! শেষ, তবু ঠাকুর তাকাচ্ছে না। কড়াইয়ে খুন্তি চালাচ্ছে তার তাবৎ শক্তি প্রয়োগ করে। খুব জোর দেখাচ্ছ ঠাকুর। পেট ভরে খেলে সবই হয়। আমারও হবে।

খালি পাতে গ্যাঁট হয়ে বসে আছি দেখে পাঁড়েজীর বোধ হয় ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে। উঠে দাঁড়াল। ভাবলাম, বাড়াবাড়ি ভাল না। বিদেশ-বিভুঁয়ে মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা দরকার। সম্পর্ক নষ্ট করে লাভ নেই। এক বেলা একটু কম খেলে মরে যাব না। পাঁড়েজীর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্যই উঠে দাঁড়ানো গেল। দেখে মনে হল, পাঁড়েজীর যেন ধড়ে প্রাণ এসেছে। সান্ত্বনা দেওয়া দরকার ছিল। রোজ এমন হবে না। অনেকদিন পর তো। সব ঠিকঠাক হয়ে গেলে এভাবে আর মরা মাছের মতো আমার দিকে তাকাতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা ঘুরে গেল। পয়সা দশ আনা ঠিক আছে তো। এর পর যদি পয়সার খামতি হয়, যেভাবে রমকি আর বিলাইতির হেনস্থা, কখন কোথায় কি ছিটকে পড়েছে কে জানে? ফাতুয়ার পকেটে হাত দিলাম—আছে। বের

করে গুনে দেখলাম, আছে। ঠিক আছে। কোথাও কিছু ছিটকে পড়ে নি। দশ আনা পয়সা দেবার সময় তিন বার গুনে তারপর হাতে দিয়ে বললাম, দো চৌ-আনি। এই দু-আনি। মোট দশ আনা। মনে মনে বললাম, পাঁড়েজী, কথা ঠিক রেখেছি। তুমি রাখলে না। আরও দুটো খেলে ঠিক হত।

বাইরে বের হয়ে আসতেই খর রোদ মাথার উপর। দূরে ট্রেন যাচ্ছে। টং-লিং টং-লিং শব্দ। মগজের মধ্যে ঘুমপাড়ানির গান কেউ গেয়ে যায়। সুস্বাদু আহারের পর কোন গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে। সেই গাছটার নিচে খাটিয়া। দেওড়ি শুধু পার হয়ে যাওয়া। রাজপুত্র কোটালপুত্রের গল্প মনে আসে। পদ্মমানিক হাতে। কোথাও রাজকন্যা শুয়ে পায়ে রূপোর কাঠি, মাথায় সোনার কাঠি। ঘুমে অচেতন। রাক্ষস-খোক্কসেরা গেছে যুদ্ধ করতে। বন্দিনী রাজকন্যার জন্য রাজপুত্রের হাহাকার। কখনও মনে হয়, তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে যাচ্ছে একটা সবল লাল রঙের ঘোড়া—রাস্তা আর ফুরোয় না, ঘোড়াটা কদম দিচ্ছে—রাত হয়, আকাশে নক্ষত্র ওঠে। গভীর বনভূমিতে রাজপুত্র পথ হারায়। কোথায় যে সেই রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব, মাঠটা পার হয়ে খুঁজছি! দেখি রাজকন্যাও নেই, রাজত্বও নেই। ব্যাঙ্কনিতে আম গাছের ফাঁকে শুধু কুকুরের বকলস ধরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।

এই রে! সেই কুকুরটা! দেখার সঙ্গে সঙ্গে এক মহাপ্লাবনের ছবি। টুক করে পোয়ারা গাছ আর খাটিয়াটা চোখের ওপর থেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। জায়গাটায় আর কিছু নেই—শুধু প্লাবনের জল থিকথিক করছে। জলে নাক জাগিয়ে রেখেছে শয়তান কুকুরটা। কাছে পেলেই খক করে কামড়ে ধরবে।

আর যাই! বরং স্টেশনের দিকে গেলে হয়। সেখানে একটা শোবার জায়গা মিলে যাবে। আমাকে আবার দেখছে না তো। টুক করে মাথাটা শেডের পাশে আড়াল করে দিলাম। এই সেই ছোকরা যে জানালা খুলে গোপনে কিছু দেখার চেষ্টা করছিল! রহমানদাকে নালিশও দিতে পারে। পাঁড়েজীও বলতে পারে, কি লড়কা আদমি ভেজিয়েছিলে সাব, পাতে ভাত পড়ে থাকে না, ডালও পড়ে থাকে না। কেবল কব্‌জি ডুবিয়ে রাক্ষসের মতো খায়। তা খেয়েছি। তাই বলে, রাক্ষস নই। অভাবী মানুষের এটা হয়। আবার কবে খাবার জুটবে, ভয়ে ভয়ে বেশি খেয়ে ফেলে। খুব দোষের না।

আসলে একা হয়ে গেলে মানুষ নিজের সঙ্গেই বেশি কথা বলে। এই সাত-আট দিনে টের পেয়েছি, কত শত কোটি কথা মনের মধ্যে বুড়বুড়ি দিয়েছে। নিজের সঙ্গেই বোধ হয় মানুষ প্রিয় কথা বলতে ভালবাসে। রুমকিটা কি! আমাকে

মানুষের মধ্যে গ্রাহ্য করল না। পেটে দানা পড়ার পর অপমানটা খুব গুড়গুড় করছে। তখনও দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে। ফিরলেই আবার কুকুরটাকে লেলিয়ে দেবে। এত নিষ্ঠুর হয় মানুষ! নিজের দিকে তাকিয়ে অবশ্য খুব জোর থাকল না। রাস্তায় লোকজন আমাকে কেউ দেখছেই না! এত বড় পৃথিবীতে একেবারে উহ্য হয়ে আছি—অথবা একেই বুঝি বলে ছায়াবিহীন মানুষ। পেছন ফিরে দেখলাম, ছায়াটা ঠিক আছে তো! নেই। এই রে! ওঃ, এটা তো একটা শেডের তলা। বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই নিজের আত্মবিশ্বাস ফিরে এল। আমার ছায়াটা এখনও সঙ্গে আছে। প্রতারণা করে নি। তাহলে আমি মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো এখন যে কোন জায়গায় এ বেলাটা ঘুমিয়ে নিতে পারি। রাতে ঘুম হয় না। ভয়। একা অন্ধকারে মনে হয় সব সময় ভূত দানোদের উপদ্রব। লোক যেখানে গিজগিজ করছে, সেখানেই ঘুম পাবার মতো জায়গা খুঁজি। কিন্তু কেউ ভালবাসে না। কেবল দেখলে দূর ছাই করে।

হাঁটতে হাঁটতে ফাঁকা জায়গায় হাজির। ধান সিঁড়ি ক্ষেত, পরে শালবন। মাঠ চিরে রেল-লাইন চলে গেছে কত দূর। ঘাস, মাঠ এবং বুনো ফুল। নিরিবিলি বেশ। এখানটায় শুয়ে থাকলে কেউ টের পাবে না, কুকুরের ভয়ে এত দূর কেউ চলে আসতে পারে ভাবা যায় না।

কিছু পাখির ডাকে এক সময় ঘুম ভেঙে গেল। বেলা পড়ে গেছে। শরতের বিশাল সবুজ মাঠ সামনে। ধানের ক্ষেত। মাঝে মাঝে উঁচুনীচু পাহাড়ী টিলা। জায়গাটা ভারি সুন্দর। কোন সুন্দর জায়গা দেখলেই মনে হয় পিলুকে নিয়ে আসতে হবে। সে বিশাল মাঠ এবং অরণ্য দেখলে খুশি হয়। পাহাড়ী টিলা, বনজ ফুলের গন্ধ পেলে পাগলা হয়ে যাবে। কিছুদূরেই বোধহয় কোন পাহাড়ী নদী বয়ে গেছে। একটা সাঁকোয় সূর্যাস্তে মানুষের পারাপারের ছবি। এ সব দেখে মনটা কেমন নরম হয়ে যাচ্ছে। বাবাকে কবে যে লিখতে পারব, একটা কাজ পেয়েছি। দুপুরে কাজ। সকালে মর্নিং কলেজ। না হলে প্রাইভেটে পড়াশোনা চালিয়ে যাব। একটা কাজ হলে সব হয়ে যাবে। হাই উঠছিল। কত বড় আকাশ, কত বিশাল এই পৃথিবী, বের হয়ে টের পেয়েছি। শেষ নেই। গাড়ি যায়—আর যায়। গ্রাম মাঠ তেপান্তরের মাঠ পার হয়ে যায়। কত রকম ভাষা মানুষের। কত বিচিত্র পোশাক। যেন এ ক'দিনে পৃথিবীর অনেক গূঢ় গোপন খবর আমি পেয়ে গেছি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আবছা অন্ধকার। দুটো একটা নক্ষত্র এবার উঠবে। ঘাসের মধ্যে কিছু কীটপতঙ্গ লাফালাফি শুরু করে দিয়েছে। আমাকে এবারে উঠতে হয়—বাড়িটায় না ফিরে আর কোথায় যাওয়া

যায়! একটা কুকুর আর একটা মেয়ে জীবনে এত ত্রাসের সৃষ্টি করতে পারে, অনুমানই করতে পারে নি।

স্টেশনে সব সময় মানুষজন থাকে। রাত্রিবাসের পক্ষে ভাল জায়গা। রোয়াকে বসে থাকতে থাকতে কখন কাল ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, রহমানদা আবিষ্কার না করলে ফের স্টেশনেই চলে যেতাম। রহমানদা কখন ফিরে আসবে কে জানে? কিছু বলেও যায় নি। ফিরে এলেও, ভয় কমছে না। একা থাকলেই কুকুরটা আর মেয়েটা পেছনে লাগবে। মানুষ বলে যে ইজ্জত দেয় না, তার পক্ষে সব সম্ভব। টাকা মান যশ হোক তখন দেখব—সব লিখে রাখছি। রহমানদা টের পাবার আগেই এখান থেকে ভেগে পড়া দরকার কি না, এই নিয়ে কূট তর্ক।

যা হোক তবু তো একটা আশ্রয়। মানুষটা ভাল।

দূত্তোরি ভাল। কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেবে যখন?

ও হয় না। কুকুর দিয়ে মানুষ খাওয়ানো যায় না।

যা নিরিবিলি বাড়ি, সব সম্ভব।

আফটার অল মেয়ে তো?

সাইকেলওয়ালী বলুন। সারকাসের জাদুকর একবার আস্ত একটা মুরগী গিলে ফেলেছিল। জাদুকর পারে না, এমন কাজ নেই।

ভিতর থেকে আমার সে বলল, তাড়াতাড়ি যা করার কর। তোমার যা অন্ধকারের ভয়।

তাহলে কি করব? য পলায়তি স জীবতি!

খুব যে সংস্কৃত ওগরাচ্ছ?

আর কি করা। বাবা যে ওটাই কেবল সার জেনেছেন।

তখনই দূরে ঘেউঘেউ করে একটা কুকুর ডাকছে। আর সঙ্গে আমার নাম ধরে কেউ ডাকছে, বিলু, বিলু তুই কোথায়? আমরা তোকে খুঁজছি?

এই রে! আবার। রহমানদা আর সেই মেয়েটা। কুকুরটা এদিকেই ছুটে আসতে আসতে গন্ধ শুঁকছে। দৌড়—দৌড়। রহমানদা চিৎকার করছে, বিলু, যাস না। ফিরে দেখি ঘরের দরজা বন্ধ। কোথায় ঘুরছিলি? পাঁড়েজী বলল, কখন তো খেয়ে চলে গেছে।

কে শোনে কার কথা? কিচ্ছু কানে আসছে না। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখছি; রহমানদা হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। মেয়েটাও রহমানদার মতো কেমন স্তম্ভিত হয়ে গেছে আমার ছোটা দেখে। আর থাকি! নির্ঘাত কোন ষড়যন্ত্র। হলে কি হবে, বিধির বিধান। লাঞ্ছনা কপালে লেখা থাকলে কে খণ্ডায়? সেই

বদমেজাজী শয়তানটা গোটা কয়েক লাফ দিয়ে এসেই পেছন থেকে লুঙ্গি ঝাপটে ধরল। এ শিক্ষাটা যে কার কাছে পেল! না কি কুড়ি টাকা চুরি করার খেসারত। গন্ধটা গায়ে এখনও লেগে আছে। লুঙ্গি খুলে একমাত্র পালাতে পারি। জলজ্যান্ত মেয়েটা না থাকলে কি করতাম জানি না। আর লুঙ্গি খুলে ফেলতে সাহস হল না। থাক ব্যাটা তোর লুঙ্গি নিয়ে, আমি আমার পথ দেখছি বলতে কিঞ্চিত সম্ভ্রমে বাধল।

মরেছি যখন মেরে মরব। যতটা জোরে পারলাম, নিজেকে মুক্ত করার জন্যে লাথি মারতে থাকলাম।

রহমানদা চিৎকার করছে, ছোড়দি কুকুরটাকে সামলাও। বিলুটা ক্ষেপে গেছে। কুকুরটাও ক্ষেপে গেছে।

রুমকিকে রহমানদা ছোড়দি বলে! ছোড়দির তবে এত সব কাণ্ড। ছোড়দি গম্ভীর গলায় বলল, ওকে মের না। টাইগার—টাইগার।

সঙ্গে সঙ্গে টাইগার কি এক জাদুমন্ত্রে আমাকে ছেড়ে দিয়ে কুঁইকুঁই করতে থাকল। ছোড়দির এত প্রভাব।

পালাবার পথ নেই। পেছন থেকে আসছে রুমকি আর রহমানদা। সামনে টাইগার। সত্যি ছোটখাট জ্যান্ত বাঘ। কুকুরটা কত বিশাল, টের করতে পেরে মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

রহমানদা বলল, তুই কী রে? তুই মানে, তোর কি ভালমন্দ জ্ঞানগম্যি নেই? কথা বলছি না।

—বিশ্বাস করে চাবিটাবি সব—তুই কি না—রহমানদা রাগে সব কথা শেষ করতে পারছে না।

—ফিরে দেখি, দরজা বন্ধ। তুই নেই। কোথায় ঘুরছিলি?

কিছু বলতে হয়—এখানে শুয়েছিলাম।

—বন্য স্বভাবের কেন রে তুই?

রুমকি বলল, তুই না রহমান মরবি। আর একবার সেই ছেদি না কি নাম, তোর সব নিয়ে পালাল। বিশ্বাস করে থাকতে দিলি, খেতে দিলি, রাতে একদিন হাওয়া।

রাগ দুঃখ ক্ষোভ—এই সেই পুচকে মেয়েটা—যার দাপটে পরিত্রাহি জীবন আমার—চোখে জ্বালা, রহমানদা পর্যন্ত পুচকিটাকে ছোড়দি বলে! লুঙ্গির খানিকটা কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিয়েছে, বাকিটাও আমার খাইয়ে দিত—পাজিটা কেমন বলছে, রহমান তুই মরবি। বেশ করবে, তোমার কি! তারপরই কি হল কে

জানে, বোধহয় ক্ষোভে মাথা ঠিক ছিল না—এই তো সেই, যে আমাকে এত দূর পর্যন্ত পালিয়ে আসতে উসকে দিয়েছে, কোন দূরবর্তী নক্ষত্র যাকে ভেবেছি—তার এই আচরণ। হঠাৎ বলে ফেললাম, আমি যাব না।

—যাবি না, থাকবি কোথায় ? খাবি কোথায় ?

আবার কথা নেই। আসলে আমি যে বাবা-মার ছেলে, ঘরবাড়ি আছে, পিলু আছে, নবমী আমাকে দা-ঠাকুর বলে, এত সব অহংকার থাকলে যা হয়—অথবা কিছুটা অভিমান, কার উপর জানি না, এ বয়সে এটা বোধহয় খুব বেশি থাকে, না হলে, পালাব কেন ?

—এই, দাঁড়িয়ে থাকলি কেন ? হাঁট। রুমকি শাসাচ্ছে। বাবা আসুক, তোকে পুলিসে দেব। রহমানের চাবি নিয়ে হাওয়া। ভাগ্যিস টাইগার ছিল।

পুলিসকে আমি ভয় করি, আমার বাবা ভয় করে—সেই পুলিস আবার ? জল ঘোলা দেখছি। মুখ শুকিয়ে গেছে। দিতেই পারে। না বলে কয়ে উত্তরের জানালা খুলেছি, না বলে কয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েছি, কুড়ি টাকা চুরি করেছি—এর জন্য কত বছর জেল হয়, জেল না ফাঁসি, নিয়মকানুন পুলিসের একেবারেই জানি না, খুব ভীতু বালকের মতো আর কথা না বলে হাঁটা দিলাম। কিন্তু মনে অস্বস্তি, রুমকির বাবা এলে কি সত্যি আমাকে পুলিসে দেওয়া হবে। তার চেয়ে বরং কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিক না। পুলিসে দাগী আসামীদের ধরে নিয়ে যায়। বাবার সব বিষয়ে পাস করা ছেলেটা শেষ পর্যন্ত দাগী আসামী হয়ে যাবে।

রহমানদা খুব মুখ গম্ভীর করে হাঁটছে। আগে আমি। কুকুরটাকে বকলশে শেকল পরিয়ে রুমকি পেছনে আসছে। যেন পালাতে না পারি। আর পারছিলাম না—এরা আমাকে যদি পুলিসে দেয়, আর বাবা যদি জানতে পারে আমি হাজতে আটকে আছি, বাবার এ-দেশে এসে বাড়িঘর করার গৌরব সব এক সেকেণ্ডে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। বাবা আমার না অপমানে আবার তাঁর ঘরবাড়ি ছেড়ে উধাও হয়ে যায়।

পায়ে জোর পাচ্ছি না। একটা টিলার ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দূরের পাকা সড়কে ট্রাকের শব্দ। গরুর গাড়ির শব্দ। মাঠ থেকে চাষীরা ফিরছে ঘরে। শহরের আলো কেমন মায়াবী পৃথিবীর কথা বলছে। কান পাতলে শস্যক্ষেতের কীটপতঙ্গের আওয়াজ পাওয়া যায়। আর এ সময় কি না একটা কুকুর, একটা মানুষ আর একজন নারী আমাকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিসে দেবে বলে। ভেতরে যখন ভয় এভাবে দাপাদাপি করছে তখন আর পারলাম না—রহমানদার সামনে গিয়ে সহসা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। মাথা নিচু করে

বললাম, আমাকে আপনারা পুলিসে দেবেন রহমানদা? খুব কাতর চোখে মুখে তাকিয়ে থাকলাম।

জাঁহাবাজ মেয়েটা লাফিয়ে এসে পড়ল মুখের উপর—বলল, না দিলে ধরে নিয়ে যাচ্ছি কেন?

আমি রহমানদার দিকে তাকালাম—আমার চোখে কি ভয়ে অভিমানে জল এসে গেছে। রহমানদা কিছু টের পেয়ে বলল, দূর পাগলা, আয় তো!

ফেরার সময় সারাটা রাস্তা ভারি বিমর্ষ থাকলাম। ঝুমকিকে বিশ্বাস নেই। যা জাঁহাবাজ মেয়ে, সব করতে পারে। ওর বাবা মানুষটিকে আমি দেখি নি। খুবই জাঁদরেল হবে। ঝুমকি যাঁর মেয়ে আর যাঁদের ঘরবাড়ি সাহেব-সুবোদের মতো, তাঁরা জাঁদরেল না হয়ে যায় না। রহমানদা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল। আমরা টিলা পার হয়ে শহরে ঢোকার পথ ধরে হাঁটছি। রাস্তার দু'-পাশে সব বড় বড় গাছ। ইতস্তত লাইট-পোস্ট। আলো জ্বলছে। চারপাশে তাকালে শহরটা যে এখনও ভারি ব্যস্ত, বোঝা যায়। রাস্তায় বড় বড় ট্রাক বোঝাই মাল চলে যাচ্ছে। আর পাশ দিয়েই গেছে রেলের লাইন। আমরা একটা গুমটি ঘর পার হলাম। কুকুরটা মাঝে মাঝে আমার পাশে এসে গা ঘষটাতে চাইছে। মনে মনে বিরক্ত হচ্ছি। ভয়ও হচ্ছে। কিছু বলতেও পারছি না। কুকুরটা আমার অসহায়তা ধরতে পেরে যখন তখন ইয়ার্কি করছে। বিদ্রূপ করছে। কখনও ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে উঠছে। কখনও পায়ের কাছে হুমকি দিচ্ছে। ঝুমকি হাসছে। যত কুকুরটা রাস্তায় আমাকে বিব্রত করছে, তত ঝুমকি মজা পাচ্ছে। কিছু বলাও যাচ্ছে না। কারও মজার বিষয় যে কারও প্রাণ নিয়ে খেলা এটা প্রথম ঝুমকির কুকুর আমাকে বুঝিয়ে দিল। কুকুরটাকে যখন তখন পেছন থেকে লেলিয়ে দিলে আমি আর কি করতে পারি? রহমানদা দেখেও দেখছে না। রহমানদা অন্তত আশা করেছিলাম আমার হয়ে কিছু বলবে। আমার তো বলা শোভা পায় না। যাকে পুলিসে দেবার কথা হচ্ছে, সে আর কি করে কুকুরটাকে কষে লাথি মারে! এ সময়ে মানুষের কাছ থেকে কুকুরটার প্রাপ্য বলতে ধমাস করে মুখে সজোরে লাথি। যা আমার থেকেও নেই।

গুরুদোয়ারার সামনে আসতেই রহমানদা বলল, চাবিটা আছে তো?

—আছে।

—না থাকলে দুজনকেই বাইরে। চাবিটা দে।

চাবি দিলে রহমানদা দরজা খুলে বলল, তুই পালিয়েছিলি কেন বল তো।

সব বলতে পারি। কিন্তু টাইগার আর রুমকি থাকলে বলা সহজ নয় খুব। কতক্ষণে যাবে সেই আশায় আছি।

সুইচ খুঁজতে গিয়ে রহমানদা বলল, কথা বলছিস না কেন? তুই কি কালা আছিস?

আলো জ্বলে উঠলে বললাম, রহমানদা, কুকুরে কামড়ায়।

—টাইগার তোকে কামড়েছে?

—না, মানে—দেখি, রুমকি টাইগারের বকলস ধরে আমার দিকে ত্যারছা চোখে তাকিয়ে আছে।

টাইগার তো খুব ভাল। একটা কাকপক্ষী বাড়িতে এলাউ করে না। কামড়ায় না তো! ভাল ছেলের মতো হাসতে হাসতে বললাম।

লুঙ্গিটা উল্টে পরেছিলাম। ফলে বস্ত্রখানি অটুট দেখাচ্ছে। খুলে দেখাতেও পারছিলুম না। কি জানি, রেগে গিয়ে সত্যি যদি পুলিসে দিয়ে দেয়। তার চেয়ে বলা ভাল, কুকুরে কামড়ায় না।

রহমানদা রুমকিকে বলল, ছোড়দি, তোমায় বোধহয় ডাকছেন মা।

—ডাকুক গে।

—মা-বাবার কথা শুনতে হয়, না রহমানদা? এর চেয়ে বেশি বলার সাহস হল না। আসলে বলতে চেয়েছিলাম, ভাগ এখান থেকে। হতচ্ছাড়া মেয়ে। মায়া হলে কান মলে বাড়ি পাঠিয়ে দিতাম।

—রহমান—রহমান—

—আজ্ঞে যাই।

রহমানদা বাইরে বের হয়ে দ্বিতীয় সদরটায় দাঁড়ালে।

—রুমকি কি করছে! ওকে পাঠিয়ে দাও। খাবে না! সেই কখন তোমার সঙ্গে লাফিয়ে বের হয়ে গেল! লোকটাকে খুঁজে পেলে!

—পেয়েছি। লোক না মা। ছেলেমানুষ।

—ছেলেমানুষ তো এখানে কেন?

—বাড়ি থেকে বোধ হয় পালিয়েছে?

—পালিয়েছে!

আমার মাথাটা ঘুরছিল।

রহমানদা বলল, ঠিক পালায় নি। কাজের ধান্ধায় বের হয়েছে।

ছেলেমানুষের আবার কাজের ধান্দা কেন? ছেলেমানুষ তো পড়াশোনা করবে।

গাছপালার অভ্যন্তর থেকে অথবা অন্য গ্রহ থেকে কেউ যেন কথা বলছিল; আমরা নিচের গ্রহে দাঁড়িয়ে শুনছি। অমোঘ বাণীর মতো রহমানদা সেই দেবলোকের কথাবার্তা অবধান করছে।

হঠাৎ গ্রহ থেকে আবার অমোঘ কথাবার্তা ভেসে এল, ছেলেটা বাঙ্গাল নাকি! আমি উৎকর্ণ হয়ে আছি। তক্তপোশে বসে আছি, তবু পা হাঁটু কাঁপছে। একজন মানুষের এত অপরাধ থাকলে তাকে রহমানদা রাখবে কী করে!

—তা তো জানি না মা।

—জিজ্ঞেস করে দেখ। না জেনে-শুনে লোককে জায়গা দিতে নেই। তোমার ক্ষেপামিতে শেষে না আমাদের সব যায়।

ওদের সব যাবে কেন! বাঙ্গাল আমি ঠিক। ইস, কী যে রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। এতে করেও দমন করা গেল না।

আবার গ্রহলোকে কথাবার্তা—পীলখানার মাঠে সব ছেয়ে গেছে শুনেছ!

—আজ্ঞে শুনেছি।

—তরফদাররা থাকতে দিয়েছিল। এখন সব দখল করে নিয়েছে। কত বড় সম্পত্তি। বেহাত হয়ে যাবে। উনি তো বললেন, আইন-আদালতেও কিছু হবে না। বাঙ্গালরা নাকি ভগবান। বসলে উঠতে চায় না। ঠাকুর দেবতার মতো। আমাদের গ্রহ থেকে সংযোজনকারীর আক্ষেপ—সেই মা—কী যে হবে! হুড়হুড় করে সব ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসছে। ফাঁকা জায়গা পতিত জায়গা আর থাকছে না।

—দেখ না, যা অবস্থা, দেশটা বাঙ্গালদের হয়ে যাবে। সেই কবে একবার কলকাতায় বাবা আমাদের বাঙ্গাল দেখিয়েছিলেন। জজ মানুষ—বললেন, আজ দেখবি একজন বাঙ্গাল আসবে। বাবার সঙ্গে কাজ করতেন। তিনিও জজ। খুব ডাকসাইটে জজ। অথচ বুঝলে, এসেই ডাকাডাকি—অ নিবারণবাবু, বাড়ি আছেন নাকি? বাবা বললেন, এসেছেন? —আরে আইছি। দরজা বন্ধ কইরা বইসা আছেন। বাঙ্গাল রে ডরান ভাবতাছি খুব। —না না, বাবা বিগলিত। বুঝলে রহমান, সেই আমাদের বাঙ্গাল দেখা। লোকটা কি চেঁচিয়ে কথা বলত! যেন আমরা সব কানে কম শুনি।

ঝমকি কুকুরটার বকলস ধরে দরজায় পাহারা দিচ্ছে। কুকুরটার লম্বা জিভ হা-হা করছে। হাঁ করলে আমার পুরো মুখটা মুখে ঢুকে যাবে। দু'পা সরে বসলাম।

রহমানদা ফিরে এসে বলল, তুই বাজাল ?

মাথা গোঁজ করে বসে থাকলাম।

মা তো বলল, তোরা নাকি এখন ঠাকুর দেবতা। বসলে আর উঠতে চাস না। বলেই হেসে দিল। ছোড়দি, তুমি যাও। এখন আমরা খাব। বাবুসাব এলে রাগ করবেন।

বাবুসাবের কথায় ঝুমকির মনে হল, আমাকে নিয়ে বোধ হয় বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

ঝুমকি চলে গেলে রহমানদা বলল, ছোড়দি খুব ভাল মেয়ে। তুই ওকে ছোড়দি ডাকবি। এতক্ষণ যাও সহ্য হচ্ছিল, আর পারা গেল না। আমি ওকে ছোড়দি ডাকব বলছেন, পুচকে মেয়েটাকে আমি, না আমি পারব না। আমায় কী করেছে আজ ? কুকুরটাকে লেলিয়ে দিয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে হাজির সেই মহীয়সী—মিছে কথা বলছিস ?

আমার সব বলা এক দণ্ডে উবে গেল। স্থির হয়ে বললাম, হ্যাঁ, মিছে কথা।

—তবে।

ঝুমকি যে চলে যায় নি, এ বোধটা থাকা উচিত ছিল। উঁকি দিয়ে দেখে নিলে আবার বিপর্যয়ের মুখে পড়তে হত না। বললাম, না, সব ঠিক আছে। আমি তোমাকে ছোড়দিই ডাকব। এই কথা বলার পর ছোড়দি কেমন ভালমানুষ হয়ে গেল। বলল, পালাবার চেষ্টা করবি না। টাইগার দিনরাত ওত পেতে থাকে। সব টের পায়।

তা যে পায়, তার ঠ্যালা আমি হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি। ছোড়দি কিছু আর বলল না। কুকুরটাকে নিয়ে এক দৌড়ে ভেতরে গাছপালার মধ্যে হারিয়ে গেল। সেদিকে তাকিয়ে থাকলে রহমানদা বলল, এ বাড়িতে ছোড়দির দাপট খুব। ওকে খুশী রাখতে পারলে আর কথা নেই। তোর সাতখুন মাপ। নে আর দেরি করিস না, কখন তো খেয়েছিস। তারে জামাপ্যাণ্ট রয়েছে, নিয়ে আয়। হাত-মুখ ধুয়ে জামাকাপড় প্যাণ্টে নে। খাবার দিতে বলে এয়েছি।

খাবার এলে রহমানদা বলল, তোদের তো আবার জাতের মাথামুণ্ডু নেই। কি করতে কোনটা কাটা যাবে—তার চেয়ে বরং তুই খেয়ে নে। পরে আমি খাচ্ছি বলে উঠে দাঁড়াল। ভিতরের দিকে আর একটা দরজা আছে, ওটা খুললে টের পেলাম, রহমানদার সব কিছু ঐ ছোট্ট কুঠরির মধ্যে। আসলে তবে দুটো ঘর। ঐ ঘরটায় রহমানদার যাবতীয় মহার্ঘ জিনিস, বাক্স পেঁটরা লকার সব কিছু। ওখান থেকে কি বের করতে ঘরে ঢুকল। বাইরের ঘরটা এ জন্য খুবই নিরাভরণ।

শুধু একটা টেবিল ক্লথ বাদে বলতে গেলে আর কিছুই নেই। খাট এবং বিছানা টেবিল আর গোটা তিনেক চেয়ার। এই সম্বল করে সে সব কিছু অসংকোচে আমার মতো একজন পলাতকের কাছে গচ্ছিত রেখে চলে যেতে পেরেছে। মানুষকে বিশ্বাস নেই, এ বোধটা রহমানদাকে বোধহয় ছোড়দি বুঝিয়ে দিয়ে গেছে।

মানুষের স্বভাব এ-রকমেরই। তবু মানুষ অধিকাংশ এক একজন স্বার্থপর দৈত্য। ট্রেনে এটা খুব মালুম হয়েছে। তা না হলে যে দাড়িওলা লোকটিকে ভিড়ের ট্রেনে একটু জায়গা করে বসতে দিয়েছিলাম, তারই চাপ কেন ব্লাডারের মতো আমাকে উদ্বাস্তু করে ছাড়বে। চাপে প্রায় ছিটকে গেলাম। ভিন রাজ্যের মানুষটি আমার জায়গা সম্পূর্ণ বেদখল করে নিয়েছে বলে এতটুকু অনুকম্পা নেই। স্টেশন যত পার হয়ে যাচ্ছি, তত কোন এক অদৃশ্য শক্তি দরজার কাছে আমাকে ঠেলে নিয়ে চলে এসেছে। যে যেখান থেকে পারছে উঠছে। বাক্সপেঁটরা যে যার মতো জানালায় দরজায় গলিয়ে দিচ্ছে। দেখে মনে হয়েছিল, ট্রেনে জায়গা না পেলে মহাপ্লাবনে সব তাদের ভাসিয়ে নেবে।

—কি রে, বসে আছিস কেন? ওঠ, খাবি না?

হাত-মুখ ধুয়ে জামাপ্যান্ট পরার পর আগেকার বিলু হয়ে গেলাম। উঁকি দিয়ে দেখলাম, কেউ আবার দেখছে কিনা। না, নেই। কেবল গাছগাছালির ফাঁকে একটা আলোর ডুম জ্বলছে। এবং বাড়িটাকে এত রহস্যময় করে রেখেছিল যে রহমানদাকে লুঙ্গিটা দেখানো দরকার আছে, ভুলে গেছিলাম।

রহমানদা লুঙ্গি পরে একটা হাফ-হাতা গেঞ্জি গায়ে আবার হাজির। চোখে মুখে বুঝি আশঙ্কার ছাপ টের পেয়েছে। বলল, তুই কি খুন-টুন করে পালিয়েছিস? সব সময় কেমন সিঁটিয়ে আছিস?

কি করে বোঝাব খুনেরই শামিল। গোবিন্দদার কৌটা থেকে কুড়ি টাকা চুরি আর খুনে আমার কাছে তফাত এক গাছি সুতোর। বাবার কাছে সব সমান! খুনেও পাপ, চুরিতেও পাপ। দুটোতেই ঈশ্বর তাঁর রাগ করেন। এ হেন মানুষের সন্তানের পক্ষে স্বাভাবিক থাকা খুবই কঠিন। সামান্য হাসার চেষ্টা করে বললাম, না না, খুন করব কেন? আমি গুণ্ডা না ডাকাত? তা ছাড়া ভাবলাম, আমাকে পুলিসে দেবার কথা হচ্ছে। মাথা ঠিক থাকে কি করে?

—সে তো চেহারা দেখেই মালুম পাওয়া যাচ্ছে।

খেতে বসে দেখলাম, বড় টিফিন ক্যারিয়ারে মাংস ভাত রুটি আলাদা করা।

রহমানদা বললে, যা লাগে নে।

সবটাই খেতে পারি। খিদে তখন ঘোড়ার পিঠে জিন লাগিয়ে বসে আছে। যা পায় তাই নিয়ে দৌড়াতে চায়। কি নেব, কতটা নেব আন্দাজ করতে পারছিলাম না।

—ভাত খাস রাতে?

ঘাড় কাত করে দিলাম।

—ভাতই খা। আমার আবার রাতে ভাত সহ্য হয় না।

ভাত যতটা, তাতে পেট ভরার কথা নয়। মা খাব খাব করলে বলতেন, এত খিদে নয়, চোখের খিদে। বোধহয় না খেয়ে খেয়ে খাওয়ার নেশা আমার আরও বেড়ে গেছে। ইচ্ছে হচ্ছিল, যা থাকে কপালে, সবটাই খেয়ে নি! তারপরই মনে হল, পাঁড়েজী বসে আছে। আর সাহস হল না। বাড়াবাড়ি বেশি ভাল না।

রহমানদা বললে, দুপুরে পেট ভরে খেয়েছিলি তো?

না, বলতে সংকোচ হচ্ছে। আসলে কতটা খেলে পেট ভরে তার আন্দাজ আমার গেছে। হয় তো যতটা খেয়েছি, তারই নাম পেট ভরতি খাওয়া। পাঁড়েজী দীর্ঘদিন এ লাইনে আছে। তার চোখকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। সে জানে কতটা খাওয়ার নিয়ম। বেশি খেলে সইবে কেন? পেট ভরেছে, গলা অবধি হয় নি। পাইস হোটেলে আকণ্ঠ কে খেতে দেয়? যে দেয়, সে লাটে ওঠে।

—বললাম, খুব খেয়েছি।

—খাবি। লজ্জা করবি না। এত যার বিবেক তার আবার বাড়ি থেকে পালানো কেন! কাজের ধান্ধা দেশে থেকে করলেই হত।

এ সব কথা কানে যাচ্ছিল না। একবার ভাবি বলি, আচ্ছা রহমানদা, ছোড়দি কি সত্যিই থানা পুলিসের কথা ভাবছে। কিন্তু রহমানদা তখনও কথা বলে যাচ্ছে, আমার কথা শোনার সময়ই নেই।

তোর মতো আমিও বের হয়েছিলাম। সে বেশ একটা জীবন গেছে। এখন মুঠো মুঠো পয়সা। না, তা বলে ভাবিস না, তোর মতো অনেক লেখাপড়া জানা ছেলে। লেখাপড়া জানলে দুনিয়া উল্টে দিতে পারতাম।

মানুষটা কী করে জানি না। বাংলো বাড়িটার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক তাও জানি না। নেমপ্লেটে আছে, ডাঃ এস. কে. দত্ত। গাইনো কোলজিস্ট। এই সহরটা খুব বড় নয়—জংশন স্টেশন, আর মহকুমা শহর মিলে যা ঘরবাড়ি থাকার কথা তাই আছে। বাড়িটা শহরের একপাশে, অনেকখানি জমিজমা নিয়ে বাগান নিয়ে বাড়ি। যেন মানুষটা নিজের একটা আলাদা পৃথিবী বানাবার তালে

আছে। আসলে সবাই নিজের জন্য একটা আলাদা পৃথিবী তৈরি করতে চায়। আমারও সেই বাসনা।

খাওয়া হলে রহমানদা বলল, শুয়ে পড়। এখন আমি একটু বসব।

তা বসুন, আপনার জায়গায় আপনি বসবেন শোবেন—তা আবার বলা কেন। কিন্তু বসা যে মানুষের এ রকমে হয়, জানতাম না। বোতল গ্লাস, পরিপাটি করে চানা ভাজা এবং ভক করে ঝাঁজটা নাকে লাগলে এক কোণায় সরে গেলাম।

—তোর অসুবিধা হচ্ছে। তবে পেয়ারাতলায় খাটিয়াতে শুয়ে থাক। পরে ডেকে আনব।

—সেই ভাল। আপনি খান। একটা বালিশ নিয়ে সামনের পেয়ারাতলায় চিৎপাত হওয়া গেল। রাস্তার আলো আসছে। পাতার জাফরিকাটা ছায়া ছড়িয়ে আছে খাটিয়াটার ওপর। শুয়ে মনে হল, ভয় করবে। বাড়িতে হলে কিছুতেই পারতাম না। মানুষের বসবাসের জায়গায় কিছু অদৃশ্য আত্মা সঙ্গী হয়ে যায়। আবাস নয়, এবং অপরিচিত জায়গা বলে কোন প্রেতাত্মা বোধ হয় সঙ্গী হতে চাইছে না। জংশন স্টেশনে মাঝে মাঝে হুইসিল দিয়ে গাড়ি যায়, রাস্তায় ট্রাক-বাস রিক্শর শব্দ এবং আলোর মধ্যে প্রেতাত্মার কোন অস্তিত্ব টের পাওয়া গেল না। বরং প্রেতাত্মা বলতে এখন রুমকি। সে আমাকে পুলিসের ভয় দেখিয়ে রেখেছে।

ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ করছিলাম। মাঝে মাঝে টাইগার গলা ফাটিয়ে ওপাশে চিৎকার করছে। জেগে আছে জানান দিচ্ছে। সকালে ছোড়দিকে বোধহয় সব খুলে বলাই ভাল হবে। কুড়ি টাকা চুরি করেছি ঠিক তবে ডাইরিতে লিখে রেখেছি। কে কি পাবে, সব লিখে রেখেছি। টাকা মান যশ হলে ফেরত। আজ যে দশ আনা পয়সা দিয়েছে রহমানদা, তাও লিখে রাখব। আশ্রয় দিয়েছে, তাও। কাজ দিলে তাও লেখা থাকবে, কারো কাছে কোন ঋণ রাখব না। বাবা বলেছেন, অঋণী অপ্রবাসী থাকতে। তবে দেশ ছেড়ে আসার পর তাঁর মুখে অপ্রবাসী কথাটা আর বের হত না। শরণার্থীদের জন্য সরকার লোন দিচ্ছে, বাবা সেদিকটাতে যানই নি। কে কার ঋণ শোধ করবে। যা সব সন্তান-সন্ততি, তাদের আর ঋণের মধ্যে রেখে পিতৃদায় বাড়াতে চান না। শিষ্যদের মানি-অর্ডার এলে শুধু জবাবে লিখতেন, ঠাকুরসেবার জন্য প্রেরিত তোমার প্রণামী যথাসময়ে পেয়েছি। বাবার খেরো খাতায় যে সব নিয়মকানুন লেখা আছে, তাতে প্রণামী কখনও ঋণের পর্যায়ে পড়ত না। যে যার মঙ্গলের জন্য পাঠায়। তিনি শুধু উৎসর্গকারী, বাবার এসব ধারণা মনে হওয়ায় গোপনে

হেসে ফেললাম। মানুষ বোধহয় নিয়মকানুন এভাবেই নিজের মতো করে তৈরি করে নেয়। নেশা করা, মাতলামি করা পাপ কাজের মধ্যে পড়ে রহমানদার খেরো খাতায় বোধ হয় লেখা নেই। থাকলে বলতে পারত না, তুই শুয়ে পড়। আমি একটু বসব।

রহমানদা কী করে মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করে জানি না। একদিনে জানা সম্ভবও নয়। শহরটায় এসে বুঝেছি, সব মানুষই রোজগারের ধান্ধায় ঘুরছে। যার-যেমন ক্ষমতা। আমার ক্ষমতার মধ্যে আছে ইতিহাস ভূগোল অঙ্ক ইংরেজি। বাংলা ভাষাটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। ওটা রহমানদাও জানে। একজন ভিখিরীও জানে। হিসাবপত্র রাখতে পারি সরকারী অফিসের কাজে লাগতে পারি—কোন একটা বাবু-কাজ আমার চাই। রুমকির বাবা যদি পুলিসে দেয়, তবে সব যাবে। দাগী আসামী জানলে কুকুর পর্যন্ত পেছনে লাগে। ওদের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। আসলে কি টাইগার টের পেয়ে গেছে, পাঁচিলের পাশে একটা খুদে চোর শুয়ে আছে?

না, ঘুম আসছে না। ইচ্ছে হচ্ছে পাঁচিল টপকে কুকুরটার গলা টিপে ধরি। সত্যিকারের একটা খুন-টুন না করলে চলছে না। কুকুর তুমি মরবে। ফাঁক পেলেই দড়ির ফাঁস পরিয়ে ঝুলিয়ে দেব। বেশি হুজ্জোতি আমি সহ্য করব না। প্রাণীদের প্রতি বাবার সব সময়ই একটু বেশি আবেগ। হেমন্তকে পিলু কোন কারণে লাথি-ফাথি মারলে বাবা বলতেন, দেব নাকি এক ঘা। হেমন্তের বুঝি লাগে না। বাবার কাছে মানুষ এবং জীবজন্তু তেনারই সৃষ্টি। তুমি শাসন করার কে হে?

কিন্তু এমন পেছনে লাগলে রাগ হয় না! আচ্ছা, ঠিক আছে—কিছু করব না। খুনের কথায় বাবার মুখটা ভেসে উঠল।

তুমি শেষ পর্যন্ত নিরীহ একটা অবলা জীবের প্রাণ হরণ করলে। পারবে তুমি কারো প্রাণ দিতে? যা পার না, তা তুমি মারতেও পার না। হতাশায় কেমন ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। আমাকে দিয়ে আসলে কিছুই সম্ভব নয়। উচ্চাশা বাদে আমার আর কোন সম্বল নেই—এত সব ভাবনার মধ্যেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম —সকালে দেখি গাছতলাতেই শুয়ে আছি। রহমানদা ডেকে ডেকে সারা —রহমানদার স্নান সারা।

—এবারে ওঠ। আর কত ঘুমাবি। হাত-মুখ ধুয়ে এলে সেই ডিম ভাজা, পাঁউরুটির পিস। এখন দেখছি খাবার সামনে থাকলে মাথায় আর কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। রুমকি যে কুকুরটা নিয়ে যে কোন মুহূর্তে হাজির হতে পারে, তাও মনে নেই।

দুশ্চিন্তা থেকে রক্ষা পাবার মোক্ষম একটা উপায় খুঁজে বার করা গেল। সারাদিন খাদ্যসামগ্রী সামনে নিয়ে বসে থাকলে হয়। কিন্তু পাব কোথায়। দিতেই সব খাব সারা হয়ে যায়, তাকে কোন সরবরাহকারী আছে যে, এটার পর এটা খান, তারপর এটা, তারপর মিহিদানা, খান না আর দুটো রসগোল্লা—সুতরাং মোক্ষম উপায়টা কাজে লাগতে পারত একমাত্র কোন যদি সদাশয় সরবরাহকারী বিনা শর্তে রাজী থাকতেন।

রহমানদা বলল, অসীমকে বলেছি, ওর মোটর পার্টসের দোকান আছে। তার যদি কোন কাজে লাগে—

তাহলে রহমানদা কাজে লেগে গেছে।

—কাজ পাওয়া বড় কঠিন বিলু। তার চেয়ে ব্যবসায় নেমে পড়।

—কি ব্যবসা ?

—আমার সঙ্গে থেকে থেকে শিখবি। বিচারবুদ্ধি একটু থাকলেই হয়ে যায়। কি করবি ?

—কোন অফিসে-টফিসে—

—তুই ক্ষেপেছিস। সরকারী অফিসে চাকরি, সে হয় না। আমি পারব না। সব চোর, বুঝলি। পকেটমার, ছিনতাইবাজদের আমি ক্ষমা করে দিই। দেবে না, কেড়ে খাবে। কিন্তু ব্যাটারা সাধু সেজে বসে থাকে। এক দু' টাকার কাঙাল। বেটারা সব লেন্দু।

লেন্দু শব্দটি নতুন। লুচ্চির অপভ্রংশ কি না ঠিক জানি না, কিংবা লেজুড়ের। যাই হোক, রহমানদা আপাতত খেয়ে ওঠার পর বললেন, দশ আনা থাকল। আজ আবার পালাস না। ফিরতে দেরি হলে রোয়াকে বসে থাকিস। গাড়িটাড়ি গেলে লক্ষ্য রাখবি। কেউ এলে বলবি, রহমানদা নেই। তুই যে এখানে এসে উঠেছিস, গুণ্ডাতরা সব জেনে ফেলেছে। কোথায় ঘুরছি ফিরছি জানতে চাইবে।

—তুমি কী কর রহমানদা ?

এই প্রথম ওকে 'তুমি' বললাম। এবং কিছুটা চমকে গেলাম। মানুষ কত সহজে একজনকে নিজের করে নিতে পারে।

—থাকলে টের পাবি। বলতে হবে না। তোকেও লাইনে ভিড়িয়ে দেব। হিসাব ঠিক থাকলে পাঁচ সাত বছরেই গাড়ি-বাড়ি। তুই লেখাপড়া জানা ছেলে, তোর সহজেই হবে।

রহমানদা প্রচণ্ড জোরে একটা হাই তুললে। মুখে তুড়ি দিলে। শেষে বললে—স্বাধীন দেশ তো। লোকজন সব স্বাধীন। আগে পরাধীন ছিলাম। শৃঙ্খলিত

বলে দেশনেতারা। হাত-পা বাঁধা থাকলে কাজে অসুবিধা। না থাকলে কত সুবিধা। বল। যাই করবি, তাতেই ফসল। কেবল কোন্ গাছে কি কি সার লাগে জানতে হয়।
একটা টিকটিকি সে সময় ধপাস করে আমার মাথায়—ভয়ে উঠে দাঁড়ালে বললে—তুই খুব পয়া আছিস। কাল ভাল রোজগার হয়েছে। আরও হত, লেখাপড়া জানি না। অক্ষরজ্ঞান নেই, ছোড়দিদের গাড়ি চালিয়ে পেট ভরত। আর এখন সময়ে ডাক্তারবাবু বলে—হবে নাকি?
—কি হবে নাকি?
—টাকা।
—টাকা চায়?
—চায় মানে? নেশা। জমিজমার নেশা। শহরের ফাঁকা জায়গা পেলেই কিনে ফেলে। নেশা না থাকলে হয় না। যেমন নেশা না থাকলে কার দায় বল এত সকালে ছুটো মুখে দিয়ে ছোটার? বড় হ', বুঝবি।
রহমানদার এত কথা বলার দায় আমার সঙ্গে নেই। বরং গম্ভীর থাকলেই মানাত। যার আশ্রয়ে যে থাকে, সেই তার মনিব। সব সময় গোবিন্দদার মত রহমানদাও আমার মনিব—মনিবের এমন দিলখোলা কথাবার্তায় আরও বেশি মজে গেলাম। রহমানদা চলে গেলেই সারাদিন একা। পেয়ারা গাছ এবং পাঁচিল, রাস্তার লোকজন দেখা আর পাশের বাংলোবাড়িটায় রুমকি টাইগার ভয় দেখাবে। সদর দরজায় পুলিস।
ফুস করে বলে ফেললাম, না বলে কিছু নিলে চুরি করা হয়, না রহমানদা?
—চুরি।
—না, এই আর কি, কেউ যদি নেয়, নেবার পর যদি চিরকুটে লিখে রাখে, নিয়েছি। তবে কি হব?
—মরণ হয়।
—তার মানে?
—কিছু লিখে রাখতে নাই রে। 'শতং বদ মা লিখিত' কি না বলে যেন। কোনদিন এমন কাজ করবি না। লেখাপড়া শিখে তোর এই বুদ্ধি হল। কেউ নিয়ে আবার লিখে রাখে নাকি?
—লেখে না?
—লিখলেই তো ধরা পড়তে হয়।
গ্যাছে। সব গেল। নিজের হাতে মরণ-ফাঁদ পেতে এসেছি। কি করি?

মুখ কেমন ক্যাকাসে হয়ে গেল। পৃথিবীতে কত বড় নির্বোধ হলে এমন হয়। নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। চুপ করে থাকলে বললে, যাকে যা দিই, মুখে মুখে হিসাব। লেখা থাকলে হিসাবে গণ্ডগোল হয়। লোকও সব তক্কে তক্কে আছে, পেলেই খপ করে ধরে ফেল। নাচানাচি কর। ঝুরঝুর করে টাকার বৃষ্টি। যোকা কে ছাড়ে বল'?

তারপর রহমানদা কখন চলে গেল, টের পাই নি। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছি—রাস্তাই একমাত্র মুক্তির পথ—ফেরার হওয়া ছাড়া আর ভাগ্যে কিছু লেখা নেই। টেবিলে দশ আনা পয়সা। বাইরে দরকার পড়লে তালা দেবার চাবি। আর কিছু নেই। একটা তোয়ালে স্নানের জন্য, আর কিছু নেই। টেবিল-ঘড়িটা টিকটিক করে বাজছে, না মস্করা করছে, বুঝতে পারছি না। রাস্তার হাতছানি—তখনই যেউ—এই রে, যাব কোথায়? সে তো জেগে আছে। দিনরাত কেউ জেগে থাকলে, আমি করি কি? অগত্যা ছোড়দিই আমার সব। হাতজোড় করে অপরাধ স্বীকার করলে, পুলিসে দেবার কথা ভাবতে নাও পারে। বাইরে পেয়ারাতলায় বসে আছি, ছোড়দির সঙ্গে দেখা করব বলে। আর সেই সময় একটা সাদা রঙের গাড়ি। গাড়িতে নীল ফ্রক গায়ে ছোড়দি। গাড়িটা হুস করে বের হয়ে যাবার সময় হাত নেড়ে বলল, তাহলে পালাস নি, এখনও আছিস?

দৌড়ে গেলাম, ছোড়দিকে কিছু বলব বলে। ছোড়দির গাড়িটা চলে যাচ্ছে। কী সুন্দর দেখতে ছোড়দি। পায়ে সাদা মোজা, কালো পাম্পশু। ফাঁপানো ববকাটা চুল। কপালের অর্ধেকটা ঢেকে আছে। একটা সাদা রঙের গাড়ি যেন আশ্চর্য এক পৃথিবীর খবর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দূরবর্তী নক্ষত্র বুঝি মানুষের শৈশবে এভাবেই আকাশে আলো দেয়। কেন জানি বিশ্বাস হল, ছোড়দি আর যাই করুক, আমাকে পুলিসে দেবে না। টের পেলাম, ছোড়দির দুষ্টু চোখে বড় বেশি সুষমা। অন্য গ্রহ থেকে তখন কেউ যেন সংকেত পাঠায়—আমি আছি, আমি বড় হচ্ছি। মনের সব গ্লানি নিমেষে কেউ হরণ করে নেয়। প্রসন্ন মনে ভাবি, আমার বড় হওয়া তারই হাত ধরে। বাবা-মা ভাই-বোনের মতো—সেও জীবনে অংশীদার হয়ে যাচ্ছে। ভারি গোপনে পা টিপে টিপে সে আসছে।

এখন আমি স্বাধীনও বলা যায়, পরাধীনও বলা যায়। স্বাধীন এ জন্যে, আমার মনিব রহমানদা নেই। দরজায় তালা মেরে শহরটা ঘুরে দেখে আসতে পারি।

মানুষজন দেখলে, জীবন সম্পর্কে আগ্রহ বাড়ে। বাবার কথা। বনের মধ্যে বাড়িটা করার পর, বাবা বোধহয় এটা টের পেয়েছিলেন। ভিটেমাটি ছেড়ে বনের মধ্যে বাড়িঘর করতে কেউ এলেই, বাবার অহংকার বেড়ে যেত। মাটি মানুষ এবং গাছপালা সম্পর্কে নানা রকমের কৌতূহলোদ্দীপক কথাবার্তা বলতেন। মানুষ নিজের ঘরবাড়ি চায়। প্রতিবেশী চায়। গাছপালা চায়। প্রতিবেশী না থাকলে, তোমার অহংকার কার কাছে? প্রতিবেশী আছে, তাই মানুষ এত উদ্যোগী, জীবন সম্পর্কে মানুষের এত আগ্রহ। বাবা গভীর বনটার প্রথম ইজারাদার। নিজের মতো একখানা গ্রাম তাঁর আবার দরকার। তিনি ঘুরে ঘুরে খবর দিয়েছেন, চলে যাও, বহরমপুর স্টেশনে নেমে রেল-লাইন বরাবর। সামনে পাবে বাদশাহী সড়ক। পাশে পুলিস ট্রেনিং সেন্টার। পরে মাঠ। আরও পরে রাজরাজড়াদের আম-কাঁঠালের বাগান। জঙ্গল গজিয়ে এখন সুমার বন। জঙ্গল সাফ করে ঘর বানাও। কত কাল আবাদ নেই—বীজ বুনলেই গাছ। খাবার থাকবার ভাবনা নেই।

বাবাকে তখন আমার কিছুটা মোজেসের মতো মনে হত। অথবা বাবা যেন সেই মহাপ্লাবনের সময়কার মানুষ—নৌকায় তিনি সব জোড়ায় জোড়ায় পাখি, জীবজন্তু এবং মানুষের প্রজাতি তুলে নিচ্ছেন। নোয়ার নৌকা এখন বাবার গ্রামের আবাসটি। সেই বাবার ছেলে এইমাত্র নিজেকে স্বাধীনও মনে করছে—আবার পরাধীনও ভাবছে।

পরাধীন এই জন্য যে একটা কুকুর নোয়ার বংশধরকে আটকে রেখেছে—বাবা এটা ভাবতেই পারতেন না। কুকুর গৃহপালিত জীব। তার এত আসকারা হবে কেন! মানুষের কাছে সে তো মাথা হেঁট করে রাখবে। সেই কুকুরের ভয়ে নোয়ার বংশধর খাটিয়ায় শুয়ে আছে। মাথার ওপর নিষ্ফলা পেয়ারা গাছ। শরতের বাতাসে, দুটো একটা পাতা ঝরে পড়ছে মাথায় পায়ে। রাস্তায় রিকশর প্যাক প্যাক শব্দ। জংশন স্টেশনে গাড়ি—নীল আকাশে গুরুদোয়ারার গম্বুজ পার হয়ে একটা কলের চিমনির কাছে আটকে গেছে। নোয়ার বংশধর ভারি বিপাকে। পা নাড়ালেও মনে হচ্ছে পাঁচিলের ওপাশে টাইগার গরগর করছে। এ হেন অবস্থায় বাবার বিচারবুদ্ধি সাফ। ট্রেনে দেখেছি, বিনা টিকিটে বাবা আমাদের তুলে দিয়ে এ-কামরা ও-কামরায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চেকার দেখলেই পরিপাটি হাসি এবং সখ্যতা। সখ্যতার মতো বড় শত্রুতা অপহরণকারী আর কিছু নাকি নেই। সুতরাং টাইগারের বেলায় বাবার স্বতঃসিদ্ধ ধারণা প্রয়োগ করে দেখবার একটা বাসনা গজাল। একটা কুকুরের হেপাজতে থাকতে

মানুষের কতক্ষণ ভাল লাগে? কুকুরটাকে হাত করতে পারলেই খোলামেলা স্বাধীন জীবন। ভাবা যায় না।

ডাকলাম, কুঁ।

কুঁ ডাকলে, কুকুর আসে। পায়ে লুটায়। ঘাউ ঘাউ করে উঠল কিন্তু কুকুর এল না।

আবার—কুঁ।

রাস্তা থেকে দুটো নেড়ি কুকুর ঘাড় বেঁকিয়ে দেখল। এল না। তাহলে কুঁয়ে হবে না। রাস্তার কুকুরও আমায় চিনে ফেলেছে। দেবার মুরদ নেই, ডাকে। হন্যে হয়ে ঘুরছি, শুঁকছি সব কিছু, কোথাও কিছু নেই—কুঁ দিলেই হল। আর টাইগারের ইজ্জত কত। ছোড়দির কুকুর, সে কুঁ দিলে ঘাউ ঘাউ করবে শুধু। আপাতত তবে উঁকি দেওয়া যাক। পাঁচিলে উঁকি দিতেই মনটা ভারি প্রসন্ন হয়ে গেল। টাইগার জাফরিকাটা বারান্দায় বন্দী হয়ে আছে।

শত হলেও স্বভাবে কুকুর—খেতে দিলে সব হয়—ছোড়দি সেই ভয়ে বোধহয় আটকে রেখে গেছে। লাফিয়ে পাঁচিল টপকে নোয়ার বাচ্চার সঙ্গে ভাব জমালেই গেছে। সব প্রভুত্ব ছোড়দির তবে যাবে। তারপরই মনে হল, বাড়ি থেকে বের হওয়া তক আমি কেবল মানুষের খারাপ দিকটাই দেখছি। এও তো হতে পারে, পাঁচিল টপকে আমাকে কামড়াতে পারে ভেবে আটকে রেখে গেছে। ছোড়দি নেই, স্কুলে গেছে, গাড়িটা ফিরে এল, সাহেব-সুবো মানুষ বের হয়ে গেল গেট দিয়ে। খাটিয়ায় শুয়ে থাকলে খারাপ দেখাতে পারে ভেবে গাছের নিচে খুব অবলা জীবের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। ছোড়দির যখন এত প্রতাপ, তার বাবা কিনা জানি একজন। আমাকে দেখে তিনি যখন কিছু বললেন না, তখন কেন জানি মনে হল ফাঁড়া কেটে গেল। এখন ছোড়দি ফিরে এলে শুধু বলে রাখা, আমি মাত্র কুড়িটা টাকা চুরি করেছি। টাকাপয়সা হলে ফেরত দেব। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও। কান মলছি, আর কখনও এ কাজ করব না। আমাকে আর যাই কর, পুলিসে দিও না। পিলু জানতে পারলে ক্ষেপে যাবে।

এই সব সাত পাঁচ ভাবনা—যার খাচ্ছি, তার তো কিছু কাজ করা দরকার। ঘরটা খুলে ঝাঁট দিলাম, কুঁজোতে জল রাখলাম—রহমানদা এসে সব দেখে যেন খুশি হয়—আর একটা বড় কাজ করে যাচ্ছি ফাঁকে ফাঁকে—সেটা ঘড়িতে সময় দেখা—লুঙ্গি, গামছা নিয়ে চানও করে আসা গেল। দশটায় পাঁড়েজী গেলে আবার রাগ করতে পারে—পা বাড়িয়েই রেখেছে। তার চেয়ে আর একটু পায়চারি করলে সময়ও কাবার হবে, ক্ষুধারও ষোল আনা বেগ আসবে।

পায়চারি করার পক্ষে উঠোনটা প্রশস্ত। পুবে-পশ্চিমে পা ফেলে দেখলাম ছাব্বিশ বার, উত্তরে-দক্ষিণে আঠারোবার। আরও দশ দফে উত্তর-দক্ষিণ, পুব-পশ্চিম আপাতত করা যাক। করা শেষ হলে দৌড়ে গিয়ে ঘড়িটা দেখলাম—মাত্র চার মিনিট। মিনিটে এতটা হাঁটা যায়, এর আগে কখনও জানতাম না। বুঝতে পারছি, ক্ষুধার বেগের তালে হাঁটার বেগ জ্যামিতিক হারে বেড়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে বরং এই ধরনের বেগ নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা করতে কত সময় লাগতে পারে, তার গণিত সেরে রাখা ভাল। পৃথিবীর পরিধি জানা, তাকে গুণ, ভাগ করলে সময়টা পাওয়া যাবে। এতে সময়ও পার করা যাবে অনেকটা। অর্থাৎ এগারটায় গেলে পাঁড়েজী খুব একটা বেশি রাগ করবে না। বসে বসে অঙ্কটা সেরে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। উঠোনের মাটিতে একটা কাঠি দিয়ে অঙ্কটা করতে গিয়ে দেখা গেল, সারা উঠোন যোগ-ভাগে ভরে যাচ্ছে—কিন্তু অঙ্কটা মিলছে না। এই সমস্যাটা তৈরি হওয়ায় বেশ অনেকটা সময় কাটিয়ে দেওয়া গেছে, টেরই পাই নি। যখন পিছুতে পিছুতে পিঠ পাঁচিলে ঠেকেছে তখন হুঁশ ফিরে এল—কার জন্য এত বড় অঙ্ক, মনে পড়ে গেল দুটো আহারের জন্য। আর সঙ্গে সঙ্গে সব অর্থহীন। রাস্তায় এসে মনে হল, নেশার ঘোরে তালা দিতে ভুলে যাই নি তো। ফিরে এসে দু' লাফে দেখে যাওয়া গেল—তারপর কতটা দ্রুতবেগে মাঠ পারহয়ে পাঁড়েজীর দোকানে হেঁটে গেছলাম, টের পাই নি। শালপাতা জল দিয়ে ধুয়ে মুছে ঠিক করে বসে আছি। পাঁড়েজীর কত আপনজন আমি দেখুক।

কিন্তু—

কিন্তু কি?

ভাত আসছে না কেন?

আমার সে বলল, জল খাও।

পাঁড়েজী আমার দিকে গোল গোল চোখে তাকিয়ে আছে।

এনামেলের গ্লাসে জল। ঢক-ঢক করে জল খেলাম।

পাঁড়েজী আমাকে দেখে প্রথমে কিছুটা হতচকিত হয়ে গিয়েছিল বোধহয়—অথবা চিনতে পারছিল না—কোথাকার কে হে, বলা নেই, কওয়া নেই, পাত পেতে বসে যাওয়া। তারপর চিনতে পেরে 'ওফ্' শব্দ শুধু।

আমি দেখেছি, বাবা শিষ্যবাড়ি গেলে কিংবা ঠাকুরের ভোগ হলে সব সময় অন্ন বলতেন। ভাত বলতেন না। গাম্ভীর্য রক্ষা করার প্রয়াসে বলতেন, অন্ন। কাজেই গাম্ভীর্য রক্ষার্থে বোধহয় অন্ন বলারই নিয়ম। আপাতত পাঁড়েজীর গাম্ভীর্য দেখে মুখ ফসকে বের হয়ে গেল, ঠাকুর অন্ন।

—কিয়া বলতা? কি বলছ?

—অন্ন।

—দশ আনায় অন্ন হয় না।

—ঠিক আছে, দশ আনায় ভাতই হোক।

—ভাতও হবে না।

কেন হবে না বলার জোর আমার নেই। পাঁড়েজীর পাইস হোটেলে দশ আনায় মিল তবে উঠে গেল! বসে থেকে বোধহয় লাভ নেই। আমার দিকে আর ফিরেই তাকালো না। এত আহ্লাদ করে ক্ষুধার বেগ বাড়িয়ে এই ফল! কোনং রকমে বললাম, দিন আজকের মতো।

—পোষাবে না।

এ বেলায় বেশ বাংলা বলে। পোষাবে না। মাথায় বজ্রাঘাত কাকে বলে এই প্রথম টের পেলাম। না খেয়ে আছি, থাকছি এক কথা—সয়ে যায়, কিন্তু আশা করে থাকা খাব, সময় হলেই ডাল, ভাত, মাছ, তরকারি সেই স্বপ্নের মধ্যে, যেন কত কাল ধরে শখ করে খাব কথাটা পুষে রেখেছি মনে—খাব অন্ন খাব—আর পাঁড়েজী বলে কিনা পোষাবে না। কত হলে পোষাবে আর বলার সাহস হল না। বেশি চাইলে দেব কোত্থেকে? দশ আনা বরাদ্দ মিলের জন্য। বেশি চেয়ে রহমানদাকে বিগড়ে দিলে অভিমানের জাত রক্ষা করার আশ্রয়টুকু পর্যন্ত যাবে। মানে মানে উঠে পড়াই ভাল। চারপাশে হালুম-হুলুম শব্দ। পিঁপড়া কাঁদিয়া যায় পাতে—কি যেন একটা লাইন বার বার মনে আসছে। খুব খিদে পেলে মানুষের বোধ হয় চোখে জল আসে। বের হয়ে আসার সময় কেমন সব ঝাপসা দেখছিলাম—সামনের মাঠটা সহসা কেন যে এত কুয়াশায় ছেয়ে গেল! কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হাঁটছিলাম। মাঠটা বেশ বড়। দুটো ন্যাড়া বেলগাছ পার হয়ে রাস্তা। রাস্তা পার হলে কাঁচা নর্দমা, খুপরি ঘর, লরি-টেমপোর গ্যারেজ। সারি সারি ট্রাক। তারপরই গুরুদোয়ারা এবং বাংলোবাড়ির সদর। দু'দিনেই জায়গাটার মধ্যে একটা নিজস্ব ভাব এসে গেছে। খাটিয়ায় লম্বা হয়ে পড়ে থাকার বড় সুসময় এটা আমার। কিন্তু পেটের জ্বালা, বড় জ্বালা, সে কেন মানবে? গুরুদোয়ারার কলে জল, সেখানে হাঁটু গেড়ে বসলাম। অনেকক্ষণ ধরে জলপান করতে হবে। আঁজলা পেতে আকণ্ঠ জল খেলাম। হা-অন্ন পেট এতটা জল সইবে কেন? কিছুটা বমি হয়ে সে তার নিজের সমতা রক্ষা করতেই. ভাবলাম, ঠিক হয়েছে। ঢেকুর। জল খাবে, তাতেও রাক্ষুসেপনা। দশ আনায় মিল তোমার মিলবে কেন?

এখন খাটিয়ায় শুয়ে পড়তে পারলে কথা নেই। নির্ভেজাল ঘুম। ঘুম মানুষের কত বড় সম্বল, এ সব সময়ে টের পাওয়া যায়। ঘুমিয়ে পড়লে মরা। কাক-পক্ষীতে ভয় পায় না। আমার চারপাশটায় বিচিত্র সব পাখিরা এ সময়টা ওড়াউড়ি করবে জানি। ডাক খোঁজ করবে। —হ্যাঁরে ওঠ, খাবি না? কেউ যেন দূর থেকে তখন ডাকে। কে ডাকে! ঘুমটা লেগে আসছিল—মার মুখ। দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। ডাকছেন, ওঠ। খাবি না? কত বেলা হল রে।

আমি যে না খেয়ে আছি, পলাতক জীবন, আমার কিছুই মনে আসছিল না। বাড়িঘর, উঠোন, ঠাকুরঘর, যেন ডাকলেই পিলু দৌড়ে বের হয়ে আসবে, বলবে যাবি না দাদা, মাছ ধরতে যাবি না, কিংবা আরও দূরের খবর সে দেবার জন্য মুখ বার করে রেখেছে। চোখ কচলে যখন তাকালাম, দেখি সাদা রঙের গাড়িটা ঢুকছে। ছোড়দি ফিরল। ছোড়দি আমার দিকে তাকালও না। আমি যে আছি, কাল থেকে, ছোড়দি যেন ভুলে গেছে। গাড়িটা থামলে বলতাম, জান ছোড়দি, মানুষের স্বপ্ন কত সুন্দর হয়। পিলুটা দরজায় মুখ বাড়িয়ে আছে। কিছু একটা হলেই পিলুকে নিয়ে আসব। ও পাহাড় দেখে নি। তোমাকে নিয়ে আমরা দু' ভাই একদিন কাছের পাহাড়টায় ঘুরে আসব।

ছোড়দি কথা বলুক চাই না বলুক—আমার কিছু আসে যায় না। ছোড়দি এসে গেছে—বাড়িটার মধ্যে ছোড়দি আছে—ঠিক যেন কি থেকে যায় ছোড়দি থাকলে—ঠিক কাউকে বোঝাতে পারছি না—অসীম হাহাকার সমুদ্রে একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো ছোড়দি। ছোড়দিকে কখন যে কথাটা বলব। উঠে দু'বার পাঁচিলে উঁকি দিলাম। জানালা খুললে ছোড়দিকে বাগানের মধ্যে দেখা যেতে পারে—কিন্তু বারণ। সুতরাং একবার রোয়াকটায় উঠে আসা গেল—দেখলাম রোয়াকে উঠে বসলে বাড়ির ভেতরের অনেকটা দেখা যায়—কিন্তু ছোড়দিটা কোথায়? গাড়ি গ্যারেজে ঢোকাচ্ছে লোকটা দেখা যায়, অথচ ছোড়দি কেমন অদৃশ্য।

ছোড়দি আমার শত্রুপক্ষ, পুলিসের ভয় দেখিয়ে রেখেছে—সবই ভুলে যাই—কারণ এই প্রথম টের পেয়েছি, এ বাড়িতে আমার জন্য কেউ জেগে থাকে—যাতে পালাতে না পারি, টাইগারকে সতর্ক করে দিয়ে যায়। সম্পর্ক মধুর নয়, তবু কোথায় যেন একটা টান বোধ করতে পারছি। সদ্য গাঁ থেকে আসা নোয়ার বংশধরের পক্ষে এই আশা কুহকিনী কত দূর নিয়ে যাবে, সে অবশ্য তা অনুমান করতে পারে না। তবু সখ্যতা, এবং নক্ষত্রের সংকেত-বার্তা মিলে ছোড়দি আমার এক ভয়ঙ্কর অরণ্য। সে কাছে এলে ভয় লাগে, দূরে চলে গেলে কষ্ট পাই।

শরতের আকাশ এমনিতেই একটু বেশি নীল থাকে, আজ একটু বেশি গভীর নীল মনে হল। এগুলো কি মানুষের বড় হওয়ার লক্ষণ? এক অপরিচিতা বালিকার সঙ্গে দুটো কথাবার্তা, তাও কত ভয়ের কথাবার্তা অথচ কেন যে সম্পর্কের গভীরে নিয়ত এক টান থেকে যায় এবং কখনও কিছুটা ঝড়ো হাওয়ার মতো কেউ যেন উঁকি দেয় পাঁচিলে। ছোড়দি টাইগারকে নিয়ে বের হয়ে পড়েছে রাউণ্ড দিতে। এদিকেই ছুটে আসছে। হাওয়ায় ছোড়দির চুল উড়ছিল, ফ্রক উড়ছিল। কোথা থেকে এই প্রবল হাওয়া আসছে টের পাচ্ছি না। আমার কাছে এসে ঠিক উল্টো রোয়াকে বসে পড়ল। টাইগার পায়ের কাছে। সোজাসুজি বলল, গাছে উঠতে পারিস?

পিলু পারে। আমি গাছে চড়তে ভাল পারি না। তবু বললাম, হ্যাঁ, গাছে চড়তে জানি।

—লাফাতে পারবি?

—হ্যাঁ, পারব।

—আয় তো। দেখি, কেমন লাফাস?

ছোড়দি আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চায়। এখনই বলে দিলে হয়। ছোড়দির কুকুরটা টের পেয়েছে, আমি একটা চোর। চুরি করা পাপ না ছোড়দি? বাবা তো চুরি করাকে মহাপাপ মনে করে। চুরি করি নি ঠিক—

—এদিকটায়। ওদিকে না।

দু' লাফে ছোড়দির বাগানের মধ্যে চুপি চুপি ঢোকা গেল।

—ঐ ছাখ অকালের গোলাপজাম। পেড়ে আন।

তাকিয়ে দেখলাম, অনেক উপরে গাছের মগডালে চাঁপা ফুলের মতো ক'টা গোলাপজাম ঝুলে আছে। বললাম, কী সুন্দর!

গাছের মগডালে এক গুচ্ছ পাকা গোলাপজাম। মানুষের সাধ্য নয়—কিন্তু আমার অসাধ্য কাজ বলতে কিছু নেই। প্রাণ দিয়েও ছোড়দির কাছে ভালো মানুষ প্রমাণের দরকার। গাছটা সরু লম্বা, যেন আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যত উঠছি, তার চেয়ে বেশি নেমে আসছি। এত পিছল যার কাণ্ড সে কেন আমাকে সহজে রেয়াত দেবে। তবু রবার্ট ব্রুসের কথা মনে পড়ল। আমাদের পড়াশোনার সময় অমনোযোগী হলে বাবার দুটো আপ্তবাক্য সার ছিল। পারিব না কথাটি বলিও না আর, একবার না পারিলে দেখ শতবার। তারপরই রবার্ট ব্রুসের গল্প। পড়াশোনার বিষয়ে দ্বিতীয় আপ্তবাক্যটি বিদ্যাসাগরমশাই। বই নেই —বিদ্যাসাগর, খাতা-পেনসিল নেই—বিদ্যাসাগর, আলো নেই—বিদ্যাসাগর।

বড়ই রাগ হত, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কেন যে একজন ঈশ্বরচন্দ্র রেখে গিয়েছিলেন বাবাদের জন্য। পড়ার কথা উঠলে রাস্তার গ্যাসের আলো থেকে দামোদর নদ পার হওয়া পর্যন্ত বাবা আমাদের সবটা না বলে নিস্তার দিতেন না। এতে করে বাবার প্রশান্তি বাড়ত। সব সদগুণই ছেলেরা পাবে এবং তুলনায় বাবা যে একজন ঠাকুরদাসের সর্বশেষ সংস্করণ, হাবভাবে তা প্রকাশ করতে চাইতেন।

গাছ থেকে নেমে দেখলাম, জামা-প্যান্টের খানিকটা গাছে এবং ডালে। সঙ্গে শরীরের কিছু ছাল-চামড়া। গোলাপজাম পেড়ে হাতে দিলে ছোড়দি বলল, শীগগির পালা, মা আসছে।

গাছ এবং আগাছার জঙ্গলে পুকুরের এদিকটায় ভর্তি। মাথা নুয়ে দৌড়। পকেটে দুটো গোলাপজাম। ছোড়দির অলক্ষ্যে রেখে দিয়েছি। গাছে থাকতেই নিরন্ন পেট এবং নীতিবোধের ঠোকাঠুকি হচ্ছিল—কখন হাতসাফাই হয়ে গেছে টের পাই নি। ছোড়দি যদি পকেট সার্চ করত—ভয়ে কেমন কাঁটা হয়ে গেলাম। তারপর দৌড়। কারণ চারপাশে মানুষজন, চুরি করে গোলাপজাম খাচ্ছি—কে কোথা থেকে টের পাবে—একটু নিরিবিলি জায়গা হলে ভাল হয়। বারবার পেছনে তাকাচ্ছি। বাড়িটা, মায় তার গাছপালা যতক্ষণ না অদৃশ্য হল, ততক্ষণ পর্যন্ত থিতু হতে পারলাম না। শেষে মনে হল, নিরাপদ দূরত্বে এসে গেছি, এবং শরীরও আর দিচ্ছে না। সন্তর্পণে খেলে কেউ টের পাবে না। একসঙ্গে দুটোই মুখে পুরে প্রায় গিলে ফেলার মতো—তারপর মুখ মুছে ভারি নিরীহ ছোকরা হেঁটে যাচ্ছে, মুখে চোখে এমন অভিনয় ফুটিয়ে হাঁটা দিতেই টের পাওয়া গেল, ছাল-চামড়া ওঠা জায়গাগুলো জ্বলছে। আর চাকতে দশ আনা পয়সার যে মালিক আমি, পকেটে আছে তো, দেখতেই সব ফাঁকা। দৌড়ঝাঁপে কোথায় ছিটকে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ইস্ শব্দ বের হয়ে এল মুখ থেকে। কি বোকা আমি, দশ আনায় মিল না হোক, পাঁউরুটি জিলিপী, মিষ্টি, মিহিদানা কত কিছু খেতে পারতাম। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, ভাতখেকো বাঙ্গালের মিল না খেয়ে মাথাটা গোলমাল হয়ে গেছে।

দশ আনা পয়সা এখন সারাটা রাস্তায় খোঁজা। কিন্তু যদি পয়সা ক'টা ছোড়দির বাগানে পড়ে গিয়ে থাকে। সেখানে তো একা যাবার নিয়ম নেই। তবু যে পথে আসা গিয়েছিল, ঠিক ঠিক পথটা অনুসরণ করে আসা গেল। রাংতা এবং নাট-বল্টু যাই দেখি উবু হয়ে তুলে নিই। না, সবই আশা কুহকিনী। বাবার ঠাকুরদাস হওয়ার মতো। এমন একজন পিতৃদেব কি করে যে আমাকে মোটর

ড্রাইভার করার কথা শেষ পর্যন্ত ভেবেছিলেন। কারণ ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে একজন ড্রাইভারের তুলনামূলক সম্পর্কের কথা ভাবলে নির্বুদ্ধিতা বৃদ্ধি পেতে পারে—সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। ঐ তো কি চকচক করছে। টী-স্টলের পাশটায়—না, সোডার বোতলের ছিপি। একটা আস্ত সিকি যেন—আসলে পয়সা ক'টা কত দুর্লভ বস্তু, আমার চোখ না দেখলে তখন কেউ টের পেত না। একটা আবর্জনার ঢিবিতে লাফিয়ে গেছি, সেখানে বসে কিছুক্ষণ ঘাঁটাঘাঁটি করা গেল। তবু নিরাশ হতে শিখি নি—না পারিলে দেখ শতবার। এই শতবার করতে গিয়ে কখন যে বেলা পড়ে গেছে, কখন ডুবন্ত জাহাজের হতাশ নাবিকের মতো খাটিয়ায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়েছি, টের পাই নি। আকাশে চাঁদ উঠেছে, বাংলোবাড়িটায় মিউজিক বাজছে—কোথাও হাউই পুড়ছে—পৃথিবীতে মানুষের অনন্ত সুখ, শুধু আমার কাছেই সে মুখ ফিরিয়ে আছে। কবে যে সময় হবে—

রহমানদা ফিরে আমাকে দেখল শুয়ে আছি। পালাই নি, এতেই তার মুখ উজ্জ্বল। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। ঘরের সব কিছু ছিমছাম দেখে খুব খুশি। তারপর আমার মুখের দিকে তাকাতেই কেমন বিস্ময়—হ্যাঁরে, তোর চোখ-মুখ কোথায় গেছে? কি হয়েছে তোর? মুখ এত শুকনো কেন। সারাটা দিন যা গেছে, সব বললে বিশ্বাসই করবে না। মানুষের এত হুজ্জোতি হয়, তার ধারণায় হয়ত নেই। খাই নি বলতে গিয়ে গলাটা কেমন বুজে এল অভিমান এত যে আমার কোথা থেকে আসছে। বুঝি, সব মানুষের উপর অভিমান। মা-বাবা, পাঁড়েজী এমন কি পিলুটা পর্যন্ত আজ আমার শত্রু। পিলু যদি এক-আধ দিন শহরের সেই গ্যারেজে দেখা করতে যেত, তবে হয়তো পালাতাম না। পিলুরও যে অভিমান হতে পারে, তার দিগ্‌বিজয়ী দাদাটা শেষ পর্যন্ত মোটর গ্যারেজে ঝুল-কালি মেখে একটা ক্লিনারের কাজ করছে—সহ্য হবে কেন? পিলু তো কত দিন বলেছে, তুই দাদা যখন বড় হবি, কলেজে পড়ে এই-মা বড় মানুষ হবি তখন আমাদের কোন দুঃখ থাকবে না। সেই মস্ত বড় দাদাটা কিনা গ্যারেজে কাজ করতে রাজী হয়ে গেল।

—কী হয়েছে বলবি তো? রহমানদা জুতো মোজা খুলে, হাতঘড়ি খুলে ভেতরের ঘরটায় রেখে এল।

—পাঁড়েজী খেতে দেয় নি।

—খেতে দেয় নি! কেন, কেন খেতে দেয় নি? ঝগড়া করেছিস?

—না-না। বলল, দশ আনার মিল হবে না।

—মগের মুল্লুক। সহসা একটা ধনুকের ছিলা কেটে গেলে যেমন হয়, রহমানদা সেরকম সোজা হয়ে বলল, চল তো, শালার থুতনি নেড়ে দেব।

—ওর দোষ নেই দাদা। তুমি শুধু শুধু রাগ করছ।

এমন কথায় রহমানদা আমার হাত ছেড়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—তবে কার দোষ?

—আমারই।

—তোর, মানে, তুই কি কিছু……

—না, না। কিছু চুরি করি নি। মানে……

—চুরি! চুরি করবি কেন? চুরির কথা আসে কি করে? এতটুকুন একটা ছেলেকে পারল না খাইয়ে রাখতে?

—না পোষালে কি করবে?

—তোর কোন কথা বুঝতে পারছি না। বলে ফের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছিল। দশ আনা পয়সা সোজা! দশ আনায় সব জায়গায় মিল দেয়, ও দেবে না মানে? তুই ব্যাটা জরু-গরু বৌ ক্ষেত সব করবি আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে আর মিল দেবার বেলায় জুচ্চুরি। পাষণ্ড কোথাকার। হারামির সব ক'টা দাঁত যদি তুলে না দিই। ইস, সেই থেকে না খেয়ে আছিস?

প্রায় আমাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল শেষ পর্যন্ত। আমার কোন কথাই কানে তুলছে না।

দোকানের সামনে গিয়ে রহমানদা হাঁক পাড়ল, পাঁড়েজী—

—আজ্ঞে যাই জনাব।

কী ভাল মানুষ!

—তুমি ওকে খেতে দাও নি?

বুঝতে পারছি, রহমানদা ক্ষেপে গিয়ে হয়ত এখন তুই তুকারি করবে। এতটা আমার ভাল লাগছিল না। ভিতরে আবার মজাও পাচ্ছিলাম। একটা কুকুর থাকলে, আরও ভয় দেখানো যেত। লুঙ্গি খুলে দিতে পারত।

—দিচ্ছি।

—ও পেট ভরে খাবে। কত লাগবে তোমার?

—যা খায়, চোদ্দ আনা লাগে জনাব।

লোকটা একেবারে বাঙালী হয়ে গেছে দেখছি।

—তাই দাও। মাছের মুড়ো আছে?

—আছে।

—টক ?

আছে ?

—দুটো মিষ্টি ?

—দেব।

—সব মিলে কত ?

—এক টাকা।

—ব্যস তো এই কথা। দেখবে নড়েচড়ে বসেছ তো আগুন ধরিয়ে দেব চালায়। পাঁড়েজী একটা হাতল ভাঙা চেয়ার টেনে এনেছে। খুব বিনয়, বলছে, বসুন রহমান সাব। কি খায় দেখুন। তারপর রাগ করতে হয় করবেন।

—তাই দেখব। এই বিলু, পেট ভরে খাবি। তুই এমন কি খাস যাতে ওর পোষায় না। আর যদি দেখি লজ্জা করছিস খেতে, লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব। এমন উভয় সংকটে জীবনে কমই পড়া গেছে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করা আগে দরকার। পেট ভরে খাব। সেটা আকণ্ঠ হবে। এবং আর যাই করি, কোন কারণে রহমানদার সঙ্গে অবিশ্বাসের কাজ করতে পারি না। বড় আসনে আসন পিঁড়ি হয়ে বসা গেল। অনেক দিন পর ভোজের খাওয়া। গণ্ডূষও করা গেল। অর্থাৎ খাবার আগে দেবতারা তুষ্ট হোন, পেল্লাই জবরদস্ত ভোজ—যত দেয় তত খেয়ে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে দেখছি পাঁড়েজীর চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠছে। ওদিক থেকে রহমানদা বলছে, ওর ভাত লাগবে। এই ঠাকুর, তোমায় কি বাতে ধরেছে, হাতায় ভাত ওঠে না কেন ? বিলু, চালিয়ে যা।

যত বলছি আর লাগবে না, তত রহমানদা বলছে, লাগবে। তুই খা তো। ব্যাটা পেট ভরে খেতে পর্যন্ত দেবে না : কুনজুস। পাপ হবে না। মানুষকে কখনও আধপেটা খাইয়ে রাখতে হয় ? না খাইয়ে ফিরিয়ে দিতে হয় ? চিল্লা-চিল্লিতে আরও দশটা লোক জমে গেছে। রহমানদা দুপুরের ঘটনা সবিস্তারে বলছে। বলুন, বেটা তুই কোন্ মুল্লুক থেকে এসেছিস পয়সা কামাতে, পয়সা কামা, বারণ করেছে কে ? তাই বলে এমন নিষ্পাপ ছেলেটাকে না খাইয়ে রাখা। আপনারা বলুন, দশ আনায় মিল হয় কি না ? সবার যদি হয়, ওর হবে না কেন!

সঙ্গে সঙ্গে ওরাও সায় দিচ্ছে—রহমান সাব, এক পয়সা বেশি দেবেন না। যেমন দেশের গরমেন্ট, সব শালা লুটেপুটে খেতে এসেছে। এক পয়সা বেশি দেবেন না।

রহমানদা বেশিই দিল। পুরো এক টাকা। এতটা খেয়েছি যে উঠতে কষ্ট

হচ্ছে। রহমানদা বলল, বোস। আমি আসছি। বোধহয় রহমানদা তার রাতের সিগারেট আনতে গেল—কিংবা ওদিকটায় যে সার্বজনীন হোটেল আছে সেখানে খেতে চলে গেল। আমি বসে থাকলাম।

রহমানদা ফেরার সময় দুটো পান নিয়ে এসেছে। খা, খেলে হজম হবে। পাঁড়েজী অন্য খদ্দের সামলাচ্ছে। ভয়ে রহমান কিংবা আমার দিকে তাকাচ্ছে না। একা পেলে লোকটা কি করবে কে জানে? রাস্তায় বললাম, কাল খেতে দেবে তো?

—ওর বাপ দেবে। আর তুই কি! না খেয়ে থাকলি! পয়সা তো ছিল, অন্য কোথাও কিছু খেয়ে নিতে পারলি না?

দৌড়ঝাঁপে পয়সা হারিয়েছে, ছোড়দির বাগানেই পড়েছে পয়সা ক'টা, কাল খুঁজলে পেয়ে যাব। পয়সা হারিয়েছি বলতে সাহস হল না।

রহমানদা রোয়াক পার হবার সময় বলল, কেউ এসেছিল?

—না।

—জামাপ্যান্ট ছিঁড়লি কি করে?

—ছোড়দির গোলাপজাম পাড়তে গিয়ে। তারপর রহমানদা যদি প্রশ্ন করে, গাছে উঠলি কখন? পয়সা ক'টা দে। রেখে দি। বলে ফেলাই ভাল—রহমানদা! ঘরে ঢুকে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল—কিছু বলবি?

—গাছে উঠতে গিয়ে পয়সা ক'টা কোথায় পড়ে গেছে।

—তোকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। খুঁজেছিলি?

—হ্যাঁ। পাই নি। বাগানে আছে মনে হয়।

—কাল খুঁজে দেখিস।

—ঢুকতে দেবে?

—ছোড়দিকে বলে দিয়ে যাব। পয়সা হল গে মানুষের ইজ্জত। যেখানে সেখানে তাকে হারাতে নেই। ঠিক এই সময়ই কড়া নাড়ার শব্দ।

—এই খুলিস না। কেমন ফ্যাকাসে মুখ রহমানদার। বলল, কে?

—আমি।

—আমিটা কে?

—পাঁড়ে রহমান-সাব।

—অঃ। আসুন।

ভিতরে এলে বলল, বসুন।

—বৈঠেগা নেহি। আপনি মেহেরবান আদমি।

—তা বুঝছি। টাকা পয়সা এখন নেই।

—ও বাত নেহি।

—তবে কি বাত আছে?

পাঁড়েজী আমার দিকে চশমার উপর দিয়ে তাকাল। চোখ দুটো পিটপিট করছে। গোবদা মুখ, ঝাঁটা গোঁফ। গলায় ঢোলের মতো তাবিজ। তাগা কনুইতে বাঁধা। চেহারাতে রাম নাম সত্ হ্যায় হয়ে আছে।

—আজ্ঞে, রহমান সাব বলছিলাম……

—বলে ফেলুন না।

—দশ আনা আচ্ছা থা সাব।

—মানে?

—চোদ্দ আনা মিল দিলে পোষাবে না সাব। বহুত খা লিয়া।

—কতয় পোষাবে?

—না—বলছিলাম, আপনার না যায়, হামার ভি না যায়। খাস বাত এক—দশ আনাই। দশ আনা দিলেই হবে।

—এত সুমতি!

—সুমতি না সাব, বাত এই হ্যায় ও ভি দশ আনা খাবে। হাম ভি দশ আনা মিল দেবে।

চুক্তি বাতিল হলে আবার কোথায় গিয়ে পড়ব কে জানে? যা দশা চলছে। বললাম, রহমানদা, ঐ কথাই থাক।

—মানে?

—দশ আনা মিল।

—পেট ভরবে?

—খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে যাবে? ক্ষুধার সঙ্গে কিছুটা চোখের খিদে আছে, ওটা আর বিশদ করে বোঝালাম না। আমার কথা পেয়ে পাঁড়েজীর হাতে স্বর্গ মিলে গেল।

—খোকাবাবু বহুত ইমানদার আদমি আছে সাব। হাম চলে। রাম রাম।

চোদ্দ আনায় আমার আবণ্ঠ খাবার স্বাধীনতা রহমানদা দিয়েছিল। পাঁড়েজীর এত বড় স্বাধীনতা পছন্দ নয়। সে আমার সেটুকু হরণ করে দিব্যি রাম নাম বলতে বলতে চলে গেল।

সকালে আজ ঘুম থেকে রহমানদার আগেই উঠেছি। রহমানদা সকালে উঠে ঘরের কাজকর্ম কিছু সেরে রাখে। কুঁজোতে জল রাখা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কিছু কাচাকাচি থাকলে তাও। জানি না, কেন মানুষটাকে অত্যন্ত কাছের মনে হচ্ছে দিন দিন। বিশ্বস্ত থাকার চেয়ে বড় কাজ কিছু নেই। কী পরিবারে, কী বাইরে। বাবার কথা। রামায়ণ থেকে মহাভারত থেকে তার ভূরি ভূরি উদাহরণ। যিনি অন্ন দেন, তিনি ঈশ্বর। জমিদারী সেরেস্তায় বাবা কাজ করতেন—জমিদার মানুষটি তাঁর দেখা শ্রেষ্ঠ মানুষ।

কাজেই এখানে যিনি অন্ন দিচ্ছেন, তাঁর কাছে আমার কিছু ঋণ থেকে যাচ্ছে। গৃহকর্ম করে আপাততঃ সে ঋণ থেকে আংশিক মুক্তিলাভের উপায় খুঁজছি। ঘুম থেকে উঠে রহমানদা আমাকে এ সব করতে দেখে ভারি ক্ষেপে গেল—বের হয়ে যা। এক্ষুণি বের হ বলছি। তোকে বলেছি কাচাকাচি করতে? নিকালো হিঁয়া সে।

খুব কাতর গলায় বললাম, সারাদিন বসে থাকতে ভাল লাগছে না।

রহমান এ দু'দিনে আমার মোটামুটি পরিচয় জেনে নিয়েছে। আমাকে যে নবমী দা-ঠাকুর বলে তাও। বাবার কিছু কথাবার্তা তাকে আমার সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে বোধহয় শিখিয়েছে। অবস্থা বিপাকে আমরা গরিব হয়ে গেছি, এবং এ সব কারণেই বোধহয় বাড়াবাড়ি করতে সাহস পেল না। বলল, ঠিক আছে, কাল থেকেই কাজে লেগে যা। নিমতা যাবি। গাড়ি আসবে। গাড়িতে যাবি।

—কখন যাব?

—বিকেলের দিকে তুলে নেবে। তোর জামাপ্যান্ট জুতোর দরকার! ভাল হয়ে থাকতে শেখ।

দুপুরের দিকে রহমানদা আমাকে নিয়ে কিছু সওদাপাতি করল। তখনই কথায় কথায় বলল, আমি এক রকমের, তুই আর এক রকমের। তুই দেখছি তোর বাবার স্বভাব পেয়েছিস।

আরও জানলাম, ওর দু'রকমের ব্যবসা আপাতত আছে। কোলিয়ারি থেকে কয়লা আনা আর পারমিটের পেট্রল ব্ল্যাক করা। বাবুদের পয়সা দিলেই পারমিট। পারমিট বেচলে পাঁচ-সাতশো টাকা হয়ে যায়। পুলিস, সরকারী বাবু, সবাই অংশীদার। রহমানদার পয়সার অভাব নেই। লেখাপড়া শিখে যদি মানুষ অধর্ম করে, চুরি-চামারি করে, তবে লেখাপড়া না-শেখা মানুষের আর ধর্ম থাকে কোত্থেকে। কাজেই এ-সব কাজে তার কোন পাপবোধ নেই।

এটা যে খুব একটা অধার্মিক কাজ, আমারও তেমন মনে হল না। কারণ

বিষয়টা প্রথমে ভারি গোলমেলে। যুদ্ধের সময়কার কথা। ব্ল্যাক-মার্কেট শব্দটি তখন আমাদের শোনা। বয়সে খুব বাচ্চা, ব্ল্যাকমার্কেট করে টাকা কামাচ্ছে কথাটা চুরি-চামারির পর্যায়ে পড়ত না। বরং যুদ্ধের কালোবাজারী একজন মানুষের পিতৃশ্রাদ্ধে যে এলাহি ভক্তির প্লাবন দেখেছিলাম, তাতে তার ধর্মবোধে এখনও বিস্মিত হই। ফলে রহমানদার ধর্মাধর্মে কিছুটা খামতি আছে, আদৌ বিষয়টা আমাকে স্পর্শ করল না। মানুষটা সোজাসুজি কথায়—বরং অনুরাগ আরও বেড়ে গেল। বললে জীবন দিতে পারি এমন অবস্থা।
বিকেলের দিকটায় সেজেগুজে বসে আছি। এ সময়টাতে প্রায়ই আমার চোখ বাংলোবাড়িটায় গিয়ে পড়ছে। সকাল থেকে আজ ছোড়দিকে দেখি নি। নতুন জামাপ্যান্ট পরে কেমন দেখাচ্ছে, যদি ছোড়দি দেখত। দেখলে বোধহয় আর আগের মতো কুকুর দিয়ে খাইয়ে দেবার সাহস পাবে না। দেখা হলে, বাগানে যেতে পারতাম। ওখানে দশ আনা পয়সা। কেউ নেই দেখছি। এমন কি, মালীটা যে ওদিকে কি টুকটাক কাজ করে, সেও নেই। কুকুরটার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। পাঁচিল টপকে পালিয়ে দেখে এলে হয়। যেই টপকেছি, আর কোত্থেকে সেই বিশাল কুকুরটা এসে হামলে পড়েছে। ভয়ে কাঁটা। হাত তুলে দাঁড়িয়েছি। দৌড়ে আসছে কেউ। তাকে চিনি না। বাড়িতে কে কোথায় থাকে টের পাওয়া ভার। এসেই খপ করে হাত ধরে ফেলল, ক্যারে তুই?
যত বলি আমি বিলু, ছোড়দি আমাকে চেনে, তত লোকটা ক্ষেপে যায়। টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। যত বলছি, গোলাপজাম পাড়তে গিয়ে আমার পয়সা হারিয়েছে, তত লোকটা রেগে যায়। এত রাগ থাকলে মানুষ যায় কোথা?
সিঁড়ি ধরে উঠতেই বিশাল বারান্দা, একদিকে চিক ফেলা। নানারকম পাথরের কাজ করা মেঝে। আমার কেন জানি বিশ্বাস—ছোড়দি আমাকে আর তাড়া করবে না। ভাল জামাকাপড় পরলে মানুষের অন্য রকম চেহারা হয়ে যায়। ভিতর থেকে কেউ ছুটে আসছে—কে ঢুকে ছিল রে বাগানে?
—এই ছোঁড়াটা মা।
ছোড়দির মা। এত সুন্দর। কেমন বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলাম। দূর থেকে দেখেছি। ছবির মতো দেখতে পৃথিবীতে মানুষ জন্মায়, ছোড়দির মাকে দেখে প্রথম সেটা বিশ্বাস হল। আর কি জানি, জানি না, আমার পোশাক-আশাক দেখে ছোড়দির মা যেন কিছুটা বিড়ম্বনার মধ্যেই পড়ে গেছে—তুমি খোকা বাগানে?।
—পয়সা পড়েছে।
—পয়সা।

—ছোড়দি জানে।

—ওর তো জ্বর। দাঁড়াও দেখছি। কিসের পয়সা? বলে ফের ঘুরে দাঁড়ালেন। কুকুরটা বারান্দায় এখন লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। লোকটা আমাকে ছোড়দির মার হেপাজতে রেখে কোথায় হাওয়া। ছোড়দির মা বুঝতেই পারছে না আমিই সেই বাঙ্গাল।

কী বলি। কারণ গোলাপজাম পাড়তে গিয়ে পয়সা ক'টা বাগানে পড়তে পারে বলা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিলাম না। আসলে একটাই ইচ্ছে আমার—যা হয় হোক, ছোড়দি আমাকে দেখুক। ভাল জামাপ্যান্ট পরলে আমিও যে কম যাই না, এবং এতক্ষণে মনে হল, পয়সা খোঁজার অজুহাতে এ বাড়িটার মধ্যে আমি ঢুকতে চাইছি। কিন্তু ছোড়দির জ্বর—কেন জ্বর হল, বড় চঞ্চল ছোড়দি—তার যদি জ্বর হয় কি হবে? ছোড়দির মা আমাকে চুপচাপ দেখে হঠাৎ বললেন—কে আছিস রে? রুমকিকে পাঠিয়ে দে তো।

ছোড়দি পুরু হাতা জামা, লম্বা পাজামা পরে অনেক দূর থেকে যেন হেঁটে আসছে। গায়ে নরম উলের চাদর। আর আশ্চর্য উষ্ণ এক ঘ্রাণ সঙ্গে বয়ে আনছে। কাছে আসতেই কেমন চমকে উঠল ছোড়দি—আমাকে দেখে। বিশ্বাস হল না, সেই বাঙ্গালটা। কাছে এসে বলল—তুই? বলে বেশ নরম চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

—ছোড়দি?

ছোড়দি কেমন চকিত চোখে ফের তাকাল।

—পয়সা হারিয়েছি।

—কোথায়?

—তোমার বাগানে।

—কখন?

—গোলাপজাম পাড়তে গিয়ে। খুঁজে দেখব?

ছোড়দির মা ভিতরে ঢুকে গেছেন। ছোড়দি কি খুঁজল যেন, তারপর বলল—আয়। ভিতরে আয় না।

আমার ভারি সংকোচ হচ্ছিল। বাবার জমিদারের প্রাসাদ আমি দেখেছি, কিন্তু এত ছিমছাম নয়। সব কিছু সাজানো, এতটুকু ধুলোবালি কোথাও নেই। মেঝেতে আমার প্রতিবিম্ব ভাসছে। হলুদ নীল রঙের দেয়াল, লতাপাতা আঁকা পর্দা হাওয়ায় উড়ছে। একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল—বোস, আসছি। তারপর মা মা করে ডাকতে থাকল।

মা এসে বলল—এই সেই বাঙাল মা, রহমানের কাছে থাকে।

ছোড়দির মা কি ভেবে বললেন—বাঙাল বলে কী মানুষ না? আমার দিদিমা তো শুনেছি বাঙাল ছিল। জানিস, বাঙালরা দেখতে খুব সুন্দর হয়। দিদিমার মায়ের কি রঙ ছিল! আমি আর তার কী পেয়েছি?

ছোড়দির সান্নিধ্য আমাকে ভারি আপ্লুত করছিল। ছোড়দি আমাকে তার ঘরে নিয়ে বসিয়েছে। কত সব জিনিস! একটা বাক্সে কি চাকা দেওয়া—কিছুই চিনি না। টেবিল চেয়ার বই আলমারি, সব কিছুতেই আমার কৌতূহল—এটা কি ছোড়দি?

ছোড়দি বলল—রেকর্ড প্লেয়ার।

—কি হয়?

—গান। শুনবি?

—দেখব।

—ভাখ না।

—কত বই, না ছোড়দি? এত বই তুমি পড়েছ!

—এগুলো তো সব গল্পের বই রে।

—কখন পড়তে হয়? স্কুলে পড়লে এ সব পড়া বারণ নয়?

—বারণ হবে কেন?

ছোড়দি ছোট্ট সবুজ সোফায় গা এলিয়ে বসে পড়ল।

এত বই ছোড়দিকে তার বাবা কিনে দিয়েছে। বললাম—এ ঘরের সব কিছু তোমার?

—সব।

পৃথিবীতে ছোড়দি এত সব শৌখিন জিনিস নিয়ে বড় হচ্ছে। ছোড়দির বর কি রকম হলে মানায়, আমার ধারণায় আসছিল না। বললাম—ছোড়দি, যাবে?

—কোথায়?

—পয়সা ক'টা খুঁজে দেখব। পয়সা নাকি হারাতে নেই।

—কি হয় হারালে? তুই কি বোকা রে। তোর কথাবার্তা শুনলে হাসি পায়।

—পয়সা হারালে নাকি মানুষের ইজ্জত যায়।

—ধুস। আমার তো কিছু ঠিক থাকে না। মা কত বকে।

তখনই মনে হল, ছোড়দির সঙ্গে এক ঘরে বসে এতক্ষণ কথা বলা উচিত হচ্ছে কি না। লাই দিলে ঘাড়ে চড়ে—এমনও তো ভাবতে পারে। বিচারবুদ্ধি সজাগ রাখা ভাল। বললাম—ছোড়দি, আমি বরং উঠি। তোমার জন্য—

—বোল না। বিকেলের জলখাবার হচ্ছে।

বিকেলের জলখাবার বিষয়টি আমার মাথায় ঠিক আসছে না। লোকে সকালে জলখাবার খায়। দুপুরে পেট ভরে, রাতে পেট ভরে খেতে হয়। আমরা ভাই-বোনেরা দেশের বাড়িতে থাকতে তিন-বেলাই পেট ভরে ভাত খেতাম। জল-খাবার খেত বড়রা। তাও সকালে।

বললাম, বিকেলে কে আবার জলখাবার খায়? যেন বড়ই অনাসৃষ্টি কারবার। বড়ই নিয়ম-বহির্ভূত কাজ।

আর তখনই দেখি গরম লুচি ভাজা দু' প্লেট, বেগুন ভাজা, এক গ্লাস করে জল। মীনা করা গ্লাসগুলি সাজিয়ে রাখা হল। ছোড়দির সঙ্গে আর কেউ খাবে। এ সময় আমার থাকা ঠিক না। হ্যাংলা ভাবতে পারে। ছোড়দি জলখাবার খেয়ে হয়ত বাগানে যাবে। এজন্য বসতে বলেছে। কাজেই খুব সংকোচের সঙ্গে বললাম, ছোড়দি, আমি বাইরে দাঁড়াচ্ছি। তুমি খেয়ে এস।

—তোরটা কে খাবে?

এতটা আমার সাহস নেই, অথবা ভাবতে পারি, কেউ আমার জন্য গরম লুচি ভেজে বসে থাকতে পারে? প্রথমে ভুল শুনতে পারি, এমন মনে হল। আমার এখন কিছুতে বিশ্বাস নেই। আশা করেছিলাম ছোড়দি পোশাক দেখে বলবে, ভারি মানিয়েছে তোকে। কিছুই বলে নি। যেন আমার পক্ষে যা স্বাভাবিক, আজ তাই পরে এসেছি। এ ক'দিন শুধু আমার নাটক গেছে।

লুচির প্লেটটা থেকে ভারি সুঘ্রাণ আসছে। পাশে দুটো মিষ্টি। কোনরকমে সামলে বললাম, আমাকে খেতে বলছ?

—তবে কাকে?

—না। মানে ভুল হচ্ছে না তো?

ছোড়দি এবার ভাবল, ঠাট্টা করছি। উঠে এসে বলল—মারব এক থাপ্পড়। খা তো।

এ সব বিষয়ে প্রথমে নানা সংশয় দেখা দেয়। প্রথম কথা, আমি কে? আমাদের বাড়িতে ছোড়দির মত বয়েস হলে বিয়ের কথা ওঠে। আমার এবং ছোড়দির বয়সটা বোঝাবুঝির মাঝখানটায়। কিছুটা এগিয়ে এসেছি। সবটা হয় নি। কি এক রহস্য, ঠিক বুঝতে পারি না, তবু টানে। প্রকৃতি আমাদের সামনে জাদুকরের গালিচা পেতে রেখেছে। শুধু আজীবন তা হেঁটে পার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা। ছোড়দিকে বললাম, তুমি সাইকেল চড় কেন? যেন এই যে খাওয়া, এখনই যথার্থ সময় সব ঝাল মিটিয়ে নেবার।

—ছোড়দি বলল, তুই মেট্রিক পাস করেছিস ?
—সব বিষয়ে পাস করেছি। শুধু পাস নয়, সব বিষয়ে পাস।
—তবে এত বোকা বোকা কথা বলিস কেন ?
—ছোড়দি ভয়ে। ট্রেনে চড়ে যাচ্ছিলাম সব বিষয়ে পাস না করা একটা লোকের সঙ্গে দেখা করতে। বাপস, এত ঝামেলা কে জানে ?
সব শুনে ছোড়দি হা-হা করে হেসে উঠল। যত বলি হাসছ কেন, হাসার কি হল, তত ছোড়দি হাসতে হাসতে সোফায় লুটিয়ে পড়ছে। যত বলছি, আমার কি দোষ বল, আমাকে তো তিনিই একটা পছন্দমত কাজ দিতে পারেন। পড়তেও পারি, বাবা মাকেও খাওয়াতে পারি, কে না চায় ?
ছোড়দির হাসি থামছে না। আর মাঝে মাঝে ডাকছে—মা; শীগগির এস। বিলু কী কাণ্ড করেছে শোন। মা-মা—
তিনি এলে, ছোড়দি আবার হাসতে থাকল—মা, বিলুটা না, বিলুটা কোথায় গিয়েছিল জান ? মা, ও না প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করবে বলে বাড়ি থেকে পালিয়েছিল। হাসছে আর বলে যাচ্ছে। শুনে দেখি তিনিও হাসছেন —তুই কী রে ? তুই দেখছি সত্যি বাঙাল। এবং আমার এমন পরিচয় পেয়ে তাঁরা কিছুটা বোধহয় আমার মধ্যে একজন সরল সহজ মানুষকে খুঁজে পেয়ে গেল। এই নিয়ে রহমানদা থেকে ডাক্তার মানুষটিও বেশ আমাকে নিয়ে মজা করল। এতে কি মজা আছে, আমার মাথায় কিছুতেই ঢুকছে না। মানুষই তো মানুষের কাছে যায়। আর সে মানুষ যদি বড় হয়, তবে তার কাছে তো অনেকে যাবেই। দেশটা যে চালায়, মানুষগুলির ভাবনাও তো তার। এটা এমন কি হাসির কাজ হল ভেবে পাচ্ছি না। কেমন বোকার মত ওদের দিকে তাকিয়েছিলাম শুধু।
ছোড়দি বলল—নে, খা। খেতে খেতে পাঁড়েজীর কথা বললাম। দশ আনা মিল ঠিক হয়েছে শেষ পর্যন্ত। শর্তের কথাগুলোও ছোড়দিকে বললাম। তা ছাড়া দুপুরে মিল পর্যন্ত দেয় নি—লোকটা কি কুনজুস। ছোড়দি বোধহয় হেসে ফেলবে। না, আর বলা ঠিক না। সারাদিন না খেয়ে ছিলাম শুনলে আরও মজা পাবে। হঠাৎ দেখি তখন ছোড়দি ভারি গম্ভীর হয়ে গেছে। বলল, তুই না খেয়ে ছিলি ?
—তুমি আমার হেসে ফেলবে না তো ?
—যা বলছি, উত্তর দে।
পুলিসের ভয়টা একবার উঁকি দিয়ে গেল। কুকুরটা কোথায় দেখছি।
—কি, না খেয়েছিলি ?

—হ্যাঁ ছোড়দি।

—খাস নি, বলিস নি কেন?

—তুমি যে বললে পুলিসে দেবে?

—কবে বললাম?

—বা রে। মনে নেই? আমাকে ধরে নিয়ে আসার সময়।

ছোড়দি আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকল। ভয় লাগছে। এত সুন্দর ব্যবহার ছোড়দির মার, ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা, সন্দেশ, সব শুবে যাবে। বললাম—খেয়েছি। দুটো গোলাপজাম খেয়েছি। তোমাকে সত্যি কথা বলাই ভাল। গোবিন্দদার কাছ থেকে পালাবার সময় কুড়িটা টাকা নিয়েছি। বলে নিই নি। বাবা তো বলেন, না বলে কিছু নিলে অপহরণ করা হয়। আমি সেজন্য লিখে রেখে এসেছি।. টাকা মান যশ হলে সব ফেরত। ছোড়দি, আর যাই কর, পুলিসে দিও না। পিলু বাবা জানতে পারলে দুঃখ পাবেন।

ছোড়দি কিছু বলছে না। তাকিয়েই আছে। চোখ দুটো ছোড়দির চকচক করছে কেন? কেমন জলে ভার। ছোড়দির এটা কি হচ্ছে? ছোড়দির চোখে জল—এই ছোড়দি, ছোড়দি, ঠিক আছে, আর বলব না।

ছোড়দি কোন কথা না বলে উঠে চলে গেল। সমবয়সী যদি কেউ এভাবে চোখের জল ফেলে, আমার বড় খারাপ লাগে। ধুস, না বললেই হত। কেন যে বলতে গেলাম? ছোড়দি ফিরে এল কেমন অন্য এক ছোড়দি হয়ে। বলল—বিলু, চল তোমার পয়সা ক'টা খুঁজে পাই কিনা দেখি। ছোড়দি তার কুকুরের চেনটা এবার আমার হাতে দিয়ে বলল—শক্ত করে ধরে রাখ। তুমি যা মানুষ, যে কেউ তোমার হাত থেকে পালাতে পারে।

সেই থেকে ছোড়দি কেমন অন্য মানুষ হয়ে গেল। সারাটা বিকেল গাছের নিচে, ঝোপ-জঙ্গলের মধ্যে শুকনো ডাল পাতার ভেতর পয়সা ক'টা খুঁজল। আমার কাছে পয়সা ক'টা কত দামী, ছোড়দির খোঁজা না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। কিছুই পাওয়া গেল না।

বাড়ি থেকে এক সময় ছোড়দির মাও হাজির। বললেন—পেলি?

ছোড়দি কিছু বলল না।

যেন বড় একটা অন্যায় কাজ করে ফেলেছে ছোড়দি। পয়সা ক'টা খুঁজে পেতেই হবে। আমি বললাম—যাক গে। রহমানদাকে বলব, খুঁজে পাই নি।

ছোড়দির মা বললেন—আমার সঙ্গে এস। দশ আনা দিয়ে দিচ্ছি। রহমানকে দিয়ে দিও।

আমি বললাম—সেই ভাল।

ছোড়দি কিন্তু আমার সঙ্গে গেল না। ছোড়দির মা পয়সা ক'টা দিয়ে চলে গেলে, ছোড়দি সামনে এসে দাঁড়াল। কেমন অপমানে থমথম করছে চোখ। ছোড়দিকে নিয়ে সত্যি পারা গেল না। জর নিয়ে খোঁজাখুঁজি, তার চেয়ে এই ভাল—রহমানদাকে ফিরিয়ে দেওয়া যাবে—তা না, কেমন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে। বলছে, কেন নিলে বিলু?

—কী হয়েছে? উনি তো ভালবেসে দিয়েছেন।

—দাও, পয়সা ক'টা দাও।

—তুমি নিয়ে নেবে?

—হ্যাঁ। আমাদের পয়সা ভিক্ষা নেবে কেন? লজ্জা করে না। বলে প্রায় কেড়েই পয়সা ক'টা হাত থেকে নিয়ে নিল। যাবার সময় বলে গেল, আজই রহমানকে বলে দেব, তোমার বাবাকে যেন চিঠি লিখে দেয়। তিনি যেন তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যান। তারপর ছোড়দি যেমন গাছপালার মধ্যে রোজ অদৃশ্য হয়ে যায়, আজও তেমনি হারিয়ে গেল।

খাটিয়ায় ফিরে কেমন হতাশায় ভেঙে পড়লাম। ছোড়দিকে কিছুতেই খুশি করা যাচ্ছে না। এই রোদ, এই বৃষ্টি। এমন দুরন্ত পৃথিবী নিয়ে কে আর কত দূর যেতে পারে? কী যে অপরাধ আমার বুঝি না।

কিছু ভাল লাগছিল না। ক্রমে রাত বাড়ছে। চারপাশে আলো। গুরুদোয়ারাতে ভজন হচ্ছে। তেমনি নীল আকাশ, নক্ষত্র সব ফুটে আছে। সেই নক্ষত্র থেকে বার বার সংকেত ভেসে আসছে। বিলু, আমি তোমার জন্য বড় হচ্ছি। গ্রাম মাঠ শস্যক্ষেত্র আমার দু' হাতের মুদ্রায় নাচানাচি করে। ফুল ফোটে। শস্য জন্মায়। নদীর পাড়ে আমরা হেঁটে যাই। কোন দূরবর্তী উপত্যকায় আমি ছুটি। তুমি আছ বলেই আমি আছি। আমি ছুটি, আমি বাঁচি।

ছোড়দির চোখে জল। ছোড়দি বাবাকে আসতে লিখবে। কিন্তু আমার যে সংকেত আসছে দূরবর্তী নক্ষত্র থেকে—বড় হও, বড় হও। আমি কাকে নিয়ে বড় হব? সে আমার কে? কি সংকেত তার আমার জন্য? কেন চোখে জল? কে যেন আশ্চর্য ইশারায় বলে গেল, বিলু, তোমার মধ্যে এক ভয়ঙ্কর ভালবাসা দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে। তার টানে তুমি ভেসে পড়েছ। সে তোমাকে ঠিক কোথাও পৌঁছে দেবে। কোন গভীর অরণ্যে অথবা ফুলের উপত্যকায়।

এভাবে অনাবৃত আকাশের নীচে আমি আবার কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। স্বপ্ন দেখছি, ছোড়দি আমার শিয়রে চুপচাপ বসে আছে।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

আমি বাড়ি ফিরে আসায় পিলু যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। পিলুর সব ছিল, গাছপালা, শস্যক্ষেত্র, বনজঙ্গল, ঘোড়া গরু—সব। কেবল দাদা নেই। দাদা ফেরার। সে নিজে কত জায়গায় দাদাকে খুঁজতে গেছে। নিবারণ দাসের আড়তে গিয়ে বলেছে, দাদা আমার কোথায় চলে গেছে। রেলগাড়ি চড়ে দাদা চলে গেছে। রেলগাড়ি কতদূর যায়। সকাল বিকেল সে স্টেশনে গিয়ে বসে থাকত, দাদাটা যদি ফেরে। বাবা বলতেন, মতিচ্ছন্ন। মতিচ্ছন্ন না হলে এমন হয় না।

বাবার সম্বল ছিল তখন গ্রহগুরু। সকাল হলেই গ্রহগুরুর দরজায় হাজির হয়ে ডাকতেন, ও সুবল, কিছু টের পেলে?

গ্রহগুরু বলত, ভালই আছে কর্তা। ভাববেন না। সব গ্রহের ফের। ফিরে আসবে।

বাবা বলত, এমন একটা ভাল কাজ মানু ঠিক করে দিল, ক'জনের হয়। মানুর বন্ধু এই করে বাড়ি গাড়ি সব করেছে। তোর যে হত না কে বলবে। তুই একটু ধৈর্য ধরে কাজটা শিখতে পারলি না। চিরকুটে লিখে রেখে গেছে,—আমি যাচ্ছি, ভাববেন না। বড় হয়ে ফিরব।

বাড়ি ফিরে আমার খুব একটা মুখ ছিল না। প্রায় পক্ষকাল বাড়ি ছাড়া—মা নাকি একদিন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল। আর বাবাকে দোষারোপ করছিল। আমি যা ছিলাম তাই আছি। বড় হয়ে ফিরব এই চিরকুটটি বাবা পুঁটলিতে ঠিক যত্ন করে বোধহয় রেখে দিয়েছেন। আসলে আমার মুখ নেই। বাবাই খবর পেয়ে আমাকে গিয়ে নিয়ে এসেছেন। আমার বড় হওয়াটা কী, বাড়ি ফিরে নিজেও বুঝতে পারছিলাম না।

দু-তিনদিন পিলু আমার সঙ্গ ছাড়ল না। আমি যেখানে পিলু সেখানে। কী জানি, আবার যদি দাদা ফেরার হয়। দাদাটি তার বড় হয়ে কেমন জানি হয়ে যাচ্ছে। মা-বাবার জন্য টান নেই। ভাই-বোনের জন্য ভাবে না। মায়া তো বাড়ি ফিরে এলে রাস্তায় দৌড়ে গিয়েছিল। তারপর জড়িয়ে ধরে ভ্যাক করে কেঁদে দিয়েছিল।—দাদা তোর সঙ্গে আর আমরা কথা বলব না। কোনদিন কথা বলব না। তারপর দৌড়।—মা, বাবা দাদাকে ধরে এনেছে। প্রায় চোরের মতো

দেখছি সব। পলাতককে দেখার জন্য কলোনির ধীরেনের মা, গোপালের পিসি, সুবোধ, পল্টু যেখানে যে ছিল ছুটে এসেছিল।—কোথা থেকে ধরে আনলেন? কত রকমের প্রশ্ন। তখন পিলুই আমার ত্রাণকর্তা। সে ডাকল, দাদা, এদিকে আয়। বলে সে আমাকে বাড়ির পেছনটাতে নিয়ে গেল।—খোঁড়া গরুটার বাচ্চা হয়েছে—আয়, দেখবি।

বাড়ি থেকে ফেরার হবার পর কী ঘটেছিল পিলুই সব এক এক করে বলল। দু-তিনদিন শুধু এই। একটা কথা মনে হয় আর বলে,—বুঝলি দাদা, সেই লোকটা রে—গোবিন্দ না কী নাম, সকালে মানুকাকার কাছে হাজির। বলল, মানুকর্তা, আপনার ভাইপো কুড়ি টাকা চুরি করে পালিয়েছে।

—বলল!

—কী মিছে কথা, বল। তুই কখনও চুরি করতে পারিস? আমি বড় হলে লোকটার মুখ ঘুষি মেরে ভেঙে দেব। কী সাহস, আমার দাদার নামে মিছে কথা! আমি বললাম, না, মিছে কথা বলেনি রে। গোবিন্দর কৌটো থেকে কুড়ি টাকা নিয়েছি?

—সত্যি নিয়েছিস!

—তা না হলে ট্রেনে চড়ে যাব কী করে।

পিলু কেমন গুম মেরে গেল। এতদিন যে বিশ্বাস দাদার উপর ছিল তা যেন নিমেষে উবে গেল। খুব কষ্ট হচ্ছে পিলুর। সান্ত্বনার স্বরে বললাম, গোবিন্দদার কৌটোয় আর একটা চিরকুটে লিখে গেছি।

—কী লিখে গেছিস?

—টাকা মান যশ হলে সব দিয়ে দেব।

পিলুর পায়ে বোধহয় একটা পিঁপড়ে কামড়েছিল, সেটা সে ঝেড়ে ফেলে বলল, মানুকাকাকে তা বলেনি সে-কথা। জানিস দাদা, তুই কাউকে বলিস না, একদিন বিকেলে না আমি গেছি। রেললাইন পার হয়ে গেছি। লোকটাকে আমি চিনে রেখেছি। বড় হই, তারপর মজা দেখাব।

পিলু কি জানে, গোবিন্দ আমাকে মারধোর করত? বাবার কত বড় বাসনা ছিল, আমি একজন মোটর মেকানিক হই। একটা গ্যারেজে মানুকাকা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কমপারমেনটাল পরীক্ষা পাস করলে এর চেয়ে বড় সুযোগ আর নাকি মিলবে না। বাবাকে মানুকাকা এমন বোঝাবার পরই গ্যারেজের কাজটা বাবার কাছে হাতে-পাওয়া স্বর্গ ছিল। সেসব ছেড়ে ফেরার হওয়ায় বাবা নাকি খুব মনোকষ্টে ভুগছিলেন।

।, জানিস, খুব ক্ষেপে যেত। একেবারে রণচণ্ডী। কি মানুষ রে বাবা, ছেলেটা কোথায় কেরায় হল কোনো খোঁজখবর করছে না কেউ।
বাবা বলত, গেছে যখন ফিরে আসবে। কার জন্য তবে গাছপালা লাগিয়েছি, বাড়িঘর করেছি। ছেলে বোঝে না—কার জন্য।
—আর ফিরেছে!—বলেই মার কান্না।
—আরে ফিরবে। দেখো না দু-চারদিন। না খেতে পেলেই সুড়সুড় করে ফিরে আসবে।
—তুমি আমাকে জ্বালিও না।
সেই বাবা নাকি তিন-চারদিন পর নিজেই সকালে উঠে গ্রহগুরুর কাছে গেছিলেন। এ-দেশে আসার পর বাবার অনেক নতুন বিষয়ের উপর বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছিল। যেমন তাঁর গ্রহগুরু। তিনিই ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। গ্রহগুরুর কাছ থেকে খবর নিয়ে এসে মাকে জানালেন, খুব বেশি দূরে যায়নি। কাছে পিঠে কোথাও আছে। মতিচ্ছন্নভাব, কাটলেই চলে আসবে। ওটা এ বয়সে হয়। একটু গৃহহারা হবার শখ জাগে। তারপর নাকানিচুবানি—সংসার নিত্য হাঁ-করা জিভ, সব গিলে খেতে চায়। যখন বুঝতে পারবে সুড়সুড় করে বাছাধন ফিরে আসবে। তারপরই বাবা গাছের সবচেয়ে পুষ্ট আতা, পেঁপে এবং একথালা চাল ডাল গ্রহগুরুর সেবার জন্য পাঠিয়ে দিয়ে ছিলেন। বাবার বিশ্বাস, গ্রহগুরু সন্তুষ্ট থাকলে সংসারে কোনো অমঙ্গল ঢুকতে পারে না। তাঁর- পুত্র যেখানেই অবস্থান করুক কোনো অমঙ্গলের ভয় নেই।
মা আমার জেদি এবং একরোখা। দেশ ছেড়ে আসার পর ওটা আরও বেড়েছে। বাবার প্রতি তাঁর বিশ্বাস কম। সবকিছুতে অদৃষ্টবাদী যে মানুষ তাঁকে মা বিশ্বাস করেন কী করে! সেই বাবার ছেলে আমি। বাপের স্বভাব ছেলে পাবে, মার এটা জানাই ছিল। বাবার অবিচল গ্রহভক্তিতে মার মেজাজ নাকি খুবই তিরিক্ষি ছিল। কথায় কথায় কান্না জুড়ে দিত। রাতে ঘুমাত না। গাছের একটা পাতা খসে পড়লেও উঠে বসত। পিলু জানাল, বাবা ঘুমালে মা আর সহ্য করতে পারত না। যার ছেলে নিখোঁজ সে এভাবে নিদ্রা যেতে পারে! —তুমি কি মানুষ না! দেখ পিলু, কে বলবে তোর দাদা বাড়ি নেই। কে বলবে দেখে, আমাদের সময় খারাপ। কেমন নিশ্চিন্তে হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। চেঁচামেচিতে রাতে বাবার ঘুম ভেঙে গেলে বলতেন, ঘুমাও ধনবৌ। মন শান্ত কর। শরীর নষ্ট করে লাভ নেই। তেনার ইচ্ছের উপর আমাদের হাত নেই। শুধু লড়ালড়ি সার। বলে বাবা আবার শুয়ে পড়তেন এবং কুম্ভকর্ণের মতো নিদ্রায় মগ্ন হতেন।

বাবার নিস্পৃহতা যখন চরম বোধ হত, মা আহার বন্ধ করে দিতেন। এটাই ছিল বাবার প্রতি মার মোক্ষম ওষুধ প্রয়োগের বিধি। বাবা খুব বিড়ম্বনা বোধ করতেন। খোঁজাখুঁজি শুরু হতো। মানুকাকার কাছে ছোটাছুটি, গ্যারেজে ছোটাছুটি, চিরকুটটি আমার হস্তাক্ষরে লিখিত কিনা, না জবানুন, এসব নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তা দেখা দিলে, ঠাকুরঘরে ঢুকে যেতেন। যখন একান্ত অসহায় তখন দেশ থেকে আনা শালগ্রামশিলা ভরসা। পুজোর ঘরে বসে রোজ একশ একটা তুলসীপাতা শালগ্রামশিলার মাথায়। মার তাতেও ভরসা কম। বিপদনাশিনী ব্রত প্রতি বৃহস্পতিবার শুরু করে দিলেন। এই করতে করতে বাবার কাছে এক চিঠি হাজির।—আপনাদের বিলু রহমানের কাছে আছে। ঠিকানা সমেত চিঠি পেতেই বাবা দুর্গানাম সম্বল করে সোজা সেই শহরে।

ফিরে আসার পর পিলু কলোনির সর্বত্র খবর দিয়ে এসেছে, দাদা ফিরেছে। দাদা আমার কত বড় হবে, দেখিস। একা একা বর্ধমান পার হয়ে চলে গেছে। দাদা এম এ বি এ পাস করবে। আমার বাবাটা না দাদাকে ড্রাইভার বানাতে চায়। আচ্ছা, বাবা যে কী না! মানুকাকা যে কী না! এক বিষয়ে ফেল করলে কী হয়? বাবা তো বলেছে, কিছু হয় না। সেই বাবাটাই মানুকাকার বুদ্ধিতে দাদাকে গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিল। আমরা গরিব বলে মানসম্ভ্রম নেই। দেশ-বাড়িতে থাকলে মানুকাকা এমন বলতে সাহস পেত! দাদা চলে গিয়ে বেশ করেছে। এখন বোঝো।

এক বিকেলে আমরা সবাই বারান্দায় বসেছিলাম। অঝোরে বর্ষণ শুরু হয়েছে। ব্যাঙ ডাকছে। মাঠঘাট জলে ভেসে গেছে। কার্তিকের মাঝামাঝি খুব বর্ষা হলে যা হয়। এখানে আসার পর এবারেই প্রথম বাবার লাগানো গাছে কাঁঠাল ধরেছে। আম গাছগুলিতে মুকুল দেখে গিয়েছিলাম। কিছু আমও হয়েছে। বাড়ি ফিরে আসব আসব করে মা কটা আম রেখেছিল, কিন্তু শেষে পচে যায় দেখে আমার জন্য আমসত্ত্ব বানিয়ে রেখেছে। অঝোরে বর্ষণ হলে আমার খুব ভালো লাগে। সব গাছপালা বাড়ির চারপাশে সজীব। মা রান্নাঘরে কাঁঠাল বীচি ভাজছেন। গরম গরম কাঁঠাল বীচি ভাজা অঝোর বর্ষণের দৃশ্য দেখতে দেখতে খাওয়া কী যে মজা! পিলু খোঁড়া গরুটাকে নিয়ে আসছে। দু'জনেই ভিজে গেছে। দূর থেকেই বললে, দাদা, কী খাচ্ছিস রে!

বললাম, কাঁঠাল বীচি ভাজা।

—মা, আমি খাব।

মা বলল, কটা তো ছিল। সব তো সাবাড় করেছিস। মা যে গোপনে কাঁঠাল

বীচি ও আমসত্ব আমার জন্য তুলে রেখে দিয়েছে, পিলু জানত না। পিলু অন্য সময় হলে মার-ধারা শুরু করে দিত, কিন্তু আমি ফিরে এসেছি এই পুণ্যকালে সে কিছু আর বলল না। বারান্দায় উঠে গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে পিলু বলল, দাদা, আমাকে একটা দিবি?

আমি বললাম, সবার জন্যই করেছে। মা তোকে বলে দেখছিল তুই রাগ করিস কিনা।'

মায়া কোঁচড় থেকে তুলে বলল, নে না।

পিলু কিন্তু নিল না।

আমি বললাম, নে, আমার কাছ থেকে।

পিলু বলল, না, খা। আমাকে মা দেবে।

মা বলল, খুব যে ভালো ছেলে রে! সইবে তো! বলেই মা একটা বাটিতে বীচি ভাজা এনে পিলুকে দিল। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, কী গো, খাবে? খাও না দুটো। বিলুর জন্য তুলে রেখেছিলাম।

আমাদের বারান্দাটা টালির। বেশ লম্বা বারান্দা। আগে খুব ছোট ছিল। পা ছড়িয়ে বসা যেত না। বাবার কাছে শুভাশুভ জানতে সব যজমানরা আসে। তাদের বসার জন্যই বারান্দাটা করা হয়েছে। এবং বড় বলে, আমাদের পোষা কুকুরটাও ভিজতে ভিজতে উঠে এল। ছোট ভাইটা হাঁটতে শুরু করেছে। বৃষ্টিতে বড় ভয় পায়। মেঘ ডাকলে ভয় পায়। সে বাবার কোলে ভালো-মানুষটি হয়ে বসে আছে। আমাদের সংসারে এই আমরা ক'জন। সামনের জমিতে বাবা কিছুটা জায়গায় পাট লাগিয়েছিলেন। সেগুলো কাটা হয়ে গেছে। পিছনের জমিতে কিছুটা আউস ধান লাগানো হয়েছে। সেগুলো পেকে গেছে। নারকেল গাছের মাথায় বসে একটা কাক ভিজছিল। ছাতা মাথায় রাস্তায় লোকজন দেখা যাচ্ছে। পরে খালের মতো একটা সরু কালি বাদশাহী সড়কের দিকে গেছে। জল উপচে পড়লে কই, শিঙি, মাগুর, বড় পুঁটি, ট্যাংরা জোয়ারের জলে ভেসে আসবে। বৃষ্টিটা আরো হোক, আরও জোরে, মেঘের দিকে তাকিয়ে পিলু এমনই বোধ হয় ভাবছে। লেখাপড়া করা ছাড়া পিলুর সব কাজেই ভারি উৎসাহ। কত খবর সে রাখে। কোন মাছ কখন ডিম পাড়ে, কোন মাছ গর্ভা হলে রঙবেরঙের হয়ে যায় সে ছাড়া এ খবর আমাদের আর কেউ রাখে না। সেই পিলু বীচি ভাজা খেতে খেতে বলল, দাদা, যাবি? মাছ উঠবে।

মা বলল, সেবারের কথা মনে নেই? তোমাদের আক্কেল বড় কম!

—কী হয়েছে! পিলু ভেতে উঠল।

বাবা খুব উদাস গলায় বললেন, ধনবৌ, রাখে কৃষ্ণ মারে কে।

মা খুব ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠল—হয়েছে ধর্মের কথা আর শুনিও না। ঐ করে তো গেলে।

কী যে গেল বাবা বুঝল না। কপর্দকশূন্য মানুষের এখন যা হোক বাড়িঘর হয়েছে, ছেলেপুলে বড় হচ্ছে, বিলুটাকে নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছে, মানুকেও খবর দেওয়া হয়েছে, শ্রীমান ফিরে এসেছেন। নিয়ে আসা হল, এখন কিছু একটা করতে হয়। শ্রীমানের বড় ইচ্ছা কলেজে পড়ে। এই পড়া নিয়ে একটা গণ্ডগোল বাধবে বোঝাই যাচ্ছিল। মানুকাকার জবাব, পড়াবেন কী করে। খাওয়াতে পারেন না, ছেলেরা বোঝে না? এখন সংসারে কী করে দুটো পয়সা আসবে না দেখলে চলবে কেন? বাবার কাছে মানুকাকার কথাই শেষ কথা। কিন্তু এবারে মানুকাকার পরামর্শমতো কাজ করবেন কিনা, সেই নিয়ে তাঁর কিছুটা বোধ হয় সংশয় জন্মেছে। মানু তো বলেই খালাস, হয়তো চেনাজানা কোনো কাপড়ের দোকানে লাগিয়ে দেবে। সে তো জানে না তার ধনবৌদিটি কী বস্তু।

আমি বাড়ি ফেরার পরই মা বাবাকে শাসিয়ে রেখেছিল, ছেলে যা চায় তাই কর পড়তে চায়। ভর্তি হবার টাকা ছেলে তোমার রোজগার করে এনেছে। বাধা দিলে অনর্থ ঘটবে।

তা সত্যি, রহমানদা ফেরার সময় বাবাকে বলেছে, এই নিন, কটা টাকা দিলাম। বাবা এখানে আসার পর একসঙ্গে এত টাকা কখনও হাতে পায়নি। শিষ্যরা পাঁচ দশ টাকা বেশি হলে দেয়। ঠাকুরের নাম করে পাঠায়। কলোনিতে নিত্যপূজা আছে নিবারণ দাসের ঘরে। কিছু জমি এবং যজমান এই ভরসা বাবার। পড়াবার জন্য বাড়তি টাকা হাতে কমই আসে। বাবার সাহসে কুলোচ্ছিল না। কিন্তু মা এবং পিলু ও মায়া চায় তাদের দাদা কলেজে পড়ুক। এতে সংসারের ইজ্জত বাড়ে, বাবাটা কেন যে বোঝে না। মা তো সবাইকে বলে বেড়িয়েছে, ছেলে আমার কলেজে পড়বে। বাবা বুঝতে পারেন, মানুষের বাড়ি-ঘর হয়ে যাবার পর একটা নীল লণ্ঠনের দরকার। সেটা ধনবৌ এখন জ্বালাতে চায়। সলতে পাকানো আছে। শুধু জেলে দেওয়া বাকি।

বাবা বললেন, মানুকে বলে দেখি, দু-একটা টিউশান ঠিক করে দিতে পারে কিনা।

অনেকদিন পর আবার মনে হলো, মানুষটার বিষয়-আশয়ে ভক্তি বেড়েছে। সুবুদ্ধি গজিয়েছে মাথায়।

প্রবল বর্ষণে বাবার কথা শোনা যাচ্ছিল না। টিনের চালে ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ। গরুটা ডাকছে। আমাদের কাঁঠাল বীচি খাওয়া শেষ। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। মা ঘরে ঢুকে হ্যারিকেন জ্বালাল। দুদিকে দুটো বড় বাঁশের মাচান। বাবার অনেকদিন থেকে শখ একটা তক্তপোশ করাবেন। উত্তরের দিকের জমিতে বড় একটা শিশুগাছ আছে। ওটা কেটে বানালে শুধু মজুরির খরচা। আমি যদি দুটো টিউশান করি, বাড়তি পয়সা আসবে সংসারে। মায়েরও মনঃপূত হয়েছে কথাটা। কবে যাওয়া হবে এই নিয়ে কথা হতেই বারান্দায় হ্যারিকেন রেখে মা বলল, কালই যাও। ঠাকুরপোকে বলো, তার তো শহরে চেনাজানা মানুষজন আছে। ওকে বললে ঠিক করে দিতে পারবে।

রাতে পিলু ঘুমাচ্ছিল না। কেবল এ-পাশ-ওপাশ করছিল। এটা হয়। সে রাতে আমাকে কিছু বলতে চাইলেই এটা হয়। কিন্তু আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, ডাকলে ঘুম ভেঙে যাবে, ঘুম ভাঙলে আমার ভারি রাগ হয় সেটা সে জানে। বুঝতে পারছিলাম, আমি সাড়া না দিলে সে কিছু বলবে না। বললাম, কীরে, ঘুম আসছে না।

পিলু খুব সতর্ক গলায় বলল, দাদা, তুই সত্যি কলেজে পড়বি? তুই টাকা রোজগার করেছিস?

আমি যে টাকা রোজগার করে এনেছি, পিলু জানে না। রহমানদার সামান্য কাজকর্ম করেছি। ট্রাক নিয়ে কয়লা খনিতে গেছি। ওজন মিলিয়ে কয়লা চালকলে সাপ্লাই করেছি এবং রহমানদার খুব বিশ্বাসভাজন লোক হয়ে গেছিলাম, সে তা জানে না। আমার ইচ্ছে ছিল, পড়ার টাকা হলে বাড়ি ফিরে আসব। কিন্তু রহমানদা আমাকে আশ্রয় দেওয়ায় কী দেবে-থোবে জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আসার সময় যে সে এতগুলি টাকা বাবাকে দেবে তাও বিশ্বাস হয়নি। টাকা কটা আসার সময় বাবার কাছেই ছিল। বাড়ি ফিরে বাবা টাকা কটা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, মার হাতে দাও। প্রথম উপার্জনের টাকা মার হাতেই দিতে হয়। হাতে দেওয়ার পর মাকে প্রণাম করবে। পৃথিবীতে আজীবন তিনিই তোমার সবচেয়ে অধিক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আমাদের বাড়ি থেকে শহরটা বেশি দূর নয়। ক্রোশ দুই লাগে যেতে। পুলিস ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে একটা রাস্তা বাদশাহী সড়কে উঠে গেছে। বিরাট এলাকা নিয়ে ট্রেনিং ক্যাম্প। দেশছাড়া মানুষ যারা, বনজঙ্গল কেটে ঘর

বানাচ্ছে যারা, তাদের পক্ষে ক্যাম্পটা বড় কাজে লাগে। সুবার মাঠ ক্যাম্পের মধ্যে। সবুজ ঘাসপাতা—গরু-বাছুর সব ছাড়া থাকে সেখানে। ক্যাম্পের সব হাবিলদার সুবাদার থেকে সি ডি আই পিলুর অনুগত। ফলে গোটা এলাকাটাই যেন তার নিজস্ব জায়গা। অন্যের গরুবাছুর ঢুকলে সে ক্ষেপে যায়। তার অনুমতি পেলে আর ভয় নেই। মাঠে কার গরু-বাছুর চরে বেড়াচ্ছে কে খবর রাখে। কেবল পিলু সব খবর রাখে। তাকে মাঠে দেখলে মনে হবে, সে এত বড় বিশাল ক্যাম্পের তত্ত্বাবধায়ক। ক্যাম্পের ভিতর দিয়ে বাদশাহী সড়কে উঠতে আমাদের কম সময় লাগত। এমনিতে সাধারণের যাওয়া নিষিদ্ধ। পিলু আমাদের পাড়াটার পাসপোর্ট। বন্দুক উঁচিয়ে যে যখন সেনট্রি দেয়, পিলুর নাম বললেই হল, পিলুদের পাড়ার লোক আমরা।

সেই পিলু এখন বাড়ি-ছাড়া হচ্ছে না। দাদা কলেজে পড়বে, এটা ঠিক হয়ে যাওয়ার পর সে আরও অহংকারী হয়ে উঠল। তার দলবলের সংখ্যা বেড়েছে। সেখানে এখন তার একটাই গল্প। দাদা কীভাবে ট্রেনে চড়ে কলকাতায় গেছে। কলকাতা কত বড় শহর। রেলগাড়ি চড়ে যেতে হয়। চেকার টিকিট চায়। টিকিট না থাকলে তোমাকে ট্রেনে উঠতে দেওয়া হবে না। রেলগাড়ি চড়ে পিলু যখন এদেশে আসে, তখন তার সব ভালো মনে ছিল না। দাদার কাছ থেকে আবার জেনে নিচ্ছে সব। বাবার কাছে রানাঘাটের গল্প শুনেছে। দাদার কাছে কলকাতার। আর একটা শহর বর্ধমান পার হয়ে। এখন এই তিনটি শহর সম্পর্কে সে প্রায় অভিধান, এমন একটা ভাব নিয়ে আছে দলবলের কাছে। ট্রামগাড়ি দেখতে কেমন লম্বা ফুলবাড়ির মতো। শিয়ালদা ইস্টিশনে রেলগাড়ি বিরাট একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে যায়। টিকিট না কেটে ট্রেনে উঠলে জেল।

পিলুর যে কত প্রশ্ন থাকে। পিলু যে-ভাবে কথা বের করে নিচ্ছে, কখন না জানি ফস করে ছোড়দির কথা বলে দিই। সেই লম্বা ফ্রক গায় দেয়া মেয়েটা, সুন্দর মুখ, সবসময় বাড়িতে জুতো পরে থাকে। সবসময় পরীর মতো বাগানে ঘুরে বেড়াত। রহমানদাকে নাম ধরে ডাকত। একসময় ছোড়দির বাবার গাড়ি রহমানদা চালাত। একটা এত্ত বড় কুকুর ছিল ছোড়দির সঙ্গী। তেমন একটা পরীর মতো মেয়ে আমার খুব বন্ধু হয়ে গেছিল। বাবা নিয়ে আসার পর আমার এখন একটাই কষ্ট। সকাল হলে আর ছোড়দিকে দেখতে পাই না। কী যে থাকে মনে। ছোড়দির কথা মনে হলেই কেমন একটা রূপকথার রাজত্ব চোখে দেখতে পাই। ছোড়দি গাড়িতে উঠছে। গায়ে সাদা কেডস, সাদা মোজা, ফ্রক, নীল বেল্ট, মাথায় নীল ফুল। বিকেলে সাইকেল চালাচ্ছে বাড়ির লনে।

আমাকে পিছনে নিয়ে সাইকেল চালাচ্ছে। ছোড়দি যা বলত, তাই করতাম। একদিন ছোড়দি সাইকেলটা হাতে দিয়ে বলল, বিলু, ধর। আসছি।—ছোড়দি সেই যে গেল, আর এল না। পাঁচিলের পাশে সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রহমানদা বলেছিল, কীরে, ছোড়দির সাইকেল নিয়ে কী করছিস। পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলেছিল, ছোড়দি ভুলেই গেছে। সাইকেলটা দিয়ে আয় বাড়িতে। ছোড়দি এমন স্বভাবেরই ছিল। সে-ই বাবাকে চিঠি লিখেছিল, বিলুকে নিয়ে যান। বিলু আমাদের এখানে আছে। ছোড়দির প্রতি আমার এজন্য একটা অভিমানও আছে। কিন্তু কেন জানি পিলুকে সব কথা বললেও ছোড়দির কোনো গল্প তাকে করতে পারিনি। কোথায় যেন এই প্রথম কিছু গোপন করতে শিখে গেছি।

পুলিস ক্যাম্প পার হলেই বাদশাহী সড়ক। দু'পাশে আম জামের গাছ। কোথাও বড় বড় রেনট্রি। সোজা জেলা বোর্ডের অফিসের পাশ দিয়ে রেল-লাইনে উঠেছে। একটা জেলখানা, তারপর সাহেবদের কবরভূমি। শেষে সরকারি খামার ডাইনে ফেলে রাস্তাটা শহরে ঢুকে গেছে। যেতে আসতে আমার এই রাস্তাটার প্রতি একটা মায়া পড়ে গেছিল। পৃথিবীতে এমন সুন্দর রাস্তা আর কোথাও বোধ হয় নেই। দু'পাশে দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত এবং মাঝে মাঝে আকাশের প্রান্ত দিয়ে পাখিদের উড়ে যাওয়া আমাকে মুগ্ধ করত। ছোড়দির কথা মনে এলে রাস্তাটায় একা একা হেঁটে বেড়াতাম। ইট সুরকির তৈরি রাস্তা। বৈশাখের ঝড়ে কখনও সেই লাল ধুলো আমাদের বাড়ি পর্যন্ত উড়ে আসত। বাবা এখানটায় বাড়ি করার পর সব কিছুর সঙ্গে কী করে যেন একাত্ম হয়ে উঠছি। আমার মা, বাড়ির গাছপালা, খোঁড়া গরু, শালগ্রামশিলা, পিলুকে নিয়ে কার্তিক মাস পর্যন্ত একরকম কাটল। বাবা একদিন শহর থেকে ফিরে এসে বললেন, হয়ে গেল।

বাবার এমনই স্বভাব। বাড়ি এসে বারান্দায় বসলেন। মায়া পাখা দিয়ে হাওয়া করছে। কি হয়ে গেল কিছু বলছেন না। বাড়িতে দু'জন অতিথি আছেন সপ্তাখানেক ধরে। দেশ থেকে বাবা খবর দিয়ে আনিয়েছেন। এখনও সময় আছে, চলে এসো। জমিজমা কিনে এদেশে ঘরবাড়ি করে ফেল। মা এতে মনে মনে সাংঘাতিক চটে থাকে। নিজেরই খাবার নেই, শংকরাকে ডাকে। —মার এইরকম ক্ষুরধার বাক্যে বাবা কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেলেও দমে যান না। বাবার কথা, মানুষের দুঃসময় যাচ্ছে ধনবৌ—খোঁটা দিয়ে কথা বল না। চলে তো যাচ্ছে। কোনদিন না খেয়ে আছ বল।

এইসব কথাবার্তা অতিথিরা বাড়ি না থাকলে বলত। এরাই নয়—বাবা যেখানেই যান, সবাইকে বলে আসেন, আসবেন, ঘরবাড়ি কেমন করলাম দেখে যাবেন। দেশের মানুষের সঙ্গে দেখা হলেই এই কথা। লোকজন, আত্মীয় কুটুম বাড়ি না এলে ঘরবাড়ি কার জন্য! বাবা নিজে খেতে ভালোবাসতেন, আত্মীয় কুটুমের বাড়ি বেড়াতে ভালোবাসতেন। খাওয়াতে ভালোবাসতেন। বাস্তিঘর হয়ে যাওয়ার পরই দেশের আত্মীয় কুটুম চেনাজানা লোকের কাছে চিঠি। ও-দেশে আর থাকতে পারবে না। বৃথা আশা। দেশটা আবার এক হয়ে যাবে ভেব না। থাকার তো অভাব হবে না। আমি যখন আছি।

যার কাছে এই 'আমি যখন আছি' খুবই বিরক্তিকর। ছেলেটাকে যার পড়াবার মুরদ নেই, তার আবার এসব লেখা কেন। বাবার চিঠির বিশ্বাসেই দেশ থেকে-দুই চৌধুরী এখন এখানে এসে উঠেছেন। রোজই রাজবাড়ি যেতে হচ্ছে। জমির বিলি বন্দোবস্ত দেখতে। বাবা প্রথম দু'দিন গেছিলেন সঙ্গে। উপেন আমিনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। এখন ওরা নিজেরাই যায়। আমাদের বাড়ির পেছনটাতে কিছু ডোবা জঙ্গল আমবাগান আছে। তাই আপাতত কিনে রাখা। বাবা যে ভালো আছেন, সচ্ছল পরিবার বাবার, এসব বোঝানোর জন্য বেশ ভালো মাছ-টাছ বাজার থেকে আসছে। একটা আস্ত ইলিশ পর্যন্ত। যে দামই হোক বাবার যেন অর্থের কমতি নেই—ফিরে গিয়ে কেউ না বলে বাবা আমার ভারি কষ্টে আছেন।

বাবা মনে করেন সংসারের অভিভাবক হিসাবে এটা তাঁর বড়ই কৃতিত্ব। বিলুটা কলেজে পড়বে—এই খবর দিতে নিবারণ দাসের আড়তে ছাতা বগলে চলে গেছেন ক'দিন। নতুন বাজার বসেছে সেখানে চেনাজানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে যায়।—কি কত্তা, ছেলের খোঁজ পেলেন?

—পাব না কেন। ও তো আর বাড়ি ছাড়া হয়নি। মতিচ্ছন্ন হয়েছিল। আবার সব ঠিক হয়ে গেছে। ফিরে এসেছে। কলেজে পড়তে চায়। যখন চাইছে পড়ুক। আমার একভাবে চলে যাবে। আসলে বাবার এতসব কথা বাড়িঘর করার মতোই। ছেলে আমার আর একটা পাস দেবে। এখানে যারা বাড়ি-ঘর করেছে, কেউ কলেজের মুখ দেখার সুযোগ পায়নি, কেবল তার ছেলে বিলু কলেজে পড়ে। এই একটা বড় খবরে বাবা কিছুদিন মশগুল থাকলেন। যজমান বাড়ি গেলেও আমি জানি একথা সে-কথায় তিনি তাঁর পুত্রের কথা টেনে আনবেন। এবং এমন যখন চলছিল তখনই সেদিন শহর থেকে ফিরে এসে বাবা বারান্দায় বসতে না বসতেই জানালেন, হয়ে গেল।

হয়ে গেল কথাটার কত রকম মানে হতে পারে বাবা যদি বুঝতে পারতেন। মা কুমড়ো ফুলের বড়া করছিল খুন্তির শব্দে ঠিক শুনতে পায়নি। কেবল বলল, কি বললে ?

—হয়ে গেল।

মা এবার সবটা শোনার জন্য কড়াই নামিয়ে বারান্দায় উঠে এল।—কি হয়ে গেল !'

—বিলুর পড়ার ব্যবস্থা। পুজোর ছুটির পর ভর্তি হবে। কি যেন বলল, মাস্থ, তবে হয়ে যাবে। কোনো চিন্তার কারণ নেই। সব ক্লাস ভর্তি হয়ে গেলেও মাস্থ যখন আছে, বিলুর জন্য আটকাবে না। মা বোধ হয় বাবার সব কথা বুঝতে পারছিল না। আমাকে ডেকে আনল। কাছে গেলে বলল, তোর বাবা দেখ কি বলছে। আটকাবে না বলছে।

বাবা বলল, আগে এক গেলাস জল দাও, খাই। বাবা জলটা খেয়ে পিলুকে ডেকে জিজ্ঞেস করল গোরুটা নেড়ে দিয়েছে কিনা, না, এক খোঁটাতেই আছে। বাবা তার দ্বিতীয় পুত্রটিকে সব সময় সংশয়ের চোখে দেখেন। সে সহজেই কাজ না করেও বলে দিতে পারে, হ্যাঁ দিয়েছি। এই তো দিয়ে এলাম। বাবা বাড়ি না থাকলে দ্বিতীয় পুত্রটি একটু বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। এতে সংসারের অনিষ্ট হলেও প্রতিবেশীরা পিলুর সুখ্যাতি করতে ছাড়ে না। সে তার বাবার কাজের প্রতি বড়ই অমনোযোগী। বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, দেখে আয় নেড়ে দিল কি না।

গরুবাছুর আমি নাড়ানাড়ি করি পিলুর পছন্দ নয়। দাদার আভিজাত্য নষ্ট হবে ভাবে। দাদা কলেজে পড়বে, সেই দাদা মাঠে গরুবাছুর টানাটানি করুক সে চায় না। সে বাবাকে আশ্বস্ত করে বলল, যাচ্ছি। তোমার যে বাবা—আর কি যেন বলার ছিল বলতে পারল না। মুগুরটা কাঁধে ফেলে চলে গেল। যাবার সময় বাবা হেঁকে বললেন, শোনো, পুকুরে এখন নেমো না। যদি নামো ডু'ডুব দিয়ে উঠে আসবে। যদি দেখি দেরি হচ্ছে ভালো হবে না।

এটা অবশ্য পিলুর হয়। গরমকালটায় সে পুকুর পাড়ে গেলেই প্যান্ট খুলে কিছুক্ষণ পুকুরে সাঁতরে নেয়। কখনও সখনও গামছায় ছেঁকে কুচো চিংড়ি ধরে আনে। আর কিছু না পারুক, ঘাসপাতা পেলে তাও জড় করে নিয়ে আসবে। বাইরে গেলে ফেরার সময় তার হাতে কিছু থাকবেই। পিলু খালি হাতে বাড়ি ঢুকতে শেখে নি। মা-র তর সইছিল না। এমনই স্বভাব মানুষটার। সবটা না বলে অস্বস্তির মধ্যে রাখা। মা একটু রুখে উঠল, কি বলছিলে বিলুকে বল।

—বলছি বলছি। বলে কাপড়ের খুঁট দিয়ে মুখের ঘাম মুছলেন। মান্নু তো বলল, আই এস সি না কি বলে ওটা হবে না। এক এ-টাও হবে না। আই কম-টা হবে। নতুন খুলেছে। কিছু সিট খালি আছে।'

আমার অবস্থা যা হয়। কলেজ পড়া নিয়ে কথা। ছোড়দিও আমাকে বলে দিয়েছে, পড়াটা ছেড় না বিলু। আমি বুঝি আমাকে বড় হতে হলে পড়তে হবে। বড় হওয়ার সঙ্গে কলেজে পড়াটার এমন একটা নিগূঢ় সম্পর্ক আছে আগে যদি বুঝতাম। মাকে বুঝিয়ে বললাম, কমার্স নিয়ে পড়ব।

বাবা যা বললেন, তার মধ্যে এক এ-টা বুঝেছে। মার এক মামা এক এ পাস ছিল। স্বদেশী করত। মানুষজন তাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। তার মতো ছেলে হবে ভাবতেই মার গর্ব বোধ হত। কিন্তু সেটা হচ্ছে না শুনে খুব দমে গেল। আর জেদি এক রোখা হলে যা হয়, বলল, বিলুকে এক এ পড়তে হবে। ও সব আইকোম টোম চলবে না। ওতে কিছু হয় না।

বাবা নিরাশ গলায় বললেন, বোঝো।

—বোঝার কি আছে। সারাজীবন বুঝিয়ে তো এই হাড়মাসে এনেছ।

এ-দেশে আসার পর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় মার শরীরটা বেশ ভেঙে গেছে। বাবা আমার কেমন অতলে ডুবে যাচ্ছিলেন। কি করে বোঝান, বিষয়টা একই। লাইন আলাদা। বাবা অগত্যা পার পাবার জন্য বললেন, মান্নু তো বলল, আজকাল আর এক এ পড়ে লাভ নেই।

—রাখ তোমার মান্নু। ঐ তো ডোবাল। কে বলেছিল একটা গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিতে। জলে পড়ে গেছি বলে, আমরা বুঝি আর মানুষ না।

এদেশে বাবার মান্নুকাকাই সম্বল। বাবার আত্মীয় বলতে এই দেশে একজনের খোঁজ তার জানা ছিল। সেখানেই ওঠা। সেখান থেকে মান্নুকাকা ক্যাম্পে পাঠাবার তালে ছিল, কিন্তু মার শেষ সম্বল বাবার হাতে দিয়ে আমাদের এই ঘরবাড়ি। সুতরাং মান্নুকাকাই যে আমার ভালোমন্দ বোঝার শেষ মানুষ মা স্বীকার করে না। বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পর বাবাও কিঞ্চিৎ মাকে সমঝে চলেন। জাত মান যেটুকু রক্ষা হয়েছে যা দেবী এই সর্বভূতেষু'র জন্য। বাবা অগত্যা বললেন, তালে মান্নুকে বলতে হবে বিলু এক এ পড়বে। তার ব্যবস্থা কর।

—তাই বলগে।

মা এইটুকু বলে নিষ্ক্রান্ত হলেন। বাবার অবস্থা এখন খুবই বিপজ্জনক। মান্নু-কাকাকে চটাতে পারেন না। মাকেও না। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, কি করবি ?

তখনই আবার আমার মা রান্নাঘর থেকে বারান্দায় হাজির, টিউশনির কথা কিছু বললে না?

বাবা খুব ক্ষিপ্ত। বোঝে না সোঝে না—কেবল তর্ক। বাবা বললেন, জানি না।
মা আরও এক ধাপ ক্ষেপে গেল।—ঠিক আছে, নিবারণ দাসকে বলছি। সেতো মরে যায় নি।

নিবারণ দাস বাবার অবস্থাপন্ন যজমান। বাবা না থাকলে বিপদে আপদে সে আমাদের দেখে থাকে। বাবা নিবারণ দাসকে শেষ সম্বল মনে করেন। কোথাও কিছু না হলে সেতো আছেই। তাকে এ-নিয়ে জ্বালাতন করা বাবার বোধহয় পছন্দ নয়। অগত্যা বললেন, বলেছি। সব বলেছি। ঠিকও হয়েছে। কালী-বাড়িতে বিলু থাকবে। ওখানকার সেবাইত নাকি একজন মাস্টার খুঁজছে। বিলুকে দিয়ে হয়ে যাবে মান্তু বলল। বাবার এই আশ্বাসে মান্তুকাকার উপর মার আবার আস্থা ফিরে এল। একেবারে শান্তশিষ্ট বালিকা তখন মা আমার। খুব অল্পতেই মার বিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায় আবার খুব অল্পতেই মার আস্থা চলে আসে। যাবার সময় শুধু বলল, তোমরা যা ভালো বোঝো কর। বিলু আবার যেন ফেরার না হয়। বড় চাপা স্বভাবের।

বুঝতে পারছিলাম মা তার পছন্দ-অপছন্দের চেয়ে আমার পছন্দ অপছন্দ নিয়ে বেশি ভাবছিল। মাকে বললাম, কমার্সটা ভালো মা। আমার ওটাই পড়ার ইচ্ছে।

সুতরাং পুজোর পর পর বাবা আমার যাত্রার আয়োজন করলেন। খুব দূর নয়। আমাদের বাড়ির পেছনটাতে বড় একটা পুরনো ইটের ভাটা আছে। ওখানে নবমী থাকে। পিলু আমাকে নিয়ে সেখানে দু-একবার গেছেও। আমি ফেরার হলে পিলু নবমীকে বলে এসেছিল, দাদাটা যে কোথায় চলে গেল। পিলুকে মনমরা দেখে নবমী বলেছিল, আপনার দাদা একজন গুণীমানী মানুষ হবে গ দাঠাকুর। তার কি কলোনি ভালো লাগে। বড় হলেই চলে আসবে। সেই থেকে পিলু নাকি স্বপ্ন দেখত, দাদা রোজই সকাল বিকেল একটা গাড়িতে বাড়ি আসছে। পিলুর জন্য নতুন জামা নতুন প্যাণ্ট, মার জন্য শাড়ি, আর এক হাঁড়ি রসগোল্লা। পিলু রসগোল্লার কাঙাল। স্বপ্নে সে কতদিন নাকি দাদার হাত থেকে নিয়ে রসগোল্লা খেয়েছে।

আমি বাড়ি ফিরলেও পিলু নবমীকে গিয়ে খবর দিয়ে এসেছে। দাদাকে বাবা গিয়ে নিয়ে এসেছেন। ছোড়দির চিঠি পেয়ে বাবা যে আমাকে আনতে রওনা হয়েছে, সে-খবরও দিয়েছিল। পিলুর সব সুখ-দুঃখের খবর নবমী বুড়িকে দেওয়া

চাই। তার যত কাজ থাক, যত কলপাকুড় সংগ্রহের বাতিক থাক, নবমীকে সব খবর না দিয়ে থাকতে পারে না। সেই নবমী বুড়ির বনটা পার হলে, কারবালা। তারপর একটা ইট সুরকির রাস্তা এবং পরে কাশের বন—রেল-লাইন। রেল-লাইন পার হলেই সেই কালীবাড়িটা। পিলু শুনে বলল, ওতো খুব কাছেরে দাদা। আমি রোজ এক দৌড়ে যাব, এক দৌড়ে আসব। পিলু বোধহয় ভেবেছে বাড়ি ছেড়ে আমার থাকতে কষ্ট হবে। দাদা ঘাবড়ে না যায়। সে দাদাকে সাহস দিচ্ছে।

বাবা সকাল থেকেই আমার যাবার আয়োজনে ব্যস্ত। পঞ্জিকার শুভ দিন দেখে যাওয়া হবে। যাবার আগে বাবার পুজো আর্চার সময় বেড়ে গেল। বিগ্রহ খুশি থাকলে সব ঠিক থাকবে। আগে তাঁকে খুশি করা দরকার। নীল অপরাজিতা তুলে এনেছেন—নেংড়ি বিবির হাতা থেকে পদ্মফুল তুলে এনেছেন, একশ একটা তুলসী পাতা এবং বিল্বপত্র একশ একটা। খোঁড়া গরুটার দুধের সবটাই পায়েস হয়েছে। মা সকাল সকাল রান্নাঘরের কাজ সেরে ঠাকুরঘরে ঢুকে গেছেন। বাবা এক হাতে পুজোর আয়োজন করতে দেরি করে ফেলবেন—কারণ সব সময়ই বাবার ধারণা পুজোর কোনো ত্রুটি থাকলে বাড়িঘরে অমঙ্গল ঢুকবে। কিনা অঘটন ঘটে। কাজেই সব দিক বজায় রাখতে হলে মা টের পান, তারও হাত লাগানো দরকার। মায়া আজ পিলুকে আমাকে সকালের খাবার দিল। দুপুরের খাবার মা পুজোর ঘর থেকে বের হয়ে দেবে। স্নান করে গরদের শাড়ি পরে পায়েস রান্না, তারপর ঠাকুরঘরে মা চন্দন বেটে আতপ চাল ধুয়ে তিল তুলসী হরিতকী সাজিয়ে এবং ধুপ দীপ জেলে যখন বুঝল বাবা খুব প্রসন্ন তখনই বের হয়ে এল। আমাকে বলল, চান করে ঠাকুরঘরে গিয়ে বস।

পুজোর সময় বাবা কেমন নির্বিকল্প মানুষ হয়ে যান। পুত্র-কলত্র সব তাঁর কাছে তখন অর্থহীন। ধ্যানে মগ্ন থাকেন আর আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে ঘণ্টা বাজান। তুলসীপাতা একের পর এক চাপান বিগ্রহের মাথায়। বাবার ধারণা বিগ্রহের সেবা ঠিকঠাক হচ্ছে বলেই আমরা সব বেঁচে বর্তে আছি। আমি যে ফিরে এসেছি, সেও বিগ্রহের অসীম কৃপায়। বোঝাই যায় বাবা কেমন এক মহাবিশ্বের খবর পেয়ে যান এই ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। মানুষের জন্মমৃত্যু, বেঁচে থাকা সবই অপার রহস্যময়। যেন সব কিছুর অস্তিত্বের মূলে তিনি।

বাবার পুজো শেষ হলো বেশ বেলা করে। একসঙ্গে আমরা খেলাম। খেতে বসে বাবা বললেন, বিলু তোমার নতুন জীবন শুরু। মনে রেখ পৃথিবীতে কেউ

তোমার পর নয়। বাবা সংস্কৃত শ্লোক উচ্চারণ করলেন—তার অর্থ বোঝালেন। তুমি একা এ বিশ্বসংসারে। আবার তুমিই এই বিশ্বসংসার। তুমি নিজেও একজন ঈশ্বর। সবই তার লীলা তোমার মধ্যে।

বাবা খুব বিচলিত হয়ে পড়লে এমন সাধুবাক্য সব আমাদের বলেন। আমার কষ্ট হচ্ছিল, কারণ যত কাছেই হোক—অন্যের বাড়ি—তারা কেমন হবে জানি না, তাছাড়া পিলুকে ছেড়ে থাকতে আমার কেন জানি কষ্ট হয়। সেই শহরটাতেই হয়েছিল, কিন্তু ছোড়দি অনেকটা জায়গা জুড়ে ছিল—অত খারাপ লাগে নি। পিলুকে বললাম, বাস কিন্তু।

যাবার সময় দেখলাম মা আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। বাবা বললেন, এখন মন খারাপ করতে নেই।

মার মন খারাপ। এটা কি মা টের পায় আমি তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। খুব বেশি দূর না। কালই হয়তো সকালে চলে আসব হাঁটতে হাঁটতে। কিন্তু মা কি আমার সেই গোপন রহস্যের খবর জেনে গেছে। মা কি জানতে পেরেছে বিলুর পৃথিবীতে আর কেউ ঢুকে যাচ্ছে। সাদা জ্যোৎস্নায় সে কোন এক পরী কে জানে।

বেলা থাকতেই রওনা দিলাম। বাবা পিছনের বনজঙ্গল পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে হেঁটে এলো। পিলুর হাতে আমার জামাকাপড়ের পুঁটলি। ওতে আছে দুটো হাফ প্যান্ট, একটা মারকিনের হাফ শার্ট। একটা বাবার পুজো-পার্বণে পাওয়া কোরা অল্পদামের ধুতি। আর আছে রহমানদার দেওয়া প্যান্ট শার্ট। বাবার ধারণা একজন মানুষের পক্ষে এর চেয়ে বেশি পোশাক-আশাক নিষ্প্রয়োজন। বাড়িতে খালি গা, খালি পা এবং হাফ প্যান্ট পরনে—কারণ বাবার কাছে আমি এখনও খুব ছোট আছি। আমারও মনে হয় এই যথেষ্ট। কেবল ছোড়দি আমাকে বুঝিয়েছে, খালি গায়ে থাকিস না। অসভ্যতা। ছোড়দির ভয়ে সব-সময় গায়ে জামা রাখতে ভারি কষ্ট হতো। এখন এসব দেখার কেউ নেই। কিন্তু যেখানে যাচ্ছি, সেখানে আবার যদি কোনো ছোড়দির উদয় হয় তবেই হয়েছে। পায়ে জুতো পর্যন্ত আছে। শার্ট গুঁজে পরতে শিখেছি। পিলুর কাছে আমি এখন একজন বাবু মানুষ। বাবু মানুষের হাতে গামছার পুঁটুলি শোভা পায় না। সে সেজন্য আমার সঙ্গে যাচ্ছে। তার হাতেই সব। পরনে তার ইজের। মা যত্ন করে দু-জায়গায় তালি মেরে দিয়েছে। সেই পরে একটা মারকিন

কাপড়ের জামা গায় সে আমার সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। সে ওটা কালীবাড়িতে রেখে আবার দৌড়ে ফিরে আসবে। দাদার জায়গাটাও ভালো করে ঘুরে ফিরে দেখে আসবে। তার দাদা মাস্টার—ছাত্র পড়াবে। কেমন বয়সের ছেলে বোধহয় সেও দেখার বাসনা। যেতে যেতে কত গল্প তার। কিছুদূর এসেই পিছনে তাকিয়ে দেখলাম গাছপালার আড়ালে আমাদের-বাড়িটা অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমরা নবমীর বনটায় ঢুকে গেছি।

—দাদারে?

দাঁড়ালাম। —কিছু বলবি।

—নবমীর সঙ্গে দেখা করবি না?

—দেরি হয়ে যাবে। তোকে আবার ফিরতে হবে। অবশ্য বললাম না, বনজঙ্গলে 'সাপখোপের উপদ্রব থাকে। পিলুর অবশ্য বেজায় সাহস। এ ব্যাপারে সে বাবার স্বভাব পেয়েছে। রাতবিরেতে বাবা কখনও আলো নিয়ে বের হন না। বাবার কথা—তুমি অনিষ্ট না করলে তিনি তোমার অনিষ্ট করবেন কেন। তিনি বলতে মা মনসা। মনসার বাহন মাত্রেই দেবতা। তাঁকে সংশয়ের চোখে দেখলে সেও সংশয়ের চোখে দেখবে। সংসারে এমনই নাকি নিয়ম। পিলু এ বিষয়ে বাবার একটা স্বভাব পেলেও অন্য স্বভাবটা পায়নি। সে সাপের খোঁজ পেলে তেড়ে যাবেই। বাবা কতবার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, পিলু ওটা করিস না। বনজঙ্গলে থাকি। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে লড়াই ঠিক না। তুই কবে যে তেনার কোপে পড়ে যাবি।

নবমীর সঙ্গে দেখা না করে যাব ভাবতেই পিলু বোধহয় কষ্ট হলো। সে আর একটাও কথা বলছে না। পুঁটুলিটা বইতেও কষ্ট যেন।

অ্যাঃ, নিজে বাবুর মতো যাবে। আমি নিতে পারব না।—বলেই পুঁটুলিটা মাটিতে ফেলে দিল।

পিলু আমার চেয়ে বছর চারেকের ছোট। তবু মনে হয় বিষয়বুদ্ধিতে সে আমার চেয়ে প্রবল। আমার আলাদা একটা সম্ভ্রমবোধ গড়ে উঠেছে সেও যেন পিলুর জন্য। সেই এমন ভাব করে যে আমি আলাদা জাতের। দাদার সুখ্যাতির জন্য সে বড় কাঙাল। নিজে যা পারছে না, দাদার মধ্যে সেটা দেখতে পেলে সে খুশি হয়। সেই দাদার পুটুলিটা এখন মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। পিলু কি নবমীর সঙ্গে দেখা করা না করার মধ্যে কোনো মঙ্গল-অমঙ্গলের আভাস দেখতে পায়। নবমীর সঙ্গে দেখা না করলে দাদাটার কি না জানি অনিষ্ট হবে—এমন সংস্কারে তাকে পেয়ে বসতে পারে। পাশ দিয়ে যাচ্ছি, একটু ভিতরে ঢুকে দেখা

করে যাওয়া এমনকি কষ্টের। আর কতটুকুনই বা দেরি হবে। বললাম, 'সেই ভালো পিলু। নবমীর সঙ্গে দেখা করেই যাব।

পিলুর মুখে আশ্চর্য সরল স্বর্গীয় হাসি। এমন উজ্জ্বল চোখ মুখ যে নিমেষে সে ভুলে গেল দাদাটার উপর তার অভিমান হয়েছিল। পুঁটুলিটা তুলে ঝেড়ে-ঝুড়ে আবার বগলে নিল। শেষে একটা কচুবন পার হয়ে যেমন অন্তবার ডাকে, এবারেও ডাকল, আমি দাঠাকুর, নবমী। নবমী টের পায় সেই সরল বালক, তার জন্ত কোনো খবর বয়ে এনেছে। পৃথিবীতে নবমীর কাছে খবর পৌঁছে দেবার কেউ নেই। সে বনের ফল-পাকুড় খেয়ে থাকে কচু-ঘেচু সিদ্ধ করে খায়। আর আছে একটা ছাগল আর তার দুধ। বনটা পুরো পার হয়ে যাবার ক্ষমতা সে কবেই হারিয়েছে। পিলুই একমাত্র তার ডাকপিয়ন। বনটার বাইরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সব খবর দেয়। বন কেটে যারা ঘরবাড়ি বানাচ্ছে তাদেরও। বুঝতে পারি, নবমী এক্ষুনি সাড়া দেবে। ঠিক জবাব এল, একটু দাঁড়াওগো দাঠাকুর। এই ফাঁকে সে পিলুর দেওয়া বাবার পুজো-পার্বণে পাওয়া খোঁট পরে নেবে। বনের ভিতরে কে আর দেখে। লজ্জা নিবারণের দায় তার থাকে না। গাছপালার মধ্যে অবিরাম যে কথাবার্তা চলে তার মধ্যে লজ্জা নিবারণের কথা থাকে না। সে পিলুর ডাকে সাড়া দেয়। ছাগলটা ব্যা ব্যা করে ডাকে মানুষের সাড়া পেয়ে। ছাগলটার যে বাচ্চাটা নবমী বুড়ি পিলুকে দিয়েছিল। পিলুর অত্যধিক যত্ন এবং পর্যাপ্ত আহারে পেট ফেঁপে মরে গেছে। নবমী বলেছে, বাচ্চা হলে আবার তাকে একটা দেবে।

নবমীকে সহসা দেখলে এখন সত্যি ডাইনী বুড়ির মতো মনে হয়। চেহারাটা হাড় জিরজিরে আরও কঙ্কালসার। দাঁত দু'পাশে দুটো বের হয়ে আছে। আলগা মতো দাঁত দুটো কথা বলতে গেলে নড়ে। চোখ কোটরাগত। নাক বাজপাখির মতো লম্বা। ত্যানাকানি পরে সে যখন বনের ভিতর থেকে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে বের হয়ে এল তখন পিলুর কি আনন্দ। পিলু বোধহয় ভাবে, একদিন নবমী বুড়ি আর তার ডাকে সাড়া দেবে না। মরে যাবে। যেতে আসতে একবার খোঁজ নিয়ে যায়, সে শুধু বুড়ি বেঁচে আছে কি না। বুড়ির খোঁজ-খবর নেয়। কি এখন খায় জিজ্ঞেস করে। সেই নবমী কাছে এলে পিলু বলল, আমার দাদা। চিনতে পারছ।

—ও মা, কি মানুষগো। আমি কি কানা না হাবা চিনতে পারব না। তারপরেই লম্বা হয়ে গেল। গড় হলে আমার ভারি লজ্জা করে। বামুনের বাচ্চা, আমাদের গলায় পৈতা আছে, খালি গায়ে এখানটায় ঘুরে গেলে নবমী দেখেছে।

পিলুকে এখন সাক্ষাৎ দেবতা ভেবে থাকে। সেই যেন কখন আসে, এমন এক অপেক্ষা তার। কে জানে, এভাবেই কোন শবরীর প্রতীক্ষা ছিল কি না সেকালে। নবমী আর পিলুকে দেখে আমার কেন জানি চোখে রামায়ণের সেই সুন্দর কাহিনীটি ভেসে ওঠে।

পিলু বলল, দাদা আমার মাস্টার হয়েছে!

—মাস্টার!

—হ্যাঁগো, দাদা ছাত্র পড়াবে। কালীবাড়ি চেন? আমরা সেখানে যাচ্ছি। দাদাকে পৌঁছে দিয়ে আবার ফিরব।

—তবে আর দেরি করবেন না গো দাঠাকুর। ফিরতে ফিরতে সাঁজ লেগে যাবে। ভয় পেলে বুলবেন, বন-বাদাড়ে কতকিছু থাকে, এরা আমাকে চেনে—আমার কথা বুলবেন—নবমী বুড়ির দাঠাকুর আমি। কেউ ছুঁতে সাহস পাবে না।

নবমীর কাছ থেকে এভাবেই বুঝি পিলু ভয় জয় করার সাহসের মন্ত্র পায়। সে বলল, আমার দাদার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও। আমায় যে দিয়েছিলে।

আমার গাটা ভয়ে কেমন শিরশির করছিল। পিলুর যে কতরকমের বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। লাঠি ঠুকে ঠুকে নবমী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি পালাব কিনা ভাবছি। পিলু বুঝতে পেরে বলল, ভয় পাস না দাদা। নবমী বলেছে, আমি ওর মতো পরমায়ু পাব। এখন দাদারও এমন হয় সে চায়। ততক্ষণে নবমী আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, আমার মতো পেরমায়ু পানগো দাঠাকুর। আমার কেশের মতো।

দেশ ছাড়া হয়ে আমরা কত অসহায় পিলুর আচরণ দেখলেই টের পাওয়া যায়। এদেশে এসে হেজেমজে না যাই তার জন্য পিলু সব দিকে খেয়াল রেখে চলে। নবমীকে দেখলে পুণ্য হয়, আয়ু বাড়ে, পিলুর ধারণা। বাবার সম্বল, শালগ্রাম-শিলা। মার বিপদনাশিনী ব্রত এত। সব আছে বলেই কেন জানি মনে হলো আমরা ঠিক বেঁচে থাকব। পিলুর এখন আর কোনো ভয় নেই। দাদাকে বনবাসে দিয়ে এলেও না। সে বরং আমাকে গার্জিয়ানের মতো শেখাচ্ছে।

—দাদারে!

—কী!

আমরা হাঁটছি আর কথা বলছি। ইটের ভাটা পার হলে সেই কারবালা। ডান দিকে মাইলখানেক জুড়ে মাঠ, মুসলমানদের সারি সারি কবরখানা, মিনার, বাঁধানো শান, রুপোলি চাঁদ-তারা আঁকা। আর উপরে বিশাল সব বৃক্ষ। মিনারে

কত স্মৃতিকথা লেখা। পড়া যায় না। উর্দু ভাষায় লেখা। সোজা গরুর গাড়ি চলার মতো। একটা পথ, উঁচু নিচু ঝোপঝাড়।

পিলু দু-লাফে আমার আগে এসে গেল—বলল দাদারে!

—কী বলবি তো!

—পেট ভরে খাবি।

—খাব না কেন!

—তুই ঠিক লজ্জায় পেট ভরে খাবি না।

—হ্যাঁ বলেছে।

—ঠিক জানি। আমরা কাঙাল হয়ে গেছি নারে?

—কাঙাল হব কেন?

—মা যে বলে তোমাদের রাক্ষুসে ক্ষুধা, কার ক্ষমতা নিবারণ করে।

পিলু ঠিকই বলেছে। ছোড়দির ওখানে এর জন্য আমার ভোগান্তি গেছে। পিলু কষ্ট পাবে বলে তাকে গল্পটা বলিনি। পাইস হোটেল বলে অবশ্য সেখানে আমার খেতে কোনো লজ্জা ছিল না। পয়সা দিয়ে খাব—যত খুশি খাব। যত খুশি খেতে গিয়েই ঝামেলাটা হয়েছিল। কিন্তু যদি কালীবাড়িতে ছোড়দির মতো কেউ থাকে, মুখ তুলে খেতেই পারব না। পিলু কি করে যে টের পায়!

—কি রে খাবি তো?

—হ্যাঁ হ্যাঁ খাব।

—আমার কি, না খেলে নিজেই কষ্ট পাবি। বড় হলে কেউ সঙ্গে থাকে না। নিজেরটা নিজেই দেখে নিতে হয়।

—হয়েছে, আর পাকা কথা বলতে হবে না।

রেল লাইনে উঠে বলল, জানিস দাদা, এখানে একটা লোক কাটা পড়েছিল।

—কবে?

—সেই যে মেলা গেল। মেলাতে লোকটা এসেছিল কালীথানে পুজো দিতে। পিলু কেমন ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। ভয় ভিতরে ঢুকে গেলে পিলুর চোখ খুব ভ্যাবলা হয়ে যায়। সে গুছিয়ে তখন কথা বলতে পারে না।

—কি রে কথা বলছিস না কেন। এসে তো গেলাম।

দূর থেকে কালীবাড়ির বিশাল নিমগাছটা দেখা যাচ্ছে। রেল লাইনের গুমটি ঘর পার হলেই দেখা যায়। ওকে বললাম, তুই আর যাবি? পিলু কিছুক্ষণ কি ভাবল। আমার উপর বিশ্বাস কম। বলল, তুই যেতে পারবি।

—খুব পারব। তুই যা। নালে বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে।

আবার ডাকে, দাদারে।

॥

—তুই কিন্তু রেল-লাইন পার হোস না।

—কেন?

—কখন গাড়ি এসে ঘাড়ের উপর পড়বে।

এতক্ষণে বুঝতে পারলাম পিলুর ভয়টা কোথায়। কালীবাড়ির সীমানা ঘেঁষে রেল লাইন চলে গেছে। পিলুর ধারণা রেল লাইনটা ভাল না। কালীবাড়ির কাছটায় কি বছর কেউ না কেউ কাটা যায়। কেউ এখানে আত্মহত্যা করতে চলে আসে। জায়গাটার কোনো অশুভ প্রভাব আছে। কেউ বলে মা কালীর ভোগে গেছে। তার দাদাটাকে কাজে অকাজে রেল লাইন পার হতেই হবে। যা অন্যমনস্ক। যদি কিছু হয়ে যায়। সেই ভয়ে কেমন ভ্যাবলু বনে গেল পিলু।

—আমি ঠিক দেখে পার হব। ভাবিস না।

পিলুর এইভাবে কতরকমের যে ভয় তার দাদাটাকে নিয়ে। সে নিমগাছটার কাছে এসে বলল, আমি যাই।

কিন্তু আশ্চর্য কালীবাড়ির সামনের রাস্তাটায় কেউ নেই। সেবাইত কোন দিকটায় থাকে জানি না। পকেটে মামুকাকার দেওয়া একখানা চিঠি সম্বল। লম্বা পাঁচিলের মতো মন্দির চলে গেছে। কিছু কাক হাহাকার করে ডাকছে অশ্বত্থ গাছের মাথায়। দুটো বড় পেল্লাই দরজা। দুটোই বন্ধ। মন্দিরের বাঁ দিকে এক ফালি একটা দরজা চোখে পড়ল। দুটো লোক মন্দিরটার দক্ষিণের মাঠে ঘাস কাটছে। একটা রিকশ ক্রিং ক্রিং করে বেল বাজিয়ে এল আবার নিমেষে উধাও হয়ে গেল। পিলু তার দাদাকে এভাবে একা ফেলে যেতে ভরসা পেল না। এ যেন দাদাকে একটা রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে যাওয়া হবে। সে খুব সাহসী হয়ে যায়।

আমি খুব সন্তর্পণে এগোচ্ছি। গাছপালার ফাঁকে বিকেলের রোদ নেমে যাচ্ছে। বিরাট এলাকা জুড়ে এই মন্দির। শনি-মঙ্গলবারে মানত দিতে লোকজন আসে। আমরাও দু-একবার ওইসব দিনে ঘুরে গেছি। ঢাক বাজছে ঢোল বাজছে। বলির পাঠার আর্তনাদ আর মন্দিরের ভিতর কেউ জোরে জোরে মন্ত্রপাঠ করছে। লোকজনে ভরে থাকে। মাথায় কপালে পাঁঠার রক্ত। বৌ-ঝিরা নানারকম মানতে ব্যস্ত। সারি সারি রিকশ, গাড়ি লেগে থাকে। আজ সে সবের কিছু নেই। কেমন খাঁ-খাঁ করছে। মন্দির থেকে কাউকে বের হতে দেখা গেল না। মহামারীতে সব শেষ হয়ে গেলে যেমন জনশূন্য হয়ে যায় গাঁ-গঞ্জ আমার আর পিলুর কাছে এখন জায়গাটা সে রকমের।

পিলু তবু এগিয়ে যাচ্ছে। সে ইটের রাস্তাটা পার হয়ে মন্দিরের রোয়াকে উঠে গেল। তারপর ফালি দরজাটা ঠেলতেই দেখল—সামনে বড় কোঠাঘর—তক্তপোশে তিনচারজন ছেলে বুড়ো শুয়ে। আসলে সবাই দিবানিদ্রা যাচ্ছে। সে সন্তর্পণে নেমে এসে বলল, দাদা সবাই ঘুমাচ্ছেরে। এ কেমন জায়গারে! বেলা পড়ে এল, তবু ঘুমোচ্ছে। তারপর বলল, ডাকব!

আমার কেমন অস্বস্তি হচ্ছিল। পরের বাড়ি। আমি এদের আশ্রিত হয়ে থাকব। আমার এ অসময়ে কতটা ডাকার দাবি আছে সে নিয়ে যখন ভাবছি, তখনই মন্দিরের দরজা-খোলার শব্দ পাওয়া গেল। বিরাট পেল্লাই দরজা ঠেলে ঠেলে কেউ খুলে দিচ্ছে। আমারই বয়সী একটি মেয়ে। ডুরে শাড়ি পরনে। মাথায় ঘোমটা। পিলু ছুটে গিয়ে বলল, আমার দাদা, এখানে থাকবে। ভিতরে খবর দাও না। বালিকাটি কিছু বুঝতে পারল না। সে ঘড়া করে জল এনে ঢেলে দিচ্ছে মন্দিরের চাতালে। উঁকি দিয়ে দেখলাম, কেউ যেন মন্দিরের ভিতর গেরুয়া নেংটি পরে শুয়ে আছে। মানুষ না বলে কঙ্কালই বলা ভালো। আমাদের কথাবার্তায় কারো ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে ভেবে বালিকাটি সদর দরজার বাইরে বের হয়ে বলল, কাকে খুঁজছ।

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু পিলু বাধা দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। বলল, আমার দাদা। মাস্টার। পকেটে চিঠি আছে। দেখানারে দাদা।

বালিকাটি হঠাৎ ফিক করে হেসে দিল, অমা! আমাদের নতুন মাস্টার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে গো। আসেন, আসেন। তা অত ছোট কেন? ভিতরে আসেন। আপনার সকালে আসার কথা ছিল না? বলেই সে ভিতরে দৌড়ে খবর দিতে গেল। কোন দিক দিয়ে যায় লক্ষ্য করছি। চাতালের পাশে মন্দিরের মিনা করা থাম। মেয়েটি থামের আড়ালে হারিয়ে গেল। তারপরই ফের হাজির। —অমা, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন গো? আমার সঙ্গে আসেন।

—এটা কে?

—আমার ভাই।

—আপনিও আসেন।

পিলু বলল, দাদাকে দিয়ে গেলাম। আমি যাব না। বাড়ি ফিরতে হবে। দাদাকে দেখে রাখবে কিন্তু। বলেই দৌড়।

মেয়েটি এবারেও হাসল। বলল, আমরা খেয়ে ফেলব না। আপনার দাদাটি আস্তই থাকবে।

বুঝতে পারছি বয়েস কম হলেও অনেক অভিজ্ঞতার ছাপ মেয়েটির মুখে। জানি-

না, এ বাড়ির সে কে হয়। এতটুকুন মেয়ের মাথায় ঘোমটা কেন। চোখ ডাগর, মুখে আশ্চর্য সজীবতা। শরীরে বড় বেশি লাবণ্য। পিলুর চেয়েও বেশী পাকা পাকা কথা। চাতাল পার হয়ে যাবার সময় বলছিল, ভয়ে কুঁকড়ে আছেন গো দেখছি। দিন পুঁটুলিটা হাতে দিন। বলেই আমার দিকে ভারি চোখে তাকাল। এমন চোখ এবং চোখে টান আমি জীবনেও দেখিনি। যেতে যেতে আমার শরীর কাঁটা দিয়ে উঠল। পুঁটুলিটা সে যেন জোর করেই হাত থেকে কেড়ে নিল।

এভাবে আমার পৃথিবী ক্রমেই বড় হয়ে যেতে থাকল। এখানে এসে টের পেলাম, ধর্মস্থানে খাবারের অভাব হয় না। দেশ ছেড়ে আসার পর এই প্রথম পর্যাপ্ত আহারের মুখ দেখলাম। সেবাইত মানুষটি যে এ অঞ্চলের একজন মানী ব্যক্তি, দু-একদিনেই তা টের পাওয়া গেল। জেলা কংগ্রেসের প্রভাবশালী ব্যক্তি। মানুকাকাও কংগ্রেসের হয়ে জেল খেটেছে—সেই সুবাদে আলাপ এবং ঘনিষ্ঠতা। আমার দলে আরও দু-চারজন আশ্রিতের মতো এখানটায় জায়গা হয়ে গেল। তবু প্রথমটায় দু-দিন খুবই আড়ষ্ট ছিলাম। বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে থাকতাম। স্নানের সময় হলে সেই ঘোমটা দেওয়া বালিকাটি আসত। বলত, চান করে নিন। খাবেন না? জড়ভরত হয়ে থাকেন কেন?

মেয়েটা এত চোপা করে কেন বুঝি না। এখানে বোধহয় সবাই হৈচৈ করে থাকতে ভালবাসে। বাড়ির হালচাল বুঝতে সময় লাগে, এই কথাটা কি করে যে মেয়েটাকে বোঝাই। ওর নামও জেনে গেছি। সবাই লক্ষ্মী বলে ডাকে। ভিতরে গেছি—দেখেছি পাকশালার দরজায় কলসি কাঁখে দাঁড়িয়ে আছে। একবারও ওকে কাঁখে কলসি ছাড়া দেখিনি। এর কি শুধু এই কাজ। আর মাঝে মাঝে আর একটা কাজ পেয়েছে, সেটা বোধহয় আমার দেখাশুনা করা।

চিঠিটা দেখার পরই সেবাইত মানুষটি বলেছিল, থাকতে পারবে তো! বাড়ির জন্য মন কেমন করবে না তো?

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিলাম।

—যখন যা দরকার বলবে। কোনো সংকোচ করবে না। নিজের বাড়ি মনে করবে। যে যার মতো এখানে থাকে খায়। এটা এজমালি সংসার। লক্ষ্মীকে ডেকে বলল, ওর ঘরটা দেখিয়ে দে। হাত-পা ধুয়ে নাও। চা খাও তো? চা না খাও মুড়ি সন্দেশ, যেটা ভালো লাগে বলবে। তারপরই ডেকেছিল, শুনছ—মাথায় বেশ ঘোমটা দিয়ে যিনি এলেন তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, মাস্টারদার

ভাইপো। দেশ থেকে সবা এরা চলে এসেছে। তোমাদের নতুন মাস্টার। খেয়াল রেখ। এত ছেলেমানুষ বুঝতে পারিনি। এখান থেকেই কলেজে পড়বে। নটু পুটুকে পড়াবে। পছন্দ কিনা দেখ।
আমি বাড়িতে থাকব শুনেই তিনি মাথার ঘোমটা কিছুটা টেনে কপালের উপর তুলে নিলেন। নিজের লোক—ঘোমটা দেওয়া ঠিক না।—ছেলে দুটো ভারি দুষ্টু। পড়তে চায় না। তোমার নাম কি?
—বিলু।
—আমি কিন্তু বিলু বলেই ডাকব।
সেবাইত বললেন, তোমার বৌদি। যা কিছু দরকার এর কাছে চাইবে। কোনো সংকোচ করবে না।
আমার বৌদিটির রূপ বর্ণনা দিলাম না। কারণ এমন কিছু সৌন্দর্য থাকে যার বর্ণনা দেওয়া যায় না। এতে বৌদিকে আমার খাটোই করা হবে। দীর্ঘাঙ্গী। পরনে লাল পেড়ে শাড়ি। হাতে দুটো সাদা শাঁখা। খুব লক্ষ্য না করলে শাঁখা এবং হাতের রঙ পার্থক্য করা যায় না। বৌদি লক্ষ্মীকে ডেকে বলল, নটু পুটুকে ডেকে দে। ওদের মাস্টারমশাই এয়েছেন। প্রণাম করে যেতে বল।
লক্ষ্মী বলেছিল, তোমার ছেলেরা ঘুমাচ্ছে।
—ঘুমাচ্ছে, তুলে দে।
ভাবতে পারছি না, কার্তিকের বেলা পড়ে আসে সহজে, সহজেই সন্ধ্যা নেমে আসে। অবেলায় কেন এরা ঘুমায়। লক্ষ্মী আমাকে বারান্দার টুলে বসিয়ে সেদিন প্রায় সবাইকে চেঁচামেচি করে জাগিয়ে দিয়েছিল। নিজেই বিরক্ত বোধ করছিলাম ওর চেঁচামেচিতে। কি না জানি ভাবে। অথচ সেবাইত মানুষটা ঠাণ্ডা মাথায় বলেছিলেন, কে এসেছে বললি?
—নতুন মাস্টার এয়েছে। তোমরা ঘুমোচ্ছ আর মানুষটা কি ভাববে বলত। মানুষটা মানে আমি।
—নতুন জায়গা, ভিনদেশী। দেখলে সব কি ভাবে।
এ বাড়ি কার বাড়ি, কে আসল মহাজন, কাকে বেশি সমীহ করতে হবে এখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। নটু পুটু এসেছিল, তবে তখন নয়। সন্ধ্যার লক্ষ্মী হারিকেন জ্বালিয়ে দেবার পর। কারণ ভিতর বাড়িটাতে অসংখ্য ঘর। ছোট ছোট দরজা, জানালা আরও ছোট। ছোড়দির বাড়ির তো মবিশাল বিশাল দরজা জানালা এ বাড়িতে নেই। মন্দিরের দুটো বিশাল দরজা বাদে আর সর্বত্র কেমন কানা গলিঘুঁজির মধ্যে ঘরগুলি হারিয়ে গেছে।

আমাকে লক্ষ্মী যখন পড়ার ঘরটায় নিয়ে গেছিল তখন প্রায় হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলাম। রাস্তার পাশে, রোয়াকের উপর ঘর। একটা দরজা সামনে, ভিতরের দিকে আর একটা দরজা। রাস্তার উপর দু-দিকে দুটো জানালা। আর দক্ষিণের দিকেও একটা জানালা আছে। ওটা খুলে দিতেই সামনের মাঠ দেখতে পেয়েছিলাম। আর মনে হয়েছিল এই ঘরটাই সবচেয়ে বেশি বড়। দু-পাশে দুটো বড় তক্তপোশ। মাঝে তিনটে হাতল ভাঙা চেয়ার। একটা টেবিল চাকচিক্যবিহীন। সামনে তাক। নটু পুটুর স্লেট পেন্সিল খাতা বইতে ঠাসা। বাড়িতে ঢোকার আগে এখানেই তিন চারজন লম্বা হয়ে শুয়েছিল। ঘুমোচ্ছিল। পিলু দরজা ফাঁক করে বলেছিল, এ কেমন বাড়িরে দাদা। অবেলায় সবাই ঘুমায়।

দু-রাত কাটাবার পর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে গেছি। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত, আশ্রিতের সংখ্যা অনেক। সবার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেছে—শুধু একজন বাদে। তিনি মন্দিরেই থাকেন খান। একটা গেরুয়া নেংটি পরে থাকেন। গায়ে জামা দেন না। কি খান চোখ দেখিনি। চোখ সব সময় লাল। যেন সেই মহাভারতের দুর্বাশা মুনি। সকালবেলায় হোতার সাঁকো থেকে বড় নিমগাছটা পর্যন্ত কেবল পায়চারি করেন—আর সংস্কৃত শ্লোক অনর্গল আওড়ে যান। যেন পৃথিবীটাকে পবিত্র রাখার দায়িত্ব, ধর্মাধর্ম রক্ষার দায়িত্ব তাঁকে কেউ অর্পণ করে গেছেন। এমন কঙ্কালসার মানুষ অথচ কি দৃপ্ত আর তেজী। মন্দিরের আসনে যখন বসে থাকেন, আমার মাঝে মাঝে তাঁকে কাপালিকের মতো লাগে। যদি কখনও তার চিৎকার ভেসে আসে, বাড়ির সবাই কেমন তটস্থ হয়ে পড়ে। নটু বলেছিল, নরেন খ্যাপা। কাছে যাবেন না। চোখ লেগে গেলে রক্ষা নেই। মন্দিরে বসিয়ে সারাদিন গীতাপাঠ করাবে। উঠতে দেবে না। চান করতে দেবে না। কেবল বলবে, খা খা। আমারে খা। ভয়ে এই ঘরটা থেকে সহজে তাই বের হই না।

সেবাইতের ছেলে নটু। পুটু ওর বোনের ছেলে। বোন এখানেই থাকে। মাথায় সিঁদুর নেই। হাতে শাঁখা নেই। পটুর বাবা কোথায় থাকে জানি না। তবে তিনি বেঁচে আছেন জানি। গতকাল পিয়ন পুটুর বাবার চিঠি দিয়ে গেছে। ধনঞ্জয় বলে একজন এ বাড়ির আশ্রিত পুটুর জ্যাঠতুতো দাদা। পঁয়ত্রিশ চল্লিশ দেখতে। ধনঞ্জয়ও ঘরের বার হয় না। পুটুর মার ঘরে দিন রাত শুয়ে থাকে। ঘরটার জানালা ছোট বলে বারান্দার আলো থেকে সব কিছু ভিতরে স্পষ্ট দেখা যায় না। পুটুর মাকে আমি দিদি ডাকার পর স্নেহশীলা রমণীর আচরণ লক্ষ্য

করেছি। বাইরে বড় কম বের হন। সকালবেলায় তাঁকে দেখলে মনে হবে, সারারাত যেন না ঘুমিয়ে কাটিয়েছেন। চোখ বসে গেছে। সুশ্রী দেখতে, তবে লাবণ্য নেই তেমন। কোনো রোগ-টোগ থাকলে মেয়েদের যেমন লাগে দেখতে পুটুর মা সে রকমের।

আমার ঘরের ও পাশের তক্তপোশটায় আরও একজন এ বাড়ির আশ্রিতজন থাকে। কালো কুচকুচে দেখতে। মাথায় বিশাল টাক। বেঁটেখাটো মানুষ। এ বাড়ির আদায়পত্র তার হাতে। নটু পুটু দাদু ডাকে—আমি আর কি ডাকি, দাদুই ডাকতে শুরু করেছি। এতে খুব খুশী তিনি। আমার খাওয়া চান নিয়ে তার দেখছি বেশ একটা ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

আমার জামা প্যাণ্ট কোরা কাপড় দু'দিন ধরে কুলুঙ্গিতে পড়ে আছে। সকালে লক্ষ্মী মুড়ি সন্দেশ আর গ্লাসে গ্লাসে জল নিয়ে এ-ঘরে একবার আসে। তিন চেয়ারে আমরা তিনজন। পড়ার চেয়ে নানারকম মুখরোচক খবর নিতে নটু পুটু বেশি ভালোবাসে। খাবার এলে সেটা বেড়ে যায়। আমি আশ্রিত বলে, সন্দেশের পরিমাণ কখনও কম হতো না। বরং আমার মুড়ির সঙ্গে চারটে কাঁচা গোল্লা থাকলে নটু পটুর ভাগে দুটো বরাদ্দ থাকত। সকালের জলখাবার আমাদের তিনজনের একসঙ্গে, দুপুরের খাবার একসঙ্গে রাতেও তাই। সকালের তদারকির দায় লক্ষ্মীর। দুপুরে বৌদি নিজ হাতে দেন। রাতেও তাই। নটু পুটুর স্কুল নেই। আমার কলেজে ভর্তি হওয়ার বিষয়টি দাদাই ভার নিয়েছেন। সময় মতো হবে। লক্ষ্মী দু'দিনেই কেমন তেরিয়া হয়ে বলল, মাস্টার তোমার কিছু হবে না। ও ভাবে সব ফেলে রাখে। বলে সে নিজেই নিয়ে এল একটা তার। সেটা টানিয়ে দিয়ে বেশ সুন্দর করে ভাঁজ করে রেখে দিল জামাকাপড়। লক্ষ্মীর এ ঘরে আর একটা কাজ রাতে থাকে। আমাদের বিছানা করে মশারি টানিয়ে দেওয়া। নটু পুটু আর আমি এক বিছানায় পাশাপাশি। পুটুর শোওয়া খারাপ বলে লক্ষ্মী বলে গেছে, ওটারে একপাশে দেবেন। খুব লাথি মারে।

জামা প্যাণ্টের দুরবস্থা নিয়ে এখন আর আমার ভাবনা হয় না। একটা হাফ-প্যাণ্ট পরে সহজেই এ-ঘর ও-ঘর করতে পারি। এ বাড়িতে পোশাক-আশাকের প্রাবল্য খুব কম। আমার ছাত্ররাও দেখছি খদ্দরের প্যাণ্ট জামা পরে। বড়রিদাও তাই। বড়রিদা হাতে কাচা কাপড় পরেন। ধোপা বাড়ির সঙ্গে এ বাড়ির সম্পর্ক কম। কেবল দিদি একটু সাজগোজ করতে ভালোবাসেন। তাকে কখনও দেখেছি, আয়নার সামনে বসে সাজগোজ করছেন। বৌদির তিনবেলা স্নানের অভ্যাস। বাড়িতেই চান করেন। আমারও তাই নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু কালীবাড়ির পিছনে

বিশাল ঝিল, বাঁধানো ঘাটলা দেখার পর দাদুর সঙ্গে সেখানে চান করাই শ্রেয় বোধহয়। সারাদিন লক্ষ্মীর কাজ ছিল ঝিল থেকে জল টানা। আমার জন্য বাড়তি জল ওর আর টানতে না হয় সেটাও বোধহয় মনের মধ্যে কাজ করছিল। আর এরপরই লক্ষ্মী কেমন আমার প্রতি সদয় হয়ে গেল। কোনো কথায় আর চোপা করত না। বরং মাঝে মাঝে লক্ষ্য করেছি কথা বলতে বলতে চোখ নামিয়ে নেয়। সে অন্ত্যজ শ্রেণী থেকে এসেছে, এটাও টের পেলাম আর টের পেলাম লক্ষ্মীর ইতিপূর্বে দুবার বিয়ে হয়েছে। বর কপালে সয়নি। মা বাবা নেই। শেষে কাগে বগে ঠুকরে খাবে এই ভয়ে এ বাড়ির আশ্রয়ে এসে উঠেছে। ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম, লক্ষ্মীর জন্য আমার ভিতরে আর একটা কষ্ট তৈরি হচ্ছে। কেন এমন হয় বুঝি না।

আসলে এরি নাম বড় হওয়া। থেপে থেপে কষ্ট রেখে যাচ্ছি এক এক জায়গায়। আগে দেশ বাড়ির জন্য কষ্ট হতো। পরিচিত গাছপালা, মানুষজন, গোপাট, স্কুলবাড়ির সঙ্গে মানুষের নাড়ির টান জন্মে যায়। চলে আসার সময় কেবল মনে হতো এখানে আর আমি থাকব না, কখনও আর আসব না, অথচ এরা শীত গ্রীষ্মে একই রকমভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। যে বালক দৌড়ে যেত, গ্রীষ্মের দিনে আম পাড়ত, সে থাকবে অনেক দূরে। শস্যক্ষেত্রগুলিতে ফসল ফলবে, কিন্তু যে বালক ক্ষেতে ফসল বেড়ে ওঠার সৌন্দর্য উপভোগ করত, সে আর থাকবে না। দেশ ছাড়ার সময় আমার চোখে জল এসে গেছিল। এদেশে এসেও যখন যেখানে ছিলাম সে জায়গাটার জন্য মায়া পড়ে গেছে। এখানে এসেও তাই। এত কম বয়সে লক্ষ্মীর দুবার বিয়ে হয়েছে। অথচ কেউ বেঁচে নেই। মা নেই, বাবা নেই। লক্ষ্মীর চালচলন দেখলে বোঝাই যায় না সে এত শোকতাপ পেয়েছে। বরং ওই যেন এত বড় বাড়িটার আসল চাকা। কারণ এ বাড়িতে সবাই খায়, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, এমন কি তারা চান করে জামা কাপড় পর্যন্ত কেচে দেয় না। সব লক্ষ্মীর জন্য পড়ে থাকে। পাকশালায় আর দু'জন মাঝবয়সী বৌ থাকে। কার্তিকের বৌ আর সদি পিসি। ওরা রান্নাবান্নার তদারক করে। উত্তর দিকের অতিথিশালার পাশে কার্তিকের থাকার ঘর। সে মোড়ে একটা মুদি দোকান করেছে। বৌ তার পাকশালে থাকে। বিনিময়ে সেও খেতে পায়। সে অবশ্য বলে, দুবেলা প্রসাদ পায়। বদরিদাকে মামা ডাকে। সম্পর্কে ভাই হয়। আমি বদরিদাকে দাদা ডাকি বলে সে আমাকে মামা ডাকে। মাস্টার ডাকে না। আমার ঘরটার ভিতর দিয়েই যেতে হয় সবাইকে। চার পাঁচটা সাইকেল আছে, সাইকেলগুলি সব পড়ার ঘরের এক কোণায় জমা হয়ে থাকে। সাইকেলের

গায়ে কারো নাম লেখা নেই। যার যখন যেটা দরকার নিয়ে বের হয়ে যায়। বদরিদা বলেছে একমালি সংসার। আসলে বুঝি তিনি বলতে চেয়েছিলেন, পান্থশালা।

সকাল থেকেই পান্থশালায় লোক আসা শুরু হয়। মন্দিরের সদর দরজা দিয়ে ঢুকলে ঘুরে যেতে হয় বলে আমার ঘরটা দিয়ে সর্টকাট করে। যাবার সময়, সবার একটা কথা, কি মাস্টার তোমার ছাত্ররা পড়ছে ত। এরা এখন ভিতরে গিয়ে বদরিদার ঘরে তাস খেলতে বসবে। তারপর দুপুরে খেয়ে কখনও ঘুমিয়ে শেষ বেলায় বাড়ি ফেরে। কেউ যাবার সময় নটু পুটুর মাথায় গাঁট্টা মেরে যায়। নটু যে এ বাড়ির হবু মালিক কেউ মানতেই চায় না। তার বাবার বন্ধুরা আসে শহর থেকে। কেউ আবার বৌ বাচ্চা নিয়েও চলে আসে। ভিতর বাড়িতে ঢুকলেই বোঝা যায় কত বিচিত্র মুখ। সবারই লোভ প্রসাদে। এবং এই লোভেই বোধহয় বদরিদার চেনাজানার জগৎ এত বিশাল হয়ে যাচ্ছে। বদরিদার এক কথা, এসেছ, মার প্রসাদ না নিয়ে যাবে কি করে।

নটু বলল, স্যার শনিবার কিন্তু সকালেই দরজাটা বন্ধ করে দেবেন।

আমি বললাম, কেনরে ?

—শনি মঙ্গলবারে বড় ভিড় হয়। সকাল থেকেই দেখবেন কতদূর থেকে সব লোকজন আসছে। মানত দিতে আসে। নটু আমাকে আরও খবর দিল, রাতে সদু পিসির ভর উঠবে কালীর থানে। লোকজন তখন—এ ঘর দিয়েই ছোটাছুটি করবে। আপনারও পড়া হবে না। আমাদেরও না।

শনিবারে সেটা যথার্থই টের পেলাম। সকাল হতে না হতেই হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। মন্দিরের চাতালে ঢাক বাজছে। পাঁঠার আর্তনাদ। যে-সব ছাড়া পাঁঠাগুলি অতিথিশালার ওদিকটায় শুয়ে থাকে তারাও আর্তনাদ করছে। চাতালে ঢাক বাজলে কেমন গুমগুম শব্দ হয়। কার্তিক সকাল থেকেই কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে বসে থাকে। শনি মঙ্গলবার তার দোকান বন্ধ থাকে। বড় রামদাটা রাতিতে ঘষে ধার তোলে। পট্টবস্ত্র পরে নেয়। এবং তাকে দেখলে বোঝা যায়, সে একজন তখন তান্ত্রিক মানুষ। আমাকে মাস্টার পর্যন্ত ডাকে না। গাঁজা ভাঙ খায় বোধহয়। না হলে এত গুম মেরে থাকে কেন ? মানত করা পাঁঠাগুলি চাতালের এক কোণায় জড় থাকে। মন্দিরের মধ্যে কেউ যেতে পারে না। বাইরে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে সন্দেশের ঠোঙা, অথবা নৈবেদ্য ছুঁড়ে দিতে হয়। সবারই কত রকমের যে দুঃখ। কত রকমের যে প্রার্থনা। ছেলেবুড়ো যুবতী মেয়ে বৌ বেটি সবার এত কি প্রার্থনা থাকে।

অবশ্য আমি একবার মাত্র বের হয়ে দেখেছিলাম। তারপর মনে হয়েছে, ঐ গণ্ডগোলের মধ্যে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা ঘুরবে। নিজের ঘরে এসে নটু পুটুকে নিয়ে বসলাম। ওদের এ ব্যাপারে কৌতূহল খুবই কম। বরং নটুর দেখলাম সিঁড়িভাঙা অঙ্ক শেখার আজ বেশ আগ্রহ। এটা দেখে আমার মাস্টারি করার প্রবণতা চাঙ্গা হয়ে উঠল। খুব অভিনিবেশ সহকারে পড়াচ্ছি। পুটু কিন্তু জানালায় বার বার কি দেখছে। পুটুর টাস্ক দেওয়া আছে সেটা সে করছে না।

—কি হচ্ছে পুটু, ওদিকে মন কেন। একেবারে গুরুজনের মতো গলা আমার।

পুটু বলল, এই ওখানে কি করছিস রে। জানালায় কাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলছে।

তাকিয়ে আমি অবাক। দেখি ওখানটায় পিলু দাঁড়িয়ে আছে। সে দাদার টানে চলে এসেছে। আমি কিভাবে পড়াচ্ছি, ভীষণ গর্বের সঙ্গে দেখছে।

পিলুকে দেখে যতটা চঞ্চল হয়ে পড়ব ভেবেছিলাম, ঠিক ততটা হওয়া গেল না। আমার ভাই বলতেও কেমন সংকোচ হচ্ছিল। সে জানালার সিক ধরে দাঁড়িয়ে আছে। পরনে ইজের, খালি গা, উস্কখুস্ক চুল। ও এরকমভাবেই থাকে। সকালবেলায় উঠে ঠিক দাদার জন্য মন কেমন করায় দৌড়ে চলে এসেছে। দরজা খুলে দিয়ে বললাম, ভিতরে আয়। তারপর একটু শাসনের গলায় বললাম, কি করতে এসেছিস ?

নটু বলল, স্যার কে ছেলেটা ?

আমি বললাম, তোমরা ভিতরে যাও। তারপরই মনে হলো হাফপ্যান্ট পরা স্যারের এত গাম্ভীর্য শেষ পর্যন্ত টিকতে নাও পারে। বললাম, পিলু।

পিলু কিন্তু বেশ খোস মেজাজে তক্তপোশে বসে পা দোলাচ্ছে—আমার দাদা। আমি দাদার ছোট ভাই। তোমরা দাদার স্টুডেনট ? নটু বলল, হ্যাঁ। নটু পুটু সঙ্গে সঙ্গে যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেল। ওদের সমবয়সী আমার একটা ভাই থাকতে পারে বিশ্বাসই ছিল না। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, স্যার ভিতরে যাব। পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, আমি নটু, ওর নাম পুটু।

—যাও।

—এই পিলু ভিতরে যাবি ?

পিলু আমার দিকে তাকাল। নটু কি তার মাকে দেখাতে চায়—এই পিলু মাস্টারমশাইর ভাই। সকালবেলায় দাদাকে দেখতে চলে এসেছে। বৌদি যদি কিছু ভাবে, কিংবা বনশ্রিলা। বাড়িটার এমনিতেই এত বেশি আকর্ষণ যে কেউ এলে যেতে চায় না। পিলু যা স্বভাবের তাকে এমন বাড়িই মানায়।

আমি বললাম, পিলু এক্ষুনি চলে যাবে। ওকে ভিতরে নিয়ে যেও না। যেন নিয়ে গেলেই পিলু ধরে ফেলবে, এখানে দাদার মতো সেও থেকে যেতে পারে। কেউ কিছু বলবে না। মন্দিরের ভাঁই করা সন্দেশ, দুপুরে সরু আতপ চালের ভাত, মাছ ভাজা, পটল ভাজা, মুগের ডাল, শনি মঙ্গলবারে বাটি ভর্তি পাঁঠার মাংস, চাটনি। পাত পেতে বসে গেলেই হলো। যে আসে সেই যখন পাত পেতে বসে যেতে পারে তবে তার বেলায় কতটা আর রামায়ণ মহাভারত অশুদ্ধ হবে। কিন্তু পিলুটা বোঝে না কেন, আমার ইজ্জত আছে। তুই তো আর কার্তিক ভাদুড়ি নোস, যে পাঁঠা কেটে বাড়ির লোক হয়ে যাবি—তুই যে নটু পুটুর স্যারের ভাই। কিন্তু ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেল। লক্ষ্মী এসে গেছে এক বাটি মুড়ি আর চারটে কাঁচাগোল্লা নিয়ে। আমার সকালের খাওয়া। পিলু বড় বড় চোখে বাটিটা দেখছে।

লক্ষ্মী বলল, ধরো মাস্টার। তারপরই পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, ও মা এ যে তোমার সেই ভাইটাগো। লক্ষ্মী পিলুকে একবার দেখেই চিনে রেখেছে। কি গো দেখতে এলে দাদাকে খেয়ে ফেলেছি কি না।

লক্ষ্মীর ভিতরে অন্য এক ব্যথা কাজ করে বুঝতে পারি। সে কি টের পায়, যাকে সে ভালোবাসে সে মরে যায়। তার কি ভয় থাকে গভীরে। কোনো গোপন ভালোবাসায় পড়ে গেলে আমাকে নির্ঘাত গিলে ফেলা হবে। এবং লক্ষ্মীর আচরণ মাঝে মাঝে আমাকে বিস্মিত করে। আমার সমবয়সী অথচ এই বাড়িতে তার কি হম্বিতম্বি। সারাটা দিন কাজ, কেবল সন্ধ্যার পর সে আর কোনো কাজ করে না। বারান্দার এক পাশে শরীর মুখ ঢেকে শুয়ে থাকে—ভোঁসভোঁস করে ঘুমায়। বারোটার পর শিবা ভোগ হয়। তারপর বড়দিদা, বৌদি নটু পুটু দিদি অর্থাৎ সেবাইত বংশের সবাই খাবে। অবেলায় কেন ঘুমায় সবাই, এখন বুঝতে পারি। বৌদি আমাকে বলেছিলেন, তুমি কি আগে খেয়ে নেবে ভাই। খেলে বলো। আমার কেমন সংকোচ হয়েছিল বলতে, এত রাতে কখনও খাই না বৌদি। আবার মনে হয়েছিল, আমার দুই ছাত্র যদি এত রাত করে খেতে পারে, আমি পারব না কেন। বলেছিলাম, না না, ঠিক পারব। কোনো অসুবিধে হবে না। রাত জাগা অভ্যাস নেই বলে ঘুমিয়ে পড়তাম। লক্ষ্মী এসে ডেকে দেয়, ও মাস্টার ওঠো। খাবে চলো। দাদা বৌদি সবাই বসে আছে। আমার এত ঘুম যে কখনও বিরক্ত হয়ে যেত ডাকতে ডাকতে—কি যে মরণ, বুঝি না বাপু। খিদে পায় না। খিদের চেয়ে ঘুমটা বেশি। সেই কখন চাট্টি খেয়েছে—দেখ কেমন হাঁ করে ঘুমাচ্ছে। দেব জল ঢেলে বলছি।

উঠে বসলে দেখতাম লক্ষ্মী আমার দিকে তাকিয়ে নেই। যেন দেয়াল টেয়াল দেখছে। আসলে এ বাড়িতে লক্ষ্মীর পছন্দ মতো লোকের অভাব। আমাকে তার পছন্দ, সেটা প্রথম দিনেই বুঝতে পেরেছিলাম। বাবার গৌর বর্ণ আমরা পেয়েছি। বয়সের তুলনায় হাতে পায়ে লম্বা হয়ে গেছি বেশি। সোনালী দাড়ি গোঁফ অল্প অল্প সারা গালে। লক্ষ্মী ঠাট্টা করে কাল বলেছিল, নবীন সন্ন্যাসী ঠাকুর গো, কি যে আমার হবে?

সেই লক্ষ্মী পিলুকে দেখে ছাড়বে না বোঝাই যাচ্ছিল। এতেই আমি আরও বেশি কাবু হয়ে গেছিলাম। নটু পুটু দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে যাবে বলে। পিলু পা পা করে এগুচ্ছিল। কিন্তু চারটে বড় বড় কাঁচাগোল্লা এক জামবাটি মুড়ি দেখে তার এগোনো বন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্মী সব রেখে ছুটে গেছে ভিতরে। কেন গেল বুঝি না। পিলু কি সং। তামাশা। ভিতরে ভিতরে পিলুর উপর ক্ষেপে যাচ্ছিলাম। এলি তো একটা জামা গায়ে দিয়ে আসতে কি ক্ষতি ছিল। জামাটা ছেঁড়া—তা হোক না, জামা তো। ওর নাকটা দেখলাম। পোঁটা লেগে থাকে—বড় খারাপ স্বভাব। সেই কবে থেকে গায়ে রিফ্যুজি ছাপ লেগেছিল, সেটা বাড়িঘর হয়ে যাওয়ার পর থাকা ঠিক না। তবে রক্ষে নাকে পোঁটা নেই। ওর রঙ শ্যামলা। মুখে মায়ের আদল। চোখ দুটো বড়ই মায়াবী। যা কিছু দেখে, তাই ওর কাছে বিস্ময়। ফলে চোখ দুটো বোধহয় দিনে দিনে আরও বেশি ডাগর হয়ে উঠছে। এ হেন বালকের প্রতি লক্ষ্মী নটু পুটু সবাই টান বোধ করবে সেটা আর বেশি কি। কিন্তু ওর এই বিস্ময়ে আমার যে সম্ভ্রম যায়। চকিতে এতসব ভাবনা মাথায় খেলে গেল। কেউ নেই দেখে বললাম, পিলু বাড়ি যা। এক্ষুণি চলে যা।

পিলু যেন আমার কথা শুনছে না।—দাদা তুই চারটে কাঁচাগোল্লা খাবি? তারপর আর আমার জবাবের প্রতীক্ষা না করে নিজেই ছুটে কাঁচাগোল্লা তুলে একটা মুখে পুরে দিল। কাঁচাগোল্লা একসঙ্গে মুখে পুরে দিলে গলায় আটকে যায়। পিলুর অভ্যাস নেই—সে মুখে দিয়েই বুঝল, গলা দিয়ে ঢুকছে না। আমি চিৎকার করে উঠলাম, শিগগির জল খা। জল খেলে এমন সুস্বাদু খাবার মিলিয়ে যাবে—সে কিছুতেই জল খেতে রাজি না। কিন্তু চোখ মুখের অবস্থা খারাপ। জল ঠেসে ধরলাম মুখে। বিষম খাচ্ছে—এক বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা—আর তখনই দেখি, বৌদি, লক্ষ্মী নটু পুটু হাজির। সবাই পিলুকে দেখতে এসেছে। দেখবে কি, সে তো বিষম খেয়ে অস্থির। তার হাতে আরও একটা কাঁচাগোল্লা। বৌদি কাছে গিয়ে মাথায় ফুঁ দিল, এবং দেখলাম পিলুর চোখ আবার সহজ হয়ে আসছে।

হাতে আর একটা কাঁচাগোল্লা, দাদার বাটি থেকে তুলে নিয়েছে—কে কি না জানি ভাবে, সে পিছনে নিয়ে গেল হাতটা। কেউ আর দেখতে পাবে না।

বৌদি বলল, তোমার ভাই।

—হ্যাঁ।

—কি নাম?

—পিলু।

—কি সুন্দর দেখতে। এ যে একেবারে যশোদা দুলাল। এ-বাড়ির কথাবার্তাই এই রকমের। বৌদির ঘরে একটা ছবি দেখেছি। মুখটা ঠিক পিলুর মতো। মাথায় ময়ূরের পালক—ওটা না থাকলে হুবহু পিলুর ছবি হয়ে যেত। বৌদি বলল, লক্ষ্মী ওকেও দুটো খেতে দে। আমার দিকে তাকিয়ে বলল, পিলু দুপুরে মার প্রসাদ পেয়ে যাবে। পিলুর দিকে তাকিয়ে বলল, তুমি কিন্তু যেও না।

এসময় আমার গম্ভীর থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। পিলুকে এরা জানে না। পিলু যদি আসকারা পেয়ে যায় তবে এমন সুস্বাদু খাবার হাতছাড়া করে নড়বেই না। পিলু আরও একজন আশ্রিতজন হয়ে যেতে পারে ভাবতেই আমার কেমন সম্ভ্রমে লাগল। যেভাবেই হোক পিলুকে বুঝিয়ে সুজিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিতে হবে। লক্ষ্মীর ছোটাছুটি বেড়ে গেছে। সে পিলুর জন্য দুটো কলা, এক বাটি মুড়ি, চারটে কাঁচাগোল্লা নিয়ে এসেছে। পিলু এখন খুব ভালো ছেলে। সে কলা দুটো খেয়ে ফেলল, কাঁচাগোল্লা খেল। মুড়ি খেল। তারপর আমার পড়ে থাকা বাটির দিকে তাকিয়ে থাকল।

—খাবি।

—তুই খাবি না দাদা?

—না।

—দে। বলে সে বাকি দুটো কাঁচাগোল্লা খেয়ে ঢেকুর তুলে বলল, এদের বাড়িতে কাঁচাগোল্লার গাছ আছে নারে দাদা?

—তাই। আমার ক্ষোভে দুঃখে কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। পিলু তুই বুঝলি না, এ-বাড়ির আমি কে? লক্ষ্মী বৌদি নটু পুটু না কি ভাবল। আমরা হাভাতে, তাই বলে লোকের কাছেও সেটা প্রকাশ করতে হবে। তোর বুদ্ধি সুদ্ধি কবে হবে। ভালো খাবার দেখলে তুই মাথা ঠিক রাখতে পারিস না। এসব কথা বললে পিলু দুঃখ পেতে পারে, বলাও যায় না—বড় অবোধ আমার এই ভাইটি। নটু পুটু দাঁড়িয়েছিল—খাওয়া হলেই তাকে নিয়ে যাবে—ঘুরবে,

সব গাছপালার ভিতর হেঁটে বেড়াবে—সমবয়সী হলে যা হয়। ওরা আমার শুধু অনুমতির অপেক্ষায় আছে। নটু পুটুকে বললাম, তোমরা এখন যাও।

ওরা চলে গেল। পিলু অবাক হয়ে দেখল। দাদাটার কি প্রভাব প্রতিপত্তি! সে তো তার দাদাকে একদম মানে না। আর সে দাদার এমন গম্ভীর ভারিক্কি মুখ কখনও দেখেনি। সে যেন কিছুটা ঘাবড়েই গেল। বলল, দাদারে আমি চলে যাব?

—এখুনি যা।

—খেতে বলল যে!

—আর একদিন খাবি। ওকে বলতে পারতাম, ওরা জানে আমরা খুব গরিব পিলু। গরিব হলেই কি সব সময় হাভাতে হতে হয়। তুই বাবার মানসম্ভ্রম বুঝবি না। কিন্তু সেসব বলতে কষ্ট হলো। সে চুপচাপ বের হয়ে গেল। লাফিয়ে নেমে গেল রোয়াক থেকে। তারপর রেললাইন পার হয়ে গাছপালার মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পিলু চলে যেতেই মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল। একবার ইচ্ছে হলো, বের হয়ে ডাকি—পিলু যাস না। খেয়ে যাবি। এমন সুস্বাদু খাবার পিলু কতদিন খায়নি। টানাটানির সংসারে নিত্য দিনের খাওয়া খুব একটা ভালো হয় না। পিলু এখানে খেলে বাড়ি গিয়ে বলত, মা কালীবাড়িতে ভোজ খেয়ে এসেছি! শুধু মাকে কেন, যাবার সময় নবমীকেও খবরটা দিয়ে যেত। কি সরু চাল নবমী, আর কি সুঘ্রাণ! পাঁঠার মাংস এক বাটি। মুগের ডাল, মাছভাজা, টক মিষ্টি। কালীবাড়িতে শনি-মঙ্গলবারে এত প্রসাদ হয় কি বলব! ভোগের রান্না, স্বাদই আলাদা। মুখে লেগে আছে। তোমাকে একদিন ধরে ধরে নিয়ে যাব। তারপর মনে হলো, না ভালোই হয়েছে। পিলুর বড় পেটুক স্বভাব। খাবার লোভে পড়ে গেলে সে সহজে নড়তে চায় না। সে দাঁড়িয়ে থাকে। রোজ এসে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বাড়িতে খাওয়া নিয়ে যত ঝামেলা তার। সে মাছ ছাড়া ভাত খেতে পারে না। বাজার না হলে সে নিজেই যায় ডোবা নালায়। কুঁচো চিংড়ি, কাঁকড়া যা পায় কোঁচড়ে করে নিয়ে আসে। আর মাংস কেনার এত পয়সা কোথায়। একবার মাংস খাব খাব করছিল—কিন্তু হয় না। সে নিজেই গুলতি মেরে একটা খরগোশ শিকার করে নিয়ে এল।

নটু পুটু দুবার উঁকি দিয়ে গেছে। কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের মুখ রাশভারি দেখে ঢুকতে সাহস পায়নি। তবু নটু একবার সাহস করে ঢুকে বলল, পিলু কোথায় গেল?

—পিলু? পিলু তো চলে গেল।

—পিলু চলে গেছে। মা যে বলল, মাস্টারের ভাই এয়েছে। ও থাবে এখানে? রান্নাঘরে খবর দিল।

লক্ষ্মীও হাজির, কৈগো মাস্টার তোমার ভাইটি কোথায়। বড়রিদা ভিতরে নিয়ে যেতে বলল। দেখতে চেয়েছে।

ওরা কি ভাবে। পিলু কি সং। ভিতরে আমার কেমন অহংকারে বাধল। তারপরই মনে হলো, আমি অন্যায় অভিমানে ভুগছি। মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে, ঘৃণাও করতে পারে। সব মানুষ সমান হয় না। পিলুকে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের সম্ভ্রম রক্ষা করেছি ঠিক, বাবারও সম্ভ্রম রক্ষা করা গেছে—কিন্তু ঠিক মনুষ্যত্ব রক্ষা হয়নি। এমন একটা সরল বালকের প্রতি আমি ভারি অবিচার করেছি। ততক্ষণে খবরটা ভিতরে পৌঁছে গেছে।

লক্ষ্মী কলসী কাঁখে ঠায় টেবিলের সামনে দাঁড়িয়েছিল। আর হাজার রকমের প্রশ্ন, চলে গেল কেন?

—চলে গেছে। আমি কি করব। নিজের ইচ্ছায় এসেছিল, নিজের ইচ্ছাতে চলে গেছে। ও কারো কথা শোনার পাত্র নয়।

তুমি মিছে কথা বলছ মাস্টার। কালীর থানে মিছে কথা বলতে হয় না জান। খেচে খেতে এসেছে ভেবেছ।

আমার ভিতরে ক্ষোভ বাড়ছিল। মেয়েটার এমন রূঢ় কথা আমার সহ্য হচ্ছে না। মিছে কথা বলছি, তুই তো এ বাড়িতে জল তুলিস, খেটে খাস—তোর এত আস্পর্ধা হয় কি করে। বললাম, লক্ষ্মী তুমি পিলুকে চেন না। মিছে কথা বলার কি আছে।

কিন্তু যখন বৌদি আর বড়রিদা এলেন, আমার সত্যি তালগোল পাকিয়ে গেল। এবার আর খুব জোর ছিল না কথায়। বড়রিদা বললেন, কোথায় সে? কোথায় গেল।

লক্ষ্মীই জবাব দিল, কোথায় আবার যাবে। বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন মাস্টার। সম্ভ্রমে লাগে।

মেয়েটা এত বোঝে কি করে। কিন্তু সবার সামনে লক্ষ্মীকে বলতেও পারছি না, কেন বাজে বকছ। সম্ভ্রমের কি আছে। আমিও তো আশ্রিতজন।

বড়রিদা রোগা মানুষ। গলায় লম্বা পৈতা। খদ্দরের মোটা ধুতি মালকোচা করে পরা। দেখলে মনে হবে, যেন ক্ষিপ্ত হয়েই ভিতর বাড়ি থেকে উঠে এসেছেন। কিন্তু আমি জানি, এই অমায়িক মানুষটির ভিতরে একটা বড় মাপের মানুষ বাস

করে। তার কাছে মিছে কথা বলতেও বাধছে। বৌদি শুধু বলল, মাস্টার এটা ভালো কাজ হলো না। কতদূর থেকে দাদাকে দেখতে এয়েছে। আবার যাবে রোদে!

আমার চোখে জল এসে যাচ্ছিল। কোনোরকমে সামলে বললাম, বাড়িতে কিছু বলে আসেনি। খেয়েদেয়ে ফিরলে বাবা মা খুব চিন্তায় পড়ে যেতেন।

বৌদি-দাদা কথাটার মধ্যে যুক্তি খুঁজে পেয়ে আর কিছু বললেন না। নটু পুটু পিছনে দাঁড়িয়ে। লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে। ওকে বড় ভয় করছে। সে সবার সামনেই না বলে দেয়, সব মিছে কথা। মাস্টারের বানানো কথা। কি নিষ্ঠুররে বাবা! ভাইটাকে দুটো ভালো-মন্দ খেতে পর্যন্ত দিল না।

খেতে খেতে বেলা দুটো আড়াইটা বেজে যায় এ-বাড়িতে। ভোগের রান্না শেষ হয় দেরি করে। পাঁঠা বলি হয় বারোটার মধ্যে, মানুষের তো মানতের শেষ নেই। যারা বলি পছন্দ করে না, পাঁঠা উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়। শনি মঙ্গলবারে একটা দুটো ছাড়া পাঁঠা থাকেই। দিনে দিনে এরা জমে যায়। বাড়ে—বড় হয়। শনি মঙ্গলবারে মানতের পাঁঠা না পাওয়া গেলে, ছাড়া পাঁঠা বলি হয়। ওদিকটায় আমি যাই না। ঘরের মধ্যে বসেই টের পাই কার্তিক রামদা নিয়ে এগোচ্ছে। ঢাক কাঁসি এবং গুরুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ আরম্ভ হলেই বুকটা আমার কাঁপে। পাঁঠা ধরার লোক ধনঞ্জয়। সে সকাল সকাল চান করে মন্দিরে এ-দিনে চলে যায়।

পিলু চলে যাবার পর আমার কিছুই ভালো লাগছিল না। এমনকি মন্ত্রপাঠ ঢাক-ঢোলের বাজনা সব কিছুতেই মেজাজ অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে। ঝিল থেকে স্নান সেরে আসার সময় দেখেছিলাম—কত বিচিত্র মানুষ মন্দিরের চারপাশে জড় হয়ে আছে। সাধু, ভিখিরি, ছেলেমেয়ে বউ বুড়ি গর্দানমোটা ব্যবসায়ী, জমিদার বাড়ির মানুষজন সব যে যার মতো অশ্বত্থ গাছগুলির নিচে শুয়ে বসে আছে। চা খাচ্ছে ফ্লাস্ক থেকে। পাঁচ সাতটা বাচ্চা ছেলে গেরুয়া কাপড় পরে ঝিলের পাড়ে বসে চুল কামাচ্ছে। চুলের মানত আছে বোঝাই যায়। ধীরু নাপিত বাঁধা মানুষ মন্দিরে। সেই সব করে। গেরুয়া কাপড় সে পায়। মানুষের কত লীলা এমনই মনে হয়। পিলু এসেছিল দাদাকে শুধু দেখতে। তার কিছু আশা ছিল না। এত মানুষের মধ্যে পিলু থাকলে কি আর বেশি বাড়তি মানুষ হতো। লক্ষ্মী এসে বলল, খেতে যান গো মাস্টার! খাবার দেওয়া হয়েছে।

বলার ইচ্ছে ছিল, খিদে পায়নি। কিন্তু জানি কথাটা লক্ষ্মী শেষও করতে দেবে না। খিদে পায়নি কেন? মন খারাপ। অত দেমাক ভালোনাগো মাস্টার।

কালীর থানে এসেছ, কপালে না থাকলে হয় না। মান অভিমান কমাও। গরিব বলে কি মানুষ ছোট হয়ে যায়।

খেতে গেলাম অগত্যা। কিন্তু খেতে পারলাম না। বার বারই চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে। পিলুটা হয়ত ডাল দিয়ে ভাত খেয়ে উঠে গেছে। কিছু ভাজা, কুমড়ো ফুলের বড়া আর কি বেশি রান্না হতে পারে। দুই চৌধুরী থাকার সময়ই বাবা কতুর। আমার উপার্জনের টাকাও বোধহয় শেষ। খাওয়া-দাওয়া কষ্টে চলছে এখানে থেকেও তা বুঝতে পারি। লক্ষ্মী বারান্দায় একপাশে দাঁড়িয়ে। কলাপাতায় নুন, লেবু, কাঁচালঙ্কা জল সে সবাইকে দেয়। তার চোখ ফাঁকি দেওয়া কঠিন বলে, চোখ ঝাপসা হলে মুখ নিচু করে রেখেছি। যতদূর জানি ভিতরের দুঃখটা কেউ টের পায়নি। লক্ষ্মীকেও পেতে দিইনি। চুপচাপ খেয়ে উঠে নিজের ঘরে চলে এলাম। তক্তপোশে মাদুর পেতে জানালা ঘেঁষে শুয়ে পড়েছি। চোখে হাত রেখে কত কিছু ভাবছি। নতুন জীবন শুরু। বদরিদা দু-একদিনের মধ্যে কলেজে যাবেন বলেছেন আমাকে নিয়ে। ভর্তি করার দায়িত্বটা মানুকাকার কথায় তিনিই ভার নিয়েছেন। মানুকাকা নাকি বলেছেন, বাবা খুব অসহায় মানুষ। তা বলতেই পারেন। যজনযাজন ছাড়া তাঁর আর কিছু কাজ জানা নেই। এদেশের মানুষদের এমনিতেই ধারণা, দেশ ছেড়ে এসে সবাই কুলীন বামুন কায়েত হয়ে গেছে। বাবা যে তেমন নয় কে জানে। মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে সময় লাগে।

আর তখনি কার মৃদু পায়ের শব্দ। টেবিলে খুটখুট করছে। নটু আসতে পারে পুটুও। এরাও আমার পাশে শুয়ে দিবানিদ্রা দেবে। বদরিদা ওদের ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। পাশে শোয় ঠিক, কিন্তু ঘুমাতে চায় না। এ-পাশ ও-পাশ করে। কখনও দু'জনে মারামারি পর্যন্ত শুরু করে দেয়। সবকিছুর মীমাংসা আমাকে করতে হয়। চোখ খুলে দেখলাম, তারা কেউ কিনা। না। তারা নয়। লক্ষ্মী। সে সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, খেলে না কেন মাস্টার।

একটা কড়া জবাব দেব ভাবলাম। কিন্তু চোখ দুটো এত মায়াবী যে কড়া কথা বলা গেল না। আমি খাইনি বলে যেন এক গোপন কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছে। থাকতে না পেরে এখানে চলে এসেছে। বললাম, খেলাম তো।

—এটা খাওয়া। তুমি কতটা খাও আমি দেখি না। তুমি খেতে খেতে চোখের জল ফেলছিলে কেন?

—লক্ষ্মী। কেমন চিৎকার করে উঠতে দিতেও পারলাম না। পাশ ফিরে তাকে বললাম, এখন যাও। আমি ঘুমাব।

—ঘুমাতে কে বারণ করেছে। ঘুমাও না। তাই বলে তুমি আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

একবার বলার ইচ্ছে হল, তুমি কি এ বাড়ির গোয়েন্দা। বৌদিকে না আবার বলে দেয়। ওরা তবে কি ভাববে। উঠে বসলাম। ধরা পড়ে গেছি যখন উপায় কি। বললাম, কাউকে বলো না।

লক্ষ্মী কেমন মাথা নিচু করে বলল, তুমি এটা মাস্টার ভাবলে কি করে আমি সবাইকে বলে বেড়াব। আমি ছোট জাতের বলে মনটা ছোট হবে কেন। কালীর থানে থাকলে মন ছোট রাখতে নেই। তিনি তো সব দেখতে পান। গোঁসা হবে না তাঁর।

এ-হেন মেয়েটির সঙ্গে আমি কথায় কি করে পারি। চুপচাপ থাকলাম। লক্ষ্মী তবু দাঁড়িয়ে আছে। যাচ্ছে না। কি ভাবছে কে জানে। লক্ষ্মী গায়ে কিছু পরে না। অথচ শরীর আশ্চর্যভাবে ঢেকে ঢুকে রাখতে শিখেছে। এ-বয়সটা এমন যে সব কিছু ফুটে বের হতে চায়। লক্ষ্মী টের পায় বলেই শরীর নিয়ে এবং তার ডুরে শাড়ি নিয়ে সব সময় খুব সতর্ক থাকে। আমার ঘরে হুট হাট চলে আসে, ওতে আমি শঙ্কিত থাকি। এই সেদিনও এটা ছিল না। ছোড়দির কথা মতো সব করতে পারতাম। ছোড়দির পিছনে সাইকেলে চেপে কতদিন দামোদরের পাড়ে চলে গেছি। নদীর চরায় হেঁটে বেড়িয়েছি। ছোড়দি কত কথা বলত, বিলু তুই বড় হবি কিন্তু। বিলু ছোড়দি মা বাবা সবাই চায় আমি বড় হই। সেই বড় হওয়াটা লক্ষ্মীও চায় বুঝি। কলেজে যাবার দিন দেখলাম, আমার একটা মাত্র ফুলপ্যান্ট ধুয়ে সুন্দর করে ভাঁজ করে বালিশের নিচে রেখে দিয়েছে। আমি কি পরে যাব না যাব, আমার চেয়ে লক্ষ্মী সেটা যেন বেশি জানে। কে তাকে এই দায়িত্ব দিয়েছে। বৌদি, বড়দিদা না সে নিজেই এ-ভাবে মানুষের দায়িত্ব নিতে ভালবাসে। অন্যমনস্ক হলেই দেখছি, লক্ষ্মী কখন এসে আমার জীবনের অনেকটা জায়গা জুড়ে বসে গেছে। বুঝতে পারছি সাপের খোলস ছাড়ার মতো আমার পুরনো খোলসটা এবার শরীর থেকে ধীরে ধীরে খসে যাচ্ছে। নতুন খোলস—নতুন এক আশ্চর্য ছাপ এবং দারুচিনি গাছের মতো সুঘ্রাণ—কে যেন ধীরে ধীরে এসে একটা সঠিক আস্তানা গাড়তে চাইছে। তারজন্য প্রায়ই জানালায় অথবা জ্যোৎস্না রাত্রে, কোনো নিরিবিলি আকাশের নিচে নক্ষত্র দেখতে দেখতে ভাবি সে কে। সে কোনো রহস্যময়ী নারী—যে আমায় কোন ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যেতে চায়।

পিলু সেটা টের পেয়ে গেছে কিনা কে জানে। সে আর আসে না। প্রায়ই জানালায়, মনে হয়, সে এসে দাঁড়িয়ে ডাকবে, দাদা আমিরে। সেই স্বর্গীয় হাসিটি লেগে থাকবে পিলুর মুখে। আমি বলব, আয় ভিতরে আয়। আজ তুই এখানেই খেয়ে যাবি। লক্ষ্মী টের পেয়ে বলেছিল, বাড়ি যাও না মাস্টার। ভাইয়ের জন্ম কেমন করছে মন!

কেমন উদাস গলায় বললাম, অনেকের জন্যই মন কেমন করে। কিন্তু কাউকে বলতে পারি না। পিলু কেবল সেটা ধরে ফেলেছে। সে আর সে-ভাবে বুঝি আমার কাছে আসবে না। লক্ষ্মী কি বুঝে মাথা নিচু করে রাখল। যে মেয়েটা সারাদিন চোপা করে তার চোখও দেখলাম কেমন জলে ভার হয়ে উঠছে। ধরা পড়ে যাবে বলে, সে দৌড়ে ভিতরে চলে গেল।

এরপর অনেক দিন লক্ষ্মী আমার সামনে আসেনি। তাকে আর আগের মতো কাছাকাছি দেখতে পাই না।

রাতে যখন খেতে যাই ভিতর বাড়িতে তখন সে বিছানা করে রাখে। কলেজ থেকে ফিরে দেখি আমার বইপত্র খাতা সব তাকে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছে। সকালের খাবার নটু পুটুকে নিয়ে আসতে হয়। আমারটাও তারাই নিয়ে আসে। লক্ষ্মীকে কাছে পাবার যা কিছু উপলক্ষ্য ছিল, সব থেকেই সে কেমন দূরে সরে থাকছে। লক্ষ্মী যত দূরে সরে যাচ্ছিল, তত ভিতরে এক আশ্চর্য টান বোধ করছি। সে দূরে থেকে আমার সব কিছু লক্ষ্য রাখছে। আমার সব কিছুতেই তার অদৃশ্য হাত কাজ করে চলেছে। এমন কি সে আমার জন্ম আলাদা স্নানের জলও তুলে রাখে। জামাপ্যান্ট ধুয়ে মেলে দেয়। তারপর যেখানে যা রাখবার রেখে দেয়। সাঝবেলায় জানি লক্ষ্মী জল আনতে যাবে ঝিলে। তাকে সেখানে একা পেতে পারি ভেবেই কেন যে গিয়ে সিঁড়ির চাতালে বসে থাকলাম। লক্ষ্মী এল, দুবার জল নিয়ে গেল। সে যেন আমাকে চিনতেই পারে না। মরিয়া হয়ে শেষ বেলায় বললাম, লক্ষ্মী, দাদাকে বলে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করছি। মজা বুঝবে। লক্ষ্মী কেমন আঁৎকে উঠল। লক্ষ্মী ভারি যুবতী নারীর মতো বলল, মাস্টার কপালে আমার সয় না। সে মানুষটার অনিষ্ট হোক আমি চাই না। এই ভাল আছি। এইটুকু বলে সে চলে গেল। বুঝতে পারছিলাম, লক্ষ্মী নিজেকে আর জড়াতে চায় না। তার ধারণা, যে মানুষের জন্ম টান বোধ করলে জগৎ-জননী রাগ করে। তাকে কেড়ে নেয়। সে সারা জীবনের জন্ম বোধহয় এইখানে সেবাদাসী হয়ে পড়ে থাকতে চায়। আর কিছু জীবনে তার কাম্য নয়।

ঝিলে কিছু পাখি উড়ে এল, ও-পাড়ের বাঁশবনে কারা আগুন জেলেছে। শীত-

শীত করছিল। কিন্তু উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। আকাশে কিছু নক্ষত্র। নিরিবিলি এক জনশূন্য পৃথিবীর আমি বাসিন্দা। মানুষের কত রকমের সংস্কার গড়ে ওঠে বড় হয়ে উঠতে উঠতে। এক সময় দেখলাম, লক্ষ্মী লণ্ঠন হাতে চলে এসেছে। হাতে শীতের চাদর। শুধু বলল, বাড়ি চল মাস্টার। ঠাণ্ডা লাগবে। এটা গায়ে দাও। ঠাণ্ডা লাগিয়ে জ্বর বাধালে কে দেখবে।

—কেন তুমি।

—আমি তোমার কে? কেউ না। আমার দায় পড়েছে দেখার। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কথাগুলি বলল লক্ষ্মী। লণ্ঠনের আলোয় তার মুখ দেখা যাচ্ছিল না। বুঝতে পারছি লক্ষ্মী আমার অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়ছে। কিছু একটা না আবার মাস্টারের হয়। সে তারপর বলল, বাড়ি চল মাস্টার। মানুষের মুখে আকথা কুকথা লেগেই থাকে। তুমি আর আমাকে জ্বালিও না। অনেক রাত হয়েছে.এবারে ওঠো। তারপর লক্ষ্মী আমাকে দরজায় পৌঁছে দিয়ে চলে গেল। যাবার সময় শুধু বলল, ভারি ছেলেমানুষ তুমি।

এ কথায় কেন যে ক্ষিপ্ত হয়ে গেলাম। দৌড়ে গেলাম, সে মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনটা কেড়ে মুখের কাছে নিয়ে গেলাম। —দেখি তোমার মুখ। আমি ছেলেমানুষ, তুমি কে। কেমন মাথাটা লক্ষ্মীর কথায় ঝাঁ ঝাঁ করে উঠেছিল। প্রায় পাগলের মতোই কাণ্ডটা করে ফেলেছি।—দেখি মুখ, খোল। খোল বলছি। লক্ষ্মীর আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ি করছি।

লক্ষ্মী শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে রেখেছে। না না, দেখ না মাস্টার, পায়ে পড়ি। আমার মুখ দেখলে তোমার অনিষ্ট হবে মাস্টার। তারপরই কেমন আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল। সত্যি ভারি ছেলেমানুষী করে ফেলেছি। কেউ দেখে ফেললে কি ভাবত। চুপচাপ ঘরে এসে বসলাম। নটু পুটুকে বললাম, আজ তোদের ছুটি। আজ পড়াব না। ওরা চলে গেলে—রেল লাইন ধরে অনেকটা হেঁটে গেলাম। জ্যোৎস্না রাত—আমার কেন জানি কিছুই ভালো লাগছে না। কেমন ভিতরে চঞ্চল বালকের মতো এক তীব্র অস্থিরতায় পাগল হয়ে উঠেছিলাম। তারপরই দেখলাম হাঁটতে হাঁটতে সেই নবমী বুড়ির বনটার কাছে এসে গেছি। মানুষ বুঝি শেষ পর্যন্ত এখানেই এসে থামে। কখনও খর রোদ, কখনও জ্যোৎস্না, কখনও গাছপালার নিবন্তর ছায়া। মানুষ এভাবেই সামনে হেঁটে যায়। বনভূমির এক আশ্চর্য নিথর সৌন্দর্যে আমি কেমন মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমার চাঞ্চল্য কমে গেল। ধীরে ধীরে ফের রেল লাইন ধরে হেঁটে ফিরতে থাকলাম। মনে হচ্ছিল যেন কান্না আমার চারপাশে ঘোরাফেরা করছে। তাদের পায়ের শব্দ আমাকে

ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যেন যেতে বলছে। হাহাকার হাসিতে টের পাচ্ছিলাম। তারা আমায় কোন ফুলের উপত্যকায় নিয়ে যেতে চায়। আমি সব ছেড়ে, ঘরবাড়ি ফেলে, এখন সেদিকেই হাঁটছি। উপত্যকার দুই প্রান্তে আমি আর পিলু দাঁড়িয়ে। নির্জন সেই উপত্যকায় আমাদের দু'জনের মাঝখানে কেউ কেবল আঁচল উড়িয়ে নৃত্য করছে। পিলুর আর সেই ডাক 'দাদারে' শুনতে পাচ্ছি না। সে বার বার ডেকেও আমার সাড়া পাচ্ছে না।

॥ চতুর্থ পর্ব ॥

এভাবেই আমি বড় হচ্ছিলাম। আমার মান-সম্মান বোধ এখন নানাভাবে আমাকে বিড়ম্বনার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। লক্ষ্মীর আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ির বিষয়টা মাঝে মাঝে আমাকে এখনও তাড়া করে। থিতু হয়ে কোথাও যেন বসতে পারি না। কেবল মনে হয়, ওটা আমি কী করতে যাচ্ছিলাম। আমরা দু'জনই এ বাড়ির আশ্রিত। কেউ দেখে ফেললে কী না জানি হত।

জানালায় বসে আছি। সামনে বড় একটা নিম গাছ। শীত বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। কুয়াশাচ্ছন্ন সব। সামনের রেল-লাইনের ওপারটা দেখা যাচ্ছে না। সব আবছা মতো হয়ে আছে। আজকাল লক্ষ্মী আবার আমার ঘরে আসছে। সেদিনের সেই সব কথার পর লক্ষ্মী আমাকে কিছুদিন এড়িয়ে চলত। এমনকি ভিতর বাড়িতে জলখাবার দিলে, লক্ষ্মীর গলা পেতাম। মাস্টার তোমার খাবার দেওয়া হয়েছে। ভিতরে গেলে লক্ষ্মীকে দেখতে পেতাম না। সব সময় এদিক ওদিক সে অদৃশ্য হয়ে থাকত। কখনও অভিমানবশে ভিতরে না গেলে নটু পুটু আমার জলখাবার নিয়ে আসত। ভারি অভিমানে ভুগতাম। লক্ষ্মীর তো কতো কাজ। সে হয়ত সময়ই পাচ্ছে না, দরজার ওপাশ থেকে আমাকে ডেকে দিয়েই অন্য কোন ঘরে ঢুকে গেছে। দেবস্থানে কত রকমের কাজ থাকে। মন্দিরের চাতাল থেকে রান্নাবাড়ি ধোওয়া-মোছার কাজটা লক্ষ্মীর। ঘরে ঘরে ঝাড়পোঁছ দেওয়া, সবার জামাকাপড় কাচা, মার আমার স্নানের জল তোলার কাজটা সে ইচ্ছে করেই হাতে নিয়ে নিয়েছে। তাকে আমি সব সময় দেখতে পাব আশা করা ঠিক না। তবু আমার মনে হত লক্ষ্মী আমার চোখের সামনে আসতে চাইছে না। দেখা হলে চকিতে, একবার চোখ তুলেই খুব জরুরী

কাজের ভান করে তার সরে পড়াটা আমার মান-সম্মানে বড় লাগত। লক্ষ্মীর কাছে বোধহয় আমি খুব ছোট হয়ে গেছি।

এর মধ্যে একদিন লক্ষ্মী আমাকে দেখে ফিক করে হেসে দিয়েছিল। লক্ষ্মীর চোখ এমনিতেই বড়। হাসলে আরও বড় দেখায়। এতে ওর নারী মহিমা বাড়ে সে বুঝতে পারে। আমার ভেতরের কাতর ভাবটা কি লক্ষ্মী টের পেয়ে গেছে। ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি। চোখে মুখে এমন কোন ভাব কি ফুটে উঠছে? না'লে মজা করে এমন হাসার কী দরকার লক্ষ্মীর। আজ যদি লক্ষ্মী জলখাবার দিতে আসে সেই আশায় বসে আছি।

নটু পুটু বড়দিনের ছুটি বলে মাসির বাড়ি গেছে। সামনে পরীক্ষা। পড়ার চাপ খুব। এ-ক'দিন ছাত্র পড়াবার কাজটা সকালে নেই বলে নিজের পড়াটাতে একটু বেশি মনোযোগ দেব ভেবেছি। কিন্তু মাথার মধ্যে লক্ষ্মীকে একা পাওয়ার সুযোগটা বড় বেশি দাপাদাপি করছে। পড়ায় মন দিতে পারছি না।

মনে মনে পড়ার চেষ্টা করছি। পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছি। মাথায় কিছু ঢুকছে না। ঘরে ঢোকার আগে লক্ষ্মী বেশ দুপদাপ শব্দ করে। সে যে আসছে জানান দেয়।

জোরে পড়লে তার দুপদাপ শব্দ শুনতে পাব না। তাই মনে মনে পড়া। এমন একটা বিতিকিচ্ছি চিন্তা মাথায় থাকলে কিছুতেই পড়া হয় না। লক্ষ্মীকে কথাটা বলা দরকার। ও ভুল বুঝলে আমার মনুষ্যত্বে কোথায় যেন লাগে। বার বার লক্ষ্মীর সঙ্গে কিভাবে কথা শুরু করব, কিভাবে বলব, লক্ষ্মী আমি কিন্তু তোমার কথায় ভারি রেগে গিয়ে কাজটা করে ফেলেছিলাম। আমার অন্য কোন ইচ্ছে ছিল না। তুমি আমাকে খারাপ ভেব না। এইসব কথার মধ্যেই মনে হয় ভেতরে আমার কোন খারাপ ইচ্ছে ছিল। এ সময় কেমন অপরাধবোধে আরও ম্রিয়মাণ হয়ে গেলাম। লক্ষ্মী জলখাবার দিতে এলেও কথাটা বলতে পারতাম না। সেই ঘটনার পর থেকে কতবার যে ভেবেছি লক্ষ্মীকে একা পেলে সব বুঝিয়ে বলব। দেখার সঙ্গে কী অন্য কোন ইঙ্গিত ছিল তার কথায়। লক্ষ্মী নিজেকে ছোটজাতের মেয়ে ভাবে। তার দু'বার বিয়ে এবং বৈধব্য দুই ঈশ্বর নির্দিষ্ট। কোন মানুষই তার কপালে সয় না। সে আর আমাকে তার সঙ্গে জড়াতে চায় না। মেয়েটা এখনও তার বালিকা বয়সই পার করতে পারে নি। চোখে মুখে বালিকা বয়সের ছাপ খুব বেশি একটা না থাকলেও বোঝা যায়, বয়সে ও আমার ছোটই হবে। এই বয়সেই লক্ষ্মী জীবনের সেই রহস্য জেনে গেছে। যা ভাবলে আমার চোখমুখ লাল হয়ে যায়। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে।

মনে মনে বললাম, আমি তোমাকে আমার সঙ্গে জড়াব কেন। তোমার এত আস্পর্ধা হয় কী করে। তারপরই মনে হল, কথাটা জোর করে বলছি। বাড়ির একজন গৃহশিক্ষকের পক্ষে একজন ঝি-মেয়ের সঙ্গে জড়ানোটা অসমীচীন। সে বোধ আমার প্রকট। ভাবলাম লক্ষ্মীকে লেডাবেই কথা বলব।—তুমি এতটা আশা করলে কী করে। ' তোমার আস্পর্ধা খুব দেখছি। তারপরই মনে হল, যাই বলি না কেন, ওকে এমন রূঢ় কথা কখনও বলতে পারব না। আমার সে সাহসই নেই। আস্পর্ধা কথাটা বার বার বিড়বিড় করে বকছি। আর বুঝতে পারছি লক্ষ্মীর প্রতি প্রবল এক আকর্ষণ বোধ করছি। মানুষের যে কী হয়! ও কখনও আমার জামা প্যান্ট ঠিকঠাক করে না রাখলে, বই খাতা তুলে তাকে সাজিয়ে না রাখলে মনে মনে কষ্ট পাই। লক্ষ্মী নিজেই যে কাজটা হাতে তুলে নিয়েছিল তা নিয়ে তার আবার অবহেলা কেন। আঁচল কাড়াকাড়ির পর থেকে রোজ কলেজ থেকে ফিরে ভেবেছি, আজ সব কিছু গিয়ে ঠিকঠাক দেখব। আমার পাজামা গেঞ্জি চেয়ারে ভাঁজ করা, আমার লণ্ডভণ্ড বইয়ের জঞ্জল আর নেই। সব সাজিয়ে গুছিয়ে লক্ষ্মী ছিমছাম করে রেখেছে। ফিরে এসে দেখতাম, না লক্ষ্মী ঘরেই ঢোকেনি। লক্ষ্মীর কোন সাড়া শব্দ নেই বাড়িতে। যে মেয়েটা এত চোপা করত সব কাজে সে কেমন ভারি নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কোথায় অদৃশ্য হয়ে আছে।

আর তখনই মনে হল কেউ আসছে। তাড়াতাড়ি আলোয়ানটা ভাল করে জড়িয়ে নিলাম এবং পাঠ্য বইয়ের ওপর উপুড় হয়ে পড়লাম। বড় মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছি, কোন বাহ্যজ্ঞান নেই এমন অভিনয় আর বুকে বড় ঢিপঢিপ শব্দ—লক্ষ্মীই হবে। লক্ষ্মী আমার জলখাবার হাতে ঘরে ঢুকছে। আমি তাকাচ্ছি না। কেউ আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে যেন জানি না, পড়াটা ক্রমে আরও জোরে উচ্চস্বরে অন্য এক লয়ে উঠে যাচ্ছে।

লক্ষ্মী ডাকল, মাস্টার তোমার জলখাবার।

রাখ। এই পর্যন্ত। লক্ষ্মীকে দেখে যে আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছি এবং আমার কিছু কথা আছে ওর সঙ্গে ভুলেই গেছি। আসলে এটাই আমার স্বভাব। আবেগ বড় বেশি। যেন লক্ষ্মীকে এখন কিছু বললেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে। পড়ার চেয়ে খাওয়াটা আমার বড় নয়, তুমি এখন যাও—অবশ্য সবটাই মনে মনে—লক্ষ্মী গেল না। দাঁড়িয়ে থাকল। হয়ত এক্ষুনি ঝামটা মেরে কথা বলবে, ওঠো ওঠো—কি ছিরি ঘরের। বাড়িতে কে দেখত। কিন্তু লক্ষ্মী কিছু বলছে না। দাঁড়িয়েই আছে। বললাম, লক্ষ্মী তুমি অতি তরলমতি বালিকা। বাংলাটা

আমার কানেই কেমন যেন শোনাল। যেন আমি বলছি না, প্রৌঢ় কোন মানুষ কথাটা বলছে। সাধু ভাষা প্রয়োগে কি বেশি সুবিধা, এতে কী কথাবার্তার গুরুত্ব বাড়ে।

লক্ষ্মী বলল, বৌদি বলেছে, শরীর খারাপ, রান্না-বাড়িতেই আজ খেয়ে নেবে।

কেমন আচমকা ঠোক্কর খেলাম। দেবস্থানে দু'ভাবে রান্নার ব্যবস্থা। সরকারী, বেসরকারী। সরকারী রান্না তীর্থযাত্রীদের জন্য। যারা দেবস্থানে মানত দিতে আসে তারা টাকা দিয়ে প্রসাদ পায়। আর বাড়ির মানুষজনের রান্না বৌদি নিজ হাতে করেন। নটু-পুটুর ছুটি। শুধু আমারই কলেজ—দশটায় ভাত-ডাল-মাছ।

বৌদির শরীর ভাল না কেন?

সে আমি জানব কি করে?

কি হয়েছে?

আমাকে তরলমতি বললে কেন, বলব না।

তরলমতি বালিকাই তো?

না বলবে না। আমি বালিকা নই।

তবে তুমি কি?

আমি লক্ষ্মী। কেমন গম্ভীর গলায় কথাটা বলল।

এতক্ষণে আমার মধ্যে যে উত্তেজনা ছিল, তা অনেকটা প্রশমন হয়েছে। স্বাভাবিক থাকলে বুঝি সবই গুছিয়ে বলা যায়। বললাম, লক্ষ্মী সেদিন তুমি কী না ভাবলে। তোমার সঙ্গে কথা ছিল।

লক্ষ্মী বলল, কোন্‌দিন।

ঐ তো সেদিন। তুমি ঠিক কিছু ভেবেছ।

ভাবব না! ওভাবে কেউ আঁচল নিয়ে কাড়াকাড়ি করে! আমি মেয়েমানুষ না! তোমার বুদ্ধি-সুদ্ধি কবে হবে মাস্টার। কেউ দেখে ফেললে কী হ'ত।

তুমি আমাকে ছেলেমানুষ বললে কেন?

মাস্টার তোমার ভারি গুমর। এত গুমর ভাল না।

লক্ষ্মী কি মনে করিয়ে দিতে চায়, সে এ বাড়ির মাস্টার বলে যা-তা করতে পারে না। বললাম, গুমরের কী দেখলে?

বৌদি কত করে বলল, তোমার ভাইটিকে নিয়ে আসতে, তুমি কিছুতেই আনলে না।

লক্ষীকে কী করে বুঝাই, আমরা খুব গরীব। আমার পোশাক-আশাক দেখেও তো বুঝতে পারে। ভাইটা যেভাবে এ বাড়িতে এসেছিল, তা দেখেও বুঝতে পারে। কিন্তু বুঝতে না চাইলে কী করতে পারি। ভাইটার খাবার বিষয় কাণ্ডজ্ঞান বড় কম। সুস্বাদু খাবার পেলে সে আর উঠতে চায় না। লোভে পড়ে যায়। রোজই এসে তবে জানালায় উঁকি দিয়ে বলবে, দাদারে আমি। গরীব বলে আমাদের কাণ্ডজ্ঞানের অভাব আছে কেউ টের পেলে আমার বড় লাগে।

সেজন্য তুমি রাগ করেছ?

রাগ! রাগের কী দেখলে।

না এই যে তোমাকে আর দেখা যায় না।

তোমার সামনে হাবার মতো সব সময় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি।

তার মানে?

তুমি মনে কর আমি কিছু বুঝি না। তোমার সঙ্গে আমার কথা বলাই অন্যায় হয়েছে। তুমি যাও।

যাব কেন। যাব না। দাঁড়িয়ে থাকব। তোমার কথাতে যাব? তোমার বাড়ি?

লক্ষ্মী তোমার চোপা করার স্বভাবটা গেল না।

আমার কোন কথাই সে গ্রাহ্য করে না। তক্তপোশে পা ঝুলিয়ে বসল। ওর খালি গা। প্রকৃতির সুষমা ওর শরীরে। শাড়ির আঁচল দিয়ে আশ্চর্যভাবে গা ঢেকে রাখে। এতটুকু আলগা স্বভাবের না। নিজের লজ্জা নিবারণের জন্য সে বড় নিপুণভাবে সারা শরীর ঢেকে রাখে। এ ঘরে এলে আরও বেশি। উঠতি বয়সে এ-সব বোধহয় বড় টানে। লক্ষ্মী কাছে থাকলে আমার ভাল লাগে। না থাকলে মনে হয় কী যেন নেই। কিন্তু এ মুহূর্তে আমার কোন শ্লথ আচরণ লক্ষ্মীকে আস্কারা দিতে পারে, আমি বললাম, তুমি যাবে না?

কী কথা আছে যে বললে!

এমনই হয়, কথা বড় হারিয়ে ফেলি। লক্ষ্মীকে আমার কিছুই বলা হয়ে ওঠে না। কেবল বললাম, তুমি আমাকে খারাপ ভেব না।

তুমি খারাব, খুব খারাব।

না লক্ষ্মী, আমি তোমার মুখ দেখতে চেয়েছিলাম। আর কিছু না।

তুমি কী মাস্টার। ওঠো, তোমার প্যানপ্যানে স্বভাব যাবে না। আমার অনেক কাজ। বলে লক্ষ্মী ঝাঁটা নিয়ে এল। ঘর-দোর ঝাঁট দেবে। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকল। বলল, যাও। না গেলে ঝাঁট দি কি করে?

সামনের রাস্তায় রিকশা যাচ্ছে। নিমগাছ থেকে পাতা ঝরছে। একটা ইঞ্জিন গেল হুশ শব্দ করে। তখন লক্ষ্মী বলল, তোমার এই কথা।

আর কি কথা আশা করে লক্ষ্মী। বললাম, তুমি এখানে কবে থেকে আছ?

মনে নেই।

আমি তোমাকে খুব কষ্ট দি। সেদিন সত্যি কী যে হ'ল।

তোমার রামায়ণ পাঠ আমার ভাল্লাগে না। তাড়াতাড়ি খাও। দাদা পূজার ঘরে ঢুকবে। চান করবে। জল তোলা আছে।

পরে ঝাড়ু দিও।

না, এক্ষুণি দেব। তোমার কি ড্যাং ড্যাং করে পড়তে যাবে। আমার মতো খাটতে, বুঝতে ঠ্যালা।

তুমি আর আমার জল তুলবে না। বিলে চান করে নেব।

তুলব কি না পরে ভাবব। খাওয়া হ'ল। বাব্বা, মানুষ বটে একখানা। সব সময় গাড়ি রেডি। মনের মধ্যে কী আছে তোমার মাস্টার।

তুমি জলখাবার নিয়ে আসতে না কেন। ঠিক আমাকে খারাপ ভেবেছ?

এই তোমার বুদ্ধি মাস্টার। তুমি আমার কী করেছ। বল কী করেছ। খারাব ভাবব কেন বল।

ভাবনি তো।

না, না, না।

আমার মুখে এতক্ষণে কেমন প্রসন্ন হাসি খেলে গেল। বাটিটা এগিয়ে দিয়ে বললাম, রাগ ছিল ঠিক।

রাগ!

বা রে কলেজ থেকে ফিরে দেখতাম, আমার ঘরে তুমি ঢোকইনি।

ঢুকি আর চোরের দায়ে ধরা পড়ি।

একথা কেন?

তুমি জান না মাস্টার, ছুটুর দামী কলমটা পাওয়া যাচ্ছে না।

তার তুমি কী করবে?

আমি তো সব করি। দিদি বৌদি ঠেস দিয়ে বলল, তুই করিস, তুই জানিস না, কে জানে?

ঠিকই তো বলেছে।

বাড়ে চুরি গেলে আমি কী করব। সব দোষ আমার। বেশ তোমরা। বৌদিকে

বলেছি, আর কুটো গাছটি নাড়ব না। সব নবাব। কেউ হাত নেড়ে খাবে না। বই আর গুছিয়ে দি তো আমার নামে কুকুর পুষ।

তুমি নিয়েছ বৌদি ভাবতেই পারে না। তোমার ওটা ভুল।

ভুল কি ঠিক সত্যি জানি না মাস্টার। আমরা ছোট জেতের মেয়ে। আমরা সব করতে পারি। আচ্ছা বল, কালীর থানে বাস করে কেউ চুরি করতে পারে। পাপ হবে না?

এজন্য আসতে না?

হ্যাঁ। বলে লক্ষ্মী চোখ তুলে তাকাল। শ্যামলা মেয়ের চোখে সেই মায়াবী দৃষ্টি। বললাম, ভিতরে গেছি, তুমি নেই। ডাক শুনি, তুমি নেই। ভাবতাম কী না জানি করে ফেললাম। কোথায় থাকতে।

তোমার সামনে আসতে লজ্জা লাগত।

কেন?

বারে বৌদি যদি ভাবে আমি নিয়েছি তবে তুমি ভাববে না। মেয়েটার ছ্যাঁচড়া স্বভাব ভাববে না। লজ্জা করে না।

আমার ভীষণ হাসি পেল এ জন্য। বললাম, আর আমার মাথায় কত বিদ্ঘুটে চিন্তা তোমাকে নিয়ে। জান ক'রাত আমার ঘুম হয়নি?

আসলে এত কথা লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার—কারণ, এই বাড়িতে লক্ষ্মীর সঙ্গে যেন কোথায় এক গোপন আত্মীয়তা আমার ক্রমে গড়ে উঠেছে। মন খুলে ওর সঙ্গে কথা বললে, কেমন হাল্কা বোধ করি। এ-ক'দিন কী যে গেছে। ভাইটা দুপুরে না খেয়ে চলে যাবার পর লক্ষ্মী আমাকে নানাভাবে হেনস্থা করেছে। মাস্টার তোমার কাজটা ভাল হয়নি। ছেলেমানুষ কতটা পথ হেঁটে দাদাকে দেখতে এয়েচে আর তাকে তুমি না খাইয়ে পাঠিয়ে দিলে। বৌদি খুব রাগ করেছে। খেতে বসে আমি যে খেতে পারছিলাম না, লক্ষ্মী তাও টের পেয়েছে। এবং কখন দু'ফোঁটা চোখের জল পড়েছিল, লক্ষ্মীর চোখ থেকে তাও এড়িয়ে যায়নি। একটা মেয়ে যখন এত আমার দেখে বেড়ায় তখন গভীর এক বন্ধুত্ব আপনা থেকেই বুঝি গড়ে ওঠে। লক্ষ্মী ক'দিন এড়িয়ে চলায় মনটা যে ভার হয়েছিল, সব জেনে কেমন হালকা হয়ে গেল। বললাম, ঠিক ভাইকে নিয়ে আসব। তুমি সামলিও।

লক্ষ্মী কেমন ত্যারচা করে তাকাল। বলল, একটা আজগুবি দাদাকে সামলাচ্ছি, আর তার ভাইকে পারব না। দেখই না এনে।

আমার বাড়িটা কালীবাড়ি থেকে খুব বেশি দূর না। বাবা যে জঙ্গলের মধ্যে ঘরবাড়ি বানিয়েছিল, সেখানে এখন বলতে গেলে রাজসূয় যজ্ঞ চলছে। গভীর বনটা ক্রমে পাতলা হয়ে আসছে। তালগাছ অর্জুন গাছ আর খেজুরগাছ রেখে আগাছা সাফ করছে মানুষেরা। বাঁশ বেত দিয়ে চালাঘর বানাচ্ছে। বাড়িটায় যেতে হলে রেল লাইন ধরে কিছুদূর হেঁটে যেতে হয়। তারপর মাঠ। কাশবন। কারবালার প্রান্তর এবং প্রান্তরটা পার হলেই নবমী বুড়ির পরিত্যক্ত ইটের ভাটা। ভাটার শেষ থেকেই বনটা আরম্ভ। গাছ-পাতা, পায়ে হাঁটা পথ, পাখির নিরন্তর ওড়া, এসব দেখতে দেখতে কখন যে নিজের বাড়ি-ঘরে পৌঁছে যাই টের পাই না। ঘণ্টাখানেকের রাস্তা—কেমন অদ্ভুত প্রিয়জনের মতো আমাকে এগিয়ে নিয়ে যায়, সে তার দূরত্ব বুঝতেই দেয় না। এমন প্রিয় রাস্তা মানুষের থাকে বলে আমি আগে কখনও জানতাম না।

ভাইটা সেই ঘটনার পর থেকে এদিকটায় আর একদিনও মাড়ায়নি। তার কাছে দূরত্বটা আরও কম। সে সারাদিন টোটো করে বেড়াতে ভালবাসে। ইস্কুল নেই বলে তার অফুরন্ত সময়। বাড়িতে বই-খাতা-পেনসিল বাবা কিনে দিয়েছে এই পর্যন্ত। কাছে-পিঠে স্কুল নেই—শহরের স্কুলে ভর্তি করে দিতেও বাবা ভরসা পাচ্ছে না। যেন ভাইটা দূরের রাস্তা চিনে ফেললে আর বাড়ি ফিরতে চাইবে না। ওর ওপর বাবার ভরসা কম। যেন বাবার আপ্তবাক্য বড়টা আগে মানুষ হোক, পরে ছোটটার কথা ভাবা যাবে।

আসলে আমার মনে হয়, বাবা ধরে নিয়েছেন, পিলুর যে বিদ্যা-বুদ্ধি ওতে করে যজন-যাজনের কাজটা ভালই চলে যাবে। সবাই চাকরি-বাকরি খুঁজলে পৈতৃক ধারাটা রক্ষা করবে কে! ধর্ম নিয়ে চিন্তা-ভাবনা বাবার বড় প্রবল। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে পুজো-আর্চার লোক না থাকলে গেরস্থের মঙ্গল হবে কি করে। ফলে পিলু যা পড়ছে ওতেই বাবা খুশি। বাড়ির গৃহদেবতার পূজা এখন পিলু বেশ নিপুণভাবেই করতে পারে। উপনয়ন দেশেই হয়ে গেছিল বলে রক্ষা। বাবা পিলুকে তিনবেলা আহ্নিক পাঠেরও অভ্যাস করিয়েছেন। মানুষ ধর্মবিমুখ হয়ে উঠেছে। বড়টারও ঈশ্বরপ্রীতির অভাব, মেজটাকে আর তিনি বোধহয় আলগা করে দিতে সাহস পাচ্ছেন না।

মাঝে এক রোববারে বাড়ি গিয়ে টের পেয়েছিলাম, পিলুর বড় অভিমান হয়েছে! সে দাদাকে দেখে আগের মতো কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেনি? সে গম্ভীর মুখে আমাদের খোঁড়া গরুটাকে নিয়ে মাঠে চলে গেল। বাড়ি গেলে পিলু আমাকে অজস্র খবর দেয়। মা-বাবা কথা বললে রেগে যায় তখন। দাদাকে

জরুরী খবর দেবার সময় বাবার সব প্রশ্নই তার কাছে অর্থহীন। মা'র মুখের উপর কথা বলার অভ্যাস সেই কবে থেকে। মা কিছু বললেই তার স্বভাব বলা, তুমি চুপ করতো মা। দাদা বুঝলি, ল্যাংরা বিবির হাতাতে সুখন্ত ছিপ ফেলে এত বড় মাছ তুলেছে। বলে সে তার দু-হাত প্রসারিত করে বলত, আমিও ধরব। রাজবাড়ির পেয়াদাকে বলেছি, ওকে একটা টিয়ার বাচ্চা দেব। ও রাজি। তারপর সে কবে হোতার সাঁকোর নিচ থেকে বড় একটা বেলে মাছ ধরেছিল, কবে মবমী বুড়ির খবর নিয়ে ফেরার সময় দুটো ঝুনো নারকেল পেয়েছিল এবং তালের শাঁস কাটতে গিয়ে হাত জখম করেছিল এই খবর। পিলু নাকি নিবারণ দাসের দোকানে দু' সের পাটও বিক্রি করেছে। সে এক ঠোঙা ভর্তি লেড়ে বিস্কুট এনে সবাইকে খাইয়েছে। যত সামান্য ঘটনাই হোক, তার কাছে সবই বড় খবর। সে এও জানিয়েছিল, চরু রান্না করতে শিখে গেছে। বাবা তাকে বলেছে, নিবারণ দাসের কালীপূজার তন্ত্রধার হবে সে। তারপর তার সেই বনভূমির খবর। সেখানে প্রতিটি গাছপালার সঙ্গে কথা বলে। পাখি, কাঠবিড়ালীর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব। কোন্ জঙ্গলে কটা বিষধর সাপ বাস করে তাও তার জানা, পরিত্যক্ত ইটের ভাটায় একটা সাপের মাথায় সিঁদুরের কৌটা দেখেছে, কালো গুখখোরের একটার লেজ কাটা, কোন এক হাড়গিলে পাখির ডিম খেয়ে ফেলেছে দুটো খেত গুখখুর—দিনমান তার দাদার সঙ্গে এমনই সব খবর দিয়ে যাওয়া। সেদিন ওকে না খাইয়ে পাঠালে আরও দু-চারবার এসে দাদা কেমন আছে জেনে যেত। দাদার স্টুডেন্টদের সঙ্গে যে সামান্য অবস্থানেই সখ্যতা জন্মে গেছিল, তা আরও প্রগাঢ় হ'ত। এমন দাদাটার উপর তার অভিমান হওয়া খুবই স্বাভাবিক। স্বার্থপর ভাবতেই পারে।

সেদিন বেশিক্ষণ বাড়ি থাকতে পারেনি। বেলায় বেলায় ফিরতে হয়। বন-জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একা ফিরতে ভয় করে। ফেরার সময় পিলুর সঙ্গে দেখাই হয়নি। মনটা কেমন খুঁতখুঁত করছিল। কালীবাড়িতে ফিরে যাবার সময় ভাইটার সঙ্গে দেখা হবে না ভাবতেই কষ্ট হচ্ছিল। গরু নিয়ে মাঠে কী করছে? ডাকাডাকি করেও সাড়া পাইনি। ফিরে আসার পর মনে হয়েছিল ইচ্ছে করেই সে লুকিয়ে আছে। বাড়ি থেকে দাদাটা চলে না গেলে সে ফিরবে না।

শীতের বিকেল। আমি বাড়ি যাচ্ছি। আজ বাড়িতে রাতে থাকব। বেশি দূর না অথচ কদিন মা বাবা ভাইবোনদের দেখতে না পেলে কেমন মনমরা হয়ে যাই।

আমার এই বিষণ্ণতা সবার আগে টের পায় লক্ষ্মী, রাতে হয়ত বিছানা করে দিচ্ছে। মশারি টাঙাচ্ছে। আর ফাঁকে ফাঁকে আমাকে দেখছে। কখনও বলছে বাবাঠাকুর আজ মা কালীর থানে মুতে দিয়েছে।

বাবাঠাকুরের সম্পর্কে আগের মতো ভীতি আর আমার নেই। তিনি মন্দিরেই সারাদিন পড়ে থাকেন। নেংটি পরনে। নেপালী বুড়োর মতো দেখতে। রঙ ফর্সা। ধবধবে। কত বয়স কেউ জানে না। থুতনিতে গুণলে গোটা তিনচার দাড়ি। পুজো দেবার সময় দেবীর প্রতি পেছন ফিরে বসে থাকেন। আর হরদম দেবীর সঙ্গে বচসা, কখনও ছেলেমানুষের মতো কান্না, কখনও হাতে মণ্ডা নিয়ে দেবীর জিভে ঠেসে দেওয়া, খা মাগী খা, আর ঢং দেখাস না। বাবাঠাকুরের কৃপা আছে আমার প্রতি। ক্ষণে ক্ষণে মন্দির থেকে হাঁক আসে, মাস্টার। হাঁক এলে কথা নেই, ছুটে যেতে হবে। তিনি আমাকে দাঁড় করিয়ে হাতে মণ্ডা দেবেন, কখনও কুমারসম্ভব আউড়ে যাবেন, আবার কখনও জিভ ভেংচাবেন। আবার হাঁক বদরি। সঙ্গে সঙ্গে বদরিদা হাজির। বদরিদা থানের সেবাইত তখন কে বলবে। ডাকবেন, বৌমা। হাজির। সব হাজির হলে শীতের রাতেই সবাইকে নিয়ে রওনা। তিনি গঙ্গাস্নানে যাচ্ছেন। কার হিম্মত আছে মুখের উপর বাবাঠাকুরকে কোন প্রশ্ন করে। সেই বাবাঠাকুর দেবীর মাথায় মুতে দিয়েছে। কোন বড় খবর না আমার কাছে। সকালে মন্দিরের সামনে সারবন্দী গাড়ি দেখলেই বোঝা যায় মানুষটার কোথায় একটা বড় রকমের মাহাত্ম্য আছে। হাতে কঞ্চি নিয়ে তাড়া করছেন সব ক'টা ধনাঢ্য পরিবারকে। আমার তখন কেমন ভারি মজা লাগে। আমি আশ্রিত জেনে বাবাঠাকুর আমার প্রতি অন্যরকম। কখনও তিনি এমন ব্যবহার করেন যে যেন ইয়ার-দোস্ত। আমার তখন ভারি লজ্জা লাগে।

কথার সাড়া না দিলে কখনও লক্ষ্মী বলেছে, মাস্টার তোমার মন ভাল না। ভাল না থাকলে পড়ায় মন বসবে কী করে। বাড়ি থেকে ঘুরে এস।

বাবাঠাকুর অন্তর্যামী। তিনি যা টের পান না, লক্ষ্মী তা কত সহজে ধরতে পারে। সব সময় ভয় বাড়ির কার না কিছু আবার হল। ভয় বেশি পিলুটার জন্য। যা স্বভাবের ছেলে। জঙ্গলটায় সাপখোপের বড় উপদ্রব। শীতকাল বলে সে ভয়টা কম। তবু সে যেমন একখানা ছেলে—কোথায় কি ধরতে গিয়ে কার গলা চেপে ধরবে—ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মনে হচ্ছিল কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছাব। মাঠ পার হয়ে নবমী বুড়ির বনটায় পড়েছি। আগে বনটাতে ঢুকলেই গা ছমছম করত। পাশে মুসলমানদের কবরভূমি। কত মানুষের হাড়-

কঙ্কাল না জানি মাটিতে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে। এ-সময় মৃত্যুভাবনা আমাকে কিছুটা কাতর করে। কিন্তু বনটার ভেতর ঢুকে গেলে আর ভয় থাকে না। নবমী বুড়ি এই বনটায় থাকে। সে আমাকে দাদাঠাকুর ডাকে।

এখানে সব গাছই বড় বেশি লম্বা এবং প্রাচীন। দেবদারু গাছের জঙ্গল। কোথাও বড় বড় শিশুগাছ.ডালপালা মেলে পথটাকে ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছে। বড় সুন্দর পথ। কোনো বালকের পক্ষে এমন পথ ধরে হেঁটে যাওয়া বড় অভিজ্ঞতার বিষয়। বার বার পথটা অতিক্রম করে দেখেছি, সে প্রতিবার নতুন হয়ে দেখা দেয়। পায়ের নিচে ঝরে পড়া পাতার খসখস শব্দ। ঝিঁঝি পোকার ডাক। কান পাতলে গভীরে আরও সব শব্দমালা উঠে আসে। কখনও কখনও থমকে দাঁড়িয়ে যাই। আশ্চর্য সব পাখির ডাক শুনি, ব্যাঙের ক্লপ ক্লপ শব্দ। কখনও অদূরে কাঠ কাটার একটানা বিচিত্র শব্দতরঙ্গ—সব মিলে এই বনভূমিতে বেঁচে থাকাটাকে রোমাঞ্চকর মনে হয়। এই বনভূমির এক পাশে আমরা যত বড় হয়ে উঠছি ততই জায়গাটার আকর্ষণে পড়ে যাচ্ছি।

বাড়ি ফিরে দেখলাম ঠিক পিলু বাড়ি নেই। মা কল থেকে জল আনতে গেছে। বাবা গেছেন নিবারণ দাসের বাড়ি। মায়া বলল, জানিস দাদা নিবারণ দাসের মা-টা না মরে গেছে।

ছোট ভাইটা আমাকে দেখেই দৌড়ে এসে হাঁটু জড়িয়ে ধরল। কোলে উঠতে চায়। ওকে কোলে তুলে নিলে দেখলাম রাস্তায় ছুটে গেছে মায়া। আমাদের বাড়িটা পার হয়ে কিছুদূরে আরও দু-তিনটে বাড়ি হচ্ছে। লোকজনও এসে গেছে। এরাই প্রথম আমাদের প্রতিবেশী এখানে। মায়ার সঙ্গে কারো কারো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। ভাইটাকে আমায় জিম্মায় দিয়ে সে যেন কিছুটা হাল্কা হয়ে গেছে। রাস্তায় কি করে যে ওর সমবয়সী আরও দুটো মেয়ে জুটে গেল। ওরা এক্কাদোক্কা খেলছে। পাড়ার দুটো মেয়েই বোধহয় আমার সম্পর্কে মায়াকে প্রশ্ন করছিল। খেলার চেয়ে আমাকে দেখার ওদের বেশি আগ্রহ। এ-সময় মায়া যে বড় অহংকারী হয়ে উঠবে জানা কথা। তার দাদাটা কলেজে পড়ে—কত বড় কথা।

মায়া ওর দু'জন সঙ্গীর সঙ্গে খেলছিল। দাদা বাড়ি এলে সবাই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মায়ার লাফানো, ছুটে যাওয়া এবং ঘুরে ফিরে গানের সুরে ছড়া কাটা সবটাই আজ একটু বেশি বেশি হবে। আমি বাড়ি ফিরলে মায়া পিলু কীভাবে যে সেটা প্রকাশ করবে ঠিক ওরা বুঝে উঠতে পারে না। যেমন মায়া এখন ছড়া কাটছে—উলু উলু মাদারের ফুল। বর এসেছে কতদূর, বর এসেছে বাঘনাপাড়া,

ওলো বউ রান্না চড়া। এ-সব কথার সঠিক অর্থটা মায়া হয়তো ভাল করে বোঝেই না—কিন্তু আমার কাছে এই ছন্দমালা, নতুন এক জগৎ তৈরি করে দেয়। নিরিবিলি আমি গোয়ালঘরের ধারে বকনা বাছুরটার পাশে দাঁড়িয়ে থাকি। ভাইকে কোলে নিয়ে বাছুরটাকে আদর করি। মাকে দেখতে পাই কলসী কাঁখে ফিরছে পুলিশ ক্যাম্প থেকে। মায়া তার আগেই খবরটা দিতে ছুটে গেছে। এবং বুঝতে পারি মার জল নিয়ে ফেরার ছন্দ আরও দ্রুত হয়ে উঠছে। তাঁর বড় ছেলে বাড়ি এসেছে—এমন সুসংবাদে স্থির থাকতে পারছে না মা।

আমাকে দেখেই মার মুখ ভারি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মার কপালে বড় সিঁদুরের কোঁটা। লাল পেড়ে শাড়ি পরনে। একটা সুতীর চাদর গায়ে। জলে কাঁথের কিছুটা অংশ ভিজে গেছে। চুল খোঁপা বাঁধা। কত চুল। শীতেও মার কপাল ঘামছে। জলের কলসি রেখেই হাঁক-ডাক শুরু করে দিল, মায়া তাড়াতাড়ি কর মা। সাঁজ লাগা। আলো জাল। বাসন পড়ে আছে। পিলু আসে নি। তুই কতক্ষণ।

বললাম, এই ত এলাম। পিলু গেছে কোথায়?

তোর বাবা বাড়ি না থাকলে এত বাড় বাড়ে।

আবার কিছু করল নাকি?

বারান্দার জলচৌকিতে বসে কথাটা বললাম।

দুপুরে বের হয়েছে, এখনও ফেরার নাম নেই। গরুটা কোন্ মাঠে দিয়েছে কে জানে।

দেখে আসব?

কোথায় খুঁজবি।

আসলে মা চায় তার বড় ছেলে বাড়িতেই থাক। ঘোরাঘুরি সহ্য হবে না। মা'র কত স্বপ্ন আমাকে নিয়ে। প্রতিবেশীদের কাছে আমার কথা মা'র মুখে লেগেই থাকে। আমার কাছে এসে পৈঁঠায় পা মেলে বসল মা। বলল, গোপাল কাকের মা তোকে দেখতে চেয়েছে। কাল একবার যাস। মায়া নিয়ে যাবে।

আমাকে আবার দেখার কি হল।

ঠাকুরকর্তার বড় ছেলেকে দেখবে দেখবে করছে।

বাবা বাড়িঘর বানাবার পর সেই কবে থেকেই গাঁয়ের লোক, আত্মীয়স্বজনদের চিঠি লিখে চলেছেন। চলে এস। সুমার একটা বনে মানুষজন ঘরবাড়ি বানিয়ে যাচ্ছে। জমি সস্তা। একশো টাকা দিলে এক বিঘা জমি। অনাবাদী উরাট, মানুষের হাত লাগলে কী না হয়। পাশে পুলিশ ক্যাম্প। পরে বাদশাহী সড়ক।

সড়কটা মুর্শিদাবাদের দিকে চলে গেছে। সেই মুর্শিদাবাদ, নবাব সিরাজ, মীরজাফরের দেশ। কিছু দূরে গেলেই রেল লাইন। পরে শহর। পাশে ভাগীরথী। মা গঙ্গা। মরলেও শান্তি। গঙ্গার পাড়ে দাহ। জীবনের সর্ব সার জননী জাহ্নবী। চাল সবজি সস্তা। চালের মন চোদ্দ পনের টাকা। জলের অভাব নেই। পুলিশ ক্যাম্পে টিউবওয়েল আছে। পুনর্বাসন দপ্তর থেকে শুনতে পাচ্ছি আমাদের ঘরবাড়ির পাশে টিউকল করে দেওয়া হবে। সেই এক কথা, সঙ্গে জল হাওয়া মাটি ঈশ্বর থাকলে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য আর কী লাগে।

গোপাল কর বাবার দেশ বাড়ির যজমান। খুব শৈশবে, একবার কার যেন বিয়ে উপলক্ষে বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। রাত্রিবাস। আর ভালমন্দ খাওয়া। যে-জনই আসুক সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। কেমন আড়ষ্ট হয়ে থাকতাম। জলচৌকিতে বসিয়ে পা ধুইয়ে দেওয়া, পাদোদক খাওয়া, এ-সবের মধ্যে গোপাল করের মা, সংসারের মঙ্গল নিহিত আছে বুঝি ভাবত। আমার তখন প্রাণান্ত। গোপাল করের বাবার বাজারে ছিল বড় মসলাপাতির দোকান। চক মেলানো উঠোন। বড় পুকুর—বড় মাছ আর লক্ষ্মীর কৃপা সর্বত্র। সাদা করাসে নিয়ে বসানো, গুরুদেবের মতো ভক্তি এবং এই করে জীবনে কেবল সম্মান আদায়ের পালা। বাবাই জমি দেখে দিয়েছেন। গোপাল কর লোকজন লাগিয়ে জঙ্গল সাফ করছে। এখানটায় যেই আসে, দু-চারদিন আমাদের বাড়িতে অবস্থান, বাবা তখন খান না-খান, বুঝতে দেন না, অভাব অনটন আছে সংসারে। যে করেই হোক অতিথি সংকারের কোনো ত্রুটি থাকত না।

সুতরাং সেই ছোট্ট ছেলেটি কত বড় হয়েছে দেখার আগ্রহ গোপাল করের মা'র হতেই পারে। আর এই করে নিজের মধ্যে কে যেন আরও বড় একটা সম্ভ্রমবোধ গড়ে দিয়ে যায়। পিলুটা বোঝে না, হা-ভাতের মতো গিললে বৌদি, লক্ষ্মী, এমন কি নটু পুটু পর্যন্ত ভাববে—আমার বাবা সত্যি বড় অভাবী মানুষ।

তখনই মনে হল, পিলুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। গরুটা ছাড়া। গরুটাকে তাড়িয়ে আনছে। দড়ি মাটিতে সেচরাচ্ছে। পিলু হুটহাট করছে। চাদরের তলায় হাত। মা চিৎকার করছে, ওরে পিলু, গরুটা সব সাবাড় করবে। ফুলের গাছগুলির পাশে কঞ্চির বেড়া। সেখানে ডাঁটার চারা বড় হচ্ছে। ঢেঁড়সের বিছন লাগানো। দুটো পটলের লতা বাড়ছে। বাবার সবজির বাগান। যেভাবে গরুটাকে আস্কারা করে দিয়েছে সব মুড়িয়ে খাবে।

মা'র চিৎকারে পিলুর মধ্যে কোন ত্রাসের সঞ্চার হয় না। সে কি সামলাতে ব্যস্ত চাদরের নিচে। অগত্যা আমাকেই ছুটে যেতে হল গরুটাকে ধরতে।

দানের গরু। বাবার আর পিলুর সর্বক্ষণ সেবাযত্নে কে বলবে গরুটার এক সময় অস্থিচর্মসার ছিল।

সেই আদরের গরুটির প্রতি পিলুর অবহেলা দেখেই টের পেয়েছি নির্ঘাত সে অন্য বড় কিছু হাতের কাছে পেয়ে গেছে। আমাকে ছুটে যেতে দেখেই বলল,—দাদারে।

দাদারে এই শব্দ অনেক কিছুর অর্থ বহন করে। আমার সেদিকে এখন খেয়াল নেই। গরুটা বাবার সবজি বাগান আবার নষ্ট না করে দেয়। দিলে বাবা মনঃকষ্টে ভুগবেন। মুখে কিছু বলবেন না। সব কর্মফল ভেবে বাবা হুঁকো খেতে বসবেন। এই সব পরিচিত দৃশ্য থেকে বাড়িটাকে রক্ষা করার জন্য ছুটে গেলাম এবং গরুটার দড়ি ধরে টানতে টানতে যথাস্থানে বেঁধে দিলে, পিলু ফের ডাকল,—দাদারে।

এই ধরনের ডাকে পিলুর কাছে কোন বিস্ময়কর খবর আছে বুঝতে পারি। আগেরবারের এড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টা আর পিলুর মধ্যে নেই। বললাম, গরুটাকে ছেড়ে দিলি, যদি কিছুতে মুখ দিত।

পিলুর যেমন স্বভাব, সে আমার অভিযোগ এতটুকু মন দিয়ে শুনল না। চাদর সামান্য ফাঁক করে সন্তর্পণে কিছু গোপনে দেখাবার চেষ্টা করল। যা দেখলাম, তাতে কোনো প্রাণীর লেজটেজ বলে মনে হল। কাঠবিড়ালী হতে পারে। এর আগে একটা কুকুরছানা, এবং ছাগশিশু নিয়ে বাড়িতে বাবা বেশ অশান্তি করেছিলেন। প্রাণীমাত্রেই বাবার কাছে ঈশ্বরের অংশ। তাকে অযথা কষ্ট দিতে নেই। পিলুর পাল্লায় যে-কোন প্রাণীর জীবন সংশয় হতে পারে, বাবার এমন ধারণা।

বনবাদাড় থেকে আবার কি একটা ধরে আনল কে জানে।

বললাম, ওটা কিরে।

পিলু মুখে আঙুল দিল। অর্থাৎ খুব গোপন। সে চায় না মা'র কানে কিংবা অন্য কেউ শুনতে পাক।

প্রথম হেক্কা সামলাতে পারলে পিলু জানে তার আর ভয় নেই। শোরগোল একদিন দুদিন। পরে বাবা পর্যন্ত খোঁজখবর নেবেন, কেমন আছে তারা।

এ-ভাবে এ-সংসারে এখন জীব বলতে দুটো কুকুর, এক গণ্ডা হাঁস, কিছু কবুতর, বিড়াল গরু বাছুর সব মিলে মানুষের সংসার। যে যাই করুক কারো গায়ে হাত দেবার উপায় নেই। ছাগশিশুটি বংশবৃদ্ধি করে তার একটা আলাদা সংসার বানিয়ে ফেলেছে। এই থেকে এখন সংসারে আয় বৃদ্ধি ঘটছে। জমির পেঁপে

গাছ থেকে, কলা গাছ থেকে যেমন আয় আসে, তেমনি ছ' মাস দশ মাস বাদে এরাও বাবার সংসারে টাকা যোগায়। অথচ নবমীর দেওয়া সেই বাচ্চাটিকে নিয়ে বাবা কী না হম্বিতম্বি করেছিলেন, দেশছাড়া হয়েছি বলে কী মানইজ্জত গেছে। বামুনের বাড়িতে এ-সব অনাচার চলবে না। তারপর এক সকালে দেখা গেল বাবাই কচি কাঁঠালপাতা কেটে ছাগলের বাচ্চাটির রসনা তৃপ্তিতে সাহায্য করছেন। এ-সব জানা আছে বলে বললাম, দেখি না।

তখন শীতের হাওয়া বইছিল। কনকনে ঠাণ্ডা। পিলু কোন রকমে চাদর আর একটু ফাঁক করে যে বস্তুটি দেখাল তাতে তাজ্জব বনে গেলাম। ডাকলাম, মা মা।

মাকে ডাকছিস কেন?

কোথা থেকে ধরলি।

লেংরি বিবির হাতা থেকে।

মা'র কাছে ছুটে গেলাম। মা ঠাকুরঘরে প্রদীপ জ্বালাতে ব্যস্ত। বললাম, দেখ এসে পিলু আবার কী একটা ধরে এনেছে।

আসলে অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না, তবে ওটা যে পিলুর সগোত্র বুঝতে কষ্ট হয়নি। এতদিন সে যা যেখানে পেয়েছে তুলে এনেছে। অভাবী মানুষের সন্তানেরা বুঝি এমনই হয়ে থাকে। বাইরের কুটোগাছটি পর্যন্ত সংসারের জন্য দরকার মনে হয়। পিলু এ সব বিষয়ে খুব সতর্ক। কিন্তু হেন বস্তুটি সংসারে উপদ্রব বাড়াবে শুধু। মা বলল, কী আবার এনেছে।

একটি হনুমানের বাচ্চা ধরে এনেছে।

মায়া শোনামাত্র হু লাফে ঘর থেকে বের হয়ে বলল, কোথায়রে?

মা যেমন করে থাকে, আর্ত গলা—অ মা কী বলছিস তুই। কোথায় পেল।

এস না, দেখ এসে।

বাচ্চাটা পিটপিট করে তাকাচ্ছিল। পিলুর বুকের কাছে খামচে ধরে আছে। যেন শত টানাটানি করলেও ওটাকে তুলে আনা যাবে না।

আর মা আমি মায়া যখন গোয়ালঘরের কাছে পিলুকে খুঁজতে গেলাম তখন দেখি সে নেই। নিমেষে হাওয়া।

পিলু কোথায় গেলি।

দূরের বনঝোপ থেকে উঁকি মেরে বলল, মা আমাকে মারবে না তো।

মা বলল, আগে এস বাড়িতে তারপর দেখছি।

আমি যাব না।

ওটা ওর মা'র কাছে দিয়ে আয়। আর অভিশাপ কুড়াস না বাবা।

পিলু সেখান থেকেই বলল, আমি পালব মা।

পড়াশোনা নেই, ঐ নিয়েই থাক।

আমি ফের ডাকলাম, তুই আয় না। মা দেখবে।

মা'র দেখার আগ্রহ কতটা বুঝতে পারছি না। এ-অঞ্চলটায় হনুমানের বড় উপদ্রব। ধেড়ে সব হনুমান কখনও মানুষকে তাড়া করে। কামড়ে দেয়। পেঁপে, কলা কিংবা মটরশাক যা কিছুই বাবা লাগান না কেন, হনুমানের উৎপাতে কিছু রাখা যায় না। সব সময় উচাটনে থাকতে হয় মাকে, মায়াকে। বাবা বাড়ি থাকলে বাবাকে। কোথায় কী খেল, কী তুলে নিল, সর্বক্ষণ সবার অস্বস্তি। লাউ, কুমড়ো কিছুই রাখা যায় না। একবার পাটের সব কচি ডগা খেয়ে জমি সাফ করে দিয়েছিল। বাবা মাথায় হাত দিয়ে বসেছিলেন। পিলু গুলতি মেরে একবার একটা হনুর পা খোঁড়া করে দিয়েছিল, বাবা এতেও ভীষণ রেগে গিয়েছিলেন। রাম-রাবণের যুদ্ধে হনুমানের কি ভূমিকা ছিল সে প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছিলেন, তোমাকে তাড়াতে বলেছি, খোঁড়া করে দিতে বলিনি। আজ তোমার ভাত নেই। দুপুরে সত্যি পিলুকে সেদিন খেতে দেওয়া হল না। বাবার কাছে এটা পাপের প্রায়শ্চিত্ত। নাহলে ঈশ্বর ক্ষমা করবেন না। তাঁর মেজ পুত্রটিকে। সেই ছেলে একটা হনুমানের বাচ্চা কব্জা করে এনেছে ভাবতেই বাবার হয়তো মাথা গরম হয়ে যাবে। পিলু আগে থাকতেই সংসারের বাবা বাদে সবাইকে সপক্ষে টানতে চায়। নাহলে যেন এই বাচ্চাটা সম্বল করে যে দিকে দু'চোখ যায় সে চলে যাবে।

মা কী ভাবল কে জানে। মেজ পুত্রটির কী খেয়াল হবে শেষ পর্যন্ত ভাবতেই বোধ হয়, ডাকলো, আয়, দেখি, কী করে ধরলি রে!

পিলু বোধ হয় এতক্ষণে আশ্বস্ত হল। সে রাস্তা পার হয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেল। মা হারিকেন নিয়ে এল উঠোনে। পিলু চাদরের তলা থেকে বের করতেই একটা বৃহৎ আকারের গিরগিটির আকারে সেটা মা-র দৃষ্টিগোচর হল।

মা বলল, ছিঃ ছিঃ তোর ঘেন্না-পিত্তি নেই। ছাড়, ছেড়ে দে।

ও আর ছাড়ে। বারান্দায় উঠে জলচৌকিতে বসে বলল, দুটো ধাড়িতে কামড়া-কামড়ি করছিল। মা, হলুদবাটা আছে? সে বাচ্চাটাকে কিছুতেই আর চাদরের নিচ থেকে বের করছে না। ঠাণ্ডা লাগতে পারে, এই আশঙ্কায় বোধ হয় সে আর বেরই করত না। কিন্তু মায়া, ছোট ভাইটা দেখার জন্য হামলে পড়েছে। আর তখনই মনে হল জামায় ক'ফোঁটা রক্তের দাগ।

—ও মা রক্ত। মায়া হতবাক হয়ে কথাটা বলল।

পিলু বলল, মারব। মারব বলছি। কোথায় রক্ত।

এই যে।

মা আমি ঝুঁকে দেখলাম। খুব বেশী রক্তপাত না হলে এভাবে জামায় রক্তের দাগ লাগে না। পিলুর মুখে কোন বিকৃতি নেই। মা কিছুটা হতভম্ব। আমি বললাম, দেখি দেখি। বলে জামা টানাটানি করতে গেলে পিলু বলল, কামড়ে দিয়েছে। কী করব? বলছি হলুদবাটা আছে কিনা। সে তিরিক্ষি মেজাজে জামা জোরজার করে নামিয়ে নিলে মা'র যেন হুঁশ হল। ততক্ষণে আমরা ক্ষতস্থানটা দেখে ফেলেছি। এই নিয়ে সে কেমন নির্বিকারভাবে বসে আছে। হনুমান দেখা আমাদের মাথায় উঠে গেল। মা চুন-হলুদ গরম করতে গিয়ে শুরু করে দিয়েছে রামায়ণ পাঠ। আমার মরণ হয় না কেন? ভগবান আমাকে নেয় না কেন। তোরা মরতে পারিস না কেন! হাড় জুড়ায়, এত জ্বালা কার সহ্য হয়।

পিলুর এসব কথায় ভ্রূক্ষেপ নেই। সে বারান্দায় কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। তার মনোযোগ অন্যদিকে। একটা কাপড়ের পাড় হাতের কাছে পেয়ে গেল। কিভাবে বাচ্চাটাকে কব্জা করছে—কি ধরনের অভিযানে বের হলে একটা হনুমানের বাচ্চা সংগ্রহ করা যায়, তার বিস্তারিত গল্প আমাকে ও মায়াকে শুনিয়ে যাচ্ছে। কোথায় তারিফ করবে তা না, কেবল পেছনে লাগবে। বাচ্চাটা বড় হলে এমন ট্রেনিং দেবে, একটা হনু আর বাড়ি আসতে সাহস পাবে না। কুকুরের মতো। কুকুর চোর ছ্যাঁচোড় তাড়া করে—কুকুরের মতো জাতিশত্রু যেমন থাকে না, হনুর বেলাতেও তাই হবে। ঘর-বাড়ি রক্ষার্থেই সে এটা করেছে। মা কেন যে বোঝে না।

পিলুর এমন ধারণায় আমিও বিশ্বাসী হয়ে উঠলাম। আমাদের পোষা কুকুরটার জন্য কেউ বাড়ি ঢুকতে সাহস পায় না। এখন বাড়ি নেই। ঠিক বাবার সঙ্গে ভ্রমণে বের হয়েছে। পিলুই বলেছে যেন, বাবা কোথায় যায় দেখে রেখ। কি করে দেখে রেখ। কারণ বাবার মতো বাউণ্ডুলে মানুষের খোঁজখবর না রাখলে কোথায় আবার উধাও হবেন কে জানে। বাবার ঐ এক স্বভাব। শহরে গেল, মানুকাকা বলল, একটা ফর্দ করে দিতে হবে ধনদাদা। কার ফর্দ, কিসের ফর্দ এবং কোন যজমান, কি নাম, জাত কি, এসব জানাজানির জন্য সেদিন হয়তো ফিরলেনই না। ফর্দ করে দিয়ে, শ্রাদ্ধ থাকলে, কি শুভকাজ থাকলে সব নিষ্পন্ন করে তাঁর বাড়ি ফেরা। বাড়িতে একটা খবর যে দিতে হয়, বাবার ধারণায় এটা

আসে না। কুকুরটা বাড়ি ফিরে এলে, চুপচাপ এবং শান্ত থাকলে বুঝতে হবে, বাবা কোন কাজের খবর পেয়ে কোথাও গেছে। আর ডাকাডাকি করলে ধন্দ আসবে মনে—তখন পিলুর কাজ বাবাকে খুঁজতে বের হওয়া। দাসের আড়তে, বাজারে, চন্দর দোকানে, অথবা মানিক সরকারের কুঠিতে খোঁজ—বাবা এয়েছিলেন? না ত'। আড়তে খোঁজ, বাবা এয়েছিলেন? হ্যাঁ এয়েছিল। মাকে বলবে, তিনি কাল সকালে ফিরবেন। গেছে আউসগ্রামে। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আছে। বাড়ি এসে পিলুর খবর দেওয়া—মা, বাবা আউসগ্রামে গেছে। ওখানে শান্তি-স্বস্ত্যয়ন আছে। মা তখন বুঝতে পারে পিলুর আনা সেই বাচ্চা কুকুরটা এত বড় না হলে কে নজর রাখত এই বাউণ্ডুলে মানুষটার প্রতি। ঘরে তিষ্ঠতেই চায় না। পিলুর ওপর মা'র তখন মায়া বেড়ে যায়। বড় বিবেচক। বাপ যার বাউণ্ডুলে তার এমন সুপুত্র থাকবে একজন মা হয়তো আশাই করতে পারেনি। এখন তবু কমেছে। সেই দেশ থেকে আসার পর, বাবা কতবার যে একদিনের জন্য বের হচ্ছি বলে মাসাধিককাল ঘরে ফিরত না। ফিরলে মা'র অভিযোগ, আমিও যাব বের হয়ে। তুমি পার, আমি পারি না। বাবা তখন কাঁচুমাচু মুখে বলতেন, আরে বোঝ না কেন, এ ক'দিন যে দেশ-বাড়ির মানুষজন খুঁজে বেরিয়েছি, তা কি এমনি এমনি। ঐ তো বামন্দির প্রফুল্ল সরকার নবদ্বীপে বাড়ি করেছে। আমাকে দেখে কি খুশি। ছাড়তেই চায় না। কর্তা আর ক'টা দিন থেকে যান। ভাল-মন্দ খাওয়া। দেশ থেকে এসে তো সব ভুলেই গেছি।

মা'র উত্তর—তাই কর। সংসারটা উচ্ছন্নে যাক। এত লম্বা জিভ হলে হয়। বাড়ির কথা একবার ভাবলে না।

ঐ তো ধনবৌ, তোমার বুদ্ধি কম। আমি খাই মানে তো একটা লোকের খাওয়া বেঁচে যায় সংসারে। দুর্দিনে একটা মানুষের আহার বেঁচে গেলে কত সুবিধা বল।

এখন আর বাবার এতটা বেড়িয়ে বেড়ানো নেই। ঘরবাড়ি হয়ে যাওয়ায় থিতু হয়েছেন কিছুটা। তবু পিলুর সংশয় থাকে বলে কুকুরটাকে বাবার নিরাপত্তার খাতিরে রেখে দিয়েছে। বাবা আর না বলে না কয়ে ভেগে যেতে পারবে না। যার বাবা এমন পেটুক তার সন্তানেরা আর কতটা ভাল হতে পারে। পিলুকে কোন আশায় কালীবাড়ির সুস্বাদু খাবারের খোঁজ দেব। সেতো তবে আর বাড়িমুখোই হতে চাইবে না। লক্ষ্মী বোঝে না। বৌদিও বলে দিয়েছে তোমার ভাইকে নিয়ে আসবে। মা'র প্রসাদ নেবে। একবার খেতে পেলে—সরু সুঘ্রাণ আতপ চালের ভাত, হাঁকা তেলে বেগুন ভাজা—ভাজা সোনা মুগের ডাল,

পাঁঠার মেটে চচ্চড়ি, মাংস, চাটনি, মণ্ডা, সন্দেশ, যেখানে প্রসাদে এই বরাদ্দ এবং তার আলাদা স্বাদ—পিলু কোন মুখে বাড়ি আসবে। দেবস্থানে কত উপরি লোক পড়ে থাকে, প্রসাদ পায়, সেও না হয়—আর সেতো নটু পুটুর মাস্টার-মশাইর ভাই। তার ইজ্জত আলাদা। বলা যায় না, একবার ছাড়পত্র পেয়ে গেলে এবং পিলুর মা সংসারী বুদ্ধি, বৌদি হয়তো বলেই বসবেন, মাস্টার, তোমার ভাইটিও এখানে থাক। দেবস্থানে আহার নয়, প্রসাদ। কি যেন কথা আছে, যে খায় চিনি, যোগান চিন্তামণি, ভাববার কিছু নেই। পিলু কালীবাড়িতে উঠে এলে দেখা যাবে সেই এক নম্বর মানুষ হয়ে গেছে। আর বাবাঠাকুরের নজরে পড়ে গেলে তো হয়েই গেল। পিলুকে রাতারাতি আর এক বামাক্ষ্যাপা না বানিয়ে দেয়। এতসব ভেবে পিলুকে সবার আড়ালে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আসলে আমার সেই মানসম্মান বোধ—বড় হতে হতে যে আমাকে ক্রমে গ্রাস করছে। আমার বাবা খেতে ভালবাসেন, আমার ভাই খাবার গন্ধ পেলে আর সেখান থেকে নড়তে চায় না—এসব জানাজানি হলে আমার মানসিক কষ্ট বাড়ে।

মা তখন পিলুর ক্ষতস্থানে চুন-হলুদ বাটা গরম করে লাগাচ্ছে। মায়া ঝুঁকে আছে। ক্ষতস্থানটা দেখে আমার মাথা ঘুরছে। আর পিলু সেই হনুর গলায় পাড় বেঁধে দিচ্ছে। বাচ্চাটা লাফাচ্ছে। চিঁচিঁ করে ডাকছে। বাঁশ বেয়ে উপরে উঠছে আবার লাফিয়ে পিলুর ঘাড়ে পড়ছে। সামনে হারিকেন ছিল। সেটাতে আবার না লাফিয়ে পড়ে, ভয়ে হারিকেনটা সরিয়ে রাখতেই দেখি, একটি লম্বা ছায়া বারান্দায় উঠে আসছে। বাবা। বাবা বারান্দায় আস্ত একটা হনুর বাচ্চা দেখে বোধহয় কিঞ্চিৎ বিভ্রমে পড়ে গেছিলেন। তারপর মগজের মধ্যে বিষয়টা একটু খেলে যেতেই বললেন, এটা কি পশুশালা?

বাবার গগনভেদী প্রশ্নে আমরা সবাই তাকালাম।

এটা কি পশুশালা?

পিলু আমাদের দিকে তাকাচ্ছে।

জবাব দিচ্ছ না কেন? যেন যারা হনুটাকে ঘিরে বসেছিল সবার কাছে প্রশ্নটা।

মা যেন পাত্তাই দিচ্ছে না।—দাঁড়া, লাগানো হয়নি। লাগছে? লাগবে না। তুই মানুষ, না অপদেবতা।

বাবার দিকে আমি ভয়ে তাকাচ্ছি না। পিলু ঘাড় গোঁজ করে বসে আছে। হনুর বাচ্চাটা বাবাকে দেখেই পিলুর জামার নিচে লুকিয়ে পড়েছে। বাচ্চাটা পিলুর জামার নিচটা কি করে যে নিরাপদ জায়গা ভাবছে বোঝা যাচ্ছে না।

বাবার হুংকার, বাড়িটা আমার, না তোমাদের ?

মা পিলুকে বলল, নে এবারে ঘরে নিয়ে বেঁধে রাখ। হাত-পা ধুয়ে পড়তে বোস।

পিলুর সাহস এখন অনেক। সে মাতৃআজ্ঞা পালন করছে। মা সহায় থাকলে সংসারে তার ভাবনা কম! এ কথার পর বাবাও কেমন নিজের অধিকার সম্পর্কে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মতো বললেন, পিলু বাবা একটু তামাক সাজা।

বাবা বারান্দার এককোণার আসন পেতে বসলেন। দেখে মনে হয় সংসারে এ-মুহূর্তে তিনি খুবই আলগা মানুষ। যেন কারো সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যাঁর স্ত্রী যা দেবী সর্বভূতেষু, তাঁর আর বেশি আশা করা ঠিক না। হনুর বাচ্চাটা সংসারে কি উপকারে আসতে পারে—পিলু কেন যে ওটাকে ধরে আনল! প্রাণিকুলের প্রতি পিলুর এই অহরহ নৃশংস ব্যবহার বাবাকে বোধহয় আপৎকালে পীড়া দিচ্ছে। হুঁকাটি এগিয়ে দিলে, বাবা বললেন, দেখছিস তো কী সুখে আছি ?

আমি বাড়ি থাকি না, আমি কলেজে পড়ি, বাবা আমাকে মাঝে মাঝে বিদ্বান, বুদ্ধিমান ভেবে থাকেন। আমার কাছে তাঁর এই অভিযোগ কাকে লক্ষ্য করে বুঝতে কষ্ট হয় না। বললাম, পিলুকে হনুতে কামড়েছে।

কামড়েছে! বলেই লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন। কোথায় কোথায়, দেখি। পিলু এসময় বাবার সহানুভূতি কব্জা করার জন্য দৌড়ে কাছে গেল। জামা তুলে দেখাল। বাবা হারিকেনের আলোতে ক্ষতস্থানটা দেখলেন। তারপর পিলুর নাড়ি দেখলেন। জ্বর জ্বর বোধ হচ্ছে না ত' ?

না।

বমি বমি ভাব ?

না।

মাথা ধরেছে ?

না।

ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে ?

হ্যাঁ।

কী খেতে ইচ্ছে হচ্ছে ?

ভাত, মাংস।

ভাল। ভয় নেই। দেখি তোমার হনু কি বলে ?

ও তো কামড়ায়নি ?

তবে কে ?

ওর খাড়িটা।

বাবার এত প্রশ্ন মার কাছে বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছিল। পিলু বাবার এত প্রশ্নে কিছুটা সম্মতি আদায় করতে পেরেছে ভেবে খুব খুশির সঙ্গে বলল, আর হনু আমাদের ফল-পাকুড় খেতে পারবে না বাবা।

মায়া বলল, তুমি যে বলেছিলে বাবা একটা কমলালেবুর গাছ লাগাবে।

বাড়িতে বাবা সব রকমের ফল-পাকুড়ের গাছ লাগিয়েছেন। এমন কি একটা আঙুরলতা পর্যন্ত। হলে কি হবে, হনুতে নষ্ট করে দিয়ে যায় বলে বাবার অন্য সব গাছ লাগানোর পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। বাবা বলেছিলেন, সবই তো হল, কেবল একটা কমলালেবুর গাছ, আখরোটের গাছ, আপেলের গাছ বাকি। যা মাটি, একেবারে সাক্ষাৎ জননী। যা লাগাবে তাই হবে। কতকালের পতিত জমি, জননী জন্মভূমি।

এবারে হনুটা আসায় মায়ার মনে হয়েছে আর সমস্যা নেই, হনুতে নষ্ট করবে না, বাবা ইচ্ছে করলেই কমলালেবু এবং আপেলের গাছ পুঁতে দিতে পারে। জল, হাওয়া, মাটি—বড় কথা নয়, বাবার লাগানোটাই বড় কথা। বাবার হাতে গাছ বড় ফলবতী হয়। আমাদের ধারণা এমন এবং মাও বাবার এই সাফল্য সম্পর্কে কোনদিন ঠেস দিয়ে কথা বলেনি। বাবা বললেন, একবার আন দেখি, রামের দোসরকে।

পিলু সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো হনুটাকে বাবার সামনে ছেড়ে দিল। বেশ লম্ফঝম্প করছে। পিলুর মনে হচ্ছিল, যেন নাচ দেখাচ্ছে বাবাকে। তার মনে হল, বাবা ঠিক আগের মতো তার কাজের বুদ্ধিমত্তা অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। সে একটু বেশি খুশি হয়ে বলে ফেলল, বাবা ঘুঙুর এনে দেবে ?

ঘুঙুর ?

ঘুঙুর। মানে পায়ে বেঁধে দেব।

কবে শুনব, তুমি একটা ভালুকের বাচ্চা ধরে নিয়ে এসেছ। তার জন্য চাই ডুগডুগি। তোমার জননীটি তোমার মাথা খাচ্ছে। তোমার এই দোসরটি সংসারে উপদ্রবের শামিল। এটা তোমার জননীর বোঝা উচিত।

পিলু বলল, মা শুনছ ?

তোমার মাকে বলিনি ত' ? তোমাকে বলেছি। তাঁকে আবার ডাকছ কেন ?

পিলু বলল, ছেড়ে দেব।

তোমার মাকে জিজ্ঞেস কর। আর শোন, বলবে—আমি কেবল আড্ডা দিইনি।

নিবারণ দাসের মার বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ হবে। তার ফর্দ, তার বৃষকাঠ, তার বৃষ কেমন হবে সব জায় করে দিতে হল। দুপুরে বের হয়েছি, ফিরেছি রাত করে। কাজের মানুষের এটা হয়। সব সময় ঘরে এসে মা মনসা দেখলে কারো ভাল লাগে না।

মা রান্নাঘরে। ভাত বসিয়ে কিছু কাঠকুটো আনতে গেছে গোয়ালের চাল থেকে। মা শুনে গেল। কথা বলল না। মা কাঠকুটো নিয়ে গেল। কথা বলল না। এটা আমার ভাল লাগছিল না। হনুর বাচ্চাটাকে নিয়ে প্রথমে মা'র আর্তনাদ, পরে নিজের সংসারে আর একজন অতিথি ভেবে চুপচাপ, বাবা প্রথমে নারাজ, পরে মার মর্জির কথা ভেবে চুপচাপ—এখন দু'জনের একজন যে কথা বলবে, অন্যজন তার বিপরীত। মা যদি বলে এক্ষুনি বিদায় কর, বাবা বলবে, আহা ছেলেমানুষ ধরে এনেছে, থাক না। আমি না হয় একজোড়া ঘুঙুর এনেই দেব।

মা বলবে, না আমার এত জ্বালা সহ্য হয় না। ছেলের জন্য আমি কথা শুনব কেন!

বাবা বলবেন, তুমি জননী। তুমি শুনবে না তো কে শুনবে। মার তখন গলায় ধার উঠবে। রাখ তোমার মিষ্টি মিষ্টি কথা। ওতে চিঁড়ে ভিজবে না।

চিঁড়ে না ভিজুক, মুড়ি ভিজুক।

বাবার এমন কথায় মা আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। আমাদের ডেকে বলবে, শোনত তোর বাবা ঠাট্টা করছে। আমাকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা! দিন-রাত খেটে মরি, কেউ কুটোগাছটি নাড় না। যার যেখানে খুশি যাও। যখন খুশি ফের। একটা তো বাড়ির বাইরে বার হল, আর একটা সারাদিন বন-বাদাড়ে, আমি কি বাড়ির ঝি-বাঁদী। আমাকে ঠেস দিয়ে কথা। তারপর বাবা হয়ত বলবেন, চণ্ডীপাঠ শুরু হয়ে গেল রে।

মার তখন আরও উত্তপ্ত ভাব। বাবা মাকে রাগিয়ে দিয়ে যে মজা উপভোগ করেন, আমরা তা পারি না। আমার মনে হয় কেবল, মা বাবা কেন যে এত ঝগড়া করে। কোথাও গেলে ফিরতে একটু দেরি হতেই পারে। তা না, কেন দেরি। কেন বাড়িঘরের কথা মনে থাকে না। আমরা তোমার কেউ না। দিনকাল খারাপ, কার মনে কি আছে কে জানে। কিছু হলে সব তো জলে ভাসবে।

অবশ্য এখনও মা চুপচাপ। কুরুক্ষেত্র শুরু হবার সূচনাপর্বের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। আসলে মা কি আজ হনুর বাচ্চাটা আসায় প্রসন্ন। তখনই বোঝা যায়

স্নেহ কত নিম্নগামী। ছোট ভাইটা এখন হাঁটতে পারে না শুধু দৌড়াতেও পারে। হনুর বাচ্চাটা অবলা জীব, যেমন কুকুরের বেলায় কিংবা সেই ছাগশিশু —মার সেবা যত্নে ওরা বড় বেশি বাড় বাড়ে। আমরা খাই না-খাই, ওদের খাওয়া নিয়ে মার বড় চিন্তা। মার কাছে এরা আমাদের চেয়েও বড় কাছের। মা বলবে, সবাই উড়ে যাবে। এরা যায় না। কুকুরটা তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

ঠিক এ-সময়ে মায়ার আবার বাবাকে তাড়া, অ বাবা, বাবাগো, কমলালেবুর গাছ একটা লাগাও না।

সব হবে। হয়ে তো যাচ্ছে। কী বাকি থাকল।

বাবার এটা বাড়িঘর করার পর একটা আপ্তবাক্য। মাকে শুনিয়ে বলা। তোমার মার তো কেবল নাই নাই ভাব। সংসারে কার না অভাব থাকে। লাখপতিরও থাকে। তোমার বাবার তো থাকবেই।

তখনই মার গলা পাওয়া গেল। এই আপ্তবাক্য সার করেই থাক। বাবার আগের আপ্তবাক্য ছিল, সে কি দেশ ছিল মশাই। খাওয়ার ভাবনা নেই। শোয়ার ভাবনা নেই। দ্বিতীয় আপ্তবাক্য—রণসাজে আছি। রণসাজ মানে এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশনে। এক পোড়াবাড়ি থেকে আর এক পোড়াবাড়ি। কখন কোনো আত্মীয়ের আশ্রয়ে। জমি-জায়গা দেখার নাম করে উধাও। হাতের সম্বল শেষ। একটু জায়গা নেই ঘরবাড়ি বানাবার। হয়তো গোটা দিন নিরম্বুই কেটে গেল, অভাবের জ্বালায় মার গঞ্জনা শুরু হলে, সোজা কথা, রণসাজে আছি। একদম নাই-নাই করবে না। মা অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার কখনও খালি থাকে না। সব হবে। একটু সবুর কর।

শেষে এই বন জঙ্গলে পতিত জমিতে মার শেষ সম্বল অবলম্বন করে উঠে আসা। গৃহদেবতা খুঁজে আনা থেকে ঘরবাড়ি সহ খোঁড়া গরুটা পর্যন্ত আমার কৃতী বাবার কর্মক্ষমতার সাক্ষ্য। সুতরাং মার কথাতে বাবা রুষ্ট হতেই পারেন। দুধ ঘি না হোক, ডাল ভাত সংসারে এখন রোজই হয়। গৃহদেবতার নামে যারা মাসোহারা পাঠায়, তাদের কেউ কেউ ইদানীং টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেওয়ায় অভাবটা আবার জাঁকিয়ে বসেছে। বাবা বলেন, সবারই খরচ বাড়ছে, না পারলে দেবে কোত্থেকে। বাবার ঐ স্বভাব, কোন মানুষের ওপর তাঁর অভিমান নেই। মা বলবে, নির্বোধ হলে এমনই হয়।

আমি নির্বোধ। শুনছিস কী বলছে!

বলব না। যে যা দেবে তাই নেবে। এই তো শ্রাদ্ধ করাবে। সব হবে, শুধু

ঠাকুরের দক্ষিণার বেলায় হাত সরে না। কত বলি এক পয়সা দু পয়সা নেবে না। কি আকাল চারদিকে। এক পয়সা দু পয়সার কোন দাম আছে?
এটা ঠিক, বাবার পুজো-আর্চার বিষয়টা জপতপের মতো। সাধনার মতো। ফললাভে কিঞ্চিৎ নির্মোহ। দক্ষিণা কে কি দিল বড় কথা নয়। নিষ্ঠাই বড় কথা। ধর্মবিমুখ মানুষেরা এই যে এখনও এতটা করছে, এটা যেন বাবার পুণ্যফলে।
পয়সাটা বড় হল, ধর্মাধর্মের কথা ভাবলে না।
আপনে বাঁচলে বাপের নাম। ধর্মটাই তুমি দেখ। সারা জীবন এক ভড়ং। আমরা পুরোহিত বংশ। আমাদের অন্য কোন কাজ সাজে! সাজে না তো বোঝ। বড়টা পরের বাড়িতে, ছোটটা বন-বাদাড়ে—আর দুটো কী হবে কে জানে। মা রান্নাঘরে বসে গজগজ করছিল।
আসলে এ দেশে আসার পর মানুকাকা বাবার দু-দুটো কাজ ঠিক করে খবর পাঠিয়েছিলেন। খাগড়ার বাজারে মল্লিকদের বড় মুর্শিদাবাদী সিল্কের দোকান। দোকানে খদ্দের সামলানোর কাজ। দ্বিতীয় কাজটা দোকানের খাতা লেখা। দুটো খবরেই বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন। মানু কী ভেবেছে, আমি জলে পড়েছি। বংশের একটা মান-ইজ্জত নেই।
সেই এককথা মার। সুযোগ এলেই খোঁটা দেবার স্বভাব। সুযোগ হাতছাড়া করতে মা রাজি না। মান-ইজ্জত! মান-ইজ্জত ধুয়ে জল খাও। এত মান-ইজ্জতের কথা বলছ, বড়টাকে তো বাস কণ্ডাকটার করতে চেয়েছিলে।
বাস কণ্ডাকটার! কে বলেছে বাস কণ্ডাকটার?
বাসে ঘন্টি তবে কে বাজায়? ভাগ্যিস পালিয়েছিল—না'লে বহরমপুর-জঙ্গী-পাইটকাবাড়ি। তোমার মুখে বড় কথা সাজে না!
মানুষ তো ছোট কাজ থেকেই বড় হয়! আলামোহন দাসের নাম শুনেছে কি-না তোর মাকে জিজ্ঞেস করত। বাবা এবার সরাসরি মাকে প্রশ্ন না করে আমাকে কথাটা বললেন।
পিলু বলল, আমি জিজ্ঞেস করে আসব বাবা?
না। তুমি পড়তে বস। রামের দোসরের বেলায় মাতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য, পড়ার বেলায় ওটা হয় না কেন?
অগত্যা বললাম, তোমরা এবার থামবে কি-না বল। এমন করলে এক্ষুণি চলে যাব। আর আসব না। এই কি দিনরাত তোমরা ঝগড়া করবে। আগে না হয় আমরাই ছিলাম বনটায়, এখন তো সব দেশ থেকে খবর দিয়ে আনিয়েছ। কত ভাল আছ চিঠিতে লিখেছ। এই যদি অবস্থা, তবে ওরা কি ভাববে?

তোমার মা এটা বোঝে না। দেয় না, দেয় না করেও তো যজমানরা কম দেয় না। এই যে নিবারণ দাসের বাড়িতে কাজ, তাতে একবেলা তোমার মা বাদে সবার ভোজন। একজনের ভোজনে কত লাগে। ষোড়শে দু-পাঁচ পয়সা করে দক্ষিণা দিলে কত হয়। পুরোহিত দক্ষিণা, ভোজন দক্ষিণা, ভোজ্যদ্রব্য মিলে কত হয়—কাঁচকলা, কাঁচা হলুদ, আলু, বেগুন ভোজ্যপত্রে দিলে সব মিলে কত হয়।

মা আর কোন জবাব দিচ্ছে না। আসলে আজকাল মা আমাকে সমীহ করতে আরম্ভ করেছে। আমি পছন্দ করি না ভেবেই মা নিজ থেকেই রান্নায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কাঠকুটো দিয়ে রান্না। এক হাতে মা বাটনা বাটা সব করে যাচ্ছে। বারান্দা থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম, আগুনের আভায় মার মুখ কেমন রক্তাভ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছে। মা কী কাঁদছে।

বাবাও বোধহয় সেটা লক্ষ্য করেছেন। বাবা সহসা কেমন বড় অস্বস্তিতে পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি উঠে বারান্দা থেকে উঠোনে নামলেন। কেমন জনান্তিকে বলা, কান্নার কী হল। আমি কি কোন রূঢ় কথা বলেছি। মার তখন ফুঁপিয়ে কান্না। আমি বুঝতে পারি, মার কষ্ট আমি পরের বাড়িতে পড়ে আছি। বাবার সাধ্য নেই, আমাকে কাছে রেখে পড়ায়। মার সাধ্য নেই কলেজে যাবার সময় রান্না ভাত আমার সামনে বেড়ে দেয়। কষ্টটা সেখানে। বাবা আর একটু সংসারী হলে মার বোধ হয় এতটা অভিমান থাকত না। বাবার নির্বুদ্ধিতার জন্য বোধ হয় মা আমার ফুঁপিয়ে কাঁদছে। পৃথিবীতে বাবার মতো ভাল মানুষদের বুঝি এমন হয়। আমাকে হঠাৎ তখন বাবা ইশারায় ডাকলেন। কাছে গেলে বললেন, তুমি মার কাছে গিয়ে বস। কথা বল। তাতে কিছুটা হাল্কা বোধ করবে। বলে বাবা অন্ধকারে হাত-পা ধুতে কালীর পুকুরের দিকে হেঁটে গেলেন। সংসারে বাবাকে মনে হচ্ছিল তখন বড় একা। এ সংসারের জন্য মার কান্নাটা আমরা চোখে দেখি। বাবার কান্নাটা কখন কোথায় আমরা সেটা টেরও করতে পারি না। আমার বাবা দেশ-ছাড়া হয়ে কত অসহায়—দিন যত যায় তত বুঝি।

আমাদের এই বনভূমিটায় আগে গাছপালা, জঙ্গল আর কত রকম লতানে গাছে ভর্তি ছিল। বছর তিনেকের মধ্যে কত ফাঁকা হয়ে গেছে। এখন নবমী বুড়ির বনটায় না গেলে বোঝা যায় না এখানে সত্যি কোন গভীর বন থাকতে পারে। বড় বড় আমবাগান, কোথাও মণীন্দ্র কাঁটার ঘন জঙ্গল, বাঁশের বন, কত রকমের সরীসৃপ আর পাখি। খরগোশ টিয়া আর নানা জাতের সাপ। সবই কেমন ক্রমে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এবারে শীতটা যেন আরও বেশি। গাছপালার একটা

ওর থাকে। ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে বলে, মাঠের ওপর দিয়ে শীতের কনকনে হাওয়া সহজেই বাড়িঘরে ঢুকে যেতে পারে।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙলে এটা আজ যেন বেশি টের পেলাম। ঘুম থেকে উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে পিলু অঘোরে ঘুমাচ্ছে। বাবা দু-বার ডেকে গেছেন, মা ডেকেছে, কিন্তু শীতের কাঁথা আমাদের ছাড়তে না চাইলে কী করি। ঘরের ওদিকের মাচানে মায়া কাঁথার ফাঁক দিয়ে হনুর বাচ্চাটা কী করছে দেখছে। পিলু ওর জন্য একটা বস্তা, কিছু ছেঁড়া ন্যাকড়া এবং খড় বিছিয়ে রেখেছিল। সেগুলো এখন সারা মেঝেতে ছড়াছড়ি। সকালে যে মা উঠেই ক্ষেপে যায়নি রক্ষে। ডাকলাম, পিলু ওঠ। এই পিলু, দেখ কাণ্ড হনুটার।

হনুর কথায় ধড়ফড় করে উঠে বসল পিলু। ওর এখন কত কাজ। সে নেমেই হনুটাকে ঘরের খুঁটি থেকে খুলে বারান্দায় বের হয়ে গেল। শীতে কাঁপছে হনুটা। পিলু উঠোনে নেমে গেল। দরজা দিয়ে সব দেখা যায়। কিছু খুঁজছে। রোদ ওঠেনি। রোদ উঠলে সে হয়তো হনুটাকে নিয়ে রোদ পোহাত। তারপরই সাতুর্কা আমগাছটার নীচে ধোঁয়া দেখতে পেলাম। পিলু আগুন জেলেছে।

এই শীতের ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবার এমন জাদুমন্ত্র পিলুরই একমাত্র জানা। গুটি গুটি আমিও উঠে গেলে দেখতে পেলাম, বাবা কালীর পুকুর থেকে স্নান করে ফিরছেন। বাবাকে দেখলে মনেই হবে না, এটা মাঘ মাসের শীতকাল। একজন সৎ ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রাতঃস্নান খুবই দরকার। এতে শরীর প্রফুল্ল থাকে। জরা-ব্যাধি-মৃত্যু কাছে আসতে ভয় পায়। আর ওংকাররসা ব্রহ্মঋষি এমন সব নাভি থেকে তুলে আনা মন্ত্রোচ্চারণে বাবা আমার এখন তদ্‌গতচিত্ত। কিন্তু এত সকালে স্নান কেন? নিবারণ দাসের মার শ্রাদ্ধের কাজ আগামীকাল। হাতে বড় কাজ এলে প্রাতঃস্নানের অভ্যাস আছে বাবার। মার কাছে গুরুত্ব পাবার অথবা আদায় করার এটা মোক্ষম অস্ত্র।

আসলে আমার মনে হয়, বাবা সকালে স্নান করে ভিজা গামছা পরে তারে যে কাপড় মেলে দিচ্ছেন, হুহু কনকনে শীতে বাবা যে এতোটুকু ঘাবড়ে যাচ্ছেন না, পুত্রদের দেখাবার প্রলোভনে, এই দেখ, তোমরা আগুন জেলেছ শীত থেকে আত্মরক্ষার্থে, আর আমি শীতের বুড়িকে কলা দেখিয়ে খালি গায়ে খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেন এটা এক ধরনের কৃচ্ছ্র সাধনার ফল। মার অবশ্য মাঝে মাঝে ইতিমধ্যেই গলা পাওয়া যাচ্ছে। ও মায়া, তোর বাবার কাপড়টা দে। চাদরটা দে। ঠাণ্ডা লাগবে। কিন্তু বাবা কিছুতেই সেদিকে যাচ্ছেন না। ঠাকুরঘরে

ঢুকে কোশাকুশি বের করে দিচ্ছেন। ভিজা গামছা পরেই ফুল তুলছেন। মায়া হাতে চাদর এবং কাপড় নিয়ে বাবার পিছু পিছু ঘুরছে।

মা ঘাট থেকে বাসি বাসন-কোসন মেজে যখন ফিরে এল তখনও বাবা ফুল তুলছে। এত ফুলের কি দরকার বোঝা যাচ্ছে না। কাল রাতে আমার জননী এবং পিতৃদেব উভয়ে বেশ তর্কে মেতে গেছিল। আজ সকালে পিতৃদেব কত ধার্মিক এবং কর্মঠ তার প্রমাণ দেবার একটা প্রয়াস চলছে বোঝা যাচ্ছে। শরীরে দিব্য প্রভাব না থাকলে যে এমন হাফ নাঙ্গা সন্ন্যাসী হয়ে কনকনে শীতে ঘোরা যায় না, জননী আমার সেটা বুঝুক। জননী এবার সোজা কাঠমালতী গাছটার কাছে গিয়ে বলল, অনেক বাহাদুরী দেখেছি। এবারে দয়া করে কাপড়-জামা গায়ে দাও। এই মায়া, বাকি যা ফুল আছে তুলে রাখ। নাও। বলে চাদর এবং কাপড় দিলে বাবা সুড়সুড় করে ঘরের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

বাসি বাসন-কোসন ধুয়ে মার হাত নীল। একঝটকায় বাবার বাহাদুরী ভেঙে মা আমার আগুন পোহাতে আসছে। আগুনে হাত মেলে দেবার সময়ই দেখলাম, হাত কেমন রক্তশূন্য, নীল। আমাদের দেশ-বাড়িতে যে সু-সময় ছিল, এখানে এসে তা কতটা হারিয়েছি, মায়ের রক্তশূন্য হাতই যেন তার প্রমাণ। মা বলল, ও পিলু, দেনা আর দুটো পাতা। আগুনের মধ্যে মা হাত ঢুকিয়ে অর্ধদগ্ধ পাতাগুলি নেড়েচেড়ে দিল। বোঝাই যায় ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে আছে হাত।

মাকে বললাম, আজ প্রাতঃস্নান।

বামুনের খোঁজে যাবে।

বামুনের খোঁজে কোথায় যাবে?

তোমার মানুকাকার কাছে।

পিলু বলল, কেন আমরা?

তোমরা মিলে তিনজন।

আমি যাচ্ছি না। ও-সব শ্রাদ্ধকাদ্ধের নেমন্তন খেতে আমার ভাল লাগে না।

বাবা ঠিক শুনেছে। কী বললে।

আমি যাব না বাবা।

কেন যাবে না? না গেলে আমার মুখ থাকবে কি করে। বলে এসেছি তিনজন তো দাসমশাই হাতেই আছে। আর বাকি ন'-জন ঠিক যোগাড় করে আনব।

বাবা বলতে বলতে কাছে এলেন। কিন্তু আগুনটার কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালেন না। আগুনের কাছে ঘেঁষে দাঁড়ালে যেন ব্রাহ্মণত্বের অপমান। আগুনে রক্তের ঘনত্ব নষ্ট হয়। রক্ত তরল হয়ে যায়। বামুন নিজেই আগুন। সে মুখ হাঁ করলে

আগুন বের হয়। অগ্নিদেবতা সর্বশাস্ত্রে একমাত্র ব্রাহ্মণকেই ভয় করেছে। আগুন এবং আমার বাবার মধ্যে যে রেষারেষি আছে তা এ সময়ে বেশ বোঝা গেল। বাবা বর্ণাশ্রমে বিশ্বাসী, ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ। অগ্নিদেবতাও বর্ণশ্রেষ্ঠ। যেন দুই কুলীনে আড়াআড়ি। মা বলল, আগুন পোহাও না। শীতে তো দাঁতকপাটি হচ্ছে। বাবা যেমন অন্য সময়ে অগ্রাহ্য করে মার কথা এখনও তাই করল। বের হচ্ছে শুভকাজে, তেমন বামুন খুঁজে বের করা বাবার কাছে শুভ কাজেরই শামিল। সকালবেলায় আর মার সঙ্গে শাস্ত্র আউড়ে কী হবে। তেল-নুন ছাড়া যে মহীয়সী কিছু বোঝে না, তাকে বুঝিয়েও লাভ নেই। বরং এ সময় লায়েক পুত্রটির সঙ্গে কথা বললে কাজে আসবে। আমার দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন, কাল নেমন্তন্ন রক্ষা করে কালীবাড়ি যাবে।

আমি যাব না বাবা।

মা বলল, যাবি না কেন। ভাল-মন্দ খাবি। দক্ষিণা পাবি।

বাবা বললেন, নিবারণ দাসের মা তোমাদের জাত সাপের বাচ্চা মনে করত।

আমি বললাম, তা করত।

পিলু বলল, বুড়ি আমাকে মোয়া নারকেলের নাড়ু হাতে দিয়ে হাঁটু গেড়ে প্রণাম করত।

বাবা বললেন, কেন করত?

মা বলল, কেন করত ও কি করে বলবে?

পুণ্য। পুণ্য সঞ্চয়। বিলু পিলু সবাইকে ভাবত এক একখানা সাক্ষাৎ কার্তিক ঠাকুর। ওরা না খেলে দাসের মা'র আত্মা শান্তি না পেলে মুক্তি পাবে কী করে। আত্মার সদ্‌গতি বলে কথা। তুমি যাবে। আমার দিকে তাকিয়ে বাবা কথাটা বললেন।

শেষ অস্ত্র এখন ছাড়া দরকার। বললাম, পড়ার ক্ষতি হবে।

হনুটা ঠিক সে সময় বাবার পায়ের কাছে লাফিয়ে পড়ল। বাবার কোঁচা ধরে টানতে থাকল। পিলু এতে মজা পায়। বাবা বললেন, ওতো দেখছি আমাকে নাঙ্গা করতে চায়। বলে বাবা আরও দু' পা পিছিয়ে বললেন, দু' দিনে তোমার পড়ার কতটা ক্ষতি হতে পারে। রাজসূয় যজ্ঞ তো নয়। যে ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছ, দিগ্বিজয়ে বের হতেই হবে।

বাবা জানে না, আমার কাছে এটা দিগ্বিজয়েরই শামিল। কিন্তু জানি বলে লাভ নেই। কিছু এদিক ওদিক বললেই, বাবার এক কথা—উড়তে শিখে গেছ, এখন আর আমরা তোমার কে?

আসলে এই শ্রাদ্ধ, শুভকাজে বাবার পিছু পিছু যেতে আমার কেমন লজ্জা লাগে। অথচ এই লজ্জার বিষয়টা কাউকে এখন বলতে পারি না। আমার বয়োসন্ধিকাল চলছে। যেখানেই যাই, মনে হয় সবাই আমাকে দেখছে। ফ্রক পরা মেয়ে যদি সে বাড়িতে ঘোরাঘুরি করে তবে কেমন আরও ভ্যাবলাকান্ত হয়ে যাই। কাজের বাড়িতে ওরা ঠিক থাকে। আর জানালায় দাঁড়িয়ে দেখবে। বলবে, ঠাকুর-মশাইর বড় ছেলে কলেজে পড়ে। আমার এসব ভাল লাগে না। অথচ আগে বাবার পিছু পিছু আমি কি না দৌড়েছি। কেবল মনে হত বাবা আমাদের না আবার একা ফেলে চলে যায়। যা একখানা ভুলোমনের বাবা।

আগুন, শীতের কনকনে ঠাণ্ডা, সোনালী রঙের নিস্তেজ রোদ আর গাছপালার মধ্যে পিলুর বোধ হয় সহসা পরলোক সম্পর্কে মনের মধ্যে প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে। এসব বিষয়ে সে বাবার চেয়ে কাউকে বড় মনে করে না। বছরকার পঞ্জিকা নিবারণ দাস দেয়। কালুবাবুর মা'র শ্রাদ্ধে একখানা গীতা পাওয়া গেছে। একবার কী কারণে, শম্ভু ঘোষের পুত্রের বিবাহে বাবা কিছু বেশী পুরোহিত বিদায় পেয়েছিলেন। ফেরার সময় শহর থেকে কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের মহাভারত কিনে এনেছিলেন। মা দেখলে অপচয় ভেবে গজগজ করবে ভয়ে বলেছিলেন, এও শম্ভু ঘোষ দিল। আমাদের ডেকে বলেছিলেন, মাকে বলতে যেও না, কিনে এনেছি। পুত্রদের সামনে বাবার মিছে কথা বলতে বোধহয় দ্বিধা দেখা দিয়েছিল মনে। মিছে বিষয়টাই সংক্রামক ব্যাধির মতো। পিলুকে এত করেও বাবা সত্যবাদী করে তুলতে পারছেন না। এটা একটা আপসোস। এতে বোধহয় বাবার ঈশ্বরও কুপিত হন। নানা দিক ভেবেচিন্তেই আমাদের কথাটা বলেছিলেন। সামান্য দু-খানা ধর্মগ্রন্থ নিয়ে সংসারে অশান্তি হোক বাবা বোধহয় চাননি। তবু মাকে মিছে কথা বলার জন্য বাবার বোধহয় ভেতরটা খচখচ করছিল। আসল রহস্যটা আমাদের কাছে পরিষ্কার করে দিয়ে তিনি কিছুটা হাল্কা হয়েছিলেন। পরে বলেছিলেন তোমার মা'র মেজাজ বুঝে একসময় কথাটা পাড়া যাবে। তোমরা মাকে কিছু বলতে যেও না। বাবার হেনস্থা হবে ভেবে আমরা মাকে শেষ পর্যন্ত ধর্মগ্রন্থ কেনার বিষয়টা গোপন করে গেছিলাম।

সুতরাং পিলুর ধারণা বাবার অগাধ পাণ্ডিত্য। বাবা গীতা পাঠ করেন। নতুন চণ্ডী একখানা কে দেবে এমন বলে আসছেন বাবা। বাবার নিজস্ব একটা পুঁটুলি আছে। নতুন গামছা দিয়ে সেটা সব সময় বাঁধা থাকে। একমাত্র পুঁটুলিটা মা'র হাটকানোর অধিকার আছে। ওটা পুত্র সন্তানেরা ধরলে বাবা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। শুভকাজ, দিনক্ষণ দেখে দেওয়া বাবার নিত্য কাজ। যারা জানতে

আসে কিছুক্ষণ ঠাকুরকর্তার কাছে বসে যায়। বাবার ঈশ্বরকথা শুনতে তারা ভালবাসে। মহীরাবণ বধে রামের পাতাল প্রবেশ, মহীরাবণের পুত্র অহীরাবণ আরও কী সব এবং সেই যুদ্ধের বর্ণনার সময় রামের দোসর হনুমানের একটা ক্ষুদ্রকায় মাছি হয়ে যাওয়ার ঘটনাটি বোধহয় পিলুর মধ্যে পুলক সঞ্চার করে। সে তখন পড়ে না। বাবার গল্পপাঠ শোনে। তখন রান্নাঘরে মা'র মুখ থমথমে। সকালবেলায় মায়া পিলু পড়ছে, আর উনি ভক্তদের ধর্মপাঠ করাচ্ছেন। কি আক্কেল মানুষটার। মাঝে মাঝে মা ডাকবে, এই পিলু পড়। কাকস্য পরিবেদনা। বাবার কথা। বাবা এক দণ্ডে চুপ মেরে যান, ভক্তরা উঠে যায়। পিলু বাবাকে ছাড়ে না। তারপর কী হল বাবা।

এখন পড়, পরে শুনবে।

পিলুর পড়ায় মন বসে না। বাবার কথাবার্তা সবাই এত গভীর আগ্রহ নিয়ে শোনে, আর মা'টা কী। মাঝে মাঝে পিলু ক্ষেপে গিয়ে বলবে, তুমি চুপ কর মা। কিচ্ছু তুমি বোঝ না।

মা'র এক কথা, ওরে পিলু কথায় চিড়া ভেজে না। পড় বাবা। জীবনটা তো নিজের বাপকে দিয়ে বুঝছিস।

এই সব কারণে বাবার প্রতি পিলুর ধর্ম বিষয়ে মৃত্যু বিষয়ে সম্ভ্রমবোধ গড়ে উঠেছে। সে বলল, বাবা নিবারণ দাসের মা এখন কোথায় আছে?

কোথায় আছে মানে?

এই মরে গিয়ে যাবে কোথায়? তুমি যে বল কিছুই বিনষ্ট হয় না।

দাসের মা পঞ্চভূতে লীন হয়েছেন।

পঞ্চভূতটা কি বাবা?

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। এই হল গে তোমার পঞ্চভূত। মানুষ সেখানেই মরে গিয়ে মিলে যায়।

ক্ষিতিটা কি বাবা?

এই যে বিশ্ব চরাচর দেখছ, গাছপালা দেখছ, শস্যক্ষেত্র দেখছ সব ক্ষিতি।

অপ?

অপ হচ্ছে জল।

মা বলল, তুমি না বামুনের খোঁজে যাবে? কখন আহ্নিক করবে। কখন খাবে। দুপুরে ফিরবে, না রাতে?

বাবা বললেন, দেখলি ত। কোন জ্ঞানের কথা হলেই তোর মা'র চণ্ডী পাঠ শুরু হয়ে যায়। তোমার মা'র দুঃখ স্বয়ং শিবেরও সাধ্য নেই দূর করে।

এক শিবের জ্বালায় প্রাণ অতিষ্ঠ, আর এক শিবে শুধু দক্ষযজ্ঞ হবে। এবারে দয়া করে আহ্নিকে বস গিয়ে। দুটো মুখে দিয়ে আমাকে উদ্ধার কর। কোথাও গেলে তো আর বাড়ির কথা মনে থাকে না।

বাবা অগত্যা ছাতা নিলে পিলু ডাকল, বাবা।

পিছু ডাকবে না। শুভকাজে বের হচ্ছি।

বাবা, শ্রাদ্ধ করলে কি হয়?

মানুষের আত্মার সদ্‌গতি হয়।

সদ্‌গতিটা কি বাবা?

এই যে—মাকে উদ্দেশ্য করে বলা। তোমার সন্তানের দিব্যজ্ঞান সঞ্চার হচ্ছে। সামলাও।

বল না বাবা।

মানুষ মরে গেলে আত্মা ঘোরাঘুরি করে।

কোথায়?

এই চারপাশে।

দাসের মা'র আত্মা কোথায়?

বাড়ি-ঘরের চারপাশেই ঘোরাফেরা করছে। মায়া কাটাতে কষ্ট হয়। শ্রাদ্ধে অন্নদান, জল দান করা হয়। আত্মা সংসারের টানাটানি থেকে তবে মুক্তি পায়।

পিলুর চোখমুখ দেখলে এখন কে বলবে, এই ছেলে বনবাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়। পাখি সরীসৃপের সঙ্গে বন্ধুত্ব। বনের গাছপালার সঙ্গে কথা বলে। মৃত্যু বিষয়টা সাময়িকভাবে তাকে কেমন কাতর রেখেছে। এত সুন্দর ঘরবাড়ি বনভূমি ছেড়ে চলে যায় মানুষ। সেও মানুষের পরিণতির কথা ভেবে খানিকক্ষণ কেমন মুহ্যমান হয়ে থাকল।

আগুন নিভে গেছে। ঠাকুরঘরে বাবা আহ্নিক করছেন। মা উনুনে দুধ গরম করছে। মায়া বাটি নিয়ে হাজির। আমি দুধ কলা দিয়ে মুড়ি খাব মা।

মা'র এক কথা, না। তেল মুড়ি মেখে দিচ্ছি খেয়ে নাও। খাওয়া ছাড়া তোমরা কিছু বোঝ না। তোমার বাবাকে দিয়ে কিছু থাকবে না।

বাবাকে এতটা দুধ দেবে। আমাদের একটুকুন দেবে না?

মানুষটা বের হবে, ফিরবে কখন ঠিক নেই। তোদের কষ্ট হয় না।

বাবা আহ্নিক করতে করতেই বললেন, দাও। ওরা খেলেই আমার খাওয়া হল।

আত্মার কথায় আমারও কেমন একটা খটকা লাগল। আত্মা বুকের মধ্যে থাকে। ধুকধুক করে। মৃত্যুকালে ওটাই উড়ে যায়। আমার মা বাবা সবার আত্মা

এক সময় উড়ে যাবে ভাবতেই জীবন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ নৈরাশ্য উদয় হল। আর নিজের কথা ভেবে কেমন ষোল আনা বৈরাগ্য উদয় হবার সময় দেখলাম পিলু হনুটাকে কাঁধে নিয়ে গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছে। চারপাশে তাকালাম। সব কিছুর মধ্যেই আত্মার অবস্থান। কাউকে হেলা করা ঠিক না। হনুটার সেবা-যত্ন দরকার। পিলুকে ডেকে বললাম, খেতে দিলি না?

পিলু বলল, দেব।

পিলু দিক না দিক, আমার দেওয়া দরকার। আত্মা মানুষের মধ্যেও থাকে, হনুর মধ্যেও থাকে। আত্মা না থাকলে কোন কিছুই নড়েচড়ে না। আত্মাকে তোয়াজে রাখা দরকার ভেবে একখানা আস্ত গাছপাকা মর্তমান কলা হনুর বাচ্চাটার জন্য ঘর থেকে বের করে নিলাম। পিলু দু' একবার যে না ভেবেছে, ঘরের গাছপাকা কলার কথা তা নয়। কিন্তু সে জানে ধরলে মা তাকে আস্ত রাখবে না। দাদা দিলে মা কিছু বলবে না। সেই আশায় সে বোধহয় ঘোরা-ঘুরি করছে। আমার হাতে আস্ত পাকা মর্তমান কলা দেখে ওর কোনো বিশ্বাস জন্মায়নি। ও ভেবেছে, ওটা আমিই খাব। আমি খেলে, তারও খাওয়া দরকার। সে চিৎকার করে বলল, মা, দাদা কলা খাচ্ছে। আমিও খাব।

আসলে এই অজুহাতে সে আস্ত একটা পাকাকলা হস্তগত করতে চায়। ওর অধিকারের বস্তুটি সে খেল কী হনুতে খেল কারো কিছু বলার নেই।

আমি বললাম, আমি খাচ্ছি না। হনুটাকে দেব।

সত্যি দিবি?

হ্যাঁরে। বলে আমরা দু' জনে হনুটাকে মধ্যমণি করে বসলাম। কলা খাওয়া-লাম। দুই ভাইয়ে দাসের মা'র মৃত্যু নিয়ে কথা বললাম।

পিলু বলল, এই আছে এই নেই। কেমন লাগে নারে দাদা। বুকের মধ্যে থাকে। আবার থাকে না। আত্মাটা বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করে।

আমি বললাম, আসলে ওটা হার্ট।

হার্ট মানে?

বুকের মধ্যে থাকে। সব রক্ত ওতে ঢুকে যায় আবার বের হয়ে আসে।

কেন যায় আসে?

এতটা অবশ্য জানা নেই। বললাম, আসে যায়, রক্ত শোধন করে।

তুই জানিস না দাদা, ওখানে ওটা পাখি। মরে গেলে উড়ে যায়। চোখে দেখা যায় না। হাওয়া হয়ে যায়। আমি এমন একটা ঘর বানাব দেখবি, পাখিটা উড়ে যেতে পারবে না। ঠোকর খেতে খেতে আবার নিজের জায়গায় ঢুকে যাবে।

একটুকু ফাঁক থাকবে না। হাওয়া ঢুকতে পারবে না। ঘরে হাওয়া ঢুকতে না পারলে ওটা বের হবে কোন্ পথ দিয়ে। কাউকে মরতে দেব না।

পিলুর ভাবনা ভারি আজগুবি। তবু জানি, সে এই ঘরবাড়ির মৃত্যু নিয়ে ভাবছে। বাবা, মা, মায়া, ছোট ভাই-এর জন্য ওর কেমন ভারি টান ধরে গেল। সবাইকে রক্ষা করার জন্য সে নিজের মতো করে একটা পৃথিবীর কথা ভাবছে। ওভাবে যে আটকানো যায় না বলে কোন লাভ নেই। বড় হলে বুঝতে পারবে। তারপরই মনে হল কী বুঝতে পারবে? মৃত্যুই শেষ! তারপরে আর কিছু নেই। বাবার ঘরবাড়ি পড়ে থাকবে, গাছপালা বড় হবে, আরও বড় হবে—বাবার সেই শেষ ছবিটা ভাবতে আমার মধ্যে কেমন ভয় ধরে গেল। যে কোন মানুষের মৃত্যুই বোধহয় শেষ পর্যন্ত প্রিয়জনে এসে শেষ হয়। বাবা লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন, সাদা চাদরে বাবার শরীর ঢাকা—বাড়ির গাছপালা বাতাসে দুলছে, বাবা নেই অথচ বাড়িঘর গাছপালা এবং শস্যক্ষেত্র একইভাবে আকাশের নীচে জেগে থাকবে। পিলু তার নিজের মতো করে এখন বাড়িঘরের সব কিছুকে রক্ষার নিমিত্ত বেহুলা লখীন্দরের মতো কোনো আবাসের কথা ভাবছে। আমার ভারি হাসি পেল। বললাম, ঘরটা কোথায় বানাবি ঠিক করেছিস? আসলে নিজের ভেতরের দুর্বলতা পরিহার করার জন্য ওকে এমন প্রশ্ন করলাম এবং হাসলাম। যেন পিলুকে চাঙ্গা করতে চাইছি। ও নিয়ে ভাবতে নেই। ও নিয়ে ভাবলে বেঁচে থাকা যায় না!

ভাবলেই কি হয়। বাবা এখন বের হবেন। আমার ভিতরেও আত্মা নিয়ে নানা রকমের প্রশ্ন। এ সময় প্রশ্নটা বাবাকে করলে রেগে যাবেন না তো? কেন জানি বাবার কাছে আজ আমার আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন রাখতে ইচ্ছে হল। বাবার কথাবার্তায় অদ্ভুত এক আত্মদর্শন আছে। এই আত্মদর্শনের জন্য বাবাকে কখনও কখনও দূরের মানুষ মনে হয়। বাবা যেন এ গ্রহের মানুষ নন। বাবাকে বললাম, একটা কথা বলব?

তোমার আবার কী কথা? বাবা বের হবার আগে মৌজ করে চোখ বুজে তামাক সেবন করছেন।

বললাম, মানুষ এত করছে, আত্মাকে ধরে রাখতে পারছে না কেন?

বাবা কিছুক্ষণ কী ভাবলেন। তারপর বললেন, ওকে ধরে রাখার কী আছে? না এই যে মানুষ মরে যায় তাকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়, আর কিছু থাকে না।

কেন স্মৃতি থাকে।

স্মৃতি সব নয়।

বাবা বললেন, কিছুই শেষ হয়ে যায় না। তারপর গম্ভীর গলায় শ্লোক উচ্চারণ করলেন, ন জায়তে ম্রিয়তে···। বলে তিনি বোঝালেন, আত্মার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই। আত্মা কোন কিছু হতে উদ্ভূত নয়। আত্মা জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত, চিরবিদ্যমান। দেহ বিনষ্ট হয়, কিন্তু আত্মার বিনাশ নেই।

তারপর বাবা দুর্গা দুর্গা বলে বামুন খুঁজতে বের হলেন। আত্মার যদি এই প্রকৃতি তবে দ্বাদশ বামুনের জন্য বাবার এই যাত্রা কেন বুঝে উঠতে পারলাম না। বাবাকে আজ কেন জানি ভারি রহস্যময় মানুষ বলে মনে হল। চুপচাপ, কিছুটা হেঁটে বাড়ি পার হয়ে একটা জলার ধারে গিয়ে বসলাম। সামনে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। সেখানে চাষীরা শীতের সবজি লাগাবার জন্য হালচাষ করছে। বুঝলাম মৃত্যু জীবনের কাছে শেষ কথা নয়।

শস্যক্ষেত্র চাষ-আবাদ দেখতে দেখতে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এমন সুন্দর পৃথিবীতে আমি একদিন থাকব না। আমি থাকব না, মা থাকবে না, বাবা থাকবে না, একদিন সবাইকে তীর্থযাত্রার মতো সব ছেড়েছুড়ে বের হয়ে পড়তে হবে। দাসের মা এখন কোন্ জায়গাটায় আছে। কেমন বিশ্বাস করতে ভাল লাগছে হাওয়ার মধ্যে মিশে আছে। দাসের বাড়ির চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। অন্নদান, জলদান হলেই মুক্তি পাবে। মৃত্যুর পর আমি নিজেও বোধ হয় এই বনভূমিটা ছেড়ে কোথাও যেতে পারব না। ঘরবাড়ির চারপাশে ঘোরা-ঘুরি করব। আমাকে কেউ দেখতে পাবে না, অথচ আমি সবাইকে দেখতে পাব।

তখনই পেছনে এসে কেউ দাঁড়াল। তাকালাম। মা। —তোকে কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিস না?

বুঝলাম দাসের মা'র মৃত্যু, বাবার দেওয়া আত্মার পরিচয়, এই চাষ-আবাদ এবং মানুষের জীবনযাপন, তার শেষ পরিণতির কথা ভেবে খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। এক ফাঁকে ছোড়দির মুখও উঁকি দিয়ে গেল। ছোড়দিটা কে, বাড়ির কেউ জানে না। লক্ষ্মী যে এত কথা বলে সেও জানে না। অবশ্য বাবাকে ছোড়দি চিঠি না দিলে আমার বোধ হয় ফিরে আসা হত না। পরে ছোড়দির চিঠিটা পড়ে দেখেছি। বিলু এখানটায় আছে। আমাদের ড্রাইভার সামসুরের সঙ্গে পাশের একটা গ্যারেজে থাকে। ওকে নিয়ে যাবেন। সঙ্গে ঠিকানা লিখে দিয়েছিল। বাবা চিঠি পেয়ে বর্ধমানে গেলেন, ছোড়দিকে দেখিয়ে বললেন, এই তোমার ছোড়দি। ছোড়দি যে আমার বয়সী, ফ্রক পরে, আমাকে নিয়ে গাড়িতে হাওয়া খেতে বের হয় আবার কখনও সাইকেলের পেছনে নিয়ে মাঠে হারিয়ে যেতে

ভালবাসে, বাবা জানত না। ছোড়দির কতটুকুন বয়স। অথচ কি পাকা পাকা কথা। না, না বিলু পড়বে। বিলু তুমি পড়াশোনা না করলে মানুষ হবে কী করে। বড় হবে কী করে। যেন সে ছোড়দির কথা রাখার জন্যই পড়াশোনা করবে। বড় হবে। নাহলে যা অবস্থা, তাতে কাজে লেগে পড়া দরকার। অভাবের তাড়নাতে মা'র কান্নাকাটি মাঝে মাঝে কেমন পড়াশোনার বিষয়ে উদাসীন করে তোলে।

মা বলল, বাড়ি আয়। খাবি।

মার পিছু পিছু বাড়ির দিকে হাঁটতে থাকলাম।

মা আর কোন কথা বলছে না। মা যেন সেই কবে থেকে বুঝে গেছে, তার প্রথম সন্তান বিলু বড় হয়ে গেছে। বিলু এই যে মাঝে মাঝে চুপচাপ থাকে, জলার ধারে এসে বসে থাকে, তা অন্য এক সুদূর পৃথিবীর ঘ্রাণ। মা তার বালিকা বয়সে যা টের পেয়েছিল, বিলু তার বয়স বাড়তেই সেটা টের পেয়ে গেছে। মা'র মুখ দেখলেই টের পাই, পিলু যতটা মা'র কাছের আমি যেন আর ততটা নই। কলেজে পড়ার জন্য বাড়িছাড়া হবার দিনটিতে মা'র কী কান্না। পিলু পর্যন্ত বুঝিয়েছে, তুমি মা কাঁদছ কেন! এইতো বনটা, তারপর কারবালা, কাশবন। কাশবন পার হলে রেল-লাইন। লাইনে উঠলেই মন্দিরের ত্রিশূল দেখতে পাবে। খবর দেবার জন্য আমি এক দৌড়ে যাব, আর এক দৌড়ে আসব।

আমি জানি মা'র কষ্টটা কোথায়। মা'র কাছ থেকে আমি আলগা হয়ে যাচ্ছি। ছোড়দি, লক্ষ্মী, আমার জগতে এসে গেছে। বড় হতে হতে আরও আসবে। শেষে আমি এক বিচ্ছিন্ন মানুষ। নাড়ির টান ছিঁড়ে যাবে। আর এক নারীর ছবি আমার মধ্যে খেলা করে বেড়াচ্ছে, মা সেটা বোধ হয় বুঝতে পারে।

মা বলল, কলা দিয়ে মেখে খা। পিলুকে শুধু মুড়ি তেল দিয়ে মেখে দিয়েছে। মায়াকেও। আমার জন্য বাবার বরাদ্দ দুধ থেকে সামান্য দুধ তুলে রেখেছিল। পিলু গাঁইগুঁই করছে মনে মনে। দাদাটা একদিন দু'দিন থাকবে। সব ভাল-মন্দ খাবে। আমি দেবস্থানে ভাল-মন্দ খাই মা'র বিশ্বাস হয় না। বললাম, পিলুকে একটু দাও। কলাটা ভেঙে পিলুকে দিলে সে বলল, নারে দাদা, তুই খা। তোকে তো মা এখন রোজ হাতে ধরে কিছু দিতে পারে না। পিলু মাঝে মাঝে সত্যি বড় বিবেকবান মানুষ হয়ে যায়। তখন মনে হয় সেই বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান। আমি কনিষ্ঠ। বললাম, হয়েছে, নে খা তো।

মায়া বলল, আমাকে দে দাদা।

একটা কলা আমরা তিন ভাইবোনে ভাগ করে খেলাম। গাছের আস্ত একটা

কলার কাঁদি নামানো আছে। সবটাই বিক্রি হবে। নরেশ কুণ্ডু দাম-দরও দিয়ে গেছে। দামটা পেলে বাজারের পয়সা হয়। এই করে আমাদের সংসার চলে। হনুটাকে আমি হাতে ধরে কলা খাইয়েছি বলে, মা কিছু বলেনি। পিলু ধরলে কুরুক্ষেত্র বেধে যেত। কত অল্প বিষয় নিয়ে মা'র যে মাথা গরম হয়ে যায় কখনও কখনও—না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

মা বলল, এই সেদিন, তোর দাসের মা এসেছিল। কত কথা।

মানুষ মরে গেলে বোধহয় তার কথা বলতে সবাই ভালবাসে। মা আমাদের খেতে দিয়ে নিজে একটুখানি মুড়ি জলে ভিজিয়ে খেয়ে নিচ্ছিল। খুবই ছোট রান্নাঘর, ওপরে তালপাতার ছাউনি। প্রতি বছরই বাঁশের খুঁটি দিয়ে ঘরটা বানাতে হয় বাবাকে। মা লেপে মুছে তকতকে করে রাখে। ছোট ভাইটা মা'র দুধ খায়। গরুর দুধ ওর জন্যও আলাদা করে তুলে রাখা হয়। বেশি দুধ হলে, বিক্রি হয়। এ বিষয়ে বাবার সঙ্গে মা'র ভারি মতান্তর। বামুনের বাড়িতে দুধ বিক্রি কবে কে করেছে। মা'র কথা—রাখ তোমার বামুনের বাড়ি। দুধ বিক্রি হলে হাতে কিছু পয়সা হয়। মা মাছ না হলে খেতে পারে না।—এয়োতি মাছ না খেলে সংসারে অমঙ্গল ঢোকে। বাবা তখন আর টুঁ শব্দ করে না। কারণ এ বিষয়ে বাবারও সংস্কার আছে বড় রকমের। বামুনের গরু দুধ দেবে, সে দুধ বিক্রি হবে বড় কথা, না, বামুনের বউ মাছ ভাত খাবে বড় কথা। দুই টানা-পোড়েনের মধ্যে পড়ে বাবা দুধ বিক্রির বিষয়টা মেনে নিয়েছিলেন। এখন গরুটার দুধ কমে যাওয়ায় গাছের কলা, পেঁপে বিক্রি হয়। তালের দিনে তাল। কিংবা সবজি ভাল হলে তাও বিক্রি। লাউ, কুমড়ো বাবার হাতে খুব ফলে। পাঁচ বিঘের মতো জমিটার বিঘেখানেক বাদে আর সবই এখন সাফ। ওদিকে বড় বড় দুটো শিশু গাছ আছে। হাতে টাকা জমলে গাছ কেটে একটা তক্তপোশ আর দুটো জলচৌকি বানাবার ইচ্ছে আছে মা'র। বলতে গেলে মা'র জীবনে এখন এটা একটা বড় রকমের স্বপ্ন।

হঠাৎ মা'র দিকে তাকিয়ে কেমন সংকোচে পড়ে গেলাম। মা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আজকাল মা আমাকে গোপনে দেখে। গোপনে চুরি করে এই দেখাটার মধ্যে কোথায় যেন মা'র একটা অহংকার তৈরি হয়। আসলে আমার মধ্যে মা বোধহয় বাবার তরুণ বয়সের ছবিটা দেখতে পায়। মা চোখ নামিয়ে খুব ধীরে ধীরে বলল, তুই যেদিন হলি, কী বৃষ্টি। তোর বাবা বাড়ি নেই। শ্বশুরমশাই সারাক্ষণ বারান্দায় ছটফট করে বেড়াচ্ছেন। বৃষ্টি নামলে শ্বশুরমশাই নিজেই শুকনো কাঠ সব তুলে রেখেছিলেন বারান্দায়। আঁতুড়ঘরে সব লাগে।

আমার জন্মদিনটার কথা বলে মা কেমন আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। একজন মানুষ পৃথিবীতে এভাবেই আসে। বড় হয়। মা না থাকলে আমার কী হত। আমি তো জন্মাতামই না। নিথর এক অন্ধকারে আমার আত্মা শুধু ঘোরাফেরা করত। জন্মরহস্য বড় গভীর। ছোড়দি কেন জানি ফের সামনে দিয়ে আঁচল উড়িয়ে চলে গেল। কী বড় হবে তো। আমার কথা মনে থাকবে তো। ছোড়দির চোখেও মা হবার গোপন আকাঙ্ক্ষা লক্ষ্য করলাম। সব ভাবতে গিয়ে আমার চোখ মুখ লাল হয়ে গেছে বুঝতে পারছি। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। আমি আর মা'র সামনে বসে থাকতে সাহস পেলাম না। যা এত পবিত্র, যা আমার পৃথিবী আগমনে সহায়তা করেছে সেই বিষয়টাই এত অপরাধপ্রবণ করে তোলে কেন। যেন কোন পাপ চিন্তা করছি। কোনরকমে খেয়ে মা'র কাছ থেকে দ্রুত দৌড়ে পালালাম।

এই ঘর-বাড়ির প্রতি বাবার মত আমারও কেমন একটা মোহ জন্মে যাচ্ছে। বাবার লাগানো গাছপালা বড় সজীব। ওরা ক্রমেই আকাশের দিকে মাথা তুলে দিচ্ছে। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ে ডাল নড়ে। যেন গাছপালাগুলি হাওয়ায় নড়েচড়ে তারাও আমাদের মতো বেঁচে আছে বড় হচ্ছে প্রমাণ করে। বেশি হাওয়া দিলে ডালপালা নুয়ে যায়। যেন বাবার কাছে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বলতে চায়, আমরাও তোমার সন্তান-সন্ততি। সার জল দিচ্ছ, আগাছা সাফ করে দিচ্ছ, বড় হতে মানুষের যা লাগে, আমরাও তাই পাচ্ছি। আমরা বুঝতে পারি, গাছের ডালপালা ভাঙলে বাবা কেন এত রেগে যায়।—দিই তোমার একটা হাত ভেঙে, দিই তোমার কান ছিঁড়ে। বুঝবে লাগে কিনা! বাবার এই তিরস্কারে টের পাই যারা বাড়ছে তারা সবাই এই ঘর-বাড়ির বড় প্রিয়জন। আর এ-জন্যই বুঝি গাছপালাগুলি আমাদের ঘর-বাড়ির চারপাশে সবুজ এক অকৃপণ সমারোহ সৃষ্টি করে চলেছে। যে কেউ ঢুকে গেলে ভাবতে পারে একটা তপোবনে ঢুকে গেলাম। এখন এই গৃহে মায়া যেন শকুন্তলার মত ঘুরছে ফিরছে। তার কাজের শেষ নেই। সে সকাল হলে ফুল তোলে। স্থলপদ্ম গাছটা কত বড় হয়ে গেছে। শীতের সময় বাবা সূর্যমুখীর চারা লাগান। এত ফুল ফুটতে শুরু করে যে তখন মনে হয় হলুদ এক প্রজাপতির দেশ। কত রঙ-বেরঙের প্রজাপতি উড়ে আসে। বাবার খুব এতে আনন্দ হয়। প্রজাপতি ফড়িং কীটপতঙ্গ সব মিলে তখন বাবার একটা ভিন্ন পৃথিবী। তবু বাবা কেন যে বাড়ি থেকে বের হলে সহজে আর ফিরতে চান না এটা আমার মাথায় আসে না।

সকালে বের হয়েছেন, এখনও ফেরার নাম নেই। শুধু বলা, নিবারণ দাসের মা'র আত্মশ্রাদ্ধ। মধ্যাহ্নে ব্রাহ্মণ ভোজন। নিবারণ দাস তার মা'র আত্মার সদ্‌গতির জন্যই ব্রাহ্মণ বিদায়ের ব্যবস্থা করেছেন। শহরে ন'জন বামুন মানুকাকাই ঠিক করে দেবে। মানুকাকা শহরটায় কতকাল থেকে আছে। সবার নাড়ী নক্ষত্র তার জানা। তবু বাবা দুপুরে ফিরলেন না। বাবা না এলে মাও খাবে না। কত বলেছে, ধনবৌ আমার জন্য বসে থেক না। দেরি দেখলে খেয়ে নিও। মানুষের সঙ্গে দেখা হলে কুশল জিজ্ঞেস করতে হয়। পরিবারের খবরাখবর নিতে হয়। মানুষের ভাল-মন্দ জানার আগ্রহ না থাকলে টান জন্মাবে কেন। দুদিনের পান্থশালা, সবার সঙ্গে যত পার একটু গল্প-গুজব করে নাও। এতে জীবনের প্রসারতা বাড়ে। অভাব গায়ে এঁটুলির মতো আটকে থাকতে পারে না।

এ দেশে আসার পর মানুষকে খবর দেবার মতো তাঁর কিছুই ছিল না। এখন কত খবর তাঁর। দেখা হলেই বলা, বিলুটা তো কলেজে পড়ছে। মেজটা পূজা-আর্চা করতে পারে। বাড়িতে আমলকী গাছটা যে সারা বছর ফল দেয় সেটাও একটা বড় খবর। এবারে সূর্যমুখী ফুলের আকার-প্রকার নিয়েও কথা হবে। খোঁড়া গরুটার জাত ভাল। দুধ দুইয়ে সেটা তিনি টের পেয়েছেন। কারো কোনো জমি ফাঁকা পড়ে থাকলে নানারকমের গাছের কথা বলবেন। বাড়ি আছে গাছপালা নেই বাবা সেটা ভাবতে পারেন না। জমির কোন্ দিকটায় কী গাছ পোঁতা হবে তার এক তালিকা দেবেন। ফলের গাছ বাড়ির উত্তরের দিকে, পশ্চিমে নারকেলের গাছ। সামনে ফুলের গাছ। দেশী ফুলের প্রতি বরাবর আগ্রহ বাবার। শ্বেত জবা, রাঙা জবার গাছ, ঝুমকোলতা কিংবা অপরাজিতার লতা কখন কি লাগাতে হয় বাবার চেয়ে যে কেউ বেশি ভাল জানে না তা প্রমাণ করতে দরকার হলে খাটাখাটনি করে কলম বানিয়ে পৌঁছে দেবেন। যেন বাড়িটা সুন্দর করে তোলার দায় লোকটার না বাবার।

মা গজগজ করলে বলবেন, গাছটা যদ্দিন বাঁচবে, আমি তদ্দিন ও-বাড়িতে, বোঝ না কেন? লোকে টের পায় আমার গাছ সত্যি কথা বলে।

মা বলবে, একেই বলে নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো।

বাবা বলবেন, একেই বলে জীবন। জীবন কখনও একা থাকতে পারে না।

রাখ তোমার আদিখ্যেতা। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, এতক্ষণ ওই করে এলে।

না না। ওটা ঠিক না। দই-চিঁড়া-মুড়ি খেয়েছি। কী খুশী রতনবাবু।

বাড়ির গাছগুলিতে বর্ষাকাল এলেই বাবার কলম ধরানো। ভাল জাতের আম,

আম, জামরুল যত গাছপালা সবার ডালে ডালে কলম বানাবার এক উৎসব লেগে যায় তখন। কে কোন্ গাছের কলম চেয়েছে বাবার কাছে একটা তালিকা থাকে। ভুল করে কেউ নিতে না এলে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন। সেখানেই শেষ নয়। কলমটা লাগাবার প্রক্রিয়া কি, মাটিতে সবুজ সার দিতে হয়, কতটা গর্ত সব ঠিকঠাক করে তবে ফেরা। বাড়ি ফিরে গাছতলা দিয়ে যাবার সময় বলবেন, দিয়ে এলাম তোমার ছানাপোনাকে। খুব আদরযত্ন করছে। এই করেই শেষ হলে তবু কথা ছিল। তা না, ফাঁক পেলেই আবার ঘুরে আসা। দেখে আসা, আদরযত্ন হচ্ছে কিনা, না রুগ্ন হয়ে গেল। এমন একজন যার বাবা তিনি যে বের হলে দুপুরে ফিরতে পারেন না সেটা আমাদের এতদিনে ঠেকে শেখা উচিত ছিল।

মা রান্নাঘরের দাওয়ায় বাবার পথ চেয়ে বসে আছে। পিলুকে একবার পাঠিয়েছে বাদশাহী সড়কে, যদি দূর থেকে দেখা যায়। শীতের বেলা পড়ে আসে। সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মা আঁচল পেতে বারান্দার শুয়ে থাকে। মায়া বারবার ডাকে ও মা ওঠো। খেয়ে নাও না। তুমি তো জানই বাবা এমন করে। খেয়ে নাও না।

ছোট ভাইটা মা'র শিয়রে বসে আছে। সেও মাকে ঠেলছে। আধো আধো কথা। মা এবং মায়া যতটা বোঝে আমরা ততটা বুঝি না। সেও বোধহয় ঠেলে ঠেলে মাকে বলছে, মা ওঠো। মা মা।

আসলে মা কেন খাচ্ছে না বুঝি। বাবার ওপর রাগ অভিমান এবং ক্ষোভে মা বিপর্যস্ত। ভেতর থেকেই খাবার ইচ্ছেটা থাকে না। রাস্তাঘাটে কত রকমের বিপদ ওঁত পেতে থাকে। যাবার সময় বলেও গেছে, এসে খাব। আর কি না সাঁঝ লেগে গেল তবু ফেরার নাম নেই। আমাকে ডেকে বলল, একটু এগিয়ে দেখ না বাবা। বলে উঠে বসল। পিলু কখনও কখনও সদয় হলে জল এনে দেয়, পুলিশ ক্যাম্প থেকে। আজ মা'র অবস্থা দেখে, সবই যে তাকে করতে হবে বুঝতে পারছে। পিলু কলসীটা মাথায় নিয়ে বলল, আয় দাদা, বাবাকে দেখে আসি। দেখে আসার জন্য যখন পুলিশ ক্যাম্প পার হয়ে যেতেই হবে, তখন জলটা নিয়ে এলে মা'র কাজে সামান্য সুরাহা হবে।

এছাড়া পিলুর ধারণা, বাবা বাড়ি না থাকলে মা'র যে বৈরাগ্য দেখা যায় সবকিছুতে পুত্রদের কাজেকর্মে উৎসাহ দেখলে তাতে ভাটা পড়তে পারে। বাবা বাড়ি না থাকলে, পিলু খুবই সুপুত্র বনে যায়। নিজে থেকে জলটা নিয়ে আসার এটাই একমাত্র তার প্রেরণা। সে তার সব সময়ের সঙ্গী

হনুটাকেও কাছ থেকে আলগা করে ফেলল। পেয়ারা গাছটার ডালে তাকে বেঁধে জলের কলসী নিয়ে ফের ডাকল আমাকে। চল না দাদা। জল তুই পাম্প করে দিবি।

মা ফের বলল, বিলু যা না বাবা, এগিয়ে দেখ একটু। জল আনা না আনার বিষয়ে মা'র কোন এখন মাথাব্যথা নেই। মানুষটা এখনও ফিরল না—কি ভাবে। এতবার কথা খেলাপ কেউ করে। তারপরই কি ভেবে যেন মা'র মুখ ভারি বিষণ্ণ হয়ে যায়। বোধহয় কোন অমঙ্গল চিন্তা মাথায় ঢুকে যায় তখন। এ সময় মাকে প্রবোধ দেবার ভরসা আমরা। যাবার সময় বললাম, পঞ্চাননতলায় খোঁজ নেব মা?

কেমন জলে পড়ে গেছে মতো বলল মা, যা ভাল মনে হয় কর।

ইদানীং বাবা বোধহয় একটু বেশি গৃহাগত প্রাণ হয়ে পড়েছিলেন। অথবা এও হতে পারে অনেক দিন পর বাবা ফের বাড়ি ফেরার ব্যাপারে মা'র সঙ্গে কথা খেলাপ করেছে। যে মানুষটা ভারি বিবেচক হয়ে উঠেছিল, সেই ফের এমন অদায়িত্বশীল হতে পারে ভেবে বোধহয় মা কষ্ট পাচ্ছে।

পঞ্চাননতলা গেলে কলসীটা সঙ্গে নেওয়া যায় না। বাদশাহী সড়কে উঠে করাত কল পার হয়ে জেলা বোর্ডের রাস্তা। রাস্তাটা রেল লাইন পার হয়ে শহরের দিকে গেছে। মোড়ে কয়েক ঘর উদ্বাস্তু জমি-জমা কিনে বাড়ি করেছে। বাবার বলতে গেলে এটা দ্বিতীয় জমিদারী। সব ক'ঘরই বাবার যজমান। ওখানে গেলে বাবার কোন খবর পাওয়া যেতে পারে। অগত্যা দুই ভাই মিলে বাপের খোঁজে বের হলাম। রাস্তায় পিলু বলল, পঞ্চাননতলায় খোঁজ না পেলে মানুকাকার বাড়ি যাব। শীতের সন্ধ্যায় দু'ক্রোশ পথ অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যায়। আর দু'জন একসঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় বেশ একটা রোমাঞ্চ বোধ করি। এই রাস্তাটা দিয়ে আমরা এতবার শহরে গেছি, চোখ বেঁধে দিলেও বাড়ি ফিরতে অসুবিধা হবে না।

পুলিশ ক্যাম্পটা এখন প্রায় খালি। ম্যাগাজিন কোয়ার্টারে মাত্র একজন সেন্ট্রি পাহারা। কালীপুকুরের দক্ষিণ পাড়টায় অফিসারদের কিছু কোয়ার্টার। ওদের ছেলেপিলেরা বাগানে ছুট বসন্তি খেলছে। পিলু বাবার খোঁজে বের না-হলে এখন এদের মধ্যে রাজার মতো বিরাজ করত। ওকে দেখে কেউ কেউ দৌড়ে এল। সে ওদের পাত্তা দিল না। বলল, বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি।

তোর বাবা আবার উধাও হল।

উধাও হবে কেন।

এই যে বলিস বাবাটাকে নিয়ে আমাদের হয়েছে মুশকিল। ক'দিন বাদে বাদে বেপাত্তা।

বাবা তো কাজে যায়। কাজে গেলে দেরি হতেই পারে।

আমার সামনে পিলু এদের কথা বরদাস্ত করতে চায় না। সে আমাকে নিয়ে জোরজার করে রাস্তায় উঠে গেল। পুলিশের প্যারেড শেষ হয়ে যাবে এবার। বিউগিল বাজছে। এই বিউগিল বাজলেই আমরা আমাদের সময় ঠিক করে নি। পাঁচটা বাজে! আবার কল-ইনের সময় বিউগিল বাজবে। আমরা শহরে গেলে ফিরতে ন'টা বেজে যেতে পারে। পুলিশ ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে যেতে হয়। তখন সেন্ট্রি হাঁকে, হু কামস্ দেয়ার। পিলু বলবে, আমি, আমি পিলু। সঙ্গে সঙ্গে সেন্ট্রি ঠিক বুঝতে পারে, বন-জঙ্গলের মধ্যে যে ঠাকুরকর্তা বাড়ি-ঘর বানিয়েছে, পিলু তার ছেলে। পিলু ফের বলবে, আমার সঙ্গে দাদা আছে। বাবাকে খুঁজতে শহরে গেছিলাম। এগুলো আমার পরিচিত দৃশ্য—কাজেই রাত হলেও খুব একটা ভয় থাকে না।

কিন্তু আমাদের বেশি দূর যেতে হল না। করাত কলটার কাছেই রাস্তাটা বাঁক নিয়েছে। এই বাঁকটার মুখে দাঁড়ালে পঞ্চাননতলার বড় বটগাছটা দেখা যায়। তার নীচে রাস্তাটা বাঁক খেয়ে একটা গেছে শহরে অন্যটা ইস্টিশনে। সাইকেল রিকশাটা কিছুক্ষণ আড়াল করে রেখেছিল মোড়টা, ওটা সরে যেতেই পিলু বলল, ঐ দেখ বাবা আসছে। সাঁঝবেলার একটা লাল আভা থাকে। অনেক দূরের বস্তু বোধহয় তখন আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমার নজরে আবছা মতো একটা মিছিল ভেসে উঠল। একদল মানুষ প্রায় মিছিল করে আসছে। এদের মধ্যে আমার বাবা আছেন, আমি ঠিক ঠাওর করতে পারছি না। বললাম, কী আন্দাজে বলছিস? কোথায় বাবা?

ওদের মধ্যে ঠিক দেখবি বাবা আছে।

পিলু কী হাওয়ায় বাবার ঘ্রাণ পায়। আমি কিছুই ঠাওর করতে পারছি না, অথচ পিলু অনায়াসে পারছে। বাবার কাছ থেকে আমি বোধহয় আলগা হয়ে যাচ্ছি। পিলুর এখনও সেটা হয়নি। পিলুর জীবনে কোন ছোড়দির আবির্ভাব হতে এখনও অনেক দেরি। এসব ভেবে পিলুর ওপর আমার খুব হিংসা হল। বললাম, তুই বড় আজেবাজে বকিস।

আর তক্ষুণি দুটো ট্রাক সাঁ সাঁ বেগে ধেয়ে আসছে। দানবের মতো কেমন খাব-খাব করতে করতে আসছে। পিলু আমার হাত ধরে টানতে টানতে জমিতে নেমে গেল। সে জানে এদের কোন মায়া দয়া নেই। কীট-পতঙ্গের মতো

ওরা মানুষকে দেখে। তার দাদাটির হয় বাস ড্রাইভার, না হয় ট্রাক ড্রাইভার হবার কথা ছিল। শেষ পর্যন্ত বাবার পরিকল্পনা মতো তার দাদাটি যে সে-রাস্তায় হাঁটেনি এতে এখন সে গর্বিত। কারণে অকারণে সে তার বন্ধুদের বলতে ভালবাসে, দাদা আমার কলেজে পড়ে। এই কলেজে পড়ার সঙ্গে পিলুর কোথায় যেন সম্ভ্রমবোধ জড়িত। ট্রাক দুটো ঠিক যখন আমাদের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল, পিলু মুখ ভেংচে দিল। ওর ভারি রাগ ট্রাক ড্রাইভারদের ওপর। কবে কাকে চাপা দিয়েছিল, সেই রাগ সে পৃথিবীর তাবৎ ট্রাক ড্রাইভারদের ওপর পুষে রেখেছে। একটা কিছু হাতে নিয়ে সে ঢিল ছুঁড়তে যাচ্ছিল। তাড়াতাড়ি আমি হাত ধরে ফেললাম, এই কী করছিস। ওরা যদি গাড়ি থামিয়ে আমাদের ধরতে আসে।

ধুস। পারবেই না।

কেন পারবে না বুঝতে পারি। পিলু শশকের চেয়ে দ্রুত দৌড়াতে পারে। আমিও পারি। কিছুটা ছুটতে পারলেই নবমী বুড়ির বনটা পাওয়া যাবে। সেখানে ঢুকে গেলে কার সাধ্য নাগাল পায়। যেন বড় বড় গাছগুলি দাঁড়িয়ে সেই দানবের মতো ট্রাক ড্রাইভারদের হাত থেকে তাকে এবং তার দাদাকে রক্ষা করবে। চোখের পলকে সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবে, সেটা সে ভালই জানে। তবু আমার কথায় যেন নিরস্ত হল। বাবাকে খুঁজতে যাচ্ছি, এ সময় উটকো ঝামেলা বাধানো যে ঠিক হবে না, পিলু সেটা বুঝে হাত থেকে ঢিলটা ফেলে দিল। তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ফের রাস্তায় উঠে বলল, ঐ দেখ। আমি মিছে কথা বলি না।

ট্রাক দুটো দেখে আমরা বেশ অনেকটা দূরে সরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ট্রাক দুটো চলে যাবার পর রাস্তায় উঠতে গিয়ে তা ধরা গেল। আমি একা থাকলে বোধহয় এতটা হত না। কিন্তু পিলুর যে নিজের চেয়ে দাদার জীবনের জন্য বেশি মায়া। তার কিছু হলে তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু দাদার কিছু হলে বাবার ঘর-বাড়ি নিঃস্ব হয়ে যাবে সে বোধ প্রবল। টানতে টানতে এতটা দূরত্ব তৈরী করার এটাই মোক্ষম কারণ। রাস্তায় উঠে গিয়ে দেখলাম, মিছিলটা আরও কাছে এসে গেছে। কিছুটা দৌড়ে গেলে কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা নাগালও পেতে পারি। পিলু আমার দিকে তাকিয়ে কি দেখল, তারপর দৌড়াতে থাকল। মিছিলটার মধ্যে আমার বাবা যে সত্যি আছেন এবার আর অবিশ্বাস করার উপায় রইল না। মিছিলের মধ্যে বাবাকে দাদার আগে আবিষ্কার করার নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে।

পিলু ঠিক আবিষ্কার করেছে। সে মিছিলটার শেষের লোকটির হাত থেকে কী একটা যেন নিয়ে নিল। তারপর হাত তুলে ডাকল, দাদারে।

আমি হাত তুললাম না। পিলুর ছেলেমানুষী আমাকে সাজে না। রাস্তার এক পাশে খুব ধীর স্থির চিত্তে বাবা যে সত্যি আছেন দেখার জন্য দাঁড়িয়ে থাকলাম। উত্তরে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমার চাদর উড়িয়ে নিচ্ছিল। পিলুর একটা হাফ শার্ট গায়ে। ওর শীত কম। সে দৌড়ায় বলে শীত কম লাগতে পারে। এও হতে পারে সে শরীরে ঠাণ্ডা লাগলে চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কেবল লাফায়। এ-গাছের ও-গাছের পাতা ছেঁড়ে। ডাল ভাঙে। বাড়িতে যা করতে পায় না, রাস্তায় বের হলে সেটা পুষিয়ে নেয়।

কাছে এলে দেখলাম, পিলুর হাতে নতুন একটা গামছার পুঁটুলি। বাবা বামুন খুঁজতে গিয়ে নিজেও কিছু উপার্জন করে ফিরেছেন। হয়তো চণ্ডীপাঠ, কিংবা কোনো বাড়িতে বামুনের অভাবে মঙ্গলচণ্ডীর পুজা, অথবা বিপদনাশিনীর ব্রত করে ফিরেছেন। বাবার পুঁটুলিটা পিলুর অধিকার করার কারণ, ওতে চাল-ডাল কিছু আনাজপাতি সহ দক্ষিণার এক পয়সা দু' পয়সা লুকিয়ে থাকতে পারে। বাড়ি গেলে সে প্রথমে বারান্দায় ওটা খুলে হাঁটকাবে—যদি মিলে যায়। মিলে গেলে সে তামার পয়সাটা হস্তগত করবে। মা মায়াও উপুড় হয়ে পড়বে। যার হাতে ঠেকবে, সেই তার উত্তরাধিকারী। পয়সা দখলের জন্য তখন বাড়িতে হলুস্থুল কাণ্ড। বাবা, বারান্দায় বসে তখন প্রসন্ন চিত্তে হুঁকো খাবেন।

বাবা ডাকলেন, বিলু এদিকে এস।

মিছিলটা থেমে আছে।

বাবা বললেন, প্রণাম কর। পিলু প্রণাম কর।

বাবার এই এক বাই। বাড়িতে, রাস্তাঘাটে স্ববর্ণের কোন মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে, প্রণাম না করলে বাবা রাগ করেন। আমার এ-সব ভাল লাগে না। এই রাস্তায় কেন। বাড়ি গেলে করা যাবে। আমার পছন্দ নয় হুটহাট প্রণাম করা, কিন্তু বাবার অবাধ্য হতে বাধে। বামুনেরা দাঁড়িয়ে আছেন। ন'জন ন'রকমের। একজন আবার এত কুঁজো যে সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। তিনি আমাকে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখলেন। যেন কিছুটা জিমনাস্টিকের খেলা দেখাচ্ছেন। কিম্ভুতকিমাকার সব মানুষ। একজন অনবরত খক্‌খক্ করে কাশছিল। খালি পা চারজনের। একজনের পায়ে খড়ম। তিনজনের টায়ারের চটি। একজনের কেডস জুতো। মাথায় লম্বা এবং নাতিদীর্ঘ টিকি। দু'জনের টিকিতে জবাফুল বাঁধা। বয়স সবারই আমার পিতৃদেবকে ছাড়িয়ে। ছেঁড়া নামাবলী, সাদা

চাদর, তালিমারা কালো পশমের সোয়েটার। কনকনে শীতে কুঁজো মানুষটার হাতের লাঠি কাঁপছে।

পিলু লাইনবন্দী মানুষগুলিকে প্রণাম করছে। সবাই রাস্তা থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। পিলুর সব কিছুতেই চট-জলদি ব্যাপার। সে দ্রুত প্রণাম সেরে হাতে পোঁটলা নিয়ে ছুটল। মাকে খবরটা দিতে যাচ্ছে। বাবা তো ফিরছেনই, সঙ্গে সেই বামুনের বাহিনী। কাল শ্রাদ্ধ। আজ এই শীতের রাতে এরা কোথায় থাকবে, খাবে কি, কোথায় বসতে দেওয়া হবে, বাবার মাথায় এ-সব আছে বলে আমার ধারণা হল না। ভয়, নিষ্ঠাবান বামুনের অভাবে দাসের মা'র আবার সদ্‌গতির না বিড়ম্বনা হয়। আত্মা নিয়ে বোধ হয় বাবা বিড়ম্বনার মধ্যে আছেন। আত্মা না প্রেতাত্মা। আত্মার তুষ্টি বিধানে বড় কর্মতৎপর এখন তিনি। তুষ্ট না হলে এই আত্মাই প্রেতাত্মা হয়ে বাবার বাড়িঘরে ভর করতে পারে। এই ভয়ে বোধ হয়, শুধু নেমতন্ন করে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেননি, সঙ্গে লোটা-কম্বলের মতো ঝুলিয়ে এনেছেন।

আমার প্রণামের পালা।

প্রশ্ন: তোমার জ্যেষ্ঠ সন্তান।

আমার না, ওঁর? বাবা আকাশের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন। বাবার স্বভাব এই। নিজের বললে পাছে ঈশ্বর কুপিত হন ভয়ে, ওঁর বলে রেহাই পান। এতেই যে যার সার কথা বুঝে নেয়। আশীর্বাদ, বেঁচে থাকো বাবা। দীর্ঘজীবী হও। পিতৃদেবের মুখ উজ্জ্বল কর। কেউ মাথায় হাত রেখে মন্ত্র উচ্চারণও করলেন।

যার পায়ে কেডস এবং পোশাকে একটু বেশি ধোপদুরস্ত অর্থাৎ যিনি এঁদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত দেখতে, প্রশ্ন করলেন—তুমি কলেজে পড়ছ?

বাবা তাহলে তাঁর বাহিনীকে পুত্রের গৌরবময় অধ্যায় আগেই শুনিয়ে রেখেছেন। বললাম, হ্যাঁ।

তিনি আমার প্রতি হৃষ্টচিত্তে তাকিয়ে আছেন। বাবা বললেন, ইনি পঞ্চতীর্থ কুলদাচরণ। বিশিষ্ট পণ্ডিত। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বাবার কর্মক্ষমতা জাহির করতে চাইলেন। তিনি শুধু ব্রাহ্মণ ভোজনে সাদামাটা বামুনই আনেননি। সঙ্গে একজন পঞ্চতীর্থও নিয়ে এসেছেন। বাবা কি আগে থাকতেই বাড়ির আবহাওয়া টের পেয়ে গেছেন। আগে থাকতেই আমাকে সতর্ক করে দিলেন, মাকে বুঝিও। তিনি যেন কলহে প্রবৃত্ত না হন।

বাবার বাহিনী হাঁটতে শুরু করেছে। দীর্ঘকায়, ক্ষীণকায় এবং অস্থিচর্মসার এই

ব্রাহ্মণকুলকে নিয়ে বাবা আমাদের ছোট থাকবার ঘরটায় সামলাবেন কী করে বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মা'র অপ্রসন্নতা বাড়বে। সেই ভয়েই বোধ হয় বললেন, বিলু পা চালিয়ে যা। একটু দৌড়ে যা। তেনাদের হাত-মুখ ধোবার জল তুলে রাখ। সন্ধ্যা-আহ্নিক জপতপ আছে।

আমি দৌড়ালাম। বাড়িতে এতগুলো লোকের আহারের কি ব্যবস্থা হবে বুঝতে পারছি না। সারাদিন মা তো উপবাসেই আছে। এমত অবস্থায় এই বাহিনী নিয়ে ঢুকলে কোন্ সতীসাধ্বীর মাথা ঠিক থাকে। কাল এলে কী ক্ষতি হত, মা এমন প্রশ্ন করতে পারে। বলতে পারে, তোর বাবার কি মতিচ্ছন্ন হয়েছে। একটু জোরে বললেই কানে যেতে পারে। বিষয়টি বাবার কাছে খুব পরিষ্কার বলেই কেমন চোখে-মুখে শঙ্কা দেখতে পেলাম। বাবার জন্য এসময় কষ্টের উদ্রেক হতেই দেখলাম ক্যাম্পের মধ্যে ঢুকে গেছি। মা তো বুঝবে না, বাবা তাঁর বাড়িঘরের মঙ্গলার্থেই কোন ঝুঁকি নিতে সাহস পায়নি। দ্বাদশ ব্রাহ্মণ ভোজন না করলে দাসের মা'র আত্মার মুক্তি ঘটবে না এমন বিশ্বাস যাঁর, সঙ্গে লোটা-কম্বলের মতো ঝুলিয়ে না এনে করেনটা কী। তিন-চার ক্রোশ হেঁটে কেউ যদি শেষ পর্যন্ত আসতে রাজী না হয়। দাসের হয়ে যখন কাজটার ভার নিয়েছেন তখন তা নির্বিঘ্নে শেষ না করা পর্যন্ত বাবার স্বস্তি নেই। বাড়ি ঢুকতে আমারও ভয় লাগছিল। পিলু ততক্ষণে বাহিনীর খবর ঠিক মাকে পৌঁছে দিয়েছে। এতগুলো মানুষ বিনা নোটিশে বাবা বাড়ি নিয়ে ঢুকলে জননীর পক্ষে যে প্রকৃতিস্থ থাকা দুরূহ বুঝতে আমারও কষ্ট হল না। ঘরে চাল ডাল বাড়ন্ত থাকাটা একজন সংগ্রামী মানুষের লক্ষণ। বাবা কথাবার্তায় এটা মাকে বুঝিয়ে দিতে কসুর করেন না। সেই সংগ্রামী মানুষ যে যখন তখন একটা বাহিনী নিয়ে ঢুকতেই পারে—তাঁর হক আছে, ঢুকবার মুখে বাবার এমন একটা হম্বিতম্বি চেহারা দেখতে পায় এবং এতেই যত অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। বাড়ির এই অশান্তি বাইরের লোক টের পাক আমি পিলু কেউ চাই না। এখন কলসী কলসী জল আনা দরকার। ক্যাম্পের কল। বেশ দূর। কত জল লাগবে কে জানে। জপতপে বসলে কী হবে। কোথায় বসবে। সরু বারান্দা—ন'জন বামুন আড়াআড়ি বসলে পাত পাতার জায়গা থাকবে না। উঠোনে—কিন্তু যা হিমেল হাওয়া, ঠাণ্ডাতে সেই কুঁজো লোকটা শেষ পর্যন্ত বাবার ঘরবাড়িতে শেষনিশ্বাস না ত্যাগ করে। ভোজনের লোভেই এতটা হেঁটে আসা, চোখমুখ দেখে ঠিক টের পেয়ে গেছি।

বাড়িতে বারান্দায় একটা হারিকেন জলছে। কারো সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে

না। কী ব্যাপার। এমন একটা উদোম ঘরবাড়ি—হাট করে সব খোলা, মা-মায়া গেল কোথায়? পিলুটা। ডাকলাম, পিলু। পিলুরে। ডাকলাম মা-মায়া? কোন সাড়া নেই। ঘরে নেই, রান্নাঘরে নেই, গোয়ালে থাকতে পারে না। ঠাকুরঘরে নেই। গেল কোথায়। তখনই গোয়ালঘরের পাশ দিয়ে বাড়ির দিকে বাবার পথটায় পিলুর গলা পেলাম। ছুটে গেলে দেখলাম অন্ধকারে মা মায়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে। মা'র কোলে ছোট ভাইটা। পিলুর খবর শোনার পরই মা যা দেবী সর্বভূতেষু হয়ে গেছে। গৃহত্যাগের হুমকি। পিলু সাধাসাধি করছে, মা তুমি যেও না। বাবা তো চিরটা দিন এমন। বাবা ফিরুক না। সব শুনে না হয় যেও। তুমি খেলে না মা?

আমি মা'র কাছে গিয়ে বললাম, বাড়ি চল।

মা বলল, তোরা গিয়ে থাক। আমি থাকব না।

না থাকার কী হল।

আমার বুঝি এটা শরীর না।

আমরা সব করব। তবু চল।

ঘরে এক মুষ্টি বেশি চাল নেই। কিচ্ছু নেই। এতগুলো লোককে কী খাওয়াবে তোর বাবা?

বাবা আসুক তো। দেখ না কী হয়।

কী হবে আবার। বলবে যাও না, ধীরেনের বাড়িতে, ধারকর্জ মানুষ কত করতে পারে। তোর বাবার কী সে বোধ আছে।

আমি জানি, মাকে কোনরকমে দুটো মুখে দেওয়াতে পারলে সব অভিমান রাগ জল হয়ে যাবে। বাবা ফিরে আসায় মা'র দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে, কিন্তু আক্রোশটা যায়নি। মা'র এটা হয়। বাবার উপর সব আক্রোশ মেটাবার একটাই পথ। মা অনশন করে বাবার উপর আক্রোশ মেটায়। যে-ভাবে হোক, বাহিনী ঢোকার আগে মাকে খেতে বসাতে হবে। বললাম যদি এক্ষুণি না ফের আমিও বাড়ি ছেড়ে পালাব।

আমার পালানোটাকে মা ভয় করে। ত্রাসের মধ্যে পড়ে যায়। একবার পালানোতেই মা তা টের পেয়েছে। মা'র বিশ্বাস এটা আমার স্বভাবে আছে। কোষ্ঠীতেও লেখা আছে। এমন কথায় মাকে খুব কাতর দেখাল। ছোট ভাইটাকে আমার কোলে দিয়ে বলল, যা যাচ্ছি।

না, এক্ষুণি।

আমার ভাল লাগছে নারে।

তুমি এখন যাবে। যাবে কিনা বল?

তোর বাবা খেল না।

বাবা ঠিক খেয়েছে।

কী করে বুঝলি।

মুখ দেখে। মুখ দেখলে আমি বুঝতে পারি।

মা আমার সঙ্গে হাঁটতে থাকল। বাড়ি ফিরে মাকে ঠেলতে ঠেলতে রান্নাঘরে নিয়ে গেলাম। পিলু জল ভরে দিল। মায়া ভাত বেড়ে দিল। মা মাথা নিচু করে খাচ্ছে। বাইরে রাতের অন্ধকার। আকাশে নক্ষত্র ফুটে উঠেছে। গরুটা হাম্বা করে ডাক দিল। কুকুরটা রান্নাঘরের দরজায় বসে মার খাওয়া দেখছে। আর ঠিক এ সময়েই বাবার গলার খাকারি শোনা গেল। বাবা রাস্তায় দাঁড়িয়ে জানান দিচ্ছে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে হাজির। পিলু বারান্দার হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে দৌড়ে গেল। মা আমার দিকে তাকিয়ে বলল, যা এগিয়ে ভাখ। ওনাদের বসতে দে! আমি খেয়ে জল আনতে যাচ্ছি। আমার মা মুহূর্তে একেবারে অন্য নারী হয়ে গেল।

শেষ পর্যন্ত বাবা কত বড় কৃতী মানুষ তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বাবা ওনাদের বসতে দিয়ে বলল, জামা-কাপড় ছাড়ুন, হাত-পা ধোন। ক্লান্তি দূর করুন—আমি আসছি। পিলু খড়-বিচালি পেতে তার উপর লম্বা তালপাতার চাটাই ফেলে দিয়েছে। সব বামুনেরই একখানা গামছার পুঁটুলি সঙ্গে। ওতে জামা-কাপড়। পিলু মা'র সঙ্গে হ্যারিকেন নিয়ে ক্যাম্পে যাচ্ছে। মাকে বললাম, আমি যাচ্ছি। তোমায় আর অসময়ে খেয়ে জল টানতে হবে না। বড় একটা মাটির জালাতে জল ভরা হচ্ছে। বাবা, মাকে একটা কথা না বলে চলে গেল। দু-পক্ষই তেতে আছে এখনও বোঝা যাচ্ছে।

বাবা যখন এলেন তখন একেবারে অন্য মানুষ। সঙ্গে নিবারণ দাস এসেছে। তার গৃহভৃত্য মাণিক এসেছে। মাণিকের মাথায় ন'জন বামুনের সিধা। মাকে উদ্দেশ করে বলল, কর্তামা, সামান্য ভোজনের আয়োজন কর্তাদের জন্য যদি করে দেন। মাথার সেই বড় বেতের কাঠাটা আমরা দু ভাইয়ে নামাতে পারছিলাম না, এত ভারি। মা'র মুখ ভারি প্রসন্ন হয়ে গেছে। ডাল সবজি, তেল, নুন, শুকনো লঙ্কা যাবতীয় সব কিছু। পেল্লাই কাঠাটা টানতে টানতে দু-ভাই ঘরে নিয়ে গেলাম। মা বলল, পিলু বাবা বসে থাকিস না। মায়া ইদিকে আয়। এগুলো আলাদা করে নে।

বাবার তখন গম্ভীর গলা, পিলু তোমার মাকে বল, বেশি কিছু করতে হবে না।

মুগের ডাল, বেগুন ভাজা, ফুলকপির ডালনা, চাটনি। মাণিক দই নিয়ে আসছে। কী বলেন, রাতের ভোজন এতেই হয়ে যাবে। বাহিনীর দিকে তাকিয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন। আবার ডাক, পিলু, দেখতো ব্যাগে তামাকের গোলা আছে। পিলু বলল, দাদা যা না, বাবার কাছে থাক। কত কিছুর এখন দরকার পড়বে। আসলে মুহূর্তে ঘরবাড়ির ছবি কত পাল্টে যায়। মা এক হাতে সব্জি কাটছে। এক হাতে সরু চালের ভাত বসিয়ে দিয়েছে। কাঠের আগুন দাউদাউ করে জলছে। দুটো উনুনে রান্না। মায়া এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে। বাবা তার বাহিনীর সঙ্গে তখন শাস্ত্র আলোচনায় মত্ত। কে বলবে তিনি এ-বাড়ির মানুষ। অতিথি অভ্যাগতের মতো তিনিও হুঁকা খাচ্ছেন আর ধর্মশ্লোক নিয়ে বিতর্ক জুড়ে দিয়েছেন। দেখে মনে হবে আবার না বামুনে বামুনে লাঠালাঠি লেগে যায়।

পিলু মাকে এক ফাঁকে এসে বলল, বাবার কত বুদ্ধি।

মা বলল, হ্যাঁ বুদ্ধি না ছাই।

তুমি মা বোঝ না। ওরা না এলে আমরা এত খেতে পারতাম। ভোজ শুধু কাল নয়, আজও।

মা বলল, যা তো বাবা, ঠাকুরের বৈকালিটা দিয়ে আয়। তোর বাবা সময়ই পাবে না। সারাদিন মানুষটার বড় খাটাখাটনি গেছে। পিলু চলে যেতেই ফের ডাক। মা এ সময় বড় আস্তে কথা বলছেন। মা যে গলা চড়ালে রাস্তা থেকে কথা শোনা যায়, এ মাকে দেখে কে আর বিশ্বাস করবে। পিলু এলে বলল, তোর বাবাকে একটু ডেকে দে।

পিলু বলল, বাবা ডাকছে।

বাবার গায়ে একটা খদ্দরের চাদর। পায়ে খড়ম। পুষ্ট গোঁফ। বাবা আমার বড় সুপুরুষ। কাছে এলে মা ফিসফিস করে বলল, তুমি একটু দই মুড়ি খাও। কখন রান্না হবে। পেটে তো কিছু নেই বুঝতে পারছি। বলেই মা বাবার দিকে চকিতে তাকাল। মাথার ঘোমটা সামান্য টেনে দিল। বুঝি মা'র এই সুন্দর চাউনি বাবাকে ঘরবাড়ির জন্য আরও দীর্ঘায়ু করবে। বাবার পৃথিবীটা কত ভরাট এ মুহূর্তে দু'জনের কাছাকাছি থাকার মধ্যে টের পেলাম। আমার মা, আমার বাবা সুখে-দুঃখে বড় কাছাকাছি। পিলুকে আজ আর পায় কে। বনভূমির মধ্যে এতগুলি মানুষের উপস্থিতি, ধর্ম আলোচনা, আকাশের অজস্র নক্ষত্র, এই কলগাকুড়ের গাছ সহ পেছনের বনভূমি নিয়ে আজ বড় বেশি চঞ্চল। এমন সুসময় মানুষের জীবনে বড় কম আসে। পিলুর কাজেকর্মে ছোটাছুটি দেখলে তা আজ বড় বেশি বোঝা যায়।

এ-ভাবে বৈশাখ মাস এসে গেল।

মাঝে একদিন পিলুকে সঙ্গে এনেছিলাম। বৌদি, বদরিদা, নটু, পুটু, লক্ষ্মী সবাই এতে খুশি। সারাটা সকাল আমাকে পড়তে দেয়নি। নটু পুটুও পিলুকে অজুহাত করে পড়া থেকে উঠে গেছে।

এই দেবস্থান অনেকটা জায়গা জুড়ে। সামনে রেললাইন, পাশে আমবাগান, পেছনে ঝিল। উত্তরে বড় বড় সব অশ্বত্থের ছায়া। বটের ঝুরি নেমে জায়গাটাকে এক গভীর অরণ্য সৃষ্টি করেছে। পিলু যতক্ষণ ছিল এই সব বড় বৃক্ষের নিচে ঘুরে বেড়িয়েছে। সকালে মুড়ি, মণ্ডা, সন্দেশ কলা খেয়েছে। সকালের খাওয়াটা আমাদের লক্ষ্মীর জিম্মায়। এত দিয়েছিল যে পিলু যতই খেতে ভালবাসুক— এত খাওয়া কঠিন। কিন্তু লক্ষ্মী শুনবে না। পিলুর রাক্ষুসেপনা ধরা পড়বে ভয়ে সেবারে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম লক্ষ্মী এটা বোঝে। যাতে পিলুর কোন কারণে কম না হয় সেজন্য লক্ষ্মী সতর্কতার খাতিরে জামবাটি ভরে সব দিয়েছিল। লক্ষ্মীকে বলেছিলাম, অতটা দিলে, খেতে পারবে না। নষ্ট করবে।

লক্ষ্মী আমার কথায় কোন কর্ণপাত করেনি। পিলুকে বলেছিল, খাও। লজ্জা কর না। দাদাটা তোমার খাওয়া পছন্দ করে না।

পিলু বড় বড় চোখে শুধু দেখছিল। খাওয়া পেলে সে খুব চুপচাপ খেতে ভালবাসে। বড় বড় চোখে তাকায় আর গোগ্রাসে খায়। রাস্তায় নিয়ে আসার সময় বলেছিলাম, রাক্ষসের মতো খাস না। রয়ে সয়ে খাস।

খাওয়ার প্রথমদিকে বোধহয় মনে ছিল কথাটা। কিন্তু খেতে খেতে কখন ভুলে গেছে। ভাল খাবার পাতে পড়লেই মনে হয় কেউ ওরটা কেড়ে নেবে। সে প্রায় বলতে গেলে গিলতে আরম্ভ করেছিল। লক্ষ্মী খেতে দিয়ে অন্য দিন চলে যায়। সেদিন গেল না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিলুর খাওয়া দেখছিল। নটু পুটুর এই সব মণ্ডা খেতে খেতে অরুচি ধরে গেছে। মন্দিরে জমা থাকে সব। সকালে বৌদি মন্দির দর্শনের সময় বের করে আনেন। সবার জলখাবার ও-থেকেই হয়। নটু পুটু মাঝে মাঝে বাড়ির মধ্যে ঢুকে হল্লা জুড়ে দেয়। খাব না, রোজ রোজ এক খাবার, খাব না। তখন তেল-মুড়ি, কাঁচা লঙ্কা দিলে ওরা বড় কৃতার্থ হয়ে যায়। পিলুর রোজ তেল-মুড়ি—সেদিন মিঠাই-মণ্ডা। সে সত্যি বড় বেশি গিলছে। আমাদেরটা প্রায় পড়েই আছে, আর পিলুর ভরা জামবাটি শেষ। লক্ষ্মী আমার দিকে একবার ত্যারচা চোখে তাকাল। পিলুকে যে বারণ করব, এ-ভাবে খাস না, খেতে নেই, সে উপায়ও নেই।

লক্ষ্মী বোধহয় আবার কিছু আনতে গেল।

ভেতরে আমার প্রচণ্ড রাগ। তুই বুঝিস না কেন মাস্টারের ছোট ভাই তুই। কিন্তু রেগে গেলে খারাপ দেখাবে। শুধু বললাম, পিলু আর খাস না। দুপুরে যে বড় রকমের ভোজ আছে ও-কথা বলতে পারিনি। সামনে নটু পুটু। ওদের কাছে পিলুর খাওয়াটা বড় নয়, পিলুকে নিয়ে কতক্ষণে আমার জিম্মা থেকে বের হয়ে যাবে। কী করে যে পিলুকে একা পাওয়া যায়। অগত্যা নটু পুটুকে বলেছিলাম, দেখে আয় ত বদরিদা কী করছে।

ওরা চলে গেলে বললাম, মারব এক থাপ্পড়। পাজি হতভাগা এত খেলি।

পিলু বলল, বারে দিলে খাব না।

দুপুরে কত বড় ভোজ। আর তুই···।

পিলু জিভ কামড়ে বলল, ইস, ভুলেই গেছি রে দাদা।

লক্ষ্মী তোকে আবার মিঠাইমণ্ডা দেবে। খাস না কিন্তু।

আর খাই। সে-যেন খুবই আহাম্মকের মতো খেয়েছে এমন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

লক্ষ্মী এলে, পিলু ছুটে পালাল। খাব না বলতে তার লজ্জা লাগে। জীবনেও এ-কথা বলার সুযোগ পায়নি। ও চলে গেলে লক্ষ্মীকে বললাম, নিয়ে যাও। দুপুরের খাওয়াটা ওর আর মাটি কর না।

লক্ষ্মী কী বুঝল কে জানে। বলল, ছেলেমানুষ খাবে। ঘুরে বেড়ালেই হজম হয়ে যাবে। দুপুরের খাওয়া মাটি করার জন্য ওকে এত দিইনি মাস্টার। লক্ষ্মী সব বাটি, গেলাস হুড়মুড় করে তুলে নিলে বুঝতে পারলাম, লক্ষণ ভাল না। ডাকলাম, এই লক্ষ্মী শোন।

কী তুমি কিছু ভাবলে না তো।

কী ভাবব। বলে আর দাঁড়াল না। লক্ষ্মীকে নিয়ে এই এক মুশকিল। ও কোন ভুল করলে সেটা কিছুতেই শুধরে দেওয়া যাবে না। ওর একটা কারণ, সে বালবিধবা এবং দেবস্থানে পড়ে আছে বলে সবাই তাকে হেনস্থা করে। সব সময় ওর মধ্যে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তারের একটা প্রবল ইচ্ছে থাকে।

পিলু আসা মাত্রই সেটা শুরু হয়েছে। ভেতরে ওর কোথাও একটা খালি জায়গা আছে। সেখানে কখন কে যে জায়গা করে নেবে বোঝা যায় না। সেদিন বোধহয় পিলুকে দিয়ে জায়গাটা ভরাট করতে চেয়েছিল। এ-কথার পর সে পিলুর আর কোন খোঁজখবরই করেনি। এমন কী আমি পিলু, বদরিদা, নটু, পুটু যখন বারান্দায় খেতে বসলাম, লক্ষ্মী একবার ভুলেও এদিকটায় ঘুরে যায়নি। জল, নুন, কাগজি লেবু সহ কলাপাতা জলে ধুয়ে দেওয়ার কাজটা লক্ষ্মীর। বৌদি

এক হাতে সব করতে থাকলে, একবার শুধু বদরিদা বলেছিলেন, লক্ষ্মী কোথায়? বৌদি বলেছিল, গোলাঘরে আঁচল পেতে শুয়ে আছে। কে এখন ওর মুখ নাড়া শুনবে।

লক্ষ্মীর মুখনাড়াকে বৌদিও ভয় পায়। ডাকেনি। বদরিদা আর কিছু বলেন নি। আমার কিন্তু প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল ভেতরে ভেতরে। দাসী বাঁদির কাজ করিস, তোর এত মুখনাড়া থাকবে কেন। বৌদির উপর রাগ হল, এত ভাল-মানুষ হলে তোমার সংসার চলবে কী করে। তারপরই মনে হল, কারণটা কী পিলু? সেই খাওয়া নিয়ে কথা বলায় কী লক্ষ্মী অভিমান করে শুয়ে আছে? ওর এই মান-অভিমান নিয়ে প্রশ্ন করার কেউ নেই। লক্ষ্মী বলছে, খাবে না। খাবে না এই পর্যন্ত। কেন খাবে না বলছে প্রশ্ন করার কেউ নেই। অসুখ-বিসুখ হতে পারে—না সে প্রশ্ন করার কেউ নেই। বৌদিও সাহস পায় না ওর মুখনাড়ার ভয়ে। খুব বেশি বাড়াবাড়ি করলে বদরিদা যাবেন। এক ধমক, ওঠ, ওঠ বলছি। যাও খাওগে। তখন লক্ষ্মী সুড়সুড় করে উঠে পড়বে। খাবে আর কাঁদবে। এ-দৃশ্য ওর আমি কতদিন দেখেছি। আমার কথায় কেউ আঁচল পেতে গোলাঘরে শুয়ে আছে ভাবতেই মনটা কেমন চঞ্চল হয়ে উঠল। এক অসহায় নারী অফুরন্ত স্নেহের ভাণ্ডার নিয়ে এই দেবস্থানে পড়ে আছে। কতবার তার প্রমাণ পেয়েছি। পিলুর খাওয়া নিয়ে লক্ষ্মীকে ও-ভাবে না বললেই ভাল হত। খাচ্ছি আর নিজেকে বার বার ধিক্কার দিচ্ছি। বৌদি শুধু একবার বলেছিলেন, এ কী বিলু তুমি কিছুই খাচ্ছ না। কী বলব। একদিন পিলুকে না খাইয়ে পাঠিয়ে দেবার পর খেতে পারছিলাম না, খেতে খেতে গোপনে কাঁদছিলাম। সেদিন লক্ষ্মীর জন্য তেমনি এক আমার কষ্ট। দেবস্থানে এক মারমুখী নারীর ছবির মধ্যে কোনো গোপন সৌন্দর্য এ-ভাবে লুকিয়ে থাকে সেদিন টের পেয়েছিলাম। সবার অলক্ষ্যে সেই গোলাঘরে গিয়ে ডেকেছিলাম, এই লক্ষ্মী আজ আবার না খেয়ে থাকবে না তো?

সহসা দেখেছিলাম, লক্ষ্মী আঁচল তুলে লাফিয়ে উঠেছিল। বলেছিল আমার দায় পড়েছে না খেয়ে থাকতে। তারপর শাড়ি সামলে সুমলে যাবার সময় মুখের উপর বলে গেছিল, তুমি আমাকে কী ভাব ঠাকুর।

লক্ষ্মীর আমাকে সেই প্রথম ঠাকুর বলে সম্বোধন। এটা সম্মানের না অসম্মানের বুঝতে পারিনি। পরেও লক্ষ্মী আমাকে একা পেলে বলেছে, ঠাকুর, আর পড়ে আমায় উদ্ধার করতে হবে না। রাত অনেক হয়েছে শুয়ে পড়। রাত জাগলে শরীর খারাপ করবে।

অথবা বলত, ঠাকুর বিয়ে থা কর। সুন্দর মতো ঠাকরুন আসুক, পুজো দেব।
কাকে ?
তোমাকে না গো, আমার প্রাণের ঠাকুরকে।
মাঝে মাঝে মনে হত, লক্ষ্মীর কী মাথায় গোলমাল আছে। বড় বেশি বেপরোয়া।
বয়স অনুযায়ী বেশি পাকা পাকা কথা বলে। লক্ষ্য করেছি, আমি বাড়ি যাব বললে, লক্ষ্মী কেমন জলে পড়ে যায়।
আমাদের বুঝি পছন্দ না ঠাকুর।
এ কথা কেন ?
এই যে ছুটি হলেই বাড়ি যাবার নেশা।
নিজের বাড়ি কার না যেতে ইচ্ছে হয়।
আমাকে নিয়ে যাবে ?
যাবে তুমি ?
যাব না কেন। একদিনও তো বললে না যেতে।
পরে মনে হল, আমি লক্ষ্মীকে একটা বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে পারি না। কি যেন সংকোচ। অথচ লক্ষ্মী কত সহজে বলল যাবে। আমি নিজেও না বুঝে কথাটা বলেছি। লক্ষ্মী আমার সঙ্গে যেতে চাইলেই নিয়ে যেতে পারি না। আর লক্ষ্মীর যা স্বভাব, হয়তো গিয়ে ভেতর বাড়িতে তখনই বলবে মাস্টারের সঙ্গে যাচ্ছি। আজ ফিরব না। জলটল যা লাগে তুলে নিও। লক্ষ্মী বললে দোষের হবে না। তার স্বভাব সবাই জানে। কিন্তু আমার উপর বাড়ির মানুষদের ভরসা নাও থাকতে পারে। কী আক্কেল তোমার মাস্টার, একটা সোমত্ত মেয়েকে এক বনজঙ্গলের ভেতর দিয়ে নিয়ে যেতে চাও। তাড়াতাড়ি কথা ঘুরিয়ে বললাম, চল না একদিন। বৌদি, দিদি, নটু, পুটু তুমি সবাই। সবাইকে নিয়ে বেড়িয়ে আসি।
সবার সঙ্গে কেন যাব ঠাকুর ? যেতে হয় তোমার সঙ্গে যাব। যা কপালে থাকে হবে।
আমার চোখমুখ কেমন ঝাঁ ঝাঁ করছে। লক্ষ্মী আকারে-ইঙ্গিতে কথাবার্তা কেমন আমাকে নাড়া দেয়। বেশ গম্ভীর গলায় বললাম, সে হয় না।
হয় না কেন।
কিছু একটা হলে ?
কী হবে।
হতেও তো পারে।

তুমি আমাকে খেয়ে ফেলবে বুঝি ?

হতেও পারে।

লক্ষ্মীর সঙ্গে থেকে আমি নিজেও পেকে যাচ্ছিলাম। লক্ষ্মী কি ধরতে পারে! আসলে আমার মুখ যতই নবীন সন্ন্যাসীর মতো দেখাক, আমি তা নই। আমিও বড় হয়ে গেছি। আমারও একটা ছোট্ট মত্ত বালিকাকে সঙ্গী পেতে ইচ্ছে করে। এই বয়সটার কী ধর্ম লক্ষ্মীর বোধহয় তা নখদর্পণে। কলেজে আমার বয়সী একটা সুন্দর মেয়েকে দেখার জন্য কতদিন যে কলেজ টাওয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে থেকেছি। আবার চোখ তুলে যদি আমাকে দেখতে পায় মেয়েটা। নাম জানি না। নাম জানার সাহসও ছিল না। ওর সঙ্গে আমার কোন ক্লাস হয় না। কেন যে ওদের সেকসনে আমি ভর্তি হলাম না। কো-এডুকেশন কলেজ। মেয়েটিকে যখনই দেখি তখনই ভারি নতুন মনে হয়। আমার মতো লম্বা। পাতলা চেহারা। লালপেড়ে শাড়ি পরনে। পায়ে নীল রঙের চটি। শীতের দিনে র‍্যাপার গায়ে যখন সে সিঁড়ি ধরে কেয়াফুলের গাছটার পাশে হারিয়ে যায় তখন কেমন এক শূন্যতায় ভুগি। আমার মুখ দেখে লক্ষ্মী কী টের পায় তার ঠাকুর ভালবাসার কাঙাল।

লক্ষ্মী হঠাৎ জোরে হেসে দিল, সে সাহসই তোমার নেই।

আমি আর একটা কথা বলতে সাহস পেলাম না। লক্ষ্মী এর পর কী ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলবে বুঝতে পারছিলাম না। অথচ সেই একদিন, আমি ওর মুখ দেখতে গেলে, কি কাতর গলা, না মাস্টার না, আমার সঙ্গে জড়িয়ে যেও না। তোমার অমঙ্গল হবে।

আসলে আমার এই ঘরটা বিকেলের দিকে খালিই পড়ে থাকে। এ বাড়িতে সবারই দিবানিদ্রার অভ্যাস। রাতে শিবা-ভোগের জন্য বারটা পর্যন্ত জাগতে হয় এটা এ-বাড়িতে থাকার পরেই বুঝে গেছি—এখন বুঝে গেছি, কলেজ থেকে সকাল সকাল ফিরলে লক্ষ্মী খুশি হয়। সে যেন অপেক্ষা করে থাকে। সে কী সত্যি মনে মনে তার প্রাণের ঠাকুর ভেবে নিয়েছে। নাহলে এত সেবাযত্ন, আমার যে বাবুয়ানি, সব কিছু ফিটফাট, চুল লম্বা, এবং একদিন কী ভেবে দাড়ি কামাব কিনা ভাবতেই লক্ষ্মীর উদয়। লক্ষ্মীকে বললাম, নাপিত এলে বল ত। নাপিত মাঝে মাঝে আসে। বদরিদার দাড়ি কামিয়ে যায়। মন্দিরের চত্বর দিয়ে ঢোকে এবং দাড়ি কামিয়ে আবার ফিরে যায়। সাবান ব্রাশ, গরম জল, খুর, সব লক্ষ্মীর জিম্মায় থাকে। লক্ষ্মী আমাকে খবরটা দিতে পারে ইচ্ছা করলে। লক্ষ্মী বলল, এ-কিগো, তুমি কি বুড়ো হয়েছ ?

বুড়ো হলেই বুঝি দাড়ি কামায়।

দাড়ি কামালে তোমাকে বিশ্রী দেখাবে। ঠাকুর তোমার এ-মতি কেন!

আচ্ছা লক্ষ্মী, তুমি আমায় ঠাকুর ঠাকুর কর কেন?

মানুষের ঠাকুর থাকে না?

তুমি তো আমার সঙ্গে ঝগড়া কর কেবল।

ঠাকুর, তোমার মতো আমিও ভালবাসার কাঙাল। বলেই ছুট লাগিয়েছিল।

সবাই ঘুমাচ্ছে। ভেতরের দুটো দরজা পার হয়ে লক্ষ্মী এখন কোথায় যেতে পারে জানি। সে ঝিলের ঘাটলায় গিয়ে বসে থাকবে। রান্নাবাড়ি পার হয়ে পেছনের মাঠটায় পড়লে ঝিলের ঘাটলা দেখা যায়। সেখানে লক্ষ্মী নেই। সে ভালবাসার কাঙাল, আমিও। লক্ষ্মীর জন্য মায়া লাগে, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাই, আবার কলেজের সেই সমবয়সী মেয়েটাও আমাকে কেমন মুহ্যমান করে রাখে। সে একবার চোখ তুলে দেখলেই সারাটা দিন আমার যে কী ভাল কাটে।

লক্ষ্মী ঝিলের ঘাটলায় নেই, অশ্বত্থের নিচে নেই, রেললাইন ধরে হেঁটে কোথাও যেতে পারে—লাইনে উঠে দেখলাম নেই, ফিরে এসে মন্দিরে ঢুকতে যাব, দেখি লক্ষ্মী মন্দিরের দরজার সামনে সিঁড়িতে মুখ নিচু করে বসে আছে। বাবাঠাকুর তার ঘরে বসে পুরনো সব ধর্মপুস্তক ঘাঁটাঘাঁটি করছেন। লক্ষ্মীর প্রতি তাঁর স্নেহ প্রবল। লক্ষ্মীকে দেখলে তিনি মন্দিরের দরজা খুলে বসেন। বলেন, কী খেলি হারামজাদী। অথবা এমন অবস্থায় দেখলে, ভোগের প্রসাদ তুলে হাতেও দিতে পারেন। ভোগের প্রসাদ খেতে ইচ্ছে হলে লক্ষ্মী এখানটায় এসে বসে থাকে জানি। আজ তার কিছুই নেই। কেমন একা এই বিশ্বে লক্ষ্মীর এই নিমগ্ন স্বভাব আমাকে পীড়া দিচ্ছিল। এখানে কিছু বলাও যায় না। বাবাঠাকুর শুনতে পাবে। কিসে কি রোষ জন্মায় বাবাঠাকুরের, এত দিন থেকেও টের পাইনি। বরং ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলি মানুষটাকে।

আমি চলে যাচ্ছিলাম। তিনি কীভাবে যে সব টের পান। ডাকলেন এই বিলু কাকে খুঁজছিস?

কাউকে না বাবাঠাকুর।

মিছে কথা বলছিস?

না বাবাঠাকুর কাউকে নয়।

লক্ষ্মী আমার দিকে তাকাল। আমার চোখে এক অসহায় তরুণের ছবি দেখে বুঝি মায়া হল তার। বলল, বাবাঠাকুর মন্দিরের শান কী ঠাণ্ডা গো। এখানে পড়ে থাকতে মন চায়।

বাবাঠাকুর বললেন, আরে বেটি তুই। বলেই তিনি শ্যামাসঙ্গীত গাইতে থাকলেন। এই মানুষটির এক এক সময় এক এক ভাব। যেন লক্ষ্মীর মুখে সাক্ষাৎ বিশ্বজননী দর্শন করেছেন, ক্যাপা মা আমার বলে এমন আত্মমগ্ন হয়ে গেলেন যে আমাদের দু'জনের পক্ষেই সরে পড়ার এটা প্রকৃষ্ট সময়। লক্ষ্মী চোখ টিপে বলল, পালাও। পালাও। না'লে এক্ষুণি কে জানে বাবাঠাকুরের কী মতি হবে। হয়তো গঙ্গাস্নানে যাবেন বলবেন। কার সাধ্য আছে বলে, না যাব না। নতুবা নীলকুঠির মাঠে। মন্দির থেকে বের হয়ে গাছপালার নিচে অথবা মাঠের মধ্যে দিয়ে তিনিও হেঁটে যেতে ভালবাসেন। তখন কুমারসম্ভব কিংবা কিংস লিয়ার থেকে আবৃত্তি। এমন গম্ভীর গলা যে বিশ্বচরাচরে মানুষের অস্তিত্ব বড় অর্থহীন লাগে। আমার ছোট হৃৎপিণ্ডে অথবা রক্তের ভেতরে যে সুন্দর তরুণী কেবল ভেসে বেড়ায়—সে কথা মনে থাকে না। অকিঞ্চিৎকর মনে হয় জীবন, সব কিছু অর্থহীন। মৃত্যু মানুষের আর এক নিবিড় বন্ধুত্ব, দূরের কথা বলে। মানুষটার কাছে গেলেই এমন টের পাই। বড় ভয় লাগে বাবাঠাকুরকে। বাবাঠাকুরের চোখ রক্তবর্ণ। চুল সাদা। নড়বড়ে দুটো দাঁত ঠোঁটের উপর ঝুলে থাকে। পরনে গেরুয়া কৌপিন। গায়ের চামড়া কোঁচকানো এবং শ্বেত চন্দনের মতো সাদা। কখনও গম্ভীর, কখনও উত্তাল, আবার কখনও ভারি ছেলেমানুষ। কোন এক উত্তরায়ণের সকালে বাবাঠাকুর যৌবনে গৃহত্যাগ করেছিলেন। ধন-সম্পদ সুন্দরী পত্নী বিশাল জমিদারি পরিত্যাগ করে হিমালয়ের পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বদরিদা তাঁর সাক্ষাৎ পান লক্ষ্মণঝোলায়। বদরিদা কফের ধাতের মানুষ। সেখানে মরণাপন্ন হলে বাবাঠাকুর শিয়রে হাজির এবং আরোগ্যলাভ। বাবাঠাকুর সম্পর্কে এই দেবস্থানে এমন সব অলৌকিক কাহিনী কত আছে। লক্ষ্মী ফাঁক পেলে সেই সব কাহিনী শোনায়। মন্দিরে তিনি থাকেন না। রাত হলে নিমগাছটার নিচে শুয়ে থাকেন। শিবা-ভোগের সময় উঠে যান। তখন তাঁর গলার সেই বিচিত্র ডাক—আয় আয় মা। সেই ডাকে দুটো সাদা রঙের শেয়াল ঝিল থেকে উঠে আসে এবং ভোগ খেয়ে চলে যায়। বাবাঠাকুরের কোন কাজে এ পরিবারের ত্রুটি থাকলে ক্ষেপে যান। দেবস্থান ত্যাগ করে দূরের ব্রহ্মময়ী কালীবাড়িতে আশ্রয় নেন। তখন শিবাভোগ নিয়ে ভোগান্তির শেষ থাকে না। সেই অপার্থিব দুই প্রাণী, একমাত্র বাবাঠাকুরের আহ্বানেই সাড়া দেয়। অন্য কেউ ডাকলে তারা আসে না। বদরিদা সংসারের অমঙ্গল আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়েন। বাবাঠাকুরের পায়ের কাছে গিয়ে দিনের পর দিন হত্যে। বাবাঠাকুরের মর্জির বিরুদ্ধে যাবার সাহস

এ পরিবারের কারোর নেই। সুতরাং লক্ষ্মী চোখ টেপায় পা টিপে টিপে সরে পড়লাম। আর তখুনি সিংহের মতো গর্জন, পালাচ্ছিস বিলু!

থমকে গেলাম। চাতাল এবং বিশালকায় প্রাঙ্গণ জুড়ে মন্দিরের কারুকাজ করা ছাদের নিচে বাবাঠাকুরের কণ্ঠ বজ্রধ্বনির মতো শোনায়। আমি যে বাবার ছেলে, তার পক্ষে এই নিনাদ অবহেলা করা খুবই শক্ত। পা টিপে টিপে আবার এগিয়ে যেতে হল। বললেন, তোর ভাইটাকে দেখালি না।

আমার ভাইটা এ বাড়িতেই আছে। কিন্তু কোথায় আছে জানি না। নটু পুটুর সঙ্গে কোথায়ও ঘুরে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্মীর খোঁজে গিয়ে ভাইয়ের কথা ভুলে গেছিলাম। বললাম, কোথায় যে গেল!

লক্ষ্মী বলল, দেখগে মাস্টার ছাড়াবাড়ির গাছে ওরা আছে।

দেবস্থানের দক্ষিণ দিকটায় একটা বড় ছাড়াবাড়ি। সেখানে শীতের সময় শহর থেকে লোকজন আসে বনভোজন করতে। রথও দেখা, কলাও বেচা। সেখানে যেতেই শুনতে পেলাম কে যেন গাইছে, গাঁয়ের ধারে শান্ত নদীটি। কে গায়, ভারি মিষ্টি গলা তো। নটু পুটু কখনও গান গায় বলে জানি না। কোন রাখাল বালকের মতো গলার স্বর চারপাশে ব্যাপ্ত। উদার, উদাস, মায়াবী। পিলু কখনও গান গায় বলে জানি না। তবে কে গায়। ডাকলাম, পিলু আছিস? সঙ্গে সঙ্গে সেই ছাড়াবাড়ির কোন অদৃশ্য স্থান থেকে যে গানের সুর ভেসে আসছিল তা থেমে গেল। আবার ডাকলাম, নটু পুটু! এবারে জবাব, আমরা এখানে মাস্টারমশাই। গাছের উপর থেকে কেউ কথা বলছে। বড় বড় সব আম, জাম, জামরুলের গাছ। একটা গাছ মাটির সঙ্গে কিছুটা সমান্তরাল হয়ে উপরে উঠে গেছে। গাছটার কাণ্ডটার উপর দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে ওঠার মতো উপরে উঠে যাওয়া যায়। গাছটার তিনটি ডাল তিন দিকে ডালপালা মেলে দিয়েছে। ওরা তিনজন গাছের ডালে বসে গাছপাকা আম সব সাবাড় করছে।

বললাম, কে গান গাইছিল রে?

নটু বলল, আমি না মাস্টারমশাই।

পুটু বলল, আমি না।

পিলুও বলল, আমি গাইনি দাদা।

গান গাওয়াটা যে লায়েক হয়ে যাওয়ার শামিল, অপরাধ, ভব্যতার লক্ষণ না, তিনজনই সেটা বুঝে ফেলেছে। বয়সটাই এমন যে সবকিছু সহজেই অস্বীকার করা যায়। কিন্তু এত সব ভাববার সময় নেই। বাবাঠাকুর বসে আছেন। বললাম, পিলু চল, বাবাঠাকুরকে প্রণাম করবি।

পিলু কেমন ভূত দেখে আঁতকে ওঠার মতো বলল, আমি যাব না দাদা। বাবা-ঠাকুর ইচ্ছে করলে চোখের পাকে সব ভস্ম করে দিতে পারে। আমি যাব না, ভয় করে।

বাবাঠাকুর মানুষকে ছাগল ভেড়া গরু বানিয়ে দিতে পারে।

ওর হাত ধরে বললাম, আয়। বাবাঠাকুর সাধুসন্ত মানুষ। তোকে এ সব কে বলেছে।

কে বলবে আবার। আমি জানি।

পিলুর মনের মধ্যেও নানারকম ভয় তবে বাসা বেঁধে থাকে। ফকির আউল বাউল দরবেশ সাধুসন্ত সবাই ভিন্ন মার্গের জীব। এরা খুশিমতো সবকিছু করতে পারে। এরা না পারে এমন কিছু নেই। দেবস্থানে ছাড়া-পাঁঠা অনেক বিচরণ করে বেড়ায়। যাদের মানত থাকে, অথচ বলি দেবার প্রথা নেই, তারা মায়ের নামে পাঁঠা উৎসর্গ করে ছেড়ে দিয়ে যায়। ছাড়া পাঁঠা দেবস্থানের সম্পত্তি। পাঁঠার পাল ঘুরে বেড়ায় দেবস্থানের এই ছাড়াবাড়ি অথবা রেল লাইনের ধারে। সন্ধ্যা হলে চাতালে ফিরে আসে। সময় মতো বলি হয় না বলে ভোমরা পাঁঠার সংখ্যা অনেক। এইসব দেখেই পিলুর ধারণা, এই দেবস্থানে এত পাঁঠা যখন, বাবাঠাকুরের কাজ না হয়ে যায় না। কোপে পড়ে গেলেই পাঁঠা। তারপর ঢাক গুড় গুড়—ট্যাং ট্যাং কাঁসির বাজনা, আর এক কোপে গলা ফাঁকা।

পিলু কিছুতেই যেতে চাইছে না। প্রায় হাড়িকাঠে পাঁঠা টেনে নিয়ে যাবার মতো ধরে নিয়ে যাচ্ছি। নটু বলছে, বাবাঠাকুর খুব ভাল। তুই যা। তোকে দেখবি হাত ভরে মণ্ডা দেবে।

পিলু, যে পিলু ভাল খাবারের নামে পাগল সেই কিনা, নিমগাছটার নিচে আসতেই আমার হাত কামড়ে দিল। আমি বললাম, এই কী করছিস! আঃ বলে হাত ছেড়ে দিতেই দু-লাফে সে রেল লাইন পার হয়ে ছুট লাগাল। যত ডাকি, তত সে দৌড়ায়। মাঠে নেমে ডাকলাম পিলু যাস না। কে শোনে কার কথা। আসলে সব নষ্টের গোড়া এই নটু পুটু। বললাম, ঠিক তোরা বাবাঠাকুরের নামে লাগিয়েছিস।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জনই একসঙ্গে এক বাক্যে বলে উঠল, আমি না আমি না, পুটু। আমি না আমি না, নটু।

দাঁড়া দুটোকেই আজ মজা দেখাব। লক্ষ্মী দূরে দাঁড়িয়েছিল। বললাম, লক্ষ্মী একটা ভাল দেখে কঞ্চি নিয়ে এস ত। এরা বড্ড মিছে কথা বলতে শিখেছে। ছিটকিলার ঝোপ থেকে সরু মতো একটা ডাল ভেঙে নিয়ে এল লক্ষ্মী।

মাস্টারের যা মর্জি, মুহূর্তে রাগ জল হয়ে যেতে পারে। সে দৌড়ে গেল। এবং নিমেষে পাতা ডাল ভেঙে লকলকে বেতের মতো বস্তুটি আমার হাতে দিয়ে বলল, ছাল-চামড়া তুলে দাও মাস্টার। জীবনেও যেন আর মিছে কথা না বলে।

পুটু একটু গোঁয়ার প্রকৃতির। সে বলল, মারুক না মারুক। তোমাকে লক্ষ্মীদি দেখ কী করি।

লক্ষ্মীকে চোখ রাঙানোতে আমার কেমন ইজ্জতে লাগে। আমার সামনে লক্ষ্মীকে শাসানো হচ্ছে।

লক্ষ্মী বলল, কী আস্পর্ধা মাস্টার। তোমার সামনে আমাকে এ কথা বলল। এ ছোঁড়া বড় হলে কী হবে।

বলব না। আমি বলছি, বলিনি।

ওরা জানে, এ-ক'মাসে আমি ওদের উপর একদিনই মাত্র রোষে এলোপাথাড়ি মেরেছি। নটু পুটু দেবস্থানে আসা এক পুণ্যার্থীর সন্তানকে কটু কথা বলে গালিগালাজ করেছিল এবং অভিযোগ দু'-একটি অশ্লীল কথাও সঙ্গে বলেছে। আমার ছাত্রের হেন অশালীনতা যেন আমাকেই বিদ্ধ করেছিল। ওরা আমার ছাত্র, ছাত্রের এই আচরণ তার গৃহ-শিক্ষকটি না কী জানি। সেইহেতু আমি একজন বাউণ্ডুলে বাবার জ্যেষ্ঠ সন্তান হওয়া সত্ত্বেও প্রহার একটু মাত্রাতিরিক্ত করে ফেলেছিলাম। বড়রিদা কিংবা বৌদি এ নিয়ে বরং আমাকেই পরে সমর্থন করেছেন। এই দুই চঞ্চল বালককে যে বশে আনতে পেরেছি তাতেই তাঁরা খুশি। কিন্তু পরে বড় কষ্ট হয়েছিল। নিজেই গেঁদাল পাতার রস লাগিয়ে দিয়েছিলাম। এবং আরোগ্যলাভে যা সেবাযত্ন সবই আমি করেছি। এতে এই দুই বালক আমার প্রতি যেমন ভালবাসা বোধ করে, তেমনি আবদার রক্ষার্থে যখন তখন ছুটি চায়। আমার কথার উপর আর কারো কথা নেই। এই কম বয়সে এত বেশি শাসন করার অধিকার পাবার ফলেই বোধহয় নিজের মধ্যে কোন স্বৈরাচারী তৈরি হয়ে যায়। ভিতরটা আমার রাগে গোঁ গোঁ করছিল। কিন্তু ভয়, শুরুটা জানি, শেষটা জানি না। মাত্রাতিরিক্ত হয়ে না যায় এই ভয়ে অনেকদিন শাসনের নামে লকলকে বেতের ডগা মাত্র মাথায় ছুঁয়ে ভয় দেখাবার চেষ্টা করি, বেশি দূর এগোই না। বারবারই মনে রাখার চেষ্টা করি, শত হলেও আমি এদের আশ্রিত।

বললাম, তুই বলিসনি তো, কে বলেছে?

পুটু চুপ।

লক্ষ্মী বলল, তুমি মাস্টার যেমন। এ ছোকরাই বলেছে। দেখছ না চোখ মুখ।

চোখ মুখ দেখে আমার মনে হয় না পুটু বলেছে। তা না হলে সে এতটা বেয়াড়া হয়ে উঠত না। লক্ষ্মী কিন্তু নাছোড়বান্দা। মাস্টারের সামনে তাকে শাসিয়েছে। যদি কিছু না বলি, আমি জানি লক্ষ্মী আমাকে নেবার জন্যও তৈরি হয়ে আছে। তোমার মাস্টার কিস্যু হবে না। একটা শয়তান এত্তটুকুন ছোঁড়াকে তুমি সামলাতে পার না, তোমার মুখের সামনে শাসায়, তুমি আবার করবে মাস্টারি। তোমারও আখের ঝরঝরে, এদেরও আখের ঝরঝরে।

সমূহ উভয়সংকট থেকে নিজেকে ত্রাণ করার কি উপায় ভাবছিলাম। বললাম, নটু তুই পিলুকে বাবাঠাকুরের নামে ভয় দেখিয়েছিস? পিলু যে চলে গেল বাবা-ঠাকুরকে প্রণাম না করে, তিনি কী ভাববেন বল ত?

আমার নরম কথাবার্তা শুনে লক্ষ্মী মুহূর্তে ক্ষেপে গেল। বলল, নাও হয়েছে। দাও আমার কঞ্চিটা। বলে সে আমার হাত থেকে প্রায় হ্যাঁচকা মেরে সেই প্রহার দেবার বস্তুটি কেড়ে নিল। তারপর যেন আমাদের চেনেই না, এমন করে চারদিক দেখতে দেখতে বলল, মাস্টারি ছেড়ে রাখালি করগে। যার যা মানায়।

লক্ষ্মীর কথায় আমার মাথা গরম হয়ে গেল।

তাই করব।

তাই কর না, কে বারণ করেছে। এখানে মরতে এলে কেন?

পুটু বলল, লক্ষ্মীদি ভাল হচ্ছে না। তোমার বাড়ি? তুমি বলার কে? তুমি আর কখ্খনও মাস্টারমশাইকে এমন কথা বলবে না। খুব খারাপ হবে বলে দিচ্ছি।

তোর বাড়ি? তোর খাই? তোর পরি? তুই বলার কেরে?

আঃ লক্ষ্মী কী হচ্ছে।

কী না, কী বলে। দাদাকে না বলেছি—তুই আমাকে এ কথা বলতে পারলি পুটু। আমি দেবস্থানে পড়ে আছি বলে, যা মুখে আসে তাই বলবি। লক্ষ্মী আঁচল চাপা দিয়ে ঝরঝর করে কাঁদছে।

পুটু বলল, দেখলেন মাস্টারমশাই—আমি কী বলেছি। আপনাকে কী না বলেছে, পুটু বদরিদার ভয়ে চোখ-মুখ কেমন শুকনো করে ফেলেছে।

লক্ষ্মী তুমি কিছু মনে কর না। ছেলেমানুষ!

মনে করব না, একশোবার মনে করব। তোমার সামনে যা-তা কথা বলল, আর তুমি কিছু বললে না।

লক্ষ্মী সঙ্গে আমাকেও জড়াচ্ছে। লক্ষণ ভাল না। লক্ষ্মীর চোপাকে সবাই ভয় পায়। আমিও পাই। বেশি আর এগোনো ঠিক না।

ছুটো খেতে পরতে দিস বলে এত কথা। লক্ষ্মী গজগজ করছে। গাছকোমর বাঁধা ওর শাড়ি। গায়ে ব্লাউজ নেই। পায়ে সে কখনও কিছু পরে না। পরার নিয়ম নেই। সে বাড়ির একাই সব সামলায় বলে বৌদি বরং একটু বেশি তোয়াজেই রাখে। সুতরাং এ-হেন তাজা বাঘিনীকে শান্ত না করলে, মাস্টার ছাত্র মিলে সবার উপরই কৈফিয়ত তলব হতে পারে।

লক্ষ্মীকে বুঝ দেবার জন্য বললাম, দেখ না ছুটোকে আজ কী করি। তুমি যাও।

আমি যাব না। এখানে দাঁড়িয়ে থাকব। কি করতে পার, কর দেখি।

আমি বলেছি কিছু করব?

বললে না, এক্ষুনি তো বললে, যাও।

খুবই মুশকিল। কোন কথাই বলা যায় না। আমার উচিত ছিল, মারি না মারি দু-ঘা লাগাই। শুধু এটুকু হলেই লক্ষ্মী প্রসন্ন হবে। ওর প্রসন্নতা রক্ষার্থে অগত্যা বললাম, পুটু তুই বড় বাড় বেড়েছিস। দাঁড়া। হাত পাত।

পুটু এ সব বিষয়ে সব সময় প্রস্তুত থাকে বলে সে হাত পাততে বিন্দুমাত্র দেরি করল না।

লক্ষ্মী বলল, থাক হয়েছে। আর বলবি না তো?

পুটু বলল, বলব।

লক্ষ্মী নিজেই আবার কি ভেবে বলল, মাস্টার আজ রাত বারটা তক পড়াবে। ঝিমুনি এলেই মার। ছোঁড়ার তেজ দেখ।

পুটু এবারে উল্টো আক্রমণ করে বসল, তুমি মাস্টারমশাইকে অপমান করেছ।

ও মা অপমান কি গ আবার।

বললে না, রাখালি করগে।

কথাটা লক্ষ্মীর বলা ঠিক হয়নি। লক্ষ্মী যে অন্যায় কথা বলেছে বোঝা উচিত। বাড়ির একজন গৃহশিক্ষককে এভাবে অপমান করলে ছাত্রদের লাগবার কথাই।

বললাম, লক্ষ্মী তুমি অন্যায় করেছ। এটা তোমার ধৃষ্টতা।

অন্যায় করেছি, বেশ করেছি। সত্যি কথা বললে তেনার রাগ। যা সত্যি ত্রিসংসার লয় পেলেও বলব। লক্ষ্মী কাউকে পরোয়া করে না। ধেষ্টতা। যত আদিখ্যেতা—কথার কি ছিরি!!

লক্ষ্মী হার না মানায় মনে মনে বেশ গুম হয়ে গেলাম। দুই ছাত্রকে বললাম, চল আমরা বেড়িয়ে আসি।

লক্ষ্মী বলল, যাও না। কোন্ চুলোয় যাবে যাও। একটু হেঁটে গেলে লক্ষ্মী দেখলাম পিছু পিছু আসছে।

নটু বলল, তুমি আসছ কেন ?

তোদের সঙ্গে যাচ্ছি না।

কিন্তু বিপদ, দুই ছাত্রকে নিয়ে যেদিকে গেলাম, লক্ষ্মীও সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে গেল। সঙ্গ ছাড়ছে না।

পুটু বলল, কি বেহায়া দেখছেন।

লক্ষ্মীকে বললাম, বাড়ি যাও। কত কাজ তোমার। বৌদি খোঁজাখুঁজি করবে। লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে আছে।

বুঝতে পারলাম, কিছুতেই কাছছাড়া হবে না। যা বলব লক্ষ্মী তার বিপরীত কাজ করে প্রমাণ করবে, সে সব করতে পারে। এ-বাড়িতে তার জোর এই ভাবী উত্তরাধিকারীদের চেয়ে কম নয়।

আমার সঙ্গে লক্ষ্মীর এ-ভাবেই জীবন কাটছিল। সেদিন সন্ধ্যায় কিছুতেই কথা বলব না, স্থির করেছি। লক্ষ্মী বড় কটু কথা সহজেই বলতে পারে। রাখালি করতে পার না কথাটা আমার খুব লেগেছে। লক্ষ্মীর মুখে এমন কথা সাজে না। ওর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ না করলে আরও মাথায় চড়ে বসবে। লক্ষ্মী আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। কথা বললাম না। নটু পুটু আজ লক্ষ্মীকে দেখেই বেশি পড়ায় মনোযোগ দিয়েছে। ওর বড় লাগানি-ভাঙানির স্বভাব। এখন দুপক্ষের মধ্যে চরম অবস্থা বিরাজ করছে। পড়াশোনায় একটুকু গাফিলতি দেখলেই ভিতরবাড়িতে খবর পৌঁছে দেবে, পড়ছে না। গল্প করছে। তিনটেই ফাঁকিবাজ। শত হলেও বদরিদা মানুষ। নৃপ কর্ণেন পশ্যতি। এ-ভয়টা আমাদের তিনজনেরই আছে।

লক্ষ্মী একটা জগে খাবার জল রেখে গেল। কেউ আমরা তাকালাম না। সাঁজ লাগার পর থেকে লক্ষ্মীর কাজ থাকে না। সে বারান্দায় পড়ে পড়ে ঘুমোয়। আজ লক্ষ্মীর কী হয়েছে কে জানে, আমাদের মশারিটা নিয়ে নিচে বসল। আমরা তিনজন একই তক্তপোশে শুই, ঘুমাই, বিছানার চাদর থেকে বালিশের ওয়াড় কাচাকাচির কাজ লক্ষ্মীর অর্থাৎ এ-ঘরটা পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব তার। এক টুকরো কাগজ পড়ে থাকলেও লক্ষ্মীর চোখ এড়ায় না। সে অন্য সব কাজের ফাঁকে এই কাজটা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে করে থাকে। সন্ধ্যার পর ভোঁসভোঁস করে ভেতর বাড়ির বারান্দায় পড়ে ঘুমোয় বলে, রাতে ওকে বড় এ-ঘরটায় দেখা যায় না। আজ একটু ভিন্ন রকমের মতি দেখছি। আমাদের পাশেই ঠিক নিচে মেঝেতে মশারি রিপু করতে বসে গেল। নটু পুটু একবার চোখ তুলে ওদের লক্ষ্মীদির ব্যাপার-স্যাপার দেখতে গেলে ধমক লাগালাম, পড়। কী দেখছিস।

ওরা উচ্চস্বরে দুলে দুলে পড়ছে। আমি একটা ট্রায়াল ব্যালেন্স নিয়ে পড়েছি। কিছুতেই মিলছে না। লক্ষ্মী যেন এখানটায় বসে থেকে তার জোর দেখাচ্ছে। আসলে আমরা তিনজন কিছুই পড়তে পারছিলাম না। যতই মনোযোগী হবার চেষ্টা করি না কেন লক্ষ্মীর এই জেদ আমাদের তিনজনকেই পীড়া দিচ্ছে।

নটু বলল, স্যার বাইরে যাব।

ওদের এ-সময় একটু বেশি প্রকৃতির ডাক পড়ে। বললাম, যা।

তারপর কিছুক্ষণ বাদে দেখলাম, বৌদি দরজায় মুখ বাড়িয়েছে। লক্ষ্মীকে দেখে বলল, তোর এখানে কি। ভিতরে আয়। নটুর কাজ। সে মাকে দিয়ে লক্ষ্মীকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যাবার সময় লক্ষ্মী দাঁতে সূচের সুতো কাটতে গিয়ে কটমট করে আমাদের দিকে তাকাল। যেন বলে গেল, ঠিক আছে। বাবুদের কত ধানে কত চাল দেখব। এ-ব্যাপারে পালের গোদাটি আসলে আমি তা বোধহয় মনে মনে ভেবে নিয়েছে লক্ষ্মী। আমার পরামর্শেই নটু ভেতর বাড়িতে খবর দিয়ে এসেছে। লক্ষ্মী চলে যাবার পর আমরা তিনজন গোল টেবিল বৈঠকে বসলাম। কী করা যায়। যে-ভাবে বাড় বাড়ছে তাতে আমাদের মান-সম্মান নিয়ে টিকে থাকাই কঠিন। বড়দিদাকে নালিশ করতে পারি। কিন্তু এতে কোথায় যেন বাধে। লক্ষ্মীর তো একরোখা স্বভাব। তখনই লক্ষ্মীর আর একটা মুখ আমার সামনে ভেসে ওঠে। ওর বোধহয় আমার উপর কী করে একটা দাবি জন্মে গেছে। সেই দাবি থেকেই হয়ত এমন কথা বলতে সাহস পায়।

নটু বলল, স্যার আমরা যদি লক্ষ্মীদিকে এ-ঘরে ঢুকতে বারণ করে দি।

বুকের মধ্যে কেমন একটা খোঁচা খেলাম।

পুটু বলল, আমাদের কাজ আমরাই করে নেব।

পরদিন সকালে লক্ষ্মী এসে দেখল আমি মশারির দড়ি খুলছি। পুটু ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। নটু বালিশ বিছানা ভাঁজ করে একপাশে রাখছে। যাও এবারে বোঝ। কোন কাজ নেই। বইটই সব ঠিকঠাক করে আমরা মাঠে নেমে গেলাম। আমাদের সকালের দাঁত মাজা হাত মুখ ধোওয়া সব ঝিলের ঘাটলায়। লক্ষ্মীকে জল এনে রাখার কাজটা থেকেও রেহাই দিলাম। জামাপ্যান্ট নিজেই কাচাকাচি করে ভাত, ডাল, মাছভাজা খেয়ে যে যার কলেজ স্কুল। লক্ষ্মীকে যাবার সময় দেখলাম, মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। মেঘলা আকাশের মতো মুখ ভার করে রেখেছে।

আর কলেজ থেকে ফিরে দেখলাম, ঘরটা ভণ্ডুল মামার বাড়ি হয়ে বসে আছে। সব ছত্রখান। মেজাজ কার ঠিক থাকে। গেঞ্জি পাচ্ছি না। তোয়ালে নেই।

এ-সব না থাকলে লক্ষ্মীর কাছে খোঁজ করতে হয়। লক্ষ্মীরও পাত্তা নেই। পুটু বলল, দেখলেন কী করেছে!

কে করেছে?

লক্ষ্মীদি আবার কে?

ওর এত সাহস!

কেউ কিছু বলে না। না আর পারা যাচ্ছে না।

লক্ষ্মী ঠিক এ-সময় নগর নন্দিনীর মতো ঘরে ঢুকল। হাতে ঝাঁটা নিয়ে ঘর সাফ করল। বালিশ চাদর তোষক নিজের মতো গোছগাছ করে রাখল। বইপত্র তুলে তাকে সাজিয়ে রাখল। অর্থাৎ এ-সব কাজের অধিকার তার। অন্য কেউ করলে সে সহ্য করবে কেন। অধিকার বলে কথা। নটু পুটু বোধহয় আমার উপর আস্থা হারিয়ে তাদের অভিভাবকের কাছে চলে গেল নালিশ করতে। লক্ষ্মীর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। বললাম, তুমি ভাল করলে না। বদরিদাকে কী বলব! যা বলবার আমি বলব। তোমাকে কিছু বলতে হবে না।

বদরিদা ডেকে পাঠালেন। বললেন, কী হয়েছে তোমাদের। লক্ষ্মী তুই ওদের পেছনে কেন লেগেছিস?

ওমা! কী বলেন গো দাদা! আমি কী করেছি। ওনারা নিজেরাই করবেন। ঘর ঝাড় দেবেন, বিছানা তুলবেন, ঘাটলায় গিয়ে দাঁত মাজবেন—আমার থাকা কেন তা'লে। কাজের নামে তেনারা ফাঁকি দেন না। পড়ার নামে ফাঁকি আমি সইতে পারব না।

তার মানে লক্ষ্মী বদরিদাকে বোঝাতে চাইল, পড়ায় মন নেই আমাদের। এটা ওটা করে সময় কাটিয়ে দেওয়া। বদরিদা বললেন, এ-সব কাজ যদি তোমরাই কর, তা'লে লক্ষ্মীই স্কুলে যাক। তোমরা সাফসোফের কাজে লেগে পড়। উল্টো ফল। নটু পুটু এদিকটা বোধহয় একেবারেই ভাবেনি। এবং আমরা তিনজনই মুখ শুকনো করে যখন বের হয়ে এলাম, তখন লক্ষ্মী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বারান্দায় হাসছে। লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে নটু পুটু জিভ ভেংচে দিল। লক্ষ্মী ওদের না ভেংচে আমাকে ভেংচাল। আমি ভাবলাম, আর কথা না। সত্যি কথা বলা বন্ধ হয়ে গেল লক্ষ্মীর সঙ্গে। আমরা তিনজনের একটা ফ্রন্ট, লক্ষ্মী একা একলা একটা ফ্রন্ট। আমরা তিনজনই লক্ষ্মীকে আড়ি করে দিলাম। লক্ষ্মী শেষ পর্যন্ত এমনভাবে জব্দ করবে যদি আগে জানতাম।

শনিবার বিকেলবেলাতে বাড়ি যাই। রোববারের বিকেলে ফিরে আসি। কলেজ থেকে ফিরে দুটো মুখে দিয়ে বাড়ি যাব বলে জামাপ্যান্ট পরছি। দেখি লক্ষ্মী

হাজির। নিজে থেকেই বলল, তুমি কথা না বললে ত বয়ে গেল। আমি তোমার সঙ্গে যাব।
কোথায় যাবে?
কেন তোমাদের বাড়িতে।
তুমি আমার সঙ্গে কোন কথা বলবে না! তোমাকে আমি নিতে পারব না সঙ্গে। আঁচলের তলা থেকে একটা পুঁটুলি বের করে লক্ষ্মী টেবিলে রাখল। না নাও, এটা সঙ্গে নাও। পিলুকে দেবে।
কিছু নিতে পারব না।
লক্ষ্মী বলল, ঠিক আছে। সে পুঁটুলিটা ফের আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে ফেলল। আমার সন্দেহ হল কেমন। পুঁটুলিতে কী আছে? যে-ভাবে আঁচলের নিচে লুকিয়ে রেখেছে তাতে সংশয় হবারই কথা। দাদা বৌদি জানল না, লক্ষ্মী গোপনে দিতে এসেছে, ফের প্রশ্ন না করে পারলাম না, ওতে কী আছে।
লক্ষ্মীও তেরিয়া হয়ে বলল, কী আছে বলব না।
ধুস যত্ত সব, এক লাফে তক্তপোশ থেকে নেমে বাইরে বের হয়ে এলাম। লক্ষ্মীকে বললাম, দরজা বন্ধ করে দাও। লক্ষ্মী কথা বলল, না। সেও বাইরে বের হয়ে এল। ওর পায়ে তোড়া, হাতে রুপোর চুড়ি। চুল সুন্দর করে পরিপাটি করে খোঁপা বাঁধা। চুলে তেল বেশি দেওয়ায় মুখটা বড় বেশি চকচক করছে। উঁচু বারান্দা থেকে আমি লাফ দিয়ে রাস্তায় নামলাম, লক্ষ্মীও ঠিক আমার মতো লাফ দিয়ে নিচে নামল। এ তো আচ্ছা ঝামেলা।
তুমি আমার সঙ্গে যাবে না।
যাব না।
তবু হাঁটছে। কী করি। সঙ্গে পুঁটুলি। মন্দিরের রাস্তা থেকেই এবার আর না পেরে বললাম, ডাকব বদরিদাকে? ডাকব বৌদিকে।
ডাক না। আমি বলেই এয়েছি।
তুমি বলে এয়েছ যাবে? আমাদের বাড়ি যাবে?
নটু পুটুর মতো কিংবা পিলুর মতো লক্ষ্মীরও যখন তখন তাহা মিথ্যা কথা বলার স্বভাব। এ-মেয়ের কথায় আস্থা রাখা দায়। একবার বৌদিকে না হয় বদরিদাকে বলা দরকার। মন্দিরের দরজা দিয়ে চাতাল পার হয়ে ভেতর বাড়িতে ঢুকে বৌদিকে বললাম, দেখুন লক্ষ্মী কী করছে! আমাকে জ্বালাচ্ছে।
এই তো খুব ভাল মেয়েরা মতো বলে গেল তোর সঙ্গে যাবে।
আমি ওকে নিয়ে যেতে পারব না বৌদি।

এ কী কথা বিলু। কেউ, যেতে চাইলে নিতে হয় না? কবে থেকে বলছে, মাস্টারের বাড়ি দেখতে যাব। মাস্টারের মা বাবাকে দেখে আসব। আর কত যত্ন করে কত কিছু সঙ্গে নিয়েছে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললাম, যাক, হয়ে গেল।

হয়ে গেল কি রে?

হয়ে গেল। জ্বালাবে।

তুই বড় স্বার্থপর বিলু। মেয়েটা তোর জন্য এত করে আর তুই……।

আমার সত্যি আর কিছু বলার নেই। বের হয়ে আসছি, বৌদি বলছেন, এতদিন আছিস, কৈ একদিনও তো বললি না, বৌদি আমাদের বাড়ি চলুন। তোর দাদাকে নিয়ে গেলি না। একদিন তোর মা বাবাকেও নিয়ে এলি না। তোর এত কিসের অহংকার রে।

লক্ষ্মীর নামে অভিযোগ করতে এসে এত কথা শুনতে হবে বুঝতে পারি নি। এটা ঠিক বৌদিকে বলা হয়নি, দাদাকেও না। মা বাবা কিংবা মায়াকে কোনদিন নিয়ে আসিনি। বৌদি বোঝে না, ওখানে গিয়ে দাঁড়াবে কোথায়? ঘরের মধ্যে দুটো বাঁশের মাচান, কিছু মেটে হাঁড়ি, কলসি, একটা পেতলের কলস, টিনের চাল আর চিড়িয়াখানার মতো যত সব জীবজন্তুর বাস। একটা হনুও ইদানীং পিলু আমদানি করেছে। আমার বাবার বাড়িঘরের সঙ্গে এই দেবস্থানের কত তফাত বৌদি একদিন গেলেই টের পেয়ে যাবে। আমাদের দুরবস্থা কেউ টের পেলে, আমার কেমন লাগে। এমনকি গরুটাও আমাদের খোঁড়া। এই যে লক্ষ্মী যাবে, গিয়েই টের পাবে সত্যি আমার বাবা পৃথিবীর কত বড় উদ্বাস্তু। সে এসে সব বললেই হয়ে গেল। বাইরে এসে মাথাটা এত উত্তপ্ত হয়েছিল যে কিছুই খেয়াল নেই। গোঁয়ারের মতো হেঁটে যাচ্ছি। কোন হুঁশ নেই। রেল-লাইনে উঠতেই মনে হল, লক্ষ্মীর যাবার কথা। না নিয়ে গেলে কথা হবে। পেছনে তাকালাম। দেখি লক্ষ্মী নিঃশব্দে ভীতু বালিকার মতো আমার পেছন পেছন আসছে। পুঁটুলিটা ভারি সযত্নে বুকের মধ্যে দু-হাতে চেপে রেখেছে। বড় করুণ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

খুব গম্ভীর গলায় বললাম, হয়েছে। এবারে পা চালিয়ে হাঁট। পা চালিয়ে না হাঁটলে রাত হয়ে যাবে। নবমী বুড়ির বনটা সাঁঝ লাগার আগে পার হতে হবে।

লক্ষ্মী মাথা নিচু করে বলল, আমি জানি।

কী জান?

জানি।

এখন রহস্যময় কথাবার্তা লক্ষীর আমার একদম ভাল লাগছে না। কোনদিন একা কোন সমবয়সী মেয়েকে নিয়ে খালি মাঠপ্রান্তর পার হয়ে যাবার অভ্যাস নেই। ছোড়দির সাইকেলের পেছনে বসে একবার দামোদর নদ পার হয়েছিলাম। ছোড়দি ছিল অভিভাবকের মতো। তখন ভেতরটা এত অপরিষ্কার ছিল না। রেললাইন ধরে যেতে যেতে মনে হল, লক্ষ্মী নিজেও একটা পুঁটুলি। দেবস্থান ছাড়া তার আর কোথাও বোধহয় এ-ভাবে একা একজন উঠতি যুবকের সঙ্গে মাঠ পার হয়ে যাওয়া হয়নি। মন্দির চোখের আড়ালে পড়ে যেতেই দেখলাম লক্ষ্মী কেমন প্রকৃতির মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। গরম ভাপ উঠছিল, সেটা কমে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সামনে সেই কাশবন। মাইলখানেকের মতো এটার ভেতর দিয়ে দু'জনকে যেতে হবে। ভিতরে ঢুকতেই কেমন গা আমার শিরশির করছিল। লক্ষ্মী আগে আগে বেশ পা চালিয়ে হাঁটছে। ওর পায়ে রুপোর তোড়া। ঝমঝম করে বাজছিল। একবার ইচ্ছে হল, পুঁটুলিতে কি আছে দেখি। চাইলেই সযত্নে লক্ষ্মী পুঁটুলি খুলে সব এক এক করে দেখাবে। আমি দেখতে চাই, অথচ দেখাতে বলার সাহস নেই। জীবনে এই প্রথম নিজেকে ভয় পেতে শুরু করেছি। নিজের উপর আস্থা রাখতে পারছি না। পুঁটুলি খুলে দেখার লোভ সংবরণ আমাকে করতেই হবে।

লক্ষ্মী হাঁটছে আর অজস্র কথা বলছে। দু'জন তাজা যুবকের সঙ্গে লক্ষ্মীর সহবাসের ছবির কথা কেবল মনে আসছে আমার। লক্ষ্মী বলছিল, দেখ, দেখ ঠাকুর, মেঘের টুকরো কেমন তালপাতার পাখা হয়ে যায়।

কাশবনের ফাঁকে মাথা তুলে তাকালে নিরন্তর এক আকাশ, টুকরো মেঘের ছবি। লক্ষ্মীর কাছে এই সব টুকরো মেঘ শীতল পাখা হয়ে গেছে। ভিতরে এক দাবদাহ এই নারীর, কোথায় যেন সবুজ এক অরণ্য খুঁজে মরছে। কত প্রশ্ন তার, মানুষ মরে যায় কেন? আকাশে তারারা কোথা থেকে আসে। এই ফুল, ফল, সবুজ ঘ্রাণ কে পৃথিবীতে ছড়িয়ে রাখে? এই অবোধ বালিকার কোনো প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর দিতে পারিনি। গোপনে এক অপার আনন্দ অনুভব করছিলাম। কেবল মনে হচ্ছিল, এমন নিরন্তর নির্জন গভীর ছায়ার মধ্যে দিয়ে লক্ষ্মীকে নিয়ে যেন অনন্তকাল হাঁটি। কিন্তু লক্ষ্মীর সেই রহস্যময় কথা, 'জানি' কি জানে লক্ষ্মী? লক্ষ্মী কি আমার সব ইচ্ছের কথা জানে। আমার চোখ-মুখ দেখে সব টের পায়। তার পুঁটুলিটা যে যথেষ্ট ভারি এতক্ষণে তা আমিও টের পেয়েছি। বললাম, ওটা দাও আমার হাতে।

লক্ষ্মী বলল, না। আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না।

কী আছে ওতে ?

কত কিছু।

দেখাবে ?

দেখবে !

গরমে আমরা দু'জনেই ঘামছিলাম। লক্ষ্মী বলল, আর কতটা ?

বেশি দূর না। কারবালা রাস্তার কাছে এসে গেছি।

লক্ষ্মী চোখ তুলে আমাকে দেখল, তারপর পুঁটুলিটা নিচে রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসল। লক্ষ্মীর এই বসাটা কেমন অভাগা রমণীর মতো। পুঁটুলিটা খোল বলতে আর কেন জানি সাহস হল না।

লক্ষ্মী তবু নিজেই সব খুলে দেখাল। একটা ঠোঙায় প্রসাদ, দুটো কাগজী লেবু, একটা ছোট ইঁচড়, দুটো তার গাছের আম, কিছু করমচা ফুল, কয়েকটা পাকা তেঁতুল। পাশে কলাপাতায় মোড়া কিছু একটা।

ওটার মধ্যে কী আছে ?

লক্ষ্মী ওটা খুলতে ইতস্তত করছিল। ফের বললাম, দেখাও। এতটা যখন দেখালে, এটাও দেখাও।

লক্ষ্মী কলাপাতা খুলে ফেলতেই আমি ভয়ে আঁৎকে উঠলাম। একটা কচি ছাগশিশুর মুণ্ডু। আজ শনিবার। বলির পাঁঠার মহাপ্রসাদ পিলুর জন্য বৌদির কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে বোধহয়।

লক্ষ্মী বলল, এই নিয়েছি সঙ্গে।

পিলু কী দুঃখ করে লক্ষ্মীকে বলে গেছে আমাদের বাড়িতে মহাপ্রসাদ কতদিন হয় না। সেই কবে একবার পিলু একটা খরগোশ মেরে এনেছিল, তারপর দু'বার বাবা দুটো পাঁঠার মাথা নিয়ে এসেছিলেন, এবং সে কবেকার কথা! আমরা এখানে সেখানে তবু ভালমন্দ খাই। মা, মায়ার ভাগ্যে তাও জোটে না। লক্ষ্মী হয়তো তাই মনে রেখেছে। তবু এমন জনহীন একটা কাশের জঙ্গলের মধ্যে মুণ্ডুটার ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকার মধ্যে যেন বড় অভিশাপের ভঙ্গী আছে।

বললাম, এটা না নিলেই পারতে।

লক্ষ্মী পোঁটলাটা বাঁধতে বাঁধতে হাসল।

এই নিয়ে যাচ্ছি।

যেন বলতে যাচ্ছিল, এই আমি, টক, ঝাল, মিষ্টি। সঙ্গে ছোট্ট এক ছাগশিশুর মুণ্ডু। আমার ভেতরেই এরা বাস করে ঠাকুর। তুমি আমাকে অবহেলা কর না।

॥ পঞ্চম পর্ব ॥

আজকাল জানলায় বসে থাকলে কত কিছু টের পাই। আমার এই ছোট্ট জানলা এখন ভারি প্রিয়। মানুষের বুঝি এমনই হয়। যেখানে নিত্যদিন তার বসবাস, শোওয়া থাকা, এক রকমের অভ্যাসের দাস বলা চলে, আমার মধ্যে সেই দাসত্ব দানা বাঁধছে। সকালবেলা বই খুলে বসি। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখি—সামনের গাছপালা, রেল-লাইন এবং খড়ের ঘরবাড়ি—সবুজ পাতার গন্ধ পাই। বর্ষার জলভরা মেঘের মতো আমার মনটা কেমন এ-সময় সবুজ ঘ্রাণে ভরে থাকে। বুঝি, শরৎকাল এসে যাচ্ছে। আকাশে কখনও গভীর মেঘলা, কখনও ঝলমলে রোদ। নিরন্তর পাখিদের ওড়া। নিজের মধ্যে টের পাই এক তরুণ যুবক সে তার আত্মপ্রকাশের জন্ম পাগল হয়ে উঠেছে। আমার যেন কিছু আর ভাল লাগে না। কী যে চাই নিজেও বুঝি না। ছোড়দিকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয়। ছোড়দিকে ছেড়ে এসেছি বছর খানেকও হয়নি। সেই দুরন্ত বালিকা এখন না জানি কত বড় হয়েছে! এক বছরে মেয়েরা কত বড় হয়ে যেতে পারে আমি যেন অভিজ্ঞতায় আজকাল টের পাই। এ-বাড়ির লক্ষ্মীকে দিয়ে বুঝতে শিখে গেছি, ছোড়দিও আমার মতো জলভরা এক-খণ্ড মেঘ। যে-কোন মুহূর্তে ধারাপাত শুরু হতে পারে। নিজের সঙ্গে ছোড়দির সঙ্গে আমার তখন কথা হয়। কেউ দেখলে টেরই পাবে না ছোড়দি আমার জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। কিংবা কোন মাঠে অথবা দামোদরের বালির চরে। আমরা দু'জনে দৌড়াই। চোখ বইয়ের পাতায়, অথচ ভেতরের কি এক গভীর গোপন রহস্য ছোড়দিকে ছুঁতে চায়। সে কেবল বন-বাদাড় পার হয়ে ছোটে। আমার এই অন্যমনস্কতা কেবল লক্ষ্মী টের পায়। সে জলখাবার দিতে এলেই, আমি ঠিক ঠিক পড়ছি কি না বুঝতে পারে। আশ্চর্য এই মেয়েটা! বড় বেশি সচেতন সব কিছু সম্পর্কে। লক্ষ্মীর ভয়ে কেমন জুজু বনে থাকি।

তুমি ঠাকুর কি ভাবছ?

কৈ কিছু না তো।

ঘ্যানর ঘ্যানর করছ। পড়ছ না।

লক্ষ্মী তুমি পড়ার কিছু বোঝ?

সব বুঝি। আমি মুখ্যু মানুষ বলে মনে কর কিছু বুঝি না।

তুমি বুঝবে না কেন। তোমার সঙ্গে কথায় আমি পারি ?

লক্ষ্মীর সঙ্গে আমার এমন ধরনের কথাই হয়। আজকাল আর আগের মতো এই দেবীস্থানে লক্ষ্মীর মতো আমিও আশ্রিত, মনে থাকে না।

মনে হয় ইহকাল বুঝি আমার এখানেই কেটে যাবে। এ-আমার কোনো পান্থ-নিবাস বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। জানালায় ছোড়দি, পাশের দরজা দিয়ে লক্ষ্মীর যে-কোনো মুহূর্তে প্রবেশ—নিরুপায় হয়ে বলি, ছোড়দি তুমি যাও। আমার পড়ার বিঘ্ন ঘটছে।

বিঘ্ন কথাটাতে কেমন অবাক হয়ে গেলাম। আসলে, ছোড়দির বাড়ির আভিজাত্য বোধ হয় আমাকে একটু বেশি সংস্কৃতিবান হতে শেখাচ্ছে। এই জন্য বিঘ্ন কথাটা উচ্চারণ।

ছোড়দি বলল, সাইকেলের পেছনে যাবি না।

তুমি কবে নিয়ে যাবে বল ?

যেদিন মানুষ হবি।

কেমন যেন বুকের ভেতর একটা দুরুদুরু ভয়। যদি মানুষ না হই। মানুষ হওয়াটা কী। পড়াশোনা করে বড় হওয়া। পুলিশ সাহেব কিংবা ডাক্তার হওয়া। কিংবা এম এ পাস, ফার্স্ট ক্লাস এই সব। বড় চাকরি। কিংবা কোনো আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া বের করে মাঠের উপর দিয়ে ছোটা।—কোনো পর্বত সানুতে ছোড়দির হাত ধরে দাঁড়িয়ে বলা, কী এবারে মানুষ হয়েছি। দেখ না। হাত মাথার উপর তুলে বলা, কী ছাখ মানুষ সত্যি হয়েছি কি না! ছোড়দির খিলখিল হাসি—তুই বিলু না, তোর না, কিচ্ছু হবে না। আর জলে সাঁতার কাটি।

পড়ার বইয়ের পাতা খোলা—আমার চোখ বইয়ের পাতায়, বিড়বিড় করে পড়ার অভ্যাস হয়ে গেলে ঠোঁট বোধহয় আপনিই নড়ে। ছোড়দি আর আমি দুজনেই জলে সাঁতার কাটছি—সাঁতার কেটে একটা নদীর পাড়ে উঠে গেছি যেন। সামনে দীর্ঘকায় এক অরণ্য, তার ভেতর মহা অজগর পাক খাচ্ছে। ফোঁসফোঁস করছে। আমাদের টেনে নিতে চায়। ভয়ে ছোড়দিকে জড়িয়ে ধরলে ছোড়দিও আমাকে জড়িয়ে ধরে। এই ভয়টা কীসের ? অজগরটা দেখলাম কেন! পড়তে পড়তে এত অন্যমনস্ক হয়ে গেলে আমি মানুষ হব কী করে। ছোড়দিকে বলি, আচ্ছা তুমি আজ যাও। কাল ডাকলে এস। আমি এখন পড়ব।

ছোড়দি বলল, তুই যে বলেছিলি বাড়ি গিয়ে চিঠি দিবি, দিলি না তো ?

জান ছোড়দি, রোজই ভাবি একটা চিঠি লিখব। কিন্তু কেন যে পারি না। তোমাকে চিঠিতে কী লিখব ঠিক বুঝতে পারি না।

কেন, লিখবি ছোড়দি তুমি কেমন আছ? তোমাকে খুব মনে পড়ে,

নিজের এই ভাবনাটুকুতেই আমার মধ্যে কেমন বিদ্যুৎ খেলে যায়। এক বালিকা বড় হয়, ছোটে—এর মধ্যে আমার যে কী নাড়ির টান! অথচ ছোড়দিকে কিছুতেই চিঠি লেখা হল না। ছোড়দি যদি চিঠি দিত। আর সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কী যে সংকোচ খেলা করে বেড়ায়। ছোড়দি আমার নামে চিঠি লিখলে বাবা মা কী না ভাববে। আমাদের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠেছে এমনও ভাবতে পারে। আমার যা বয়স তাতে কোনো বালিকার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে উঠলে গুরুজনরা কিছু ভাবতে পারে। সবচেয়ে ভয় পিলুকে। বাবা মা পিলু মায়া আর ছোট ভাইটা বাদে আমার সঙ্গে আর কারো কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে সে বিশ্বাসই করতে পারবে না। আর বিশ্বাস করলে ভাববে আমি সংসারের একজন মস্ত বড় বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি। আমার সঙ্গে পিলু তবে আর কথাই বলবে না। আগে পিওন এলে ভয় করত—ছোড়দি যা একখানা মেয়ে। লিখেই না ফেলে। কীরে চিঠি দিস না কেন! আমার বুঝি ইচ্ছে হয় না তোর চিঠি পাই। ছোড়দির চিঠি পাবার আগ্রহ যতই প্রবল হোক, মাথার উপর গুরুজনদের অস্বস্তির খাঁড়া ঝুলে থাকে বলে, মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকতাম, ভগবান ছোড়দি যেন আমাকে কখনও চিঠি না দেয়। একটা বছর এ-ভাবেই কেটে গেছে। ছোড়দির জন্য টান বাড়ছে কী কমছে বুঝতে পারছি না, লক্ষ্মী ইতিমধ্যে মনের মধ্যে কতকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে।

সেদিন লক্ষ্মী আমাদের বাড়ি গিয়ে সব জেনে ফেলেছে। বাবা বলেছে, বিলুটার মাত গতি কখন কী যে হয়!

পিলু বলেছিল, লক্ষ্মীদি জান দাদা বাড়ি থেকে একবার চলে গিয়েছিল।

লক্ষ্মী তো শুনে, হাঁ। আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, তাই নাকি মাস্টার!

লক্ষ্মীর স্বভাব, সবার সামনে কথা বললে, আমাকে মাস্টার ডাকে। দেবস্থানে আমি থাকি, সেবাইতের ছেলে আর ভাগ্নেকে পড়াই। দেবস্থানে সেবাইত বদরিদা আর বৌদি ছাড়া সবাই আমাকে মাস্টার ডাকলে, লক্ষ্মী না ডেকে থাকে কী করে? কিন্তু একা পেলেই অন্যরকম। ও ঠাকুর শুনছ, আজ ভাত হবে না। ডাক্তার বলে গেছে, কাল ভাত খাবে। এই নাও বার্লি আর কাগজিলেবু। ঐ খেয়ে পেট ভরে রাখ।

দেবস্থানে আমার উপর এই করে লক্ষ্মীর অধিকার জন্মে গেছে জোর খাটাবার। আগে লক্ষ্মীর চোপার ভয়ে কিছু বলতে পারতাম না, আমার সমবয়সী একটা ঝি মেয়ের চোপা থাকতেই পারে—কিন্তু সঙ্গে টান থাকলে যা হয়। লক্ষ্মীর

শাসন দিনকে দিন বাড়ছিল, সেই লক্ষ্মী বাড়ি থেকে সব শুনে এসে আমার সম্পর্কে নতুন একটা ধারণা নিয়ে কেমন কথাবার্তা কম বলছে। লক্ষ্মীর স্বভাবই এমন। সে কখন যে কীভাবে চটে থাকবে বোঝার উপায় নেই। ছোড়দির খবরটা মোটামুটি বাড়িতে গোপনই ছিল। বাবা জানত—কারণ ছোড়দির চিঠি পেয়েই বাবা আমার প্রবাসের ঠিকানাটা জেনে ফেলেন। তিনি নিজে না গেলে আমার বাড়ি ফেরা সহজ হত না। কারণ বাড়ি থেকে পালিয়েছিলাম মানুষ হব বলে। আর যাই করা যাক, বাবার মনমতো গ্যারেজে মেরামতির কাজ শিখলে এতদিনে বাস-ড্রাইভার না হোক কনডাক্টরের কাজটা হয়ে যেত। অভাবী বাবার সন্তান এর চেয়ে বড় কাজ করবে, কে কখন ভাবে! বাবাই বলেছিল রহমানদাকে, ছেলেটার পড়ার বাই আছে। বাড়িতেও চায়, কলেজে পড়ুক। কিন্তু···বলেই থেমে গিয়েছিলেন বাবা।

ছোড়দি তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। হাতে শেকলে বাঁধা সেই বিশাল কুকুরটা। সাদা ফ্রক গায়। বাবা এয়েছে শুনে, সে স্কুলে যায়নি। বাবাকে দেখে ভারি তাজ্জব। বাবা সুপুরুষ মানুষ। খার কাচা ধুতি পরনে। গায়ে নামাবলী, এবং পা খালি। সাদা ধবধবে পৈতা। রহমানদা বাবার পরিচয় পেয়েই ছোড়দিকে ডেকে পাঠিয়েছিল। কারণ আর যাইহোক রহমানদা তো একজন বামুন মানুষকে আদর আপ্যায়ন করতে পারেন না। ডাক্তারবাবুর মেয়েটির বড় দরকার পড়েছিল তার। আর ডাক্তারবাবুর মেয়েটি ঠিকানা লিখে চিঠি না দিলে এই নিষ্ঠাবান মানুষটির এমন শহরে আসারও প্রয়োজন পড়ত না। বাবার প্রশ্ন ছিল, বালিকাটি কে?

আমি বলেছিলাম, ছোড়দি।

ছোড়দি বলেছিল, আপনি আসুন।

বাবা এক সময় জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন বলে জাঁকজমকের কিছু খবর রাখতেন। সুন্দর ছবির মতো বাংলো বাড়িটায় উঠে বাবা আদৌ ঘাবড়ে যান নি। ছোড়দির মার সঙ্গে পরিচয়। একই গোত্রের জেনে তিনি সেখানে আহারও করেছিলেন। ফলে বাবা ছোড়দির খবরটা রাখতেন। কিন্তু বাড়ি এসে কেন জানি বাবা ছোড়দির সম্পর্কে কোনো উচ্চবাচ্য করে নি। না করাই ভাল। কিন্তু লক্ষ্মী সেদিন গেলে বাবাই বলেছিলেন, ওর ছোড়দির চিঠি না পেলে, কে জানত বিলুটা কোথায় আছে।

আর সেই থেকে ছোড়দিকে নিয়ে লক্ষ্মীর খোঁচা মারা কথা।

হ্যাঁ ঠাকুর, তোমার ছোড়দিটা কে?

ছোড়দি আবার কে? ছোড়দি।

ছোড়দি আবার বালিকা হয় নাকি? বয়সে তোমার বড় না?

আমি বলেছিলাম, না। বড় না। ছোটই হবে।

তবে ছোড়দি ডাকতে কেন?

রহমানদা ডাকত বলে।

রহমানদাটা কে?

উনিই আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন।

ছোড়দি রহমানদার কে হয়?

ছোড়দির বাবার ড্রাইভার।

এত দেখছি বিশাল কথা গ।

অবাক হলে লক্ষ্মী এভাবেই কথা বলে।

বিশালই।

তোমার ছোড়দি কী করে?

স্কুলে পড়ে।

দেখতে কেমন?

খুব সুন্দর।

লক্ষ্মী কেমন মনমরা হয়ে যেত কথাটা শুনে। জানে তার ভাগ্য অন্যরকম। তার বড় আশা শোভা পায় না। ছোট জাতের মেয়ে। দু'দুবার বিয়ে দু-বারই স্বামী হারা। শরীরে ভাল করে বয়স ধরতে না ধরতেই দু-দু'জন মরদ খেলে কে আর সাহস পায়! দেবস্থানে সেই থেকে আশ্রয়। ছোড়দির কথায় ওকে কখনও কেমন ম্রিয়মাণ দেখায়। কখনও ভারি উৎফুল্ল। বলে তোমার কলেজ ছুটি হলে চল না যাই, দেখে আসি ছোড়দিকে।

সে অনেক দূর লক্ষ্মী?

কতদূর আর হবে? রেলে চড়ে যাব।

শুধু রেলে চড়ে যাওয়া যায় না।

আমার এই ঘরটায় দুটো তক্তপোশ মাঝখানে একখানা টেবিল—দেয়ালে বড় আয়না। জানালায় আলো বেশি বলে পড়ার সময় টেবিলে বসি না। একখানা চেয়ার—ওটায় অধিকাংশ সময় নটু কিংবা পুটু বসে। কারণ আমার কাছ থেকে যেমন ওদের এতে দূরত্ব বাড়ে, তেমনি মার খাওয়ার সুযোগটাও ওদের কম থাকে। এজন্য চেয়ারটা কে আগে দখল করবে এই নিয়ে মাঝে মাঝে ওদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়। লক্ষ্মীর স্বভাব চেয়ারটার পিঠে ভর করে দাঁড়ানোর।

নটু পুটু না থাকলেই লক্ষ্মী এ কথা সে কথায় ছোড়দির কথা টেনে আনবে। ছোড়দি দেখতে কেমন এমন প্রশ্নের সঙ্গে বার বার নিজের মুখ আয়নায় দেখবে। রাস্তার দিকে মুখ করে পড়তে বসি বলে, লক্ষ্মী বোঝে, আমি কিছু দেখি না। সে তখন পৃথিবীর তাবৎ সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। এমনিতে লক্ষ্মী সুন্দর না। চিবুক চাপা নাক মোটা, আর দুটো বড় বড় চোখ। শ্যামলা রঙ। এবং বয়স ধরছে বলে লাবণ্য উপচে পড়ছে। ওর পরনে থাকে কালো পাড়ের এবং সাদা জমিনের শাড়ি।

এই যে বই খুলে বসে আছি, পড়ায় মন দিতে পারছি না, এজন্য কেন জানি লক্ষ্মীর উপর রাগ জন্মাতে থাকল। ছোড়দির প্রসঙ্গ আজকাল এতবার উঠছে যে, আমি নিজেই কেমন অস্থির বোধ করছি। এক বছর আগে ছোড়দির আচরণ আমাকে কোনো নীলবাতির খবর দেয়নি। লক্ষ্মী কথা খুঁচিয়ে বের করার কৌশলটাও বড় বেশি আয়ত্তে রেখেছে। না হলে, আমি বলতে যাব কেন, মানুষ হব বলে পলাতকের জীবন বেছে নিয়েছিলাম। অভাবী বাবার পুত্রের দুঃসাহস না থাকলে বড় হওয়া যায় না। কোন দুঃসাহসে ভর করেই যে গ্যারেজের বড় মিস্ত্রী গোবিন্দদার কৌটা থেকে কুড়ি টাকা চুরি করেছিলাম তাও লক্ষ্মী জেনে নিয়েছে। এও জেনেছে টাকা, মান, যশ হলে সব সুদসহ ফেরত। এতে করে লক্ষ্মী আমার উপর খবরদারি করার আরও যেন বেশি মৌকা পেয়ে গেছিল।

যেমন বলত, আসলে ছোড়দির বড় টান ছিল তোমার জন্য।

টান মানে লক্ষ্মী ?

ও গো এও বোঝ না। কলেজে পড়ছ কেন ? পড়া ছেড়ে দাও না। টান বোঝ না।

না বুঝি না। যাও তুমি এখান থেকে।

না যাব না। ও টান বোঝে না ! দাড়ি গোঁফ উঠে গেছে টান বোঝে না।

লক্ষ্মীর সঙ্গে আমি কখনও কথায় পারি না। বলি, ওতো সব সময় ত্রাসের মধ্যে রাখত। পুলিশে দেবে ভয়ও দেখিয়েছিল।

ওটি মুখের কথা গ। তুমি যাতে সেখান থেকে না পালাও সে জন্য ভয় দেখিয়ে রেখেছিল। নালে পয়সা ক'টা ছোড়দির গোলাপজাম পাড়তে গিয়ে হারালে সেই নিয়ে এত কাণ্ড করত না।

এটা ঠিক ছোড়দির সেই শেষ খারাপ আচরণ আমাকে এখন নতুন করে আবার তাড়া করছে। পয়সা ক'টা হারিয়েছি ছোড়দি আমাকে বাগানে দৌড় ঝাঁপ

করিয়েছে বলে। গোলাপজাম পাড়তে গাছের ডগায় না উঠলে, কিংবা কখন যে কোথায় রহমানদার দেওয়া হোটেলের পয়সা ক'টা ব্যাগ থেকে পড়ে গেল বুঝতেই পারলাম না। ছোড়দির মা সব জেনে পয়সা ক'টা আমাকে দিলে খুবই খুশি হয়েছিলাম। ও মা, শেষে কিনা ছোড়দি হাতের উপর হামলে পড়ে পয়সা ক'টা ছিনিয়ে নিল। বলল বিলু তোমার বাবাকে চিঠি লিখে দেব, তিনি যেন তোমাকে নিয়ে যান।

এখন বুঝতে পারি ছোড়দির কাছে আমার মর্যাদার প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। ছোড়দির মা'র দেওয়া পয়সা ক'টা নিলে আমি খুবই ছোট হয়ে যাব। শুধু আমি না, ছোড়দি নিজেও বুঝি। লক্ষ্মী যেন বিষয়টা এতদিন পর ধরিয়ে দিল —আসলে আমি কেমন একখানা মানুষ। এই সব করেই, লক্ষ্মী ছোড়দির ভূত আমার মাথায় আবার চাপিয়ে দিয়েছে ; সত্যি তো যে মেয়েটা আমার মর্যাদা নিয়ে এত ভাবত, বলত, বিলু তুমি কলেজে পড়বে, তুমি বড় হবে—কিসের আশায় এ-সব কথা। অথচ সেই ছোড়দি একটা চিঠি দিয়ে জানল না, আমি কী করছি। বোধ হয় ভুলে গেছে, ভাবলেই মনের কষ্টটা বাড়ে।

ক'দিন থেকে ছোড়দিকে একটা চিঠি লিখব ভাবছি। গোপনে লিখতে হবে। ঠিকানা থাকবে এই দেবস্থানের। কিন্তু কোনো খামে চিঠি এলে বদরিদা ভাববে, কে দিল চিঠি, আমাকে চিঠি লেখার তো কেউ নেই। রেল লাইন পার হয়ে বাঁশবনের ভিতরে ঢুকে কিছুটা কারবালার মধ্যে দিয়ে গেলেই আমার বাবার বাড়িঘর। সেখানেই শুধু আমার প্রিয়জনরা থাকে। আর কোনো প্রিয়জন থাকতে পারে বদরিদার মাথায়ই আসবে না। সংগত কারণে তিনি হয়তো প্রশ্ন করবেন, বিলু কার চিঠিরে ?

এমন প্রশ্নের উত্তরে সে তো বলতে পারবে না, ছোড়দির চিঠি, যদি বলে ছোড়দিটা কে ?

হয়ে গেল। গলা কাঠ। আমতা আমতা করে সব যেমন লক্ষ্মীকে বলে ফেলেছি, বদরিদাকেও না আবার বলে ফেলি। তাহলে সব গেল। আশ্রিতজনের এমন বেয়াদপি তিনি সহ্য নাও করতে পারেন। লক্ষ্মীর আর যাই হোক, কোনো কারণে আমি অপদস্থ হই সে তা চায় না। ছোড়দির খবরাখবর ফলে লক্ষ্মী নিজের মধ্যেই গোপন করে রেখেছে।

জানালা পার হলে রাস্তা। পরে একটা অতিকায় নিমগাছ। নিমগাছের ডালপালা হাওয়ায় দুলছে। শরৎকাল আমার প্রিয় ঋতু বলে মনটা কেমন ভিজে স্যাৎস্যাতে থাকে। অল্পতেই সব কিছুতে বড় বেশি মগ্ন হয়ে পড়ি। বইয়ের পাতা উল্টানো

আছে। পড়ছি না। গাছের ডালপালাগুলি দেখছি। দুটো ইষ্টিকুটুম পাখি বসে আছে গা লাগিয়ে—বড় নিবিড়ভাবে। ছোড়দিকে নিয়ে এ-ভাবে কোথাও কোনো নদী তীরে আমার আজকাল বসে থাকতে ইচ্ছা হয়। কাশবনে ফুল ফুটতে দেখলে ছোড়দির কথা মনে হয়। রেললাইন ধরে হাঁটার সময় ছোড়দির কাছে ছুটে যেতে ইচ্ছে হয়। যখনই একা থাকি, কিংবা কলেজে যাই মাথার মধ্যে ছোড়দি ভর করে থাকে। পড়তে বসলে জানালায় যেন ছোড়দি এসে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ে কেডস জুতো, বব কয়া চুল সাদা ফ্রক গায়ে ছোড়দি। যেন নিচেই আছে ছোড়দির সাইকেলটা। বের হলেই বলবে, ক্যারিয়ারে বোস। তারপর আশ্চর্য ভঙ্গীতে আমাকে পিছনে নিয়ে উধাও হয়ে যাবে। আমি আজকাল স্বপ্নেও ছোড়দিকে দেখতে পাই। স্বপ্নে ছোড়দি দেখা দিলে কী যে হয় তখন।

ছোড়দির কথা ইদানীং ভুলেই গেছিলাম। লক্ষ্মী আমাদের বাড়ি গিয়ে ছোড়দির খবর না পেলে, এবং রোজ রোজ না খোঁচালে ছোড়দির জন্য এ-ভাবে আকুল হতাম না। লক্ষ্মীই ছোড়দির একটা নতুন পরিচয় প্রকাশ করে আমাকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে। এও জানি জীবনেও আর ছোড়দিকে আমার চিঠি লেখা হবে না। বড় হলে স্বাধীন হলে ছোড়দিকে একটা চিঠি দিতে পারি। কিন্তু তা যেন কতদূর ভবিষ্যতের কথা। ততদিনে ছোড়দি আমার কথা ভুলে যাবে। আমার মতো কাঙাল মানুষকে তার মনে রাখার দায় পড়েছে। আসলে ওটা তার করুণা ছাড়া কিছুই ছিল না। সারাদিন না খেয়ে ছিলাম খবর পেয়ে ছোড়দির চোখ চকচক করে উঠেছিল, তা আমি দেখেছি। বেশি খাই বলে রহমানদার অতিথিকে বরাদ্দ পয়সায় খেতে দেয়নি খবরটা পেয়ে ছোড়দি কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেছিল—তাও মনে পড়ে। তবু যেন ছোড়দির পৃথিবীতে আমি সব সময় একজন আগন্তুক। ছোড়দিকে নিয়ে এমন আকুলতা আমার পক্ষে শোভা পায় না। পড়াশোনার ক্ষতি করছি। বলে আবার পড়ার চেষ্টা করলে দেখলাম মন বসছে না। লক্ষ্মীর উপর কেন জানি আমার ক্ষোভ জন্মাতে থাকল। সব অনিষ্টের মূলে লক্ষ্মী। এখানে আসার পর থেকেই সে আমাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন মজা আবিষ্কার করতে ভালবাসে। এও তার একটা। আমাকে খুঁচিয়ে দিয়ে মজা দেখছে।

কিছুই ভাল লাগছিল না। বই-টই ফেলে উঠে পড়লাম। জামাটা গায় দিয়ে বের হতে যাব, দেখি লক্ষ্মী সামনে হাজির। ওকি এতক্ষণ দরজায় ওপাশ থেকে আমার আচরণ লক্ষ্য করে মজা পাচ্ছিল। কারণ এক বছরে ওকে আমার

চিনতে বাকি নেই। সে আমার মনের মধ্যে কি গোপন কথা লুকিয়ে থাকে সব ঠিক টের পায়। ওর সঙ্গে আমার কোন কথা বলার ইচ্ছে নেই। দরজা পার হয়ে রাস্তায় নামতে যাব তখন যেন না পেরে লক্ষ্মীর বলা, কলেজ যাবে না ঠাকুর?

না, যাব না।

দাঁড়াও বদরিদাকে বলছি।

কী বলবে?

বলব, মাস্টার বেড়াতে বের হয়ে গেল।

বদরিদাকে আমি সমীহ করি লক্ষ্মী জানে। যা কিছু ভয় এখন আমার এই মানুষটাকে। লক্ষ্মী তারই কাছে নালিশ দিতে যাচ্ছে। পরীক্ষা পুজোর ছুটি শেষ হলে। এ সময় কলেজ কামাই করলে খুব ক্ষতি। বদরিদা এ-সব বলতে পারেন। এ-বাড়িতে বদরিদার ছেলে এবং ভায়ের যেমন আমি গার্জিয়ান, তেমনি বদরিদা আমার গার্জিয়ান। মানুকাকা একদিন এসে বলে গেছে, বিলুটা চাপা স্বভাবের। লক্ষ্য রেখ বদরি।

লক্ষ্মী মানুকাকাকে আগে থেকেই চেনে। মানুকাকাই শেষ পর্যন্ত যে এই আস্তানা আমার ঠিক করে দিয়েছে, সেদিন লক্ষ্মী তাও জানতে পেরেছে। আমার পড়াশোনার কথা, বাবার বাউণ্ডুলে স্বভাবের কথা এবং দেশ ছেড়ে আসার আগে আমার বাবা যে একজন সচ্ছল মানুষ ছিলেন তার কথাও। লক্ষ্মী এখানে আসার পর থেকেই আমার লেখাপোনার বিষয়ে ভারি সতর্ক ছিল, মানুকাকা বলে যাবার পর সে সতর্কতা তার যেন আরও বেড়েছে। আমার ভালমন্দ নিয়ে তার এত বেশি সতর্কতা আমাকে মাঝে মাঝে তিক্ত করে তোলে। রেগে গিয়ে বলি, যাও বলগে।

লক্ষ্মী কী দেখল আমার মুখে সেই জানে। বলল, যা খুশি করগে। আমার কী। তোমার ভালর জন্যই বলা!

হ্যাঁ ভালর জন্য বলা। তোমাকে আমি চিনি না।

লক্ষ্মী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, ওমা, এ কি কথা গ। আমি তোমার কী করলাম!

কিছু কর নি। যাও। দরজা থেকে সরে দাঁড়াও।

লক্ষ্মী সরে দাঁড়াল না। লক্ষ্মীর গোয়ার্তুমি আমি জানি। কিছু বলাও যায় না। আমার সঙ্গে সেদিন বাড়ি যাবে বলে গোঁ ধরল, গিয়ে তবে ছাড়ল। বৌদিকে বলতে গিয়ে উল্টো ঝামেলা—তুই কীরে বিলু। পোড়াকপালী একটা

মেয়ে, যার তিনকুলে কেউ নেই—সে তোর মা বাবাকে দেখতে যাবে—তুই নিয়ে যাবি না বলছিস। তুই এত স্বার্থপর বিলু।

বার বার লক্ষ্মীর কাছে হেরে গিয়ে আমার এখন আর কোনো নালিশ জানাতেও ভালো লাগে না। লক্ষ্মীর বিষয়ে আমি পুটু নটু এক দলে। নানাভাবে ওর বিরুদ্ধে আমরা সত্যাগ্রহ করে থাকি। কখনও কথা না বলে, কখনও ওর সেবা যত্ন পরিহার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারা যায় না। বার বার সেই এক হেরে যাওয়া। তার যা করার সে করে। আমরা নিজেরা করে রাখলে সে এক ফাঁকে এসে লণ্ডভণ্ড করে দেবেই। অভিজ্ঞতা থেকে যখন প্রমাণ হয়ে গেছে তখন জোরজার করে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে যে শের হয়ে যাব তারও উপায় নেই। বললাম, আমার কিছু ভাল লাগছে না লক্ষ্মী। সরে দাঁড়াও।

কেন ভাল লাগছে না জানি।

তুমি তো বাবাঠাকুর জানবে না কেন ?

বাবাঠাকুরের কথা তোলায় লক্ষ্মী জীভ কাটল। কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করল। এ-দেবস্থানে যে মানুষটি কিংবদন্তির শামিল তাকে নিয়ে ঠাট্টা। যার ঘর যার মন্দিরে। মন্দিরে যিনি থাকেন খান, শোন, যার আশীর্বাদে সবার বেঁচে থাকা তেনার মতো মানুষকে টেনে আনা। লক্ষ্মীর শুধু না, এ-বাড়ির সবার, এমন কী শহরের সব অভিজাত পরিবারগুলো যার শ্রীচরণ অবলম্বন করে বেঁচে আছে, ভূত ভবিষ্যৎ যিনি দেখতে পান চোখ বুজলে তাকে নিয়ে ঠাট্টা। লক্ষ্মী কেমন ত্রাসের মধ্যে পড়ে গেছে মতো বলল, যাও। যা খুশি কর ঠাকুর। তবু বাবাঠাকুরকে টেনে এন না। আমার মাথার দিব্যি রইল।

যেন লক্ষ্মী এই যে আমি বাবাঠাকুরকে নিয়ে বিদ্রূপ করছি এতে আমার অমঙ্গল হতে পারে! সবার জন্য সে করে না। আমার জন্যে তার ভাবনা—এতে আমার না আবার কিছু হয়। ফের বাবাঠাকুরকে নিয়ে কিছু বলব ভয়েই যেন সে দরজা থেকে সরে গেল।

আমার ঘরটা একেবারে বাইরের দিকে বলে কেউ টেরও পাবে না কখন আমি বের হয়ে গেছি। কোথায় যে যাব তাও জানি না। লক্ষ্মী শুধু দাঁড়িয়ে বলল, আর তোমার ছোড়দিকে নিয়ে খোঁচাব না। ছোড়দির জন্য তোমার এমন মাথা খারাপ হবে যদি আগে জানতাম।

লক্ষ্মী বলে কী। এই বয়সে মেয়েরা মানুষের সব কিছু টের পায় কী করে। আমার সমবয়সী মেয়েটা বুঝল, কী করে, সত্যি শরৎকাল এসে যাওয়ায় আমার মধ্যে সেই বিবাগী মানুষটা ছোড়দির কথা ভাবতে ভাবতে উত্তাল

হয়ে উঠেছে। তবু গোপন করার জন্য বললাম, তুমি তো দেখছি সব জেনে বসে আছ।

লক্ষ্মী শুধু বলল, তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই মাস্টার।

লক্ষ্মীর এই কথাটা অভিমানের। একা দুজনে কথা বললে, লক্ষ্মী ঠাকুর বলে আমাকে। অভিমান বশে সে আমাকে মাস্টার বলছে। বললাম, যখন চিনেই ফেলেছ তখন আর দরজায় দাঁড়িয়ে কেন। যাও ভিতরে যাও।

লক্ষ্মী আর একটা কথা বলল-না। রাস্তায় নেমে মন্দিরের সদর দরজার দিকে চলে গেল। কলেজ যাব না কেন নিজেই বুঝতে পারলাম না। হয়তো রেললাইন ধরে কিছুটা এগিয়ে কাপড়ের কলের সামনে যে আমবাগানটা আছে ওটার পাশে চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে থাকতাম। অন্যমনস্কভাবে ঘাসপাতা ছিঁড়তাম। কিংবা ঘাসের উপর শুয়ে পাখি প্রজাপতি দেখতে দেখতে একসময় কলেজে যাওয়া দরকার খুব ভাবতাম। চলে আসতাম ঠিক সময়ে। কেন যে বলে ফেলেছি, কলেজ যাব না। জেদ আমারও কম নয়, যখন বলে ফেলেছি যাব না, তখন কে বাধ্য করে দেখি। কেমন নিজের সঙ্গে নজের লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। ছোড়দির কথা ভাবলে এত উদাস হয়ে যাই কেন বুঝতে পারি না। —শরীরের শিরা উপশিরায় বোধ হয় এক ঝড় উঠে যায়। মন বিবাগী হয়ে ওঠে। কিছুটা হেঁটে মনে হল, অকারণ এই হেঁটে বেড়ানো। শরতের আকাশ কী গভীর নীল। ঘুঘু পাখির ডাক কোন সুদূর থেকে যেন কেবল শুনে যাচ্ছি। মাঠে মাঠে ধান, সবুজের সমারোহ। আমার এই জীবনে সেই সমারোহ উথলে উঠছে বুঝতে পারি। এবং একসময় চুপচাপ গাছের ছায়ায় বসে থাকলে টের পাই, কেউ এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। তাকিয়ে দেখি সেই চোপাবাজ এবং চঞ্চল মেয়েটা। বলছে, চল ঠাকুর বাড়ি যাবে। তোমার ছোড়দির আমি খোঁজ পেয়ে গেছি। সে তোমাকে দেখবে বলে বসে আছে পড়ার ঘরে।

এমন কথায় বিচলিত হওয়া স্বাভাবিক। আমার সঙ্গে লক্ষ্মী আর যাই করুক কখনও কোন তঞ্চকতা করে না। বললাম, তার মানে ?

মানে সোজা গো। এ বয়সে এমনটা হয়। ভাল লাগা মানুষের জন্য মনে কষ্ট দেখা দেয়।

লক্ষ্মীর এত পাকা পাকা কথা আমার ভাল লাগে না। বলি তুমি সব সার বুঝে আছ। এখন চল তো। শহর থেকে রায়বাহাদুর চাটুজ্যে বাবুরা এয়েছেন। বছরে বাবাঠাকুরকে একবার সবাই দর্শন করে যান। তোমার ছোড়দির মতো দেখতে কেউ গিয়ে দেখ এয়েছে।

ছোড়দির মতো বলছ কেন? ওকে তুমি দেখনি……।

না দেখলে বুঝি চেনা যায় না। ওঠো না। এ বয়সে সব ছোড়দিরাই সমান।

কৌতূহল বাড়ছে। আমার পড়ার ঘরে কেউ বসে আছে তবে। সে কে?' আমার সম্পর্কে তারই বা এত কৌতূহল কেন? বললাম, আমার জন্য বসে থাকবে কেন! দেখ অন্য কাউকে খুঁজছে।

খুঁজলেই হল। আমি বুঝি জানি না। আমি বুঝি কিছু বুঝি না। তোমার ছোড়দির চেয়ে দেখতে খারাপ না। কত বড় মানুষ তেনারা। দুর্গাপূজার সময় কত পাঁঠা বলি হয়। কত লোক খায়। মিমিদি আমার খুব চেনা। নটুপুটুর নতুন মাস্টারের কথাতেই লাফিয়ে তোমার ঘরে হাজির।

এ সময়ে আমি ভারি সংকোচে পড়ে যাই। কোনো মেয়ে পড়ার ঘরে আমাকে দেখবে বলে বসে আছে ভাবতেই কেমন ভেতরে রাগ জন্মে যায়। আমাকে দেখার কী আছে। আমি বাঘ না ভাল্লুক। আসলে মানুষ মনে করলে এত সহজে লাফিয়ে কেউ ঘরে ঢুকে যেতে পারে না। এ-ভাবে দেখবে বলে বসে থাকলে কেমন তরলমতি মনে হয় মেয়েদের। আর যাই ভাল লাগুক কোনো তরলমতি বালিকার দর্শনীয় বস্তু আমি হতে চাই না। বললাম, তুমি যাও আমি যাচ্ছি না।

আর ঠিক এ-সময় বাবাঠাকুরের ডাক শুনতে পেলাম। তিনি আমাকে খুঁজছেন। এমন মানুষের ডাক আমি অবহেলা করি সাধ্য কী। ভয় লেগে গেল। বাবাঠাকুর পর্যন্ত আমার ডাক খোঁজ করছেন। সহসা সবাই আমাকে খুঁজতে আরম্ভ করছে কেন? লক্ষ্মীর কোন কূট চাল নয়তো। তিনকূলে মেয়েটার কেউ নেই বলে বাবাঠাকুর লক্ষ্মীকে স্নেহ করেন। আমার কলেজ না যাওয়া, গম্ভীর হয়ে যাওয়া এসব কী লক্ষ্মীকে খুব ভাবিয়ে তুলেছে। সে বাবাঠাকুরকে পর্যন্ত লাগিয়ে এয়েছে, দেখগে মাস্টারের কী হয়েছে। সকালে কিছু খায়নি, কলেজে যায়নি, রেলের ধারে চুপচাপ বসে আছে। এ-বয়সটা যে খুব খারাপ লক্ষ্মী নিজের জীবন দিয়ে হয়তো বুঝতে পারে। অগত্যা উঠে দাঁড়ালাম। সাড়া দিলাম, যাই।

তীর্থস্থান বলে শনি মঙ্গলবারে যাত্রীদের ভিড় বেশি। শহর থেকে রিকশায় আসে কেউ, কেউ দূরদেশ থেকে হেঁটে আসে আবার কেউ আসে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে। ধর্মশালায় দু'চারদিন অনেকে থেকে যায়। নিমগাছটার নিচে বাবাঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, বেটা বাঙ্গাল কোথায় গেছিলি।

বিষয়টা বোধ হয় লক্ষ্মীরও বোধগম্য হয়নি। বাবঠাকুর সহসা মাস্টারকে খুঁজে

বেড়াচ্ছেন কেন। তিনি তো খ্যাপা মানুষ। নিজের সঙ্গে নিজে কথা বলেন। মন্দিরে তার একমাত্র কথা বলার লোক পাথরের ঠাকুর। আর যা কথাবার্তা সে বড় কদাচিৎ। কখনও কোন কারণে রেগে গেলে সবাইকে বাড়ির বার করে দেন। বদরিদা, বৌদি, নটু, পুটু, দিদি, ধনুদা ও কার্তিক সবাই তেনার ভয়ে তটস্থ থাকে তখন। গাছতলায় রাত্রিবাস করিয়ে ছাড়ে কখনও। বাবাঠাকুরের মর্জির উপর এই দেবস্থানে আর কারো কথা খাটে না। সেই মানুষ মাস্টারকে খুঁজে বেড়ালে আশঙ্কা বৈকি।

বাবাঠাকুরের কৃপা আমার উপরে আছে এসব লক্ষ্মীর ধারণা। আমারও কেন জানি এমন মনে হয়। বাবাঠাকুর আমাকে স্নেহ করেন। মন্দিরে গেলে হাত পাততে বলেন। কখনও সন্দেশ, কখনও শুধু ফুল বেলপাতা—আর মাঝে মাঝে আমার মুখের দিকে কেন যে অপলক চেয়ে থাকেন। লক্ষ্মী দূর থেকে সেটা কখনও লক্ষ্য করে থাকতে পারে। কাছে গেলে লক্ষ্মীই বলল, বাবাঠাকুর মাস্টারের মন ভাল না।

ধুস ছুঁড়ী। এই মাস্টার এদিকে আয়।

বাবাঠাকুরের পরনে সেই গেরুয়া নেংটি। যেন তিনি কবেই শতবর্ষ পার করে দিয়েছেন। গলায় কাচার মতো উপবীত ঝুলছে। এত যে বয়স হয়েছে, তবু কি সাবলীল হাঁটা চলায়। পড়ার ঘরের পাশে দেখলাম, দু'তিনখানা গাড়ি। বিদেশী আতরের গন্ধ নিমগাছটা পার হতে টের পেলাম। পড়ার ঘরে কেউ যদি সত্যি বসে থাকে। যাবার সময় চোখ তুলে তাকালাম, কিন্তু তক্তপোশের খানিকটা অংশ বাদে আর কিছু চোখে পড়ল না।

বাবাঠাকুর আমাকে বললেন, খুলে দেখ কী আছে?

চাতালে আশ্চর্য সব সুন্দর রমণীরা লাল পেড়ে গরদ পরে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকজন প্রবীণ সুপুরুষ হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে। হাতের আংটি থেকে উজ্জ্বল আলো ঠিকরে পড়ছে। মুহূর্তে যেন চাতালটা কোন এক অন্য গ্রহ হয়ে গেছে। এমন সুন্দর পুরুষ রমণী আমি জীবনেও দেখিনি। কিছুটা হতবুদ্ধি যুবকের মতো দাঁড়িয়েছিলাম। কী যে খুলতে বলছেন বুঝতে পারছি না। বাবাঠাকুর মন্দিরের দরজার দিকে হাত তুলে দেখালেন।

বুঝলাম তিনি মন্দিরের দরজা খুলতে বলছেন। ঠিক দরজা নয় বরং গ্রিল বলা চলে। চাতাল থেকে দেবী দর্শনে যাতে অসুবিধা না হয় সে-জন্য এ'ভাবে একটা গ্রিল এখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রিলের হুকটা তুলে দরজা খুললে, বাবা-ঠাকুর বললেন, বোস, আসনে বসে মাকে অন্নদান কর: আজ তোর পালা।

ঠাকুরের অনেক খ্যাপামি আমি দেখেছি। কিছু শোনা। হাগা মোতা কাপড়ে দেবীকে বলেন, খা খা। এতে যে মানুষটার একটা বড় বিশ্বাসের জায়গা আছে সহজে ধরতে পারি। না হলে এমন জাগ্রত দেবীর অন্ন ভোগে না কোন মন্ত্রোচ্চারণ, না কোন ফুল, বেলপাতা, শুধু এক কথা খা খা। খা মাগি। সাধারণ মানুষ যে নন তিনি তার কথাবার্তা এবং জাগ্রত দেবীর প্রতি তার আচরণ দেখলেই বোঝা যায় সেটা। কিন্তু তাই বলে আমাকে এর মধ্যে টেনে আনা কেন। পূজা আমি জানি না যে তা নয়। উপনয়নও হয়েছে খুব শৈশবে। বাবা বাড়ি না থাকলে যজনযাজন কখনও করতেও হয়েছে। কিন্তু এমন জাগ্রত দেবীকে নিয়ে বাবাঠাকুর যা খুশি করতে পারেন, আমি পারি না। কিছুটা ভ্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে সবাইকে দেখতে গিয়ে মনে হল বদরিদা চাতালের থামের আড়াল থেকে আমাকে ইশারায় কিছু বলছেন।

লক্ষ্মী দৌড়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, যা বলছে, কর মাস্টার।

বুঝতে পারছি, যে কোন কারণেই বাবাঠাকুর খেপে গেছেন। অগত্যা মন্দিরে ঢুকে আসনে বসতে হল। যে সব ভোগ পড়েছে, তাতে ফুল বেলপাতা দিতে হল। সেই অভিজাত পরিবারের পুরুষ নারীদের বাবাঠাকুর নির্দেশ দিলেন, চরণামৃত নিতে। তারা এসে হাঁটু গেড়ে বসল। একে একে সবার মায়ের আশীর্বাদ ফুল বেলপাতা নেবার শেষ দিকটায় চমকে গেলাম। সেই মেয়েটা। আমার ছোড়দি না। তবে একে দেখলে আমার ছোড়দির কথা মনে হয়। যেন এক বছর পর শাড়ি পরলে এমনই দেখাত। কলেজে যায় আমাদের ইয়ারে পড়ে। বড় মেধাবী ছাত্রী। ছিমছাম লম্বা এবং সাদা জমিনের সিল্ক আর নীল রঙের ব্লাউজ গায়। কোনো দিকে তাকায় না। অভিজাত পরিবারের হলে বোধহয় মেয়েদের কোন দিকে তাকাবার নিয়ম নেই।

কলেজ টাওয়ারের নিচে কতদিন গোপনে মেয়েটাকে দেখেছি। জেলখানার পাঁচিলের পাশে এসে ওর গাড়িটা থামত। গাড়ি থেকে নেমে তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে হাঁটা দিত। হাসনুহানা ফুলের গাছটা পার হয়ে সে সিঁড়ি ভাঙত ধীর পায়ে। বুঝতে পারতাম, সব ছেলেদের চোখ তখন ওর দিকে। যে কোনোদিকে তাকায় না সে জানে, সবাই তাকে দেখছে। সুতরাং তার পক্ষে অহংকারী হওয়া মানায়। ওদের পরিবার এই দেবস্থানে আসে, বাবাঠাকুরের প্রসন্নতা লাভে ওদের পরিবার যে ভিক্ষুকের শামিল আগে জানলে আমি লক্ষ্মীর মিমিদির সঙ্গে কলেজেই আলাপ করতাম। কলেজের প্রথম বছরটা কী যে মহার্ঘ ওকে না দেখলে যেন আমরা টের পেতাম না। ওর নামাকরণ এত বেশি

সংখ্যায় হয়েছে যে আসল নামটা আমাদের কাছে হারিয়ে গিয়েছিল। মিমি হাঁটু মুড়ে হাত পেতে বসে আছে। আমাকে চিনতে না পারারই কথা।

আমিও তাকাচ্ছি না। ছোড়দির জন্য যে আবেগ বোধ করছিলাম মিমির শরীর এবং সুন্দরী ভঙ্গী দেখে তার অনেকটা উপশম হয়েছে। আসলে রক্তে নেশা ধরেছে—ভাল জাত হলেই হল। এখন তো শুধু বড় হওয়ার পালা। বড় হতে গেলে চারপাশের গাছপালার মতো চাই কোনো লাবণ্যময়ীর সাহচর্য। ওর শরীরে কোনো সুগন্ধী আঁতরের গন্ধ। সিল্কের ভাঁজ থেকে মনে হচ্ছিল এক্ষুণি সব প্রজাপতিরা উড়ে এসে আমার শরীর ঢেকে দেবে। ফুল বেলপাতা দেবার সময় কী বুঝে তাকাতে গিয়ে দেখলাম মিমি ফিকফিক করে হাসছে।

বাবাঠাকুরের তখনই বিকট চিৎকার, ও-ভাবে না, ও-ভাবে না। লম্বা হয়ে যা মেয়েছেলে। কচি আছিস, লম্বা হয়ে যা। মাথায় দে। হ্যাঁ হ্যাঁ, পা ধরে বল, ঠাকুর তুমিই আমার সব। বল বল। কিন্তু মিমি কিছুটা গোঁ ধরে আছে যেন। সেই অভিজাত পরিবারের নারী পুরুষ তখন বলছে, মিমি বাবাঠাকুর বললে করতে হয়।

আমি জানি, বাবাঠাকুর আজ আমাকে আসনে বসানোতে মিমির মধ্যে কোনো কৌতূহল দেখা দিয়েছে, আমি একই কলেজে ওর সঙ্গে পড়ি তাও হয়তো লক্ষ্মীর কাছে জেনেছে। কারণ সেতো কাউকে চেনে না, সবাই তাকে চেনে। তা একটা কলেজ ছোকরা এমন জাগ্রত দেবীর হয়ে ফুল বেলপাতা দিচ্ছে, ভাবতে গিয়ে ফিক করে হেসে দিতেই পারে। অপরাধের কিছু না। বাবাঠাকুর বোধ হয় লক্ষ্য করে কিছুটা অপমান বোধ করেছেন। তাঁর ইচ্ছেয় খড়কুটোও বাবা-ঠাকুর, তিনি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাকে তাঁর প্রতিভূ ভেবেছেন। আমার হাত থেকে মায়ের আশীর্বাদ গ্রহণের সময় হাল্কা পরিহাসের অর্থই হচ্ছে তাঁকে লঘু করা। যেন এই অপরাধে সংসার রসাতলে যাবে। এখন একমাত্র উপায়, এই প্রতিভূর দু-পায়ে জড়িয়ে ভিক্ষে চাওয়া, ঠাকুর তুমিই আমার সব। বিদ্যুতের মতো আমার মাথার মধ্যে সব কারণগুলো শিরা উপশিরায় প্রবাহিত হতে থাকলে আমি ভারি বিব্রত বোধ করতে থাকলাম। এবং এ হেন দুরবস্থায় কী যে করি। অভিজাত পুরুষ রমণীরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে। মিমিকে বড় কাতর কণ্ঠে বলছে, ধর মা, বাবাঠাকুরের নির্দেশ অমান্য করতে নেই।

মেয়েটির মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। বদরিদা বৌদি ধনুদা এবং অন্য সব তীর্থযাত্রীরা যেন ভাবছেন, বাবাঠাকুর এ-ভাবে আর কারো উপর করুণা বর্ষণ করেন না। মেয়েটা খেপী। কিছুই বুঝছে না। চোখ স্থির করে বসে আছে।

হাসতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এমন একটা ক্যাসাদে পড়বে আগে যদি তার এতটুকু সে টের পেত।

মেয়েটির যত না ক্যাসাদ তার চেয়ে বেশি আমার। ছুটে পালাতে পারলে বাঁচি। বড় বেশি বিব্রত বোধ করছি। বাবাঠাকুরের কাছে এর অর্থ কী দাঁড়ায় আমি ঠিক জানি না, আসলে তিনি হয়তো বিশ্বসংসারের সব কিছুর নিয়ামকের একটা হেতু আমার মধ্যে কিংবা তাঁর মধ্যে খুঁজে পেতে পারেন। জন্ম মৃত্যু আধি ব্যাধি, শোক জরা সব কিছু সেই নিয়ামকের ইচ্ছে অনিচ্ছা, তিনিই মানুষের ঠাকুর কিংবা জাগ্রত দেবী অথবা এক মহিমময় করুণাময় ঈশ্বর। সেই অপার্থিব রোষ থেকে যেন মেয়েটির তরল হাসিজনিত পাপ, বা অবহেলার মুক্তির কথা ভাবছেন বাবাঠাকুর—মিমি তখন সত্যি সত্যি আমার দু-পা জড়িয়ে ধরেছে। আমি ভাবছিলাম—ছিঃ ছিঃ এ কি পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে! এমন অপ্রস্তুত হতে হবে জানলে বাবাঠাকুরের ডাকে সাড়াই দিতাম না। তার আগে ছুটে যেদিকে দুচোখ যায় পালাতাম।

তারপর এক সময় সব কেমন নিঝুম হয়ে গেল। আজ বলিদান হয়নি। শনি মঙ্গলবারে এই মন্দিরের চাতালে ছাগশিশুর আর্তনাদ কানে আসবেই। আজ সে সবের কিছু হয় নি। আমার মনে হতে থাকল, বলিদান হয়েছে, তবে সে কোন ছাগশিশুর নয়, এক মানবীর। আমিই সেই নিধনের হোতা। মনটা কুণ্ঠায় কেমন সংকোচিত হয়ে থাকল। দেবীর থান থেকে উঠে কোনদিকে যাব ভাবছিলাম। দেখলাম বাবাঠাকুর পরম নিশ্চিন্তে তাঁর ঘরে দরজা বন্ধ করে একটা কম্বলে শুয়ে আছেন। মাথার কাছে ম্যাকবেথ বইখানা।—যা তিনি অনায়াসে অনর্গল আবৃত্তি করতে পারেন। তাঁর কণ্ঠে সেই ইংরেজি শব্দমালা আমি কতদিন গোপনে কান পেতে শুনেছি। উপনিষদের কোন শ্লোক তার ব্যাখ্যা তিনি নিজে একা একা করেন এবং শোনেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীর দেবী মাহাত্ম্য বর্ণনার সময় তাঁর দুচোখ বয়ে জল পড়ে। কোমল এক প্রাণ মনে হয় অথবা সেই উচ্চারণ—ফ্রেলটি দাই নেম ইজ ওম্যান যখন বলতে বলতে কেঁপে ওঠেন, তার দিকে তখন ভয়ে তাকানো যায় না। গেরুয়া নেংটি পরা শীর্ণ হাত-পা-ওয়ালা মানুষটার লাল জবাফুলের মতো চোখ দেখলে ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যায়।

পা টিপে টিপে সিঁড়ি ধরে চাতালে নেমে এলাম। বৌদি চাতালের একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে হাতের ইশারায় আমাকে ডাকছেন। কাছে গেলে বললেন, বাবাঠাকুরের কাছ থেকে রেহাই পেলি।

মাথা বাঁকালাম। আমাকে খুব বিমর্ষ দেখে বৌদি বললেন, ভিতরে যা। স্নান-টান সেরে খেয়ে নে। তোর দাদা তোকে আবার কেন জানি খুঁজছে। ভিতরে ঢুকতেই দেখলাম, বারান্দার এক পাশে নটু পুটু লুডু খেলেছে। বাবাঠাকুরের পাল্লায় পড়ে আমি জব্দ হওয়ায় ওরা যেন কিছুটা মনে মনে খুশি। বদরিদার ঘরে ঢুকে দেখলাম সেই অভিজাত পরিবারের সবাই বেশ হাসি গল্পে মশগুল। বাবাঠাকুর প্রসন্ন না হলে তাঁর কৃপালাভ আজ ঘটত না। কতকাল থেকে যেন তারা বাবাঠাকুরের এমন বিচিত্র লীলা দেখার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল। যাদের প্রতি প্রসন্ন হন, তিনি তাদেরকেই নির্যাতন করেন এমন ধারণা চালু থাকলে আমি আর কী করতে পারি। ওরা আমাকে দেখে বলল, তুমি মিমির সঙ্গে পড় ?

পড়ি ঠিক না, এক কলেজে পড়ি। আমার কমার্স, ওর সাইন্স।

বাবাঠাকুর দেখছি তোমার ওপর খুব প্রসন্ন।

হবে।

এই সব কথা বলার ফাঁকে মিমিকে আমি খুঁজছিলাম। মেয়েটা কোথায়! এরা এত শিক্ষিত পরিবার অথচ গুরু মহিমা এদের এত কাতর করে রাখে কী করে! মিমিকে না নিয়ে এলেই যেন ভাল করত।

চোখে লম্বা কাজল টানা এবং যাকে নবীনাই বলা যায় আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের বাড়ি এস। বৌটির কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা। চুল কোঁকড়ানো। এবং ভ্রূ জোড়া যেন পাখির ডানার মতো। চোখে আশ্চর্য ধার। মিমির কেউ হয়। যেন এই পরিবারটি বংশের আভিজাত্য রক্ষার নিমিত্ত কোনো এক দূরাতীত গ্রহ থেকে অপ্সরীদের সংগ্রহ করে এনেছে।

বদরিদা বলল, এই আমাদের বিলু। মাস্টারমশাইর ভাইপো।

মানুকাকাকে ওরা চেনে। প্রৌঢ় মতো মানুষটি বললেন, বাবাঠাকুরের খুবই স্নেহভাজন দেখছি। শহরে গেলে আমাদের বাড়িতে এস।

আসলে কী বাবাঠাকুর প্রসন্ন বলে তার আশীর্বাদের ছোঁয়াচ আমার সঙ্গে এই পরিবারে প্রবেশ করবে। যেন বাবাঠাকুরের প্রতিনিধি একজন আমি। আমার সেবাযত্ন করলেই বাবাঠাকুর তৃপ্তি লাভ করবেন এমন ধারণা তাদের হতে পারে। কিছু বললাম না। কারণ যাকে খুঁজছি তাকে দেখতেই পাচ্ছি না। সে কোথায়! আমার এই বয়েসটা বুঝতে শিখিয়েছে, এতে একজন তরুণীর কত বড় অপমান এবং জ্বালা। তার কাছে দাঁড়িয়ে যদি বলি, আমার কিছু করার ছিল না মিমি। আমি নিমিত্ত মাত্র। আমি অভাবী বাবার সন্তান। মানু-

কাকা এই আশ্রয় ঠিক করে দিয়েছেন। আমার বড় হবার সখ। যেমন তোমাকে দেখলে আমার মনে হয়, আমি ঠিক ঠিক বড় হতে না পারলে তোমার কাছে পৌঁছাতে পারব না। বাবাঠাকুরকে কেউ অমান্য করতে পারে না। তোমাদের মতো পরিবারও না। তোমার যে কী দরকার ছিল ঠোঁট টিপে ফিকফিক করে হাসার।

বারান্দায় বের হলেই দেখলাম কার্তিক মামার বৌ রান্নাবাড়ির দিকে যাচ্ছে। কার্তিক মামা মামীর পেছনে যাচ্ছিল, বলিদানের সময় তার অন্য মেজাজ। এ কাজটি এ তীর্থস্থানে পাকাপাকিভাবে সে হাতে নিয়েছে। আজ তার কাজটা ছিল না এবং আমাকে নিয়ে আজ বাবাঠাকুর লীলা করেছেন জেনে, মামীর সঙ্গে অনুসরণ করা অনুচিত ভাবল। ঘুরে দেখল আমাকে। চোখ ট্যারা বলে বোঝা যায় না কোন দিকে তাকিয়ে আছে। আন্দাজে ধরে নিতে হয় আমাকেই বলছে, কী মামা আজ বাবা খুব নাকি খেপে গেছিল।

আমি বললাম, আর বলবেন না, কী ঝামেলা বলুন তো।

আরে ঝামেলার কী হল। মার থানে কী কখন লীলা কেউ বলতে পারে! আমার দাদুর কথা জান?

দাদুটা কে বুঝতে পারলাম না। চোখমুখ দেখে ধরতে পেরে বলল, আরে বদরিদার বাবা। সিদ্ধাই মানুষ—কাপালিক। শব সাধনা করতেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তান্ত্রিক মানুষ। তাকে দেখলে তো তুমি ভিরমি খেতে। বদরিদার মাথার কাছে যে মানুষটির ছবি আছে তিনিই এই শর্মার দাদু। তা দেখলে ভয় পাবার মতো। হাতে চিমটা, ত্রিশূল এবং কমণ্ডলু। কম্বল গায়ে বাঘের ছালে মানুষটা ঢাকা।

কার্তিক বলল, দাদুর দেহত্যাগের পর এল নরেন খ্যাপা। বাবাঠাকুরের অলৌকিক এবং বিভূতির কিছু খবর আমি আগেই পেয়ে গেছি—এখন কার্তিক মামা আবার নতুন কিছু খবর দেয় কিনা জানার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। অথবা সে কী বলতে চায় জানারও আগ্রহ।

তোমার কপাল খুলে গেল—থানে বসার মানুষ তুমি। বাবাঠাকুর তার কাজটা তোমাকে দিয়ে যেতে চান। তুমি কিন্তু মামা, তন্ত্রমন্ত্র সব ভাল করে জেনে নেবে। বাবাঠাকুরের কাছে অনেক গূঢ় সিদ্ধাই আছে। অবহেলা কর না।

কথাটাতে আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। এখানে আশ্রয় নিয়ে আছি, কলেজে পড়ি, নটু পুটুকে পড়াই। আমার ছোড়দিরা চারপাশে বড় হচ্ছে, কত আমার স্বপ্ন সামনে—আর কিনা বাবাঠাকুর গত হলে আমাকে বসিয়ে দিতে চায়!

বাবাঠাকুরের মনে মনে এ-সব আছে তবে। আমি বললাম, তুমি যে কি না, এ-সব আমি করবই না।

এই চুপ। এ-ভাবে বলো না। বাবাঠাকুর শুনতে পেলে আবার খেপে যাবে। শেষে বিলের জলে নামিয়ে দেবে সবাইকে।

এ-সব খবর আমার জানা, আমি এখানে আসার মাসখানেক আগে বাবাঠাকুর সহসা ক্ষিপ্ত। ঠিক সহসা বলা যায় না। রাতে শিবাভোগের সময়, দুটো সাদা শেয়াল ঝিলের ধারে রোজ ডাকলেই ভোগ খেতে আসে। হাতে কলাপাতা, কাচা মাংস আর দুধ। এই দিয়ে শিবাভোগ। ঝড় তুফান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বন্যা যাই এই ইহসংসারকে গ্রাস করুক না কেন, নিশীথে শিবাভোগ তিনি সেই প্রাচীন অশ্বত্থের নিচে ঝিলের পাড়ে দিতে যাবেনই। আর ঝড় জল প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাই থাকুক না, সেই শিবাভোগে যে দুটি প্রাণী রোজ আসে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে তারা আসবেই। না এলেই ব্যাস—কোথাও কিছু ত্রুটি ঘটে গেছে। বাবাঠাকুর তখন সেবাইত বদরিদার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সেবাইতের মনে কোন পাপ ঢুকেছে হয়তো ভাবেন। সে-কারণে সে-রাতে প্রাণী দুটো ভোগ খেতে না আসায় দুপুর রাতে সবাইকে বলেছিলেন, এখনই গৃহত্যাগ! বাবাঠাকুরের উপর কোনো অলৌকিক প্রবাহ তবে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ। তারই নির্দেশে তিনি সবাইকে গৃহত্যাগ করতে বলছেন। মন্দির এবং পাশের সংলগ্ন কোঠাবাড়ি থেকে সবাইকে বের করে নিয়ে ঝিলের ঘাটে গিয়েছিলেন। সারারাত গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রেখেছিলেন সব কজনকে, শিবাভোগে ত্রুটি ঘটায় সংসারের উপর যে রোষ নেমে আসার কথা ছিল, এই করে তা থেকে বাবাঠাকুর মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বদরিদা এবং তার পরিবার পরিজনদের।

কার্তিক মামা দেখছি আগের চেয়ে একটু বেশি সমীহ করতে শুরু করেছেন আমাকে। মার থানে আমিই ভাবি পুরোহিত। কুলীন বামুন, তার উপর আমার নিষ্ঠাবান পিতার খবর এ-বাড়িতে আগেই পৌঁছে গেছে। যাজনে এত পটু যার বাবা তার পক্ষে কালীবাড়ির পুরোহিত হওয়া খুব স্বাভাবিক এবং গর্বের বস্তু। লক্ষ্মীকেও দেখছি আগের মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে না। বৌদির সেবাযত্ন আমার প্রতি এমনিতেই একটু বেশি মাত্রায় ছিল—এই ঘটনার পর কথাবার্তায় যেন তার শ্রদ্ধার ভাব এসে গেছে। এ-সব কারণে আমি আরও সংকোচের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ঠিক আবার পলাতক হব—কে আমাকে একটা মন্দিরের পুরোহিত বানায় দেখব। সাধ্য কি—কিন্তু যেটা এর চেয়ে দুঃখের, তা হচ্ছে মিমির অবমাননা। মিমির নরম হাত, কী সরু আর লম্বা

চাঁপাফুলের মতো, হাতে হীরের আংটি, যেন পদ্মকলিতে কোন রূপোলি ভ্রমর এসে উড়ে বসেছে। মেয়েটাকে খুঁজছি মনে মনে।

গাড়ি দুটো আমার পড়ার ঘরের পাশে ঠিক আছে। ওরা ভোগের প্রসাদ খেয়ে তবে যাবে। বদরিদার ঘরে সবাই বসে আছে। বদরিদা ওদের একটু বেশিই খাতির যত্ন করছেন। চা আসছে, মন্দির থেকে সন্দেশ আসছে এবং বাবাঠাকুর এত প্রসন্ন হওয়ায় কপালে যার যা দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল সব মুছে গেছে। ওরা কথায় কথায় হা হা করে হাসতেও পারছে।

শুধু এ তীর্থস্থানে বোধ হয় একজন তার অবমাননায় হাসতে পারছে না। সমবয়সী একটা ছোঁড়ার পা ধরে, তুমিই আমার সব ঠাকুর বলার পর সে উধাও। এই মেয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে বসেছিল, আমাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ মজা উপভোগ করবে বলে বোধ হয়। নাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে—আগে বুঝতে পারি নি, দেখার পর বুঝেছি, যে মেয়ের গুমর এত, কলেজে কারো দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখে না, সেই মেয়ের তার কলেজের এক আশ্রিত ছাত্রকে দেখার জন্য এত কৌতূহল। মনে মনে ভাবলাম, বেশ হয়েছে, এখন বোঝ—তারপরই আর এক দুর্বলতা এসে গ্রাস করতে থাকল। বাবাঠাকুর সিদ্ধ পুরুষ। অন্তর্যামী। তিনি বোধ হয় আগেই টের পেয়ে গেছিলেন, তার বিলুকে নিয়ে মজা করার জন্য রায়বাহাদুরের নাতিন পড়ার ঘরে ঢুকে বসে আছে। রায়বাহাদুরের নাতিন হলেই তুমি সবাইকে অবজ্ঞা করতে পার না।

মিমি কোথায় আছে কাউকে বলতেও পারছি না। তোমার ছোকরা এমন রূপসীকে খুঁজে বেড়ানো কেন? মনে মনে খোঁজা। নটুকে একবার দেখলাম দৌড়ে মন্দিরের চত্বরের দিকে গেল। তাকে বললে হয়, এই নটু জানিস, মিমি কোথায়। মাস্টারমশাই আমি, আমাকে ডাকছেন? আমার বয়স আর ওদের বয়সের তফাত পাঁচ সাত বছরের। কিন্তু এঁড়ে বাছুরের মতো গুঁতাতে এখনই এরা শিখে গেছে। অকালপক্ক। আমার খোঁজাখুঁজির মধ্যে যদি কোন দুর্বলতা আছে টের পায়! ধুস্ মরুকগে। আমি কি করব! দরকার নেই। পড়ার ঘরে গিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে থাকাই ভাল। না হয় স্নান-টান সেরে ফেলি। এক সঙ্গে পাত পড়বে লম্বা বারান্দায়। রায় বাহাদুর আর তার পরিবারবর্গের সঙ্গে এক সঙ্গে ভোজন। বৌদিও দু-বার তাড়া দিয়েছে, এই বিলু স্নান করে নে। কলেজে গেলি না, তোর দাদার সঙ্গে খেতে বসবি।

আর আশ্চর্য মন্দির থেকে বের হয়ে লক্ষ্মীকেও দেখছি না। লক্ষ্মী আর মিমি কী তবে বাগানের দিকে গেছে। যাওয়া ঠিক হবে না—তবু টানে। দু'জন

দু'রকমের। দুই মেরুর। একটা জায়গায় বোধ হয় ওরা এখন সমব্যথী। একজন অনাথ, অন্যজন আর এক অনাথের কৃপালাভে পা জড়িয়ে ধরেছে। তবে তুমিও অনাথ, এ-সব হিজিবিজি চিন্তা মাথায় খেলা করলে দেখতে পেলাম ওরা দু'জনেই খিড়কি দরজা দিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে ছুটে আসছে। সব ভেস্তে গেল। পায়ে ধরে বলাটাও যেন এক মজা। আমাকে দেখে গুম- মেরে গেল। বাবাঠাকুরের চর সামনে।

হঠাৎ আমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। রাগ চড়ে গেলেও নিজের সম্পর্কে সচেতন বলে, রাগ সামলেই কথা বলতে হল। ডাকলাম, এই লক্ষ্মী শোন।

লক্ষ্মী থামলে মিমি দাঁড়াবে। আসলে যতই মাথা গরম হয়ে থাক, মিমিকে আমি সম্বোধন করতে পারি না। কারণ কলেজে যে মেয়ে উর্বশীর মতো ঘুরে বেড়ায় তাকে একজন বাউণ্ডুলে বাবার সন্তান নাম ধরে ডাকতে পারে না।

মিমি আর লক্ষ্মী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের চোখেই কৌতূহল—আমি কী বলব শোনার জন্য।

লক্ষ্মীকে বললাম, দেখ লক্ষ্মী তোমাদের মিমিকে বলে দিও আমি বাঘও নই,

লক্ষ্মী স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বলল, ওমা এ কি কথা মাস্টার। তোমাকে বাঘ ভাল্লুক আমরা ভাবব কেন?

আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমার কোন দোষ নেই মিমি। বাবা ঠাকুর বললে কী করি। তাই পা দুটো বাড়িয়ে না দিয়ে পারি নি।

মিমি এবার বেশ কিছুক্ষণ আঁচলে শরীর ঢেকে দাঁড়াল।' বলল, আপনি আমাদের কলেজে পড়েন?

পড়ি।

কোন ইয়ার?

সেকেণ্ড ইয়ার।

মিছে কথা, কখনও তো দেখিনি।

আপনি তো কাউকে দেখেন না।

সবাইকে দেখি। সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে না দেখে উপায় আছে!

তাহলে মিমি সব দেখে। শুধু আমাকে দেখেনি। সাহসই হয়নি কখনও মিমির কাছে যাবার। দূর থেকে দেখলে, মিমি তাকে লক্ষ্য করবে কী করে, কিন্তু আসল কথাটা যে বলা হল না।—মিমি বুঝলে। ঢোক গিললাম।

লক্ষ্মী কেমন মাস্টারী গলায় বলল, বলেই ফেল না। ঢোক গিলছ কেন?

মিমির চোখ দুটো আরও বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই দুষ্টু হাসি ঠোঁটে। আমাকে দেখলে এ-ভাবে হাসে কেন? আমি যে গোবিন্দদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পলাতক হয়েছিলাম, সে কথা কি লক্ষ্মী বলে দিয়েছে। ছোড়দি যে আমাকে সাইকেলের পেছনে চড়িয়ে দামোদরের বালিয়াড়িতে নিয়ে যেত তার কথাও কি…? যে ছেলে একটা মেয়ের সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে হাওয়া খেতে যায়, সে আবার পুরুষ মানুষ কী করে। এই অবজ্ঞা থেকেই হাসি। আমাদের দারিদ্র্যের কথাও জানতে পারে। মিমিকে কিছু বলার অর্থই হচ্ছে, আমার অধিকার সম্পর্কে আমি ঠিক সচেতন নই। কিছুটা ক্ষমা চাওয়ার মতো ব্যাপার। পায়ে ধরে তুমি আমার সব ঠাকুর বলার সময় মুহূর্তে যে বিষণ্ণতা জেগে উঠেছিল চোখে, মন্দির থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তা শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলেছে দেখছি। একজন খ্যাপা মানুষ দাদুর গুরুদেব, তার ইচ্ছে অনিচ্ছতে দাদু ভয় পেলেও মিমি পায় না। দাদু ছোট না হয়ে যায় ভয়েই মিমি আমায় চরণ দুখানি ধরে সবার সামনে নাটক করেছিল।

আমার আর কথা বলার সাহস থাকল না। ভারি বিব্রত বোধ করতে থাকলাম। কেন যে কথা বলতে গেলাম। মেয়েদের সম্পর্কে আমার একটা ভয় কিংবা সংকোচ এমনিতেই এত প্রবল যে যা কিছু ইচ্ছে গোপনে। প্রকাশ করার ক্ষমতা কম। মিমি তখন যেন না বলে পারল না, কী চলে যাচ্ছেন!

স্নান করতে যাব।

কিছু বললেন না যে।

না মানে।

আপনি ধনমান যশ হলে সবাইকে নাকি আবার সব ফিরিয়ে দেবেন।

লক্ষ্মী সহসা কেমন ঠেলা দিয়ে বলল, এই মিমিদি……

লক্ষ্মী এই প্রথম আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সমবয়সী বলে আমার সব কথা মিমিকে বলে দেওয়া ঠিক হয়নি। আমি গুম মেরে গেলাম। চলে যাচ্ছিলাম, মিমি ডাকল, শুনুন। যেন আদেশ। আমাকে ফিরে দাঁড়াতেই হবে।

মেয়েরা ডাকলে আমি চলে যেতে পারি না। খিড়কি দরজার দিকটায় তখন কেউ নেই। আমরা তিনজন। লক্ষ্মী যেন আমাকে দেখছে না। মন্দিরের গায়ের কারুকার্য দেখছে এমন চোখে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণ এরা তবে বাগানে বসে বসে আমাকে নিয়েই কথা বলেছে। লক্ষ্মী কাজটা ভাল করেনি। পিলুর কথাও বলে দিতে পারে—আমরা দেশ ছাড়া এবং উদ্বাস্তু এসবও বলে দিতে

পারে। লক্ষ্মী তো আমাদের বাড়ি গিয়ে সবই দেখে এসেছে। কত গরীব আমরা মিমি টের পেয়ে গেছে।

আমরা খুব গরীব। এ-কথা টের পেলে আমি বড় ছোট হয়ে যাই। বাবার বিচিত্র খেয়ালের কথাও বলে দিতে পারে। অভিজাত পরিবার বিষয়টা কি আমার জানা হয়ে গেছে। ছোড়দির বাড়িতে তা টের পেয়েছি। দেশে বাবার জমিদার দীনেশবাবুর বাড়ি গেলে তা টের পেয়েছি। যেন ওরা মানুষ না। অন্য গ্রহের দেবদেবী। আমাদের কুঁড়েঘরে নিজেদের থাকবারই জায়গা হয় না, তার মধ্যে আবার শংকরাকে ডাকা। বাড়িতে এক পাল বেড়াল, হাঁস কবুতর একটা হনু পর্যন্ত পিলুর কৃপায় আশ্রয় লাভ করেছে। লক্ষ্মী সব বলে দিলে আমরা যে একটা মজার দেশের মানুষ মিমি ভাবতেই পারে। এখন যত রাগ গিয়ে আমার কেন জানি লক্ষ্মীর উপর পড়ল। কিছু বলারও উপায় নেই। নালিশ দিলে বদরিদা বলবে, বিলু লক্ষ্মীর সঙ্গে তোদের বনে না কেন বুঝি না। ও তোদের জন্য এত করে আর তোরা ওর পেছনে লাগলে থাপ্পা হবে না। তোদের অর্থে, আমি নটু পুটু। নটু পুটু একদিন অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে বলেছিল, আমরা আর ওর সঙ্গে কোন কথা বলব না। আড়ি। সেটাও থাকে না শেষ পর্যন্ত। জল দিতে এসে, খাবার দেওয়া হয়েছে বলতে এসে কিংবা বিছানা করে দেবার সময় এমনভাবে কথা বলা শুরু করে দেবে যে জবাব না দিয়ে থাকা যায় না।

এ দেশের মানুষেরা উদ্বাস্তুদের যে কত করুণার চোখে দেখে। আমি যখন উদ্বাস্তু আর মিমি যখন তা টেরই পেয়ে গেছে তখন আর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বরং আমার বাবাঠাকুর সাজার বিষয়টা নিয়ে মিমি এখন কী বলে সেটা শোনাই ভাল।

মিমি সেদিকটায় একেবারেই গেল না। শুধু বলল, মাস্টার তোমার বাড়ি আমাকে নিয়ে যাবে?

আপনি থেকে তুমি। লক্ষ্মী বাগানে বসে ঠিক সারাক্ষণ মাস্টার মাস্টার করেছিল। সব ধরে ফেলেছে।

আমার বাড়ি কেন?

বেড়াতে যাব।

না না আপনি আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাবেন কেন?

বেড়াতে গেলে দোষের কিছু আছে?

না, দোষের হবে কেন।

লক্ষ্মী টানতে থাকল মিমির হাতে ধরে। চল মিমিদি। বলেছিলাম না, মাস্টার স্বার্থপর। ছোট ভাইটাকে পর্যন্ত এখানে দুরছাই করে। আমি তো জোরজার করে গেছিলাম। তোমাকে যেতে হলে জোরজার করে যেতে হবে।

তাই যাব ভাবছি। মিমি শুধু এইটুকু বলেই চলে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি পিছু পিছু এগিয়ে গেলাম। —আমাদের বাড়ি আপনি যাবেন কেন? বন জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি। ঢোকাও যায় না।

তোমরা ঢোক কী করে!

অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনাকে আমি নিয়ে যাব না। মনে মনে বললাম, মজা পেয়েছ না? বাড়ি গিয়ে দেখবে, মা হয়ত বাবার সঙ্গে গলা ছেড়ে ঝগড়া করছে। পিলু হয়তো খালি গায়ে এক বোঝা ঘাস নিয়ে ঢুকছে বাড়িতে। বাবা তখন হয়ত হাঁটুর কাপড় তুলে নিশ্চিন্তে হুকা খাচ্ছেন। মায়া হয়তো হনুটাকে কাঁধে নিয়ে দুলে দুলে পড়ছে। ঘরের মধ্যে একটা তক্তপোশ নেই। বাঁশের মাচান। বারান্দায় একটা চেয়ার নেই, মাদুর পাতা। রান্নাঘর বলতে শণ দিয়ে ছাওয়া ঝাঁপের বেড়া। হয়তো বাবা গামছা পরে স্নানে যাবার আগে পোষা কুকুরটার এঁটুলি বাছছেন। মানুষের চেয়ে জীবজন্তুর প্রতি সেবাযত্ন লক্ষ্য করলেই ধরতে পারবে অবস্থা বিপাকে আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি। ও সব দেখে তুমি মজা পাও সে হতে দেব কেন। শুধু মজা, কলেজের আর মেয়েরা, শুনে আমার দিকে ঠিক যাবার সময় চোখ তুলে তাকাবে। তাকালেই বুঝতে পারব ওরাও জেনে গেছে। তুমি শ্রীময়ী কলেজে এত অহংকারী এখানে এসে এত মুখরা হয়ে উঠলে কী করে? বাবা বলেন, স্ত্রীজাতি যা দেবী সর্বভূতেষু—তোমরা কখন যে কী যদি ঈশ্বর বুঝতে পারতেন।

মিমি আমাকে চুপচাপ থাকতে দেখে বলল, শোনো মাস্টার তুমি নিয়ে না যাও, আমি লক্ষ্মীকে নিয়ে যাব!

লক্ষ্মী আমার সঙ্গে একবার গেছে। আর একবার গেলে এমন বনজঙ্গলে ঢুকে যাবে, যে সে আবার নবমী বুড়ি না হয়ে যায়।

নবমী বুড়ি মানে?

লক্ষ্মী জানে।

নবমী বুড়ির কথায় মিমি বোধহয় কিছুটা ঘাবড়ে গেল।

লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, নবমী বুড়িটা কেরে?

আরে মাস্টারের বাড়ি যাবার পথে জঙ্গল পড়ে।

তুমি বল লক্ষ্মী কী গভীর বনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

না মিমিদি, সুন্দর রাস্তা। একবার গেলে তোমার কতদিন যে রাস্তাটার কথা মনে থাকবে। বড় বড় গাছের ছায়া, কত রকমের পাখি, দু পাশের ঝোপ জঙ্গলে কত অচেনা ফুল।

ভীষণ রেগে গিয়ে বললাম, কবি হয়ে গেলে দেখছি।

কবি মানে? লক্ষ্মী মিমির দিকে তাকিয়ে বলল, কবি কিগো মিমিদি!

তুমি নিজেই কবি মাস্টার। ভীতু মানুষেরা কবি হয় জান। নারীর স্বভাব সুলভ সেই এক মুখ ঝামটা মিমির।

আমি ভীতু মানুষ!

তা ছাড়া কী।

যাই হোক আর যাওয়ার কথা উঠছে না বলে নিশ্চিন্ত। এবারে কেটে পড়লে হয়। বৌদি এসে এমন নিরিবিলি জায়গায় দুটো মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখলে খারাপ ভাবতে পারে। পা বাড়াতেই আবার ডাক, বাবাঠাকুর আমরা কিন্তু যাব।

মিমির কাছে বাবাঠাকুর হয়ে গেলাম! আমাকে পায়ে ধরার সময় ঠাকুর বলেছিল। ঠাকুর না বাবাঠাকুর! আমি কিঞ্চিৎ বিভ্রমে পড়ে গেলাম। তাকালাম না। চলে যাওয়াই শ্রেয়। এখন দরকার আমার লক্ষ্মীকে একা পাওয়ার। রাত দশটা এগারটা নাগাদ পাওয়া যাবে। সে তখন আমার নটু পুটুর বিছানা করতে আসে পড়ার ঘরে। নটু পুটুকে সঙ্গে নিয়ে পড়তে হবে। তুমি শেষ পর্যন্ত আমার পেছনে এতটা লেগেছ! রায় বাহাদুরের নাতিনকে লেলিয়ে দিয়েছ। কলেজের দেখা আর এখানে দেখা একেবারে আলাদা রকমের। কত সম্মান দিতাম, কত মহিমময়ী ভাবতাম, দেবী মনে হত, শাড়ির খসখস শব্দ শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন করত। এখন দেখছি, তুমি আর মিমি একরকমের। আমার পেছনে লেগে মজা খুঁজে বেড়াও। আমি তোমাদের কাছে বাবাঠাকুর!

দেখুন আমাকে বাবাঠাকুর ডাকবেন না। আমি বিলু। কমার্স নিয়ে পড়ি। কম্পার্টমেণ্টালে পাস। বাবার কথায় দশটা বিষয়ের মধ্যে নটাতে পাস। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করে। অবশ্য এ-সবই মনে মনে। যা বললাম, তা অন্যরকম।—বাবাঠাকুর হতে যাব কেন! বাবাঠাকুর নরেন খাম্পা। তার ভক্ত আপনার পিতামহ।

হাঁ মাস্টার, তুমি বাবাঠাকুর তবে! লক্ষ্মী গলা উঁচিয়ে কথাটা বলল।

না, আমি বাবাঠাকুর না।

মিমি বলল, বাবাঠাকুর স্ত সেকেণ্ড।

ইস কেন যে সাড়া দিয়েছিলাম বাবাঠাকুরের ডাকে। তাঁর কাছে শরীর পবিত্র অপবিত্র বলে কিছু নেই। মানুষের মন পবিত্র থাকলে সে সব সময় পবিত্র। হাগামোতা কাপড়ে পুজা আটকায় না। স্নান না করেও মায়ের মন্দিরে ঢোকা যায়। পুজা দেওয়া যায়। আমি শুধু তার আজ্ঞা শিরোধার্য করেছি। আমি বাবাঠাকুর স্ত সেকেণ্ড হতে যাব কেন। আসলে মিমি তার অপমানের জ্বালা এভাবে মেটাতে চায়। মিমির এই ব্যবহারে নারী জাতির উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মাল। ছোড়দির জন্য যে ভাবালুতায় ভুগছিলাম তাও কেটে গেল। অবশ্য আমার মার অভাবে অনটনে যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেন সংস্থিতার চেহারাটা জীবনে বার বার দেখা। দেখা সত্বেও, একা থাকলেই কোনো ফুলের উপত্যকায় এক তরুণী কেবল দৌড়ায় এমন একটা ছবি মাথার মধ্যে কে যে গুঁজে দিয়ে যায়। আর এটা থাকে বলেই পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মাচ্ছে। এটা আছে বলেই বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখি। না হলে যেন সব ফাঁকা মাঠ, জীবন মৃত বৃক্ষের মতো। আবার সেই ধন মান যশের কথা মনে উঁকি দিল। ও-সব হলে কেউ আর মজা করতে পারবে না। তখন গাড়ি থেকে নেমে এ-শর্মার গলায় মালা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এবং এ-ভাবে কোনো এক উঁচু মঞ্চ থেকে আমি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেই, কখনও নিমগ্ন থাকি বই লেখায়, কখনও কবি হয়ে যাই। অথবা শিল্পী, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি—আয়ে না বালম—যা কিছু আমার নাগালের বাইরে সেই সব স্বপ্নে মনটা বিভোর হয়ে থাকে।

এদের সঙ্গে কথায় পারব না। মেয়েদের সঙ্গে আমি ঠিক গুছিয়ে কথাও বলতে পারি না। আমার দৃঢ়তা কম। আমার মধ্যে নারীজাতির জন্য দুর্বলতাই বেশি। সব সুন্দরী বালিকাকেই মনে হয় এদের ছুঁতে পারলেও পবিত্র হওয়া যায়। ছোড়দি নীল রঙের গাড়িতে যখন স্কুলে যেত, আমি রোয়াকে বসে দেখতাম। এই দেখার এক সৌন্দর্য আবিষ্কারের নেশা ছিল, তার পায়ে সাদা কেডস, সাদা মোজা, বব করা চুল রেশমের মতো, যেন আমার সামনে আস্ত তাজা ফুল হয়ে ফুটে থাকত। এ-সৌন্দর্যবোধ কোথায় রাখি। সৌন্দর্যবোধই আমাকে বড় বিপাকে ফেলে দেয়। কলেজে এই মিমিকেও সেই এক সৌন্দর্য-বোধ থেকে আবিষ্কার। এখন দেখছি কত নিষ্ঠুর হতে পারে মিমি। সে আমাকে জব্দ করার জন্য বাড়ি পর্যন্ত যেতে চায়। বংশ যার এত দীন হীন তার আবার বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা কেন? বাবাঠাকুর স্ত সেকেণ্ড বলায় এত রাগ যে বলি, বাড়ি গেলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে পিলু। ওকে তো জানেন না

সে তার দাদার সঙ্গে কেউ মস্করা করছে জানলে আর রক্ষা রাখবে না। দাদাই হচ্ছে পৃথিবীতে দেখা তার বড় মানুষ। দাদা আর বিদ্যাসাগর তাঁর কাছে সমান। দাদা তার কলেজে পড়ে সোজা কথা না।

সহসা খিড়কির বাগানের দিকটায় পুটু হাজির। স্যার আপনি এখানে। মামা খুঁজছে।

তাড়াতাড়ি পালাতে হয়। মিমি আর লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলা নিভৃতে অশালীন ব্যাপার। বয়স তো হচ্ছে। আঠার বয়সটা কম না। বদরিদার বিবাহ ষোল বছরে। বৌদির বয়স নয়। বার বছর বয়সে নটুর দাদা জন্মেই মরে গেল। নটু তার অনেক পরের। অনেক মানত তার জন্য। বদরিদা বোঝে সব। আমার বয়সটা ভাল না। বৌদি অন্যরকমের। তার কাছে বিলু সংসারে পাপ আছে বলে জানে না। নাহলে একা লক্ষ্মীকে আমার সঙ্গে বাড়ি যেতে দেয়! কিংবা রুচির প্রশ্নও থাকতে পারে। শত হলেও মাস্টারদার ভাইপো।

যাই হউক কারো দিকে না তাকিয়ে ধর্মশালা রান্নাবাড়ি পার হয়ে ছুটে যাচ্ছিলাম, তখনই মিমি বলছে, তুমি গেলে কী হবে। ছাড়া পাবে না। তোমার সঙ্গে কথা আছে। ছোড়দি নাকি চিঠি লিখবে তোমাকে।

মাথাটা ঝাঁঝাঁ করতে থাকল। লক্ষ্মী আমাকে সত্যি ডুবিয়েছে। লক্ষ্মীকেই একমাত্র সেই পলাতক জীবনের কথা বলেছিলাম। ঠিক বলিনি, লক্ষ্মী খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একা পেলেই বেশ সমব্যথীর মতো কথা তুলেছে ছোড়দির। যেন ছোড়দি তার একাই নয়, লক্ষ্মীরও। এখন বুঝতে পারছি আমি কত হাবা। যদি বদরিদার কানে যায়। ইস্ সত্যি কেন যে বলতে গেলাম বিশ্বাস করে। তুমি বিলু গরীবের ছেলে। তোমার এই ঘোড়ারোগ কেন।

আরে বিলু চান করবি না? সবার হয়ে গেছে।

রায়বাহাদুর পত্নীর এতক্ষণে চৈতন্য উদয়—মিমিটা কোথায়?

সঙ্গে তার পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু—ছোট ছোট কাচ্চা-বাচ্চা, মিমি তোমাদের ছোট নেই। বাগানে বসে মাস্টারের মুণ্ডুপাত করছে দেখগে। বাবাঠাকুর হু সেকেণ্ড ভাবতে শুরু করেছে আমাকে।

রায়বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন, হ্যাঁ আপনি চান করে নিন।

এ-আবার কেমন কথা! আমাকে আপনি আজ্ঞে করছে। রায়বাহাদুরও কী আমাকে বাবাঠাকুর হু সেকেণ্ড ভেবে ফেলেছে। যার হবার কথা নেতা, না হয় কবি, শিল্পী কিংবা সংগীত বিশারদ, তাকে নাজা সন্ন্যাসী বানিয়ে দেবার এই ষড়যন্ত্র কেন! আমি ক্যালক্যাল করে তাকাতেই যেন পরমগুরুর করুণা ভেবে বলা,

আপনার উপর বাবাঠাকুরের অশেষ কৃপা। তিনি তাঁর যদি এক বিন্দু আমাদের দিতেন।

প্রথম জীবনে আমার জিভে শালা কথাটা এসে গেছিল—শালা আমি কি থুঃ তোমাদের গুরু ভাই।

আপনি আজ্ঞে করায় মনটা তিক্ততায় ভরে গেল। বদরিদার উপর এদের প্রভাব, সীমাহীন খাতিরযত্ন দেখেই এটা টের পেয়েছি। যদি বদরিদাও বুঝে ফেলে, কুলীন বামুনের ছেলে, তায় আবার দেখতে ব্রহ্মচারীর মতো, সহজেই মন্দিরের বলির পাঁঠা করে ফেলা যায়। আমার বাবা যা একখানা মানুষ, তাতে করে বদরিদার প্রস্তাব সহজেই লুফে নিতে পারে। যদি বলে, বাবাঠাকুরের বয়েস হয়ে গেল, যে কোনদিন দেহরক্ষা করতে পারেন, বিলুকে দিন মন্দিরে ঢুকিয়ে দিই। ইহজন্ম এবং পরজন্মের কাজ একই সঙ্গে সারা হয়ে যাবে। কত বড় কথা এমন জাগ্রত দেবীর থানের পুরোহিত হওয়া। সাত পুরুষের পুণ্যফল না থাকলে এমন সৌভাগ্য মানুষের জন্মায় না।

আসলে রায়বাহাদুর বোধহয় ভেবে ফেলেছেন, আমার আহার না হলে ওদের পাতে বসা অনুচিত। বাবাঠাকুর এদিকটায় খেতে আসেন না। তিনি আহার কখন করেন কেউ আমরা জানিও না। কাঁচা ফলমূল দই সন্দেশ এই তাঁর আহার। মন্দিরে বসেই তিনি নিজের খুশিমত খান, খেতে ইচ্ছে না হলে শুয়ে থাকেন। শুতে ইচ্ছে না হলে মন্দিরে প্রদক্ষিণ করেন, কিংবা তাঁর ঘরে পুঁথি ডাঁই করা আছে তা পাঠ করেন। সকালবেলায় হোতার সাঁকো পর্যন্ত যান। কারণ তখন প্রাতঃকৃত্যের দরকার হয়। দু'পাশের গরীব মানুষ-জন, ফড়ে, সাধু, পাটের মহাজন বাবাঠাকুরকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। দেখলে পুণ্য। দিন ভাল যায়। একজন মানুষ দর্শনে শুভাশুভ বোধ এমন তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে এ-অঞ্চলে না এলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

খেতে বসে বোঝা গেল, আমার প্রতি সবার নজর। ধর্মশালার বারান্দায় আজ পাত পড়েছে। রায়বাহাদুরের পরিবার সহ আমরা সবাই। নটু পুটু কার্তিক মামা, ধনুদা এবং আমি। আমার দু'পাশে দু'জন, বদরিদা ডান পাশে, বাঁ পাশে রায়বাহাদুর। সবার খালি গা, সাদা উপবীত। ঠিক সামনে বসে আছে মিমি। লক্ষ্মীর এখন কাজ জল, পাতে লেবু এবং নুন দেওয়া। সে খেতে বসবে বৌদির সঙ্গে। মিমি আমার সামনে বসে। নির্বিঘ্নে যে খাব তা উপায় নেই।

রায়বাহাদুর গদ্‌গদ হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার পিতৃদেব কী করেন?

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। শুধু বললাম, কিছু করেন না।

বদরিদা জানেন আমি নিরীহ গোবেচারা মানুষ। সেই মানুষ কোন কারণে অতিষ্ঠ না হয়ে উঠলে এমন জবাব দেয় না। বদরিদা গণ্ডুষ করার সময় আমার দিকে তাকালেন।

আমিও তখন পঞ্চদেবতাকে নিবেদন করে গণ্ডুষ করতে যাচ্ছি। দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল। গণ্ডুষ সেরে বদরিদা বেশ ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন, তোর হয়েছেটা কি? সকাল থেকে নাকি মেজাজ খারাপ করে আছিস। নটু পুটুকে পড়াতে বসালি না। কলেজে গেলি না। রেল লাইনে গিয়ে বসে থাকলি। স্থূলকায় রায়বাহাদুর সরু আতপ-চালের ভাত ঘি এবং সুকতোর ডাল দিয়ে মাখছিলেন, গন্ধরাজ লেবুর সুঘ্রাণ উঠছে—তিনি তাঁর খাওয়ার চেয়ে আমার সম্পর্কে বেশি কৌতূহল অনুভব করছেন বোধ হয়—কারণ ভোগের দিকে তাঁর মন নেই—বদরিদার কথার দিকে তার মন। বদরিদা ঠিক বাবাঠাকুরের মহিমা বুঝে উঠতে পারছেন না—তাকে বিষয়টা অধিগত করানো দরকার ভেবেই যেন বলা, বাবাঠাকুরের ইচ্ছে। তুমি বদরি কেন যে বুঝছ না।

অর্থাৎ আমার আজকের মেজাজ মর্জি সবই বাবাঠাকুরের মহিমার ফলে হয়েছে। বাবাঠাকুরকে আমিও শ্রদ্ধা ভক্তি করি। বিষয় আশয় থেকে মুক্ত তিনি। তার জ্ঞান অসীম। এ-সব এখানে থাকতে টের-পেয়েছি। কিন্তু তাকে পার্থিব জগতের বাইরের কোন শক্তি ভাবিনি।

বদরিদা বললেন, তা ঠিক।

বাবাঠাকুরের অসুখের সময় বৃন্দাবন চক্রবর্তীকে নিয়ে এলে মন্দিরে ফুল জল দেবার জন্য। ঢোকাতে পারলে! বাবাঠাকুর বলির খাঁড়া নিয়ে লোকটার পেছনে ছুটেছিলেন। তিনি সব বোঝেন। ধরতে পার বাবাঠাকুর তাঁর নিজের উত্তরাধিকারী ঠিকই করে ফেলেছেন! তোমার মাস্টারের মুখখানি দেখেছ। নিষ্পাপ, পবিত্র, নবীন সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। নবীন সন্ন্যাসী কথাটা শুনে মিমি আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল।

আমি গালে হাত দিলাম। সোনালী রেশমের মতো গালে দাড়ি। এরই জন্য তবে যত হুজ্জুতি। আচ্ছা দেখা যাবে। কোনরকমে খেয়ে উঠে ঘরে এসে বসতে না বসতেই দেখি মিমি হাজির। ও আমাকে ছেড়ে দেবে না বলেছে। না-ছাড়ার কাজটা বোধহয় এখন থেকেই শুরু করতে চায়।

খুব ভাল মানুষ হয়ে গেলাম। বিনীত কথাবার্তা—আপনারা কখন যাচ্ছেন।

সে দিয়ে তোমার কী দরকার।

যখন জানার দরকার নেই বালিশটা টেনে শুয়ে পড়া যাক। চোখ বোজার চেষ্টা করি। ঘুমই এখন এর থেকে পরিত্রাণ করতে পারে। পাশ ফিরলাম।

ছোড়দি নাকি তোমাকে পুলিশে দেবে বলেছিল?

ভয় দেখিয়েছে। চোখ বুজেই বললাম। কারণ লক্ষ্মী যা ডোবাবার ডুবিয়েছে। এখন ভেসে উঠে লাভ নেই।

কেন ভয় দেখাল।

হুঁ। কিছু বলছেন! হাই তুললাম।

কেন ভয় দেখাল!

চুরি করেছিলাম।

কী চুরি করেছিলে?

টাকা। আমি আস্ত একটা চোর। হাই উঠতে থাকল। হাই তুলে যদি রেহাই পাই।

কার টাকা?

গোবিন্দদার। গ্যারেজে কাজ করতুম। মেট্রিকে কম্পার্টমেণ্টালে পাস করে এর চেয়ে বেশি কিছু করা যায় না।

এখানে উদয় হলে কী করে?

সেও ভাগ্য।

তোমাকে গ্যারেজেই মানায়।

ঠিকই বলেছেন! হাই তুলেও দেখছি নিস্তার নেই।

আমাদের গ্যারেজে কাজ করবে?

না। আমি যে কথা দিয়েছি।

কাকে কথা দিয়েছ?

ছোড়দিকে!

কী কথা!

মানুষ হব। বাবাঠাকুর হব না! চোর জোচ্চোরকে বাবাঠাকুর মানায় না। তারপরেই উঠে সোজা মিমির কাছে হাতজোড় করে বললাম, দোহাই বলবেন না যেন, আমি চুরি করেছিলাম গোবিন্দদার কৌটো থেকে। টাকা চুরি করে পালিয়েছিলাম। আপনার পিতামহ জানলে দুঃখ পাবে।

বয়ে গেছে দুঃখ পেতে।

শুনলেন না, বলল, দেখতে নবীন সন্ন্যাসী!

ঐটুকু তো তোমার সম্বল। শ্রীচরণ দুখানি বাড়িয়ে দিতে লজ্জা করল না। এক কলেজে পড়ি, এক ইয়ারের ছাত্র।

মিমি কলেজে আপনাকে দূর থেকে দেখতাম। কী গম্ভীর। আমাদের সাহসই হত না আপনার কাছ দিয়ে যাবার। আপনি এখন আমার পেছনে লেগেছেন। একটা কাজ করবেন, বড় উপকার হয়।

কী কাজ— ?

পিতামহকে নিবৃত্ত করুন। যা আজ্ঞে, আপনি করছে ?

ভাবছ তোমাকে করছে ?

না তা না। বাবাঠাকুরের ভামি আমি তিনি বুঝে ফেলেছেন। তবু যাই হোক অমন বুড়ো মানুষ আজ্ঞে আপনি করলে অস্বস্তি হয়।

দাদুকে সব বলে দিলেই আজ্ঞে আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

কী বলবেন ?

তুমি একটা চোর।

বলবেন ত !

তার মানে।

যদি দয়া করে বলেন, জানাজানি হয়।

তুমি আমাকে আপনি আজ্ঞে করছ কেন ? বলব না।

গেল সব, প্রথম ভেবেছিলাম দোহাই বলবেন না বললে, ঠিক বলে দেবে। পরে ভাবলাম কথা যদি রাখে, তাহলে আমি যে চোর ছ্যাচোড় জানাজানি হবে না। এটা এখন সত্যি দেখছি জানাজানি হওয়া দরকার। বৃন্দাবন চক্রবর্তীকে ঢুকতে দেন নি বাবাঠাকুর, এক পঞ্চতীর্থ এসেছিল দেবীর পুরোহিত হবে বলে, বাবাঠাকুর তার গেরুয়া বসন এক হ্যাঁচকায় নাঙ্গা করে দিয়েছিলেন—আরও এভাবে দু-একজন এসে বাবাঠাকুরের কোপানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁর মহিমা বোঝা দায়। এখন ভেবে ফেলেছে সবাই আমিই সেই মানুষ বাবাঠাকুর যার সন্ধানে ছিলেন। একমাত্র চোর জোচ্চোর প্রতিপন্ন হলে যদি এই বিষম দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বললাম, দোহাই বলুন। সবাইকে বলুন, চোর ছ্যাচোড় দিয়ে কখনও থানে পুজা হয়! সব প্রণামীর পয়সা মেরে দেবে না!

মিমি কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেল। বলল, জানাজানি হলে ভাল হবে ? এখান থেকে সটকে যেতে হবে না ? বদরিদা একটা চোরকে জেনেশুনে রাখবে ?

মিমি আমার কাছে দুই সমান।

তার মানে।

তার মানে আপনি বুঝবেন না। আমার চোখ সত্যি বড় কাতর দেখাল। কাতর চোখ দেখলে বোধহয় মেয়েদের মধ্যে মাতৃভাব জাগে। মিমির মধ্যেও মাতৃভাব

জাগছে। এই সুযোগ। বললাম, আপনি আতুরে নাতিন। রায়বাহাদুরকে দিয়ে বলান, আমাকে দিয়ে ওসব কাজ হয় না। হবে না।

তুমি দেখছি খুব ভয় পেয়ে গেছ?

আপনি তো আমার বাবা কাকাকে জানেন না।

মাস্টারমশাই তোমার কাকা না?

হ্যাঁ, আমার মানুকাকা। তিনি কম্পার্টমেন্টালে পাস করেছিলাম বলে গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। হাতের কাজ শিখলে নাকি অনেক পয়সা। তাঁর বন্ধু গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত করেছেন।

তোমার বাবা মত দিলেন!

বারে দেবেন না। গাড়ি চালাব। একটা আস্ত গাড়ি আমার হাতে। কত লোকের প্রাণ আমার হাতে। অফিস কাচারিতে ঠিকমতো হাজিরা আমার হাতে। বাবা তো একেবারে গদ্‌গদ। গ্যারেজে কাজ শিখতে শিখতে একদিন গাড়ি চালাতেও শিখে যাব। আমার বাবার বড় স্বপ্ন ছিল আমি গাড়ি চালাই।

মাতৃভাবটা আরও দেখছি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মিমির।

তোমার বাবা এটা ঠিক কাজ করেন নি। তুমি গাড়ির ড্রাইভার হবে, ছিঃ ভাবা যায় না।

আচ্ছা বলুন তো ভাবা যায়। কেবল আমার ছোট ভাই পিলু বলত, দাদা কলেজে পড়বে। বোনটাও। মারও ইচ্ছে।

তাই তো হওয়া উচিত।

সে আর হচ্ছে। আপনার দাদু, বাবাঠাকুর, বদরিদা মিলে মানুকাকার কাছে যদি যায়—আমি মরেছি।

ওরা যাবে কেন?

বাবাঠাকুর বানাবার জন্য।

ওরা বললেই তোমার বাবা মত দেবেন কেন।

হায় ভগবান তুমি তো আমার বাবাকে চেন না। বাবা দেশ ছেড়ে এসে কতকাল যে জাতমান উদ্ধারের জন্য নামাবলি গায়ে ঘোরাফেরা করেছেন। তুমি তো জানো না, মানুকাকার ইচ্ছেই বাবার ইচ্ছে। মানুকাকার উপর আর কারো কথা নেই। হাতের কাছে এত বড় সুযোগ বাবা কী সহজে ছাড়বেন। এত বড় মন্দিরের বাবাঠাকুরের তিনি বাবা হবেন—মন্দিরের প্রণামী থেকে সব কিছুর বখরা তাঁর হবে—তিনি কী ছাড়তে পারবেন।

সহসা আমি কেন যে মিমিকে তুমি বলে ফেললাম। এটা ধৃষ্টতা হতে পারে।

ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকালাম। চোখে-মুখে মাতৃভাব আছে না মিলিয়ে গেছে লক্ষ্য করা দরকার। যদি দেখি বদল হয় নি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন। এই যে আপনি মানে আপনার পিতামহ মানে সবাই আমার কাছে স্বপ্নের দেশের মানুষ —লক্ষ্মী বলল, আপনাদের সামনের বাগানে নাকি একটা কাকাতুয়া বসে থাকে —একদিন নিয়ে যাবেন, দেখে আসব। এত সব মনের মধ্যে যখন ক্রিয়া করছে, তখনই লক্ষ্য করলাম, মাতৃভাব বদলে গিয়ে চোখ ঘুরপাক খেতে খেতে কেমন সামান্য প্রেমিক-প্রেমিক মুখ। আমার দিকে আর সোজাসুজি তাকিয়ে কথা বলতে পারছে না। এতে প্রবল উৎসাহ সঞ্চার হল আমার মধ্যে। বললাম, মিমি তুমিই পার আমাকে এ-বিপদ থেকে রক্ষা করতে।

মিমি আঁচল সামলাচ্ছে। শরীর ঢাকছে। যাক আমি যে পুরুষমানুষ এ-বোধটা এতক্ষণে ভেসে উঠছে মনের মধ্যে। এ-বোধটা একজন তরুণ এবং তরুণীর মধ্যে থাকা ভাল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বলের মতো পায়ে গড়াচ্ছিলাম, এখন মনে হচ্ছে বল না হাতের বটুয়া। একেবারে পায়ে নিয়ে গিয়ে গোলের কাছে ফেলার আগেই হাতে তুলে বটুয়া করে ফেলেছে। মিমি বলল, তোমাদের সঙ্গে নিরঞ্জন পড়ে না।

হ্যাঁ পড়ে।

ও আমাদের পাড়ায় থাকে।

মিমি কি তাহলে এ-বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চায় না। মিমিকে বললাম, বোস না। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।

মিমি বসে বলল, তুমি কমার্স নিয়ে ভর্তি হলে কেন?

আসল কথায় আসছে না। তবু বেশী চাপ দেওয়া ঠিক না। যখন একবার বশ মেনেছে এবং আমি কমার্স নিলাম কেন, কম্পার্টমেন্টালে পাস করলে হয় কমার্স না হয় আর্টস—তা বলতে পারে আর্টস নিতে পারতে—কিন্তু বোঝাই কী করে তিন চার মাস লেট করে ফেললে আমার জন্য কে জায়গা রাখবে? মিমি সায়েন্স নিয়ে পড়ে। জেলা থেকে জলপানি পাওয়া মেয়ে। ও-মেয়েকে কে না দেখতে ভালবাসে। আর সাদা জমিন আর নীল পাড়ের শাড়ি পরে মিমি যে কত নীল হয়ে যায় গাছপালা পর্যন্ত তার সাক্ষী দিতে পারে। আমি তো সামান্য কম্পার্টমেন্টাল পাস করা ছেলে—আমার কথা না হয় বাদই দিলাম।

আমি বললাম, কমার্স আমার ভাল লাগে।

তোমাকে আর্টস নিয়ে পড়লে মানাত।

এ-কথা কেন! সায়েন্স নয় কেন? আর্টস মানে ত বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত।

শেষ বিষয়টি বাবাঠাকুরকে মেরামত করতে বিশেষ সাহায্য করতে পারে। মিমি কি সত্যি চায় আমি মন্দিরে বাবাঠাকুর হই। বর্তমান বাবাঠাকুরের যা শারীরিক অবস্থা যে কোনোদিন টেঁসে যেতে পারেন। কেবল বড় রকমের কোনো কোপের বশবর্তী হয়ে চলেছেন বলে যেন বেঁচে আছেন। বাবাঠাকুর মরে গিয়েও যদি রেহাই না দেন। তাঁর পছন্দমতো উত্তরাধিকারী আবিষ্কার করতে পারলে বদরিদা কিংবা মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকদের বড় রকমের স্বস্তি।

বললাম, আর্টস ভাল লাগে না।

তোমাকে কবি কবি লাগে দেখতে।

তোমার দাদু যে বললেন, নবীন সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী না ছাই।

কেন বললেন না। তুমি শুনলে না।

শুনেছি। আমার পছন্দ না।

কাল ভেবেছি ভৃগুর কাছে যাব। বলব, দাদা এবারের মতো বাঁচাও।

ভৃগু আবার কে।

দাড়ি কামায়। গাল সাফ করে দেব। গোঁফ ফেলব না। চুল খাটো করে কাটব। নবীন সন্ন্যাসী আর কবি দুই ছুটে যেতে তখন পথ পাবে না।

মিমি হিহি করে হাসল। বড় সুন্দর দাঁত। দাঁত কেন—কী নয়। যেদিকে চোখ সেদিকেই নয়নাভিরাম—আহা আমি কালিদাস নই—আমি মাইকেল নই—এ-বর্ণনা কী করে দিই। ওর হাতের আঙুল যেন পদ্মকলি, পদ্মকলি না চাঁপাফুল, না কী সোনালী যবের শিষের মতো। ওর পা শকুন্তলার পতিগৃহের যাত্রার আগে যেমন সচারু ছিল দেখতে তার চেয়ে প্রবল কিছু। আমার সেই ছোড়দি বড় হয়ে এখানে হাজির। সারাজীবন ভোগাবে। বললাম, মিমি আমাকে বাঁচাও। তুমি এত সুন্দর, তুমিই পার বাঁচাতে।

বাঁচানোর সঙ্গে সুন্দরের কী সম্পর্ক আমি নিজেও বুঝলাম না। তবু বলে ফেললাম।

মিমি বলল, দেখি আমি কী করতে পারি।

কিছু করতে হবে না। শুধু পিতামহর কানে কথাটা তুলে দাও।

কী কথা?

বারে ভুলে গেলে। এত করে বলছি। আমি কবি নই, নবীন সন্ন্যাসীও নই। একটা আস্ত চোর। যদি এটা বাবাঠাকুর কিংবা তোমার পিতামহ জানতে পারেন তবেই বেঁচে যাব।

তুমি নিজেই গিয়ে বল না।

আমি বললে বিশ্বাস করবে ভাবছ। ভাববে, বাবাঠাকুর হবার ভয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলছি।

সে দেখব। তুমি কিন্তু কলেজ মেগাজিনে কবিতা লিখবে এবার।

মিমির ভাল নাম দীপান্বিতা। এ-নামে আবার কেউ ডাকে না। আমরা মিমির নাম মনে মনে নিজের মতো ঠিক করে নি। মিমি আমার কাছে ছোড়দি। ছোড়দিকে দিয়েই আমার প্রথম মনঃকষ্ট, অর্থাৎ যাকে সাদা বাংলায় বলে ভালবাসা—এক বছর পর টের পেয়েছি—এরই নাম ভালবাসা—এটি টের পাবার পর মিমি আমার কাছে ছোড়দি হয়েই আছে। যেমন নিরঞ্জনের কাছে মিমি বিশালাক্ষী। কেউ ডাকে হৈমন্তি যার যেমন—সেই মেয়ে কলেজ ম্যাগাজিনের সহ সম্পাদক—কে কবিতা লিখবে, কে গল্প লিখবে, কে প্রবন্ধ লিখবে তারই ঠিক করে দেবার কথা।

বললাম, মিমি দোহাই তোমার। আমি জীবনেও কবিতা লিখিনি। কবিতা রবিঠাকুর লিখেছেন জানি। নবীন সেন, রঙ্গলাল, আর কী যেন নাম, আমার মনেও থাকে না—জীবনানন্দ না যেন কী। দ্যাখ আমার উপর তুমি এ-গুরু দায়িত্ব অর্পণ কর না। দোহাই, তোমরা সবাই দেখছি আমাকে পাগল করবে না হয় আবার দেশ-ছাড়া করবে।

মিমি এবারে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলল, হবে। দাদুর কানে কথাটা তুলব। চোর ছ্যাঁচোড় দিয়ে হয় না তাও বলব। তবে শর্ত একটাই, তোমাকে কলেজ ম্যাগাজিনে কবিতা লিখতে হবে।

আপাতত মিমির শর্তে রাজি হওয়া উচিত। পারি না পারি চেষ্টা করব। যা হয় লিখে না হয় টুকে দিয়ে দেব। তবু যা ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে তাতে করে মিমি ছাড়া আমার অন্য কোন বাঁচার পথ খোলা নেই। মিমি যাবার সময় ডানার মতো চোখ তুলে তাকাল—ডানার মত চোখ তুলে। বেশ কাব্য আছে দেখছি, তাড়াতাড়ি মিমিকে ফের ডাকলাম, মিমি শোন পেয়ে গেছি—যদি এ-ভাবে শুরু করি কবিতাটা, ডানার মত চোখ তুলে—

অন্যের, অন্যের কবিতা। মিমি চেঁচিয়ে উঠল। কে বলবে এখন মিমি কলেজের সেই মেয়ে। দৃঢ়তার ছবি, কারো দিকে না তাকানোর স্বভাব, শুধু ওর দাদা ফোর্থ-ইয়ারে পড়ে, সে এবং তার বন্ধুবান্ধব ছাড়া যে কথা বলে না, আমরা যারা মিমিকে চোর ছ্যাঁচোড়ের মতো পালিয়ে দেখি সেই মিমির মধ্যে একি প্রগলভতার

প্রকাশ। মিমি বলল, তুমি আস্ত একটি নকল নবীশ। ঠিক টুকতেও শেখনি —লাইনটা হবে, পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে—

আমি বললাম, অঃ। কার কবিতা?

জীবনানন্দ দাশের। নামটাও জানো না। কী গাঁইয়ারে।

আমি বলতে চাইলাম, আমাদের মতো তোমাদের তো আর ঘরবাড়ি ছেড়ে আসতে হয়নি। কবিতা-কবিতা কোথায় উড়ে যেত। অন্নহীন মানুষের আবার কবিতা কি!

মিমি শেষপর্যন্ত সতর্ক করে দিয়ে গেল, ঐ কথা থাকলো।

আর তখনি লক্ষ্মী হাজির। বলল, বাবাঠাকুর মন্দিরে বসেছেন।

তা আমি কি করব?

ডাক পড়েছে, লক্ষ্মী বলল।

মিমি আমার মুখ দেখে বুঝল, আমি কিছুটা বিবর্ণ হয়ে গেছি। বলল যাও, ভয় কী আমি তো আছি।

শার্ট গলিয়ে মন্দিরে গেলাম। মন্দিরের দরজায় তিনি উর্ধ্বনেত্র হয়ে বসে আছেন। মন্দিরে যেতে পাথরের মেঝেতে রায়বাহাদুর তাঁর পত্নী এবং পরিবারবর্গ বসে। মিমি আমার আগে এসে গুটি গুটি বসে পড়েছে। মিমির শরীরে কী রকম এক আশ্চর্য সুঘ্রাণ—গোলাপ না চাঁমেলি না জুঁইফুলের সুবাস—ঠিক বুঝতে পারি না! ওর শরীর বড় ঋজু। চুলের খোঁপায় সোনার প্রজাপতি ক্লিপ। পরনে মুর্শিদাবাদ সিল্ক। ডাঁটো সাপের মতো লকলক করছে সব সময়। সে আমার আগেই দু-লাফে হাজির। তার পক্ষে দুলাফে হাজির হওয়া সম্ভব। কারণ তার মজা উপভোগ করবার পালা। আমার যাওয়ার অর্থই হচ্ছে বিষয়টার ভিত গড়তে প্রথম দিকের খোঁড়াখুঁড়ি। বদরিদা বৌদি জানালার পাশটায় বসেছে। আমাকে দেখেই বদরিদা বলল, বাবাঠাকুর বিলু এসেছে।

চোখ নেমে এল তাঁর। মুখে মধুর হাসি জেগে গেল। যেন তপস্যা ভাঙার পর গিরিরাজ দর্শন।

রায়বাহাদুর উঠে জায়গা করে দিলেন ভিতরে যাবার জন্য।

আমি বললাম, এখানেই বেশ। বলে মিমির পাশেই বসে পড়লাম। তাঁর এই বেলায় কী লীলাখেলা হবে আমার জানা নেই। মন্দিরে হরেকরকম আচার অনুষ্ঠান হয়, বড় বড় ওস্তাদ গাইয়েরা এসে গানবাজনা করে যান বাবাঠাকুরকে মধ্যমণি করে। কখনও চণ্ডীপাঠ তার ব্যাখ্যা করেন। আমার নটু পুটুর পড়াশোনা থাকে বলে ওদিকটা আমরা মাড়াই না। তিনিও কখনও শোনায়

জন্য ডাকেন না। আমি বাইরের লোক, বাইরের মতোই ছিলাম। আজ সহসা তার আসরে আমার আমন্ত্রণ খাঁড়া ঝুলে আছে বলেই। খাঁড়া কী ভাবে নামে দেখার জন্য বসে থাকলাম।

কারো কারো স্মৃতি প্রখর থাকে, অনেক কিছু মনে রাখতে পারে—কিন্তু বাবাঠাকুর এক জন্মে যা পড়েছেন, তাঁর অন্য জন্মে তা কী করে কণ্ঠস্থ থাকে আমি বুঝতে পারি না। তিনি আমাকে দেখেই শুরু করলেন, মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং/বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ। তিনি এভাবে গম্ভীর, যেন এক আদিগন্ত মাঠ পার হয়ে কোনো মহাপ্রাণ সৃষ্টি রহস্যের মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন। মুগ্ধ হবার বিষয় থাকে এতে। মিমিরও সেই উদাত্ত কণ্ঠ শুনতে শুনতে কেমন পলক পড়ছে না—আমার দিকে তাঁর চোখ, তিনি একবার থেমে বললেন, এদিকে আয়। ভুল হলে বলবি। বলে কী! আমি কী জানি! তাঁর এই বিশ্বাস আসে কোত্থেকে। তিনি তাঁর সংলগ্ন হয়ে বসার নির্দেশ দিলেন। আমি উঠবার আগেই রায়বাহাদুর এবং বদরিদা উঠে দাঁড়ালেন। মন্দিরে ঢুকে বসার জন্য পথ করে দিলেন। বুক আমার কাঁপছে। লক্ষ্মী দেখলাম খুব খুশি। সে ত এই চায়। এই মন্দিরে আমি পড়ে থাকি, আর আমাকে জ্বালাবার সুযোগ এতে তার চিরদিনের মতো হয়ে যাবে। তিনি আমাকে সামনে বসিয়ে একটা বই ঠেলে দিলেন। বাংলা হরফে সংস্কৃত শব্দমালা। পড়তে অসুবিধা হবে না। যেন অভিষেকের পয়লা কিস্তি। কিন্তু এতো কোন চণ্ডী কিংবা পুরাণ নয়। মেঘদূত। মেঘদূত থেকে তিনি শ্লোক উচ্চারণ করে তার বাংলা বলে যাচ্ছেন—বুঝলে গর্বিত চাতক তোমার বাঁদিকে সুমধুর কূজনে মত্ত। আকাশে পাখা মেলে বলাকার দল মালার মতো সেজে থাকবে এবং তোমার নয়ন মনোহরে সেবা করবে কেননা তোমার সঙ্গে তাদের ক্ষণ পরিচয়, তুমি আড়াল রচনা না করলে ওরা মিথুনে মিলিত হবার সুযোগ পেত না।

বাধাহীন গতিতে এগিয়ে গেলে আমার পতিব্রতা পত্নীকে অর্থাৎ তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখতে পাবে। সে মিলনের আশায় এখন প্রতীক্ষায় আছে। সে জীবিত আছে কেন না, বৃন্ত যেমন ফুলকে ধরে রাখে, আশাও তেমন জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। এই আশার বন্ধন বিরহকালে নারীর ভঙ্গুর হৃদয়কে ধরে রাখে। মেঘদূত বিষয়টি কী আমার জানা নেই। কবি কালিদাসের লেখা, মেঘদূত অভিজ্ঞান শকুন্তলমের কথা বাবার কাছে শোনা এই পর্যন্ত। পুরাণ নয়, উপনিষদ নয়, চণ্ডীপাঠ নয়, একেবারে একজন মহাকবিকে নিয়ে পড়েছেন। কবিতার মতো করে তার উচ্চারণ এবং যক্ষের ক্রন্দন দুই মিলে আমাকে ধীরেধীরে কিসের

জন্য যে বিরহকাতর করে তুলছে। সেটা কী, সেটার নামই কী বড় হওয়া। মাঝে মাঝে মিথুন কিংবা এই সংক্রান্ত কথাবার্তায় এসে আমি দেখলাম, মিমির গম্ভীর মুখ লজ্জায় রক্তাভ হয়ে উঠছে। পেছনে দেবীমূর্তি—তিনি দণ্ডায়মান, গলায় মুণ্ডমালা এবং খাঁড়া উত্তোলন করে ধাবমান। মহাকাল তার পায়ের নিচে। বাবাঠাকুর কুহক জানেন কি? না হলে মহাকাশ এবং দেবীমূর্তির এই প্রকট বেশ আমার মধ্যে মুহূর্তে জীবন কত অনিত্য এমন ভাবাবেগে বিচলিত করে কী করে।

বাবাঠাকুর বললেন, আমি ভুল করেছি। তুমি অন্যমনস্ক বিলু। শুধরে দাও। আমার মনোযোগ ঠিক আছে কী না সেই দেখার জন্য হয়তো এমন বলা। অথবা তুমি বিলু ছোড়দির জন্য ভীষণ আবেগ বোধ করেছিলে, এই মহাতীর্থে কিংবা পবিত্র স্থানে এলে তার সার্থকতা কোথায়। তুমি তো সেই মহাকাশ, তোমার বুকে তিনি দাপাদাপি করছেন।

কী হবে বিলু?

আমি ধরিয়ে দিলাম, স্থিত্বা তস্মিন বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্তং।

হ্যাঁ, ঐ আম্রকূটের কুঞ্জবনে বনচর বধূরা বাস করেন। মেঘ তুমি অল্পক্ষণ সেখানে অবস্থান করে কিঞ্চিৎ বর্ষণ কর। বর্ষণের পর তোমার ভার লঘু হবে, তখন তুমি ত্বরিতে অগ্রসর হও—তখন দেখবে বিন্ধ্যপর্বত মুলে বিশীর্ণা রেবা নদী প্রবাহিত। মেঘ তুমি সেখানে বর্ষণ করবেই। বর্ষণের পর হাল্কা হবে। তখন সুবাসিত রেবা নদীর জলধারা পান করে নেবে। তুমি সারবান হলে বায়ু তোমাকে খুশিমতো উড়িয়ে নিতে পারবে না।

এই মহাকাব্য পাঠ আমার মধ্যে আশ্চর্য ভাবাবেগ সৃষ্টি করতে থাকে। নিজেই কখন যেন যক্ষ হয়ে যাই। অতি মধুর সেই স্মৃতিমালা আমাকে আনমনা করে তোলে। নারী সান্নিধ্য উত্তাপ সঞ্চার করে শরীরে। নারীর সহগমনই যেন একজন মানুষের বড় হওয়ার বিষয়। আমার সামনে মিমি, এবং লক্ষ্মী। বাড়ির সবাই এবং তীর্থস্থানে আগত আরও যাত্রীসমূহ। আমার মধ্যে এক নিদারুণ গন্ধ খেলা করতে থাকে। সৃষ্টির উল্লাস আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই উল্লাসই মানুষকে কোথাও কোনো বড় জায়গায় নিয়ে যায়। এই যে আমার যাত্রা, ঘরবাড়ি ছেড়ে কখনও পলাতক, কখনও খালি মাঠে মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে চিন্তা, এবং রোগ জরা ব্যাধি মৃত্যুর কথা ভাবা সেটাই কি সেই মহাকালের এক পলকের উল্লাস অথবা ক্রন্দন।

তিনি সেই সংস্কৃতশ্লোক উচ্চারণ করে চলেছেন এবং সঙ্গে তার ব্যাখ্যা—ওগো

শেষ পথে যেতে যেতে তোমার বর্ষণো কদম্বফুল ফুটে উঠবে, সবুজ এবং পাংশুবর্ণ মিলনে তাদের শোভা হবে অপূর্ব। অর্ধেক উদ্গত কেশর কোথাও—কোথাও নদী তীরে ভুঁইচাঁপা তোমার বর্ষণে মাটি থেকে মাথা বের করে উঁকি দেবে। কোথাও বনভূমি ছিল নিদাঘ তাপে দগ্ধ—তোমার বর্ষণে তা হবে স্নিগ্ধ – মাটি থেকে উদগত হবে এক মধুর গন্ধ। সেই গন্ধ আঘ্রাণ করতে করতে চকিতে হরিণগুলি তোমার বর্ষণসিক্ত পথে ছুটে যাবে—তারাই বলে দেবে সবাইকে, কোন পথে তুমি গিয়েছ।

তিনি ঋজু হয়ে বসে আছেন, চোখ বন্ধ। যেন তিনি নিজেই এখন সেই মেঘমালা। মানুষের সৃষ্ট কাব্যময় এই ধরণীর সৌন্দর্যের কথা শেষবারের মতো সবাইকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাচ্ছেন। তার খেয়ালি চরিত্র এবং খ্যাপামি যেন সবই এই বসুন্ধরার ক্ষণিক চঞ্চলতা। ঝড় অথবা বৃষ্টিপাতের মতো আগমন এবং ক্ষণিক স্থিতির পর তার প্রস্থান। তখন সামনে পড়ে থাকে শুধু আবহমানকালের এক মনুষ্যত্বের বিকাশ—যা অতি পবিত্র এবং সুন্দর এবং সচারু গঠনভঙ্গী।

তিনি বলে যাচ্ছিলেন, বিদিশা নগরীর উপকণ্ঠেই এক সুন্দর পাহাড়—নাম তার নীচৈ। সেই পাহাড়ে বিশ্রাম নেবার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পার। তোমার অপেক্ষাতে আছে সব কদম্বফুল। তোমার আসার জন্য তারা উদ্‌গ্রীব। তারা তোমাকে দেখলে সংস্পর্শে বড়ই পুলকিত হবে। সেখানে নির্জন গিরিগুহায় যৌবনবিলাসী প্রেমিকের দল বিলাসী রমণীদের সঙ্গে মিলিত হয়– তাদের সুবাসিত অঙ্গের পরিমলে গিরিগুহাগুলি সুগন্ধে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

কেন জানি মনে হল, গিরিগুহাকন্দরে আমিই সেই যৌবনবিলাসী। মিমির মতো ছোড়দিরা সেই বিলাসে অবগাহন করার জন্য তৈরি হচ্ছে। আমার শরীর সহসা বড় রোমাঞ্চিত হল।

আমার দিকে মিমি অপলক তাকিয়ে আছে। জলভারে আনত মেঘমালার মতো তার মুখে সংকোচ এবং লজ্জা। নারীকে এ সময় বড় সুন্দর দেখায়। যৌবন বিলাসীর কথাতে এই নারীর মধ্যে জেগে গেছে উষ্ণ প্রস্রবণ। তার ধারা নেমে আসছে মিমির শিরা উপশিরায়। তার চোখের মধ্যে দেখতে পেলাম ক্ষুরধার দৃষ্টি। যেন সে পারলে এই মুহূর্তে সেই গিরিকন্দরে প্রবিষ্ট হতে চায়। আমার মনের যে সামান্য ভীতি ছিল নারী সম্পর্কে, মিমির মধ্যে সেই রহস্য এবং বসুন্ধরার গর্ভবতী হবার আকাঙ্ক্ষা দেখে মুহূর্তে তা কেমন দূর হয়ে গেল। মিমিকে কেন জানি মনে হল নিজের কাছের এবং কতকালের চেনা। সৃষ্টির সেই আদিকালে যে জন্মপ্রবাহ এই গ্রহে অনুপ্রবেশ করেছিল মিমি যেন এখন তাই ধারণ করে বসে আছে।

তিনি বলছিলেন—উজ্জয়িনীর রমণীরা ধূপ জেলে কেশ সংস্কার করে। সেই সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়া জানালার পথে বাইরে এসে তোমার শরীরে বল সঞ্চার করবে। সেখানে ঘরে ঘরে পোষা ময়ূরগুলি তোমাকে দেখে আনন্দে নাচবে। প্রাসাদগুলিতে দেখতে পাবে বিরহকাতরা নারীর আলতার চিহ্ন। সেই সব প্রাসাদের মাথায় ক্ষণিক দাঁড়িয়ে শ্রমের ক্লান্তি অপনোদন করবে।

উজ্জয়িনীর গন্ধবতী নদীর তীরে চণ্ডিকাপতি মহেশ্বরের মন্দির। সেই মহাকালের মন্দিরে তুমি যাবে। মহেশ্বরের কণ্ঠ নীল, তিনি নীলকণ্ঠ, তুমিও নীল, মেঘমালা, তাই অনুচর প্রমথগণ তোমার দিকে সাগ্রহে তাকাবে। পাশেই আছে এক মায়াজাল ঘেরা উদ্যান। নদীর বায়ু তার উপর দিয়ে বয়ে যায়, উদ্যানের গাছপালা থরথর করে কাঁপে—কোনো নারীর মিথুন মিলনের মধ্যে। তুমি হয়তো জাননা সেই বায়ু গন্ধবতীর পদ্মগন্ধে আর জলকেলিরত তরুণীদের দেহগন্ধে সুবাসিত।

দেখলাম মিমি নিচের দিকে তাকিয়ে আছে।

এই বর্ণনার সঙ্গে মিমি নিজের সেই উষ্ণ প্রস্রবণে ডুবে যাচ্ছে। একবার জোরে ডাকতে ইচ্ছে হল, মিমি, তুমি কী অস্থির তোমার শরীর কী অশান্ত হয়ে উঠছে—মেঘদূতের বর্ণনা শুনে।

তিনি তখনও বলে যাচ্ছেন, সেই চণ্ডিকাপতির মন্দিরে দেবদাসীরা নৃত্য করে। তালে তালে নূপুর ধ্বনিত হয়, মেঘমালার ঝংকার ওঠে, তারা ধীরে ধীরে চামর ব্যাজন করে—চামর বিচিত্র রত্নে ভূষিত। ক্রমে তাদের হাত শ্রমে অধীর হয়। শরীরে প্রিয়তমের মৃদু নখখতযুক্ত স্তনবৃন্তে বিন্দু বিন্দু বর্ষণ পেলে তারা তৃপ্ত হয়ে তোমার দিকে কৃতজ্ঞ কটাক্ষ নিক্ষেপ করবে।

আর তখনই সহসা দেখলাম, মিমি মুখে আঁচল ঢাকা দিয়ে দৌড়ে পালাল। ও আর এতটুকু স্থির হয়ে বসতে পারেনি।

পরে মিমিকে আবিষ্কার করলাম আমার পড়ার ঘরে। যেন ব্যথাতুর রমণী—চুপচাপ বসে আমার বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে।

ঘরে ঢুকলে মিমি আমার দিকে তাকাল না। আরও বইয়ের মধ্যে নিবিষ্ট হয়ে গেল। লক্ষ্মী এসে বলল, মিমিদি ডাকছে।

মিমি আমার দিকে না তাকিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শাড়ি সামলে নিচে নেমে এল। মিমির শরীর যে কত মহার্ঘ ওর এই সতর্কতায় ধরা পড়লে আমি আজ বড় বিচলিত বোধ করলাম। আমার মাথার মধ্যে হাতুড়ি ঠুকতে থাকল কেউ। কান মুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকল। জ্বর আসার মতো এক নতুন অসুখ আমাকে

আক্রমণ করল। ঠিক জ্বর নয়, তবু জ্বরের মতো—চোখ বড় জ্বালা করছে। মিমি যাবার সময়ও আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না।

বাবাঠাকুর যে আমার জন্য মন্দিরের দরজা খুলে দিয়েছেন—বদরিদার কথাবার্তায় তা টের পেলাম। বৌদির কথাবার্তাতেও। কলেজ থেকে একদিন ফিরে এলে বদরিদা বললেন, মাস্টারদা এসেছিলেন।

আমি কিছু বললাম না।

বিকেলে কলেজ থেকে ফিরে এলে বৌদি আমার জন্য আলাদা করে রাখা ভোগের প্রসাদ রেখে দেন। বড় সুস্বাদু। এবং কামিনীভোগের আতপে এত সুঘ্রাণ যে খাবারের লোভ ত্যাগ করাই কঠিন। ঠিক বুঝতে পারছি না, একজন ভাবী মন্দির পুরোহিতের জন্য তাঁদের এটা ষড়যন্ত্র কি না।

সেদিন এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। কলেজ টাওয়ারের পাশটায় আমরা বসি। আমি, প্রশান্ত, নীরঞ্জন সেদিনও বসব বলে এগুচ্ছি, দেখছি ভাগীরথীর ধারে ধারে মিমি হাঁটছে। কলেজ পাঁচিল পার হলেই ভাগীরথীর বাঁধ। মিমি এবং তার বান্ধবীরা। এদিকটায় একবার তাকাবে জানি। তারপর এগিয়েও আসতে পারে। মিমির সঙ্গে আমার যে একটা গোপন পরিচয় গড়ে উঠেছে কেউ টের পায় না। যেন আগের মতোই আমরা বড় দূরের এবং চুরি করে দেখতে ভালবাসি তাকে।

মিমি একদিন কলেজের কমনরুমে আমাকে যেতে বলল। ওর কখন ক্লাস তা আমি জানি। মেয়েদের কমনরুম আলাদা। হাতে গোনা ক'জন মেয়ের জন্য আলাদা কমনরুম—এটা আমাদের মনে সহিষ্ণুতার অভাব ঘটালেও মুখে কারো বলার সাহস নেই।

মেয়েরা ডেকে না পাঠালে তাদের কমনরুমে আমাদের যাওয়া বারণ। ওরা অবশ্য ইচ্ছে করলেই আমাদের কমনরুমে আসতে পারে। কেউ না ডাকলেও পারে কিন্তু এতদিন ক্লাস করছি, কোনদিন একটা মেয়েকেও আমাদের কমনরুমে ঢুকতে দেখিনি। আমরা যেন মানুষ না, কিংবা মেয়েদের শ্লীলতাহানির জন্য যেন সুযোগ খুঁজে বেড়াই—তা না হলে এটা কেন হয়, আমাদের কাছ থেকে তাদের সব সময় দূরে সরিয়ে রাখা কেন? ক্লাসে যখন ওরা আসে, অধ্যাপক সঙ্গে থাকেন, যখন অধ্যাপক বের হয়ে যান, তাঁর সঙ্গে মিমিরাও বের হয়ে যায়। আমরা সব সময় ওদের শত্রুপক্ষ। অথচ কলেজ ইউনিয়নে মিমি দাঁড়ালে, কেউ এসে আমাদের তার হয়ে না বলা সত্ত্বেও ভোট দিয়েছিলাম। মিমিকে ভোট দিয়ে আমরা নিজেরাই কৃতার্থ হয়েছিলাম। কলেজ সোপানে অন্ততঃ মিমি

আমাদের একটা ধন্যবাদ দিতে পারত, তাও দেয়নি। শুধু কলেজ ইউনিয়ন সেক্রেটারি সুহাসদার কাছে মিমি যখন তখন যেতে পারে—রোগা পটকা, বেঁটে এবং বক্তৃতাবাজ মানুষ। ভারি চশমা চোখে। শহরে একটা রাজনৈতিক দলের পাণ্ডা। সুহাসদাকে সবাই এক ডাকে চেনে। মান্য-গণ্য করে। সুহাসদা মিমির এবং তার দাদার অভিভাবকের মতো। সুহাসদার কাছে একলা গেলে মিমি কিংবা অন্য কোনো মেয়েরই গায়ে যেন কোনো আঁচ লাগে না। এ-জন্য মানুষটার উপর আমাদের ছেলে ছোকরাদের গোপন একটা রাগ ছিল।

মিমিকে আমারও খুব দরকার। কী হল শেষপর্যন্ত। হপ্তা পার হয়ে গেছে—মিমির সঙ্গে আর সুযোগই হয়নি কথা বলার। মাঝে জন্মাষ্টমী এবং আগস্টের ছুটিতে দু'দিন কলেজ বন্ধ। সোমবার মিমি কলেজে আসেনি। শুক্রবারও না। শনিবারে ওর দু'টো ক্লাস। আমার ক্লাস সেরে ওর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ করে উঠতে পারছি না। ওর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ঘটেছে, জানলে, প্রশান্ত, নিরঞ্জন, নিখিল সবাই খেপে যাবে। কিংবা পেছনে এমন লাগবে যে শেষ পর্যন্ত না আবার মিমিকে নিয়ে টানাটানি পড়ে যায়।

কলেজ করিডোরে দেখা হয়েছে, কেউ কথা বলিনি। কারণ চারপাশে সবার চোখ মিমিকে লক্ষ্য করছে। বললেই আমি চিহ্নিত হয়ে যাব। কোন সেকসানে পড়ে দেখ। খোঁজাখুঁজিও শুরু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং কলেজে আমাদের চাওয়াচাওয়ি সার। আজ ডেকে পাঠাল। খবরটা নিতে পারব।

মিমি টেবিল টেনিস খেলছিল। ভারি দুরন্ত হাত। কপালে ঘাম। এদিকটায় আমাদের আসা হয় না বলে জানি না, তারা কি করে এখানে। পাশেই অধ্যাপকদের বসার ঘর। তার পাশে অধ্যক্ষ মশাই বসেন। মিমিদের কমনরুমে ঢোকা ঠিক হচ্ছে কি না এটাও মনে একবার উদয় হয়েছিল। যা থাকে কপালে, এবং কিছুটা গোপনেই ঢুকে গেছি। আমাকে দেখেই মিমির হাত শিথিল হয়ে গেছে। কিছুটা নিস্তেজ। সাপুড়ে হয়ে গেলামরে বাবা! ভাল কথা নয়। এমন বিষধর সাপ ফণা গুটিয়ে নিয়ে আমাকে দেখলে। মিমি আঁচলে মুখের ঘাম মুছল। তারপর র‍্যাকেটটা হাতে নিয়েই যতটা দ্রুত সম্ভব কাছে এসে বলল, কাল সকালে আসবে।

কোথায়।

আমাদের বাড়ি।

মারবে নাতো কেউ।

মারবে কেন?

তোমাদের বাড়িতে কাকাতুয়া আছে। দারোয়ান আছে।

আমার নাম বললেই ছেড়ে দেবে।

দাদুকে বলেছিলে ?

অত কথা বলবার সময় নয় এখন। কাল এস, বলব। বলেই মিমি আবার খেলতে আরম্ভ করে দিল। যেন তার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয়ই নেই। মিমিকে যে বলব, শেষপর্যন্ত বাড়ি, এখানে বলতে পারলে না। ফিরে যাচ্ছি, তখনই আবার ডাক, সঙ্গে ওটা নিয়ে যাবে।

ওটা মানে। আমি ফিরে দাঁড়ালাম।

কলেজ ম্যাগাজিন—বুঝতে পারছ।

ও কবিতা।

মিমি আবার খেলায় ব্যস্ত। আমার কথা তার কানে গেল না। বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকাও যায় না, আমি আর মুহূর্ত দেরি করি। কিন্তু বলা যে দরকার, মিমি আমার কবিতা হবে না। কত চেষ্টা করেছি। কবিতার কথা ভাবলে রাতে ঘুম হয় না। আর নটু পুটুর যা স্বভাব, কিছু গোপনে লিখতে বসলেই ঝুঁকে দেখা—স্যার কী লিখছেন ?

কাল সকাল মানে রবিবার সকাল। রবিবার সকালে বাড়ি যাই। মা বাবা ভাই বোনেদের প্রতি টানটা এখনও যে আছে টের পাই। ছোড়দিরা শত চেষ্টা করেও টানটা আলগা করতে পারছে না। ওদের বাড়িটা চিনতে কষ্ট হবে না। ডাকসাইটে জমিদার বাড়ি। শহরের কে না চেনে!

রাতে কবিতা নিয়ে বসা গেল। নটু পুটুর ছুটি সকাল সকাল দেওয়া গেল। রাত বারোটার পর আমার আর ছোড়দিদার খাবার সময়। শিবা ভোগ না হলে আমরা খেতে পারি না। আগে নটু পুটুও দলে ছিল। রাত বারটা অবধি জেগে থাকা বড় কষ্ট। এখন আর নটু পুটু জাগে না। আগেই খেয়ে নেয়। বাবাঠাকুরের নির্দেশে সব হয়। আমার বেলায় নির্দেশটা তিনি এখনও আলগা করছেন না। আর দু'জন জেগে থাকে। একজন বৌদি, অন্যজন লক্ষ্মী। লক্ষ্মী অবশ্য ঠিক জেগে থাকে না। যখন তখন যেখানে সেখানে ঘুমিয়ে নিতে পারে। মশার কামড় তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। আর আশ্চর্য শিক্ষা। একবার ডাকলেই উঠে পড়বে। বৌদির ফাই ফরমাস খাটার জন্য রাত বারোটার পরও তার দরকার হয়।

সুতরাং দেখা গেল, লক্ষ্মী মশারি টাঙিয়ে দিচ্ছে। নটু পুটু না ঘুমালে বসতে পারছি না। আমার যে কত বড় দায় এখন কবিতা লেখার তা যে কেউ অনুমান

করতে পারবে। চোখে মুখে নিদ্রাহীনতার ছাপ। কবিতা লিখতে পারলে মন্দিরের কাজ থেকে মুক্তি। মিমি বলেছে, কবিতা লিখে দিলেই সে বাকি দায়িত্বটুকু হাতে নিয়ে নেবে। লক্ষ্মীর বড় দুঃস্বভাব। একবার এ-ঘরে ঢোকার অজুহাত পেলে আর সহজে যেতে চায় না। আমি চাইছিলাম, ঘরটা নিঝুম হোক। পাতা পড়ার শব্দ পাই। পাখির ডাক শুনি। এ-সব শুনতে শুনতে নাকি কবিতার লাইন হুস করে একটা রেলগাড়ির মতো মাথার মধ্যে ঢুকে যায়। তা আস্ত একখানি রেলগাড়ি এতটুকু মগজে ঢুকে গেলে তার দোষ কি। খিলু ভারি হয়ে যাওয়ার অর্থ ই নড়বড়ে হয়ে যাওয়া। খিলু নড়বড়ে না হলে কবিতা নাকি লেখা যায় না। কবিতা লেখা সম্পর্কে বন্ধু-বান্ধবদের কাছে পরামর্শ নিতে গিয়ে এ-সব খবর পেয়েছি। এখন লক্ষ্মীর প্রস্থান আমার কবিতা লেখার পক্ষে জরুরী দরকার।

লক্ষ্মী নটুকে ঠ্যাং ধরে তক্তপোশের এক মাথা থেকে অন্য মাথায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা ঘুমিয়ে পড়লে আর উঠতে চায় না। শত ঠেলাঠেলিতেও কথা কয় না। ঘুমে এমন কাতর হতে বড় দেখা যায় না। এ বিষয়ে লক্ষ্মীর অভিজ্ঞতা চরম বলে সে আর ওদের ডাকাডাকি করে না। তক্তপোশের একটা দিকে তোষক পেতে নেয় এ-ভাবে। তারপর আমায় দরকার হয় লক্ষ্মীর। যে দিকটায় তোষক চাদর পাতা হয়ে যায়, সেদিকটাতে আমরা দু'জনে দু'জনকে চ্যাংদোলা করে এনে ফেলে রাখি। কাজটা দ্রুত করার পক্ষে এটাই মোক্ষম উপায়।

লক্ষ্মীকে বলতেও পারছি না, তুমি এখন যাও। যদি বলে ফেলি, তবে আর নড়বেই না। যা বলব তার বিপরীত কাজ করতে সে আজকাল পছন্দ করে। এ-বাড়িতে সেও যে ইচ্ছে করলে জোর খাটাতে জানে, তা দু-একবার কেন, অনেকবারই প্রমাণ হয়ে গেছে। আমি নিবিষ্ট রয়েছি পড়াশোনায়, ট্রায়াল ব্যালেন্স কিছুতেই মেলাতে পারছি না, বইয়ের পাতা ঘাঁটাঘাঁটি করছি—যেন দেখে বোঝে, মাস্টারের সঙ্গে কথা বললেও পড়ার ব্যাঘাত ঘটতে পারে এমন একটা ভাব নিয়ে যখন ডুবে আছি, তখনই লক্ষ্মী বলল, রাতে ঘুমাও না কেন? মাথায় কী ঢুকেছে! তুমি নাকি কবিতা লেখ!

কে বলেছে!

কে বলবে আবার, সব জানি।

জানলে ত বয়ে গেল।

ও-স্বভাব ভাল না মাস্টার। তুমি পড়তে এয়েছ। তোমার মাথায় এ-সব বাতিক কেন?

লক্ষ্মী আমার এত ভাল মন্দ বোঝে যে কিছু বলতেও পারি না। আমি যে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে পাই সে লক্ষ্মীর দয়ায়। কি কাচতে হবে না হবে, সে ঠিক জানে। গেঞ্জি রোজ জলকাচা করে দেবে। শুকিয়ে জায়গারটা জায়গায় ভাঁজ করে রাখবে। একটা জিনিস এদিক ওদিক হবার জো নেই। এমন কি আমার বইপত্র কেউ ধরলে তার রক্ষা থাকবে না। সেই লক্ষ্মী যখন জেনে ফেলেছে; আমি কবিতা লেখার চেষ্টা করছি তখন বড়দিদার কানেও কথাটা উঠবে। একজন মানুষের চারপাশ থেকে এত বিপদ দেখা দিলে সে স্থির থাকে কী করে? বললাম, দয়া করে যাও। আমি পড়ছি।

পড়ছ না ছাই।

তবে আমি কি করছি?

কী করছ তুমিই জান।

কী মুশকিল, দেখছ না ট্রায়াল ব্যালেন্স করছি। লক্ষ্মী এ সবের কিছুই বোঝে না। কেবল আমার চোখ দেখলে সব টের পায়। এত যে অনুভূতিশীল তার কাছে আমার না ধরা পড়ে উপায় কী। এবারে না পেরে বললাম, লক্ষ্মী সবই যখন টের পাও মন্দিরে গিয়ে বস না কেন? তুমিও দেখবে শেষ পর্যন্ত মা আনন্দঘন টন হয়ে যাবে।

কী বললে?

এই মা করুণাময়ী, তোমার ভাড় উঠবে। মানুষের চোখ দেখে তার ভবিষ্যৎ বলে দেবে।

দেখ ঠাকুর দেবতা নিয়ে তামাশা কর না। এতে মানুষের জিভ খসে পড়ে জান। তখনই দেখলাম, লক্ষ্মী কপালে হাত রেখে কার উদ্দেশে প্রণাম করছে। মা করুণাময়ীকে নিয়ে ঠাট্টা! এতে সে অমঙ্গল আশংকায় কেমন কাতর হয়ে গেল। লক্ষ্মীর ধারণা, তার জীবনে মঙ্গল অমঙ্গল বলে আর কিছু নেই। আমার কোনো অমঙ্গল হবে ভেবেই যেন সে তার ঠাকুরের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিল। আর কথা বলল না, আবার কোন ঠাকুর দেবতাকে নিয়ে আমি ঠাট্টা তামাশা করব সেই ভয়ে লক্ষ্মী চলে গেল। লক্ষ্মীকে ঘর থেকে তাড়াতে হলে এমন এক অস্ত্রের সন্ধান থাকা ভাল। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ঠাকুর দেবতা নিয়ে ঠাট্টা তামাশা জুড়ে দিলেই হল। লক্ষ্মী চলে গেল ঠিক, কিন্তু আমার মন বসল না। গভীরে ডুব দিতে হয়। সে কতটা গভীর জানা নেই। পাখির কোনো ডাকও কানে আসছে না। নিঝুম। কেবল জানালার দিকে তাকালে দূরের একটা গভীর নীল সিগনালের আলো চোখে পড়ে—একটা লাইন লেখা যাক—

দূরে তুমি সিগনালের আলো
বেশ কথা, আর আছে কাব্য।
আমার লেখা কিছু হয় না,
না কবিতা না ছন্দ।

মন্দ লাগছে না। সন্দ করার কারণ নেই। এই আমার প্রথম কবিতা। আচ্ছা আবার শুরু করা যাক—

পাখির শব্দ শোনার জন্য
রাত জেগে থাকি বসে। অন্ধকার
অবিরাম। কখনও নীল জ্যোৎস্না
উদার আকাশে—দূরে সিগনালের বাতি,
ছোড়দির কথা আছে চিঠি লেখার।
জানালায় কেউ আজকাল রোজ
নীলখাম রেখে যায়। দুরাতীত
গ্রহ থেকে কারা আসে, ডাকে।
কীট পতঙ্গ ওড়ে বনে জঙ্গলে।
সাদা প্রজাপতি মুক্তোর ডিম পাড়ে
কোনো এক পদ্মকলি আঙুলে।

এটা আসলে কোনো কবিতা কিনা জানি না। কাল মিমির কাছে যাবার অন্তত পাসপোর্ট হয়ে গেল, এটা দিয়ে বলব, মিমি আমি আমার কথা রেখেছি, এবার তুমি তুলে দাও কানে, বিলুটা চোর ছ্যাঁচোড়। ওকি মুক্তির স্বাদ! এই লিখে দিলে যদি মুক্তি পাওয়া যায় আমার চোখে মুক্তির আনন্দে জল এসে গেল। চোর ছ্যাঁচোড় জানলে আমাকে আর কেউ মন্দিরের পুরোহিত করতে ভরসা পাবে না।

সকালবেলাতেই রওনা দিলাম। বৌদি বললেন, বাড়ি যাচ্ছিস?

বাড়ি আর কোথায়? যাব শহরে।

শহরে কাকার বাড়ি যেতে পারি ভেবে বদরিদা বললেন, মাস্টারমশাইকে আসতে বলবি কথা আছে।

কী কথা! যাই কথা থাক ওটি আর হচ্ছে না। তারই গোড়া কাটতে যাচ্ছি মিমির কাছে। বললাম, বলব।

বারান্দা থেকে নামার সময় লক্ষ্মী বলল, যেখানেই যাও জলখাবার খেয়ে যেও। এই এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হয়েছে সব কাজে। খাওয়াটা সব সময় বড় কথা না।

যেখানে যাচ্ছি সেখানেও কম আদরযত্ন পাব না। সংসারে আমার জন্য তুমি একাই ভাব, এমন মনে কর না। বললাম, এখন খাব না। দেরি হয়ে যাবে। কোথায় তোমার রাজসূয় যজ্ঞ আছে যে দেরি হবে।

লক্ষ্মীর ট্যারা কথা আমার একদম ভাল লাগে না। যাচ্ছি একটা শুভ কাজে তোর কী দরকার আগ বাড়িয়ে কথা বলার!

তুমি লক্ষ্মী যা বোঝ না সে-নিয়ে কথা বল না।

আমার বয়েই গেছে কথা বলতে।

আর কিছু এখন বলার দরকার নেই। চোখ ঘুরিয়ে ঠোঁট উল্টে এমনভাবে বলল, যে একটা কথা বলার আর স্পৃহা থাকল না। ঘরে এসে জামা প্যাণ্ট পরছি। আর আয়নায় মুখ দেখছি। আজকাল এটা হয়েছে, চুল ঠিক আছে কিনা, কিংবা আমার মুখ দেখতে কেমন, আয়নায় বারবার দেখা। নিজেকে বার বার দেখেও আশ মেটে না কেন? আর পাশে তখন আর একটা মুখ ভেসে ওঠে। সে কখনও ছোড়দি, কখনও মিমি, কখনও লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর মুখ ভেসে উঠলেই কেমন নিজেকে মনে হয় ছোট করে ভাবছি। বারবার আয়না থেকে মুখটা সরিয়ে দিয়ে সেখানে মিমি কিংবা ছোড়দিকে লটকে দিই।

মুখ দেখছিলাম, এবারে বের হব। ভাল করে চুল পাট করলাম। চিরুনি একটা ছোট আকারের ব্যাগে ভরে নিলাম। ফাঁকে ফাঁকে আয়নায় মুখ দেখা। এক নাগাড়ে দেখতে পারি না—কে এসে আবার দেখে ফেলবে। সব চেয়ে ভয় লক্ষ্মীকে। আর লক্ষ্মীই তখন হাজির। জাম বাটিতে মুড়ি, কলা, সন্দেশ—কাঁচাগোল্লা। দেখেই বিগড়ে গেলাম।

নিয়ে যাও। খাব না। সময় নেই।

বৌদি বলেছে খেয়ে যেতে। পিত্তি পড়বে।

বৌদি না, তুমি।

আমার দায় পড়েছে।

এখন আমার মনে সংশয়, যদি সত্যি বৌদি পাঠিয়ে থাকে, প্রায় জননীর মতো এই বৌদিটি আমার সম্পর্কে সব সময় সজাগ। মিমিদের বাড়ি খুব কাছে নয়। হোতার সাঁকো পার হয়ে তেলকলের পাশ দিয়ে গেলেও ঘণ্টাখানেক লাগবে। সকালে মুখে কিছু না দিয়ে বের হলে পিত্তি পড়তেই পারে।

বললাম, রাখ।

লক্ষ্মী ঠেলা মেরে বাটি গ্লাস রেখে দিল।

তুমি যাও।

কেন আমি থাকলে লজ্জা করবে খেতে?

করবে।

এত দিন তো করেনি!

লক্ষ্মী বলতেই পারে। তিনজনের তিন বাটি মুড়ি দিয়ে লক্ষ্মী বসবে তক্তপোশে। পা দোলাবে। রাজ্যের গল্প জুড়ে দেবে। এবং পাড়ায় কার হাঁস শিয়ালে নিয়ে গেল, কে পড়ে ঠ্যাঙ ভেঙেছে, কার ছেলে আমবাগানে ধরা পড়েছে, এবং বিলে যারা জাল ফেলে বসে আছে, তাদের নৌকায় কী আছে, তীর্থযাত্রীরা কোথেকে কে এসেছে—এমনি কত খবর। যেন লক্ষ্মী এই সব খবর আমাকে না দিতে পারলে শান্তি পায় না।

তাড়াতাড়ি আছে। জল ঢেলে মুড়ি ভিজিয়ে, কলা সন্দেশ কাঁচাগোল্লা এক সঙ্গে মেখে গোটা পাঁচেক খাবায় সব শেষ করে দেবার সময় লক্ষ্মী বলল, এত তাড়াতাড়ি খাচ্ছ কেন? গলায় আটকালে কী হবে?

তোমার তো কোন দায় নেই।

লক্ষ্মী এ সময় বড় করুণ চোখে আমার দিকে তাকাল। এ চোখ আমি চিনি। কে বলবে লক্ষ্মী মুখরা—মায়া দয়া নেই। লক্ষ্মীর মধ্যে যেন এক দূরের বাউল কোন এক করুণ স্বর তুলে মাঠে নেমে যায়। এমন চোখ দেখলে আমারও কেমন রাগটা নিমেষে উবে যায়। লক্ষ্মী যেন কিছু বলবে বলে তাকিয়ে আছে।

আমি জল খাবার সময় লক্ষ্মীর মুখ, চোখ বাঁকিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম। লক্ষ্মী মাথা নিচু করে বসে আছে।

কী হল তোমার।

লক্ষ্মী মুখ তুলল না।

ঠিক আছে আর বলব না। তাড়াতাড়ি খাইনি। আস্তেই খেয়েছি।

লক্ষ্মী এবারে বলল, তুমি কার কাছে যাচ্ছ মাস্টার?

মিমির কাছে।

কেন যাচ্ছ?

লক্ষ্মী তো কখনও এ-ভাবে আমাকে কোন প্রশ্ন করে না। কেমন বেসুরো ঠেকল। বললাম, কাজ আছে?

কী কাজ?

ইচ্ছে করলে বলতে পারি, তোমার জানার কী দরকার এত। কিন্তু লক্ষ্মী আমার কাছে গোপনে তার ভাণ্ডার তুলে দিয়েছে—এই সব কথা বললে, সেটা বেশি মনে হবে। আমি কলেজ থেকে দেরি করে ফিরলে, ওর শুকনো মুখ। কখনও দেখেছি

মন্দিরের দরজায় বসে আছে পথ চেয়ে। ঘরে ঢুকলেই বলবে, এত দেরি কেন মাস্টার?

ক্লাস থাকে, কখনও বন্ধুদের সঙ্গে লালদিঘির ধারে আড্ডা, কখনও সাইকেল চড়া শিখি মাঠে—নানা কারণে দেরি হয়ে যায়। লক্ষ্মী কেমন তখন ব্যথাতুর রমণীর মতো গালে হাত দিয়ে মন্দিরের দরজায় বসে থাকে। এ-সব টের পাই বলেই তার প্রশ্নের সব জবাব দিতে এ-সময় বাধ্য থাকি। কিন্তু মিমির জন্য কবিতা লিখেছি ভাবলে লক্ষ্মী কষ্ট পেতে পারে। মিমির সঙ্গে তার যতই সখ্যতা থাকুক, কোথায় যেন টের পেয়েছে, মিমিদি তার ভ্রমরের কৌটায় হাত দিয়েছে।

বললাম, এই একটু কাজ। মানে কলেজে বলল কি না কাল যেতে।

যাও না মাস্টার। আমি কি বারণ করছি! তাড়াতাড়ি ফিরো কিন্তু।

বাইরে বের হয়ে রাস্তায় হাঁটছিলাম। লক্ষ্মী এবং আমি পাশাপাশি এক বছর ধরে এখানে আছি। দু'জনই আশ্রিত। দু'জনই পান্থনিবাসের যাত্রী। আমার প্রতি লক্ষ্মীর গোপন একটা টান আছে, সেটা মাসখানেক না যেতেই একবার বুঝেছিলাম—আজ তাকে অন্যভাবে বুঝতে শিখেছি। মুখে যাই বলুক, যে কোন মিমি তার শত্রু পক্ষ সে ভেতরে ভেতরে সব সয়ে যাবে। মুখ ফুটে কোনো কথা বলবে না।

আমি যে কী করি। আমার যে বড় হওয়ার কথা। লক্ষ্মীর মধ্যে আটকে থাকলে আমি বড় হব কী করে। আর যদি বাবা, মামুকাকা, রায়বাহাদুর এবং বদরিদা মিলে সত্যি মন্দিরের পুরোহিত বানিয়ে দেয় তবে আমার বড় হওয়াটা যে এখানেই শেষ। মিমির কাছে যেতে ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু মিমির কাছে আমার ভ্রমরের কৌটা গচ্ছিত আছে আপাতত, কারণ মিমিই পারে আমাকে এই বন্দী দশা থেকে মুক্তি দিতে।

কখন যে হাঁটতে হাঁটতে হোতার সাঁকো পার হয়ে এসেছি। বয়স মানুষকে এ-সময় বোধ হয় বেশি ভাবাবেগে তাড়িত করে। সব কিছু পরিপূর্ণ মনে হয়। পাখির ডাক শুনতে ভালবাসি। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। দূরে কোন সবুজ বনভূমি দেখলেই কেমন এক রহস্য টের পাই। মিমির সৌন্দর্য, আভিজাত্য এবং শরীরে আশ্চর্য মায়াবী সুবাসেও টের পাই সেই রহস্য খেলা করে বেড়াচ্ছে। আমার কাছে কিছুই চিরন্তন হয়ে থাকে না। কিংবা মনে হয় না, এখানেই শেষ। এই আবাসই আমার সব। নিত্য নতুন ছবির টানে একটা বিবাগী মন তৈরি হয়ে গেছে আমার ভেতর। আমি হাঁটি। কতকাল আমাকে এ-ভাবে হাঁটতে হবে জানি না।

কাকা এই আশ্রয় ঠিক করে দিয়েছেন। আমার বড় হবার সখ। যেমন তোমাকে দেখলে আমার মনে হয়, আমি ঠিক ঠিক বড় হতে না পারলে তোমার কাছে পৌঁছাতে পারব না। বাবাঠাকুরকে কেউ অমান্য করতে পারে না। তোমাদের মতো পরিবারও না। তোমার যে কী দরকার ছিল ঠোঁট টিপে ফিকফিক করে হাসার!

বারান্দায় বের হলেই দেখলাম কার্তিক মামার বৌ রান্নাবাড়ির দিকে যাচ্ছে। কার্তিক মামা মামীর পেছনে যাচ্ছিল, বলিদানের সময় তার অন্য মেজাজ। এ কাজটি এ তীর্থস্থানে পাকাপাকিভাবে সে হাতে নিয়েছে। আজ তার কাজটা ছিল না এবং আমাকে নিয়ে আজ বাবাঠাকুর লীলা করেছেন জেনে, মামীর সঙ্গে অনুসরণ করা অনুচিত ভাবল। ঘুরে দেখল আমাকে। চোখ ট্যারা বলে বোঝা যায় না কোন দিকে তাকিয়ে আছে। আন্দাজে ধরে নিতে হয় আমাকেই বলছে, কী মামা আজ বাবা খুব নাকি খেপে গেছিল!

আমি বললাম, আর বলবেন না, কী ঝামেলা বলুন তো!

আরে ঝামেলার কী হল। মার থানে কী কখন লীলা কেউ বলতে পারে! আমার দাদুর কথা জান?

দাদুটা কে বুঝতে পারলাম না। চোখমুখ দেখে ধরতে পেরে বলল, আরে বদরিদার বাবা। সিদ্ধাই মানুষ—কাপালিক। শব সাধনা করতেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। তান্ত্রিক মানুষ। তাকে দেখলে তো তুমি ভিরমি খেতে। বদরিদার মাথার কাছে যে মানুষটির ছবি আছে তিনিই এই শর্মার দাদু। তা দেখলে ভয় পাবার মতো। হাতে চিমটা, ত্রিশূল এবং কমণ্ডলু। কম্বল গায়ে বাঘের ছালে মানুষটা ঢাকা।

কার্তিক বলল, দাদুর দেহত্যাগের পর এল নরেন খ্যাপা। বাবাঠাকুরের অলৌকিক এবং বিভূতির কিছু খবর আমি আগেই পেয়ে গেছি—এখন কার্তিক মামা আবার নতুন কিছু খবর দেয় কিনা জানার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। অথবা সে কী বলতে চায় জানারও আগ্রহ।

তোমার কপাল খুলে গেল—থানে বসার মানুষ তুমি। বাবাঠাকুর তার কাজটা তোমাকে দিয়ে যেতে চান। তুমি কিন্তু মামা, তন্ত্রমন্ত্র সব ভাল করে জেনে নেবে। বাবাঠাকুরের কাছে অনেক গূঢ় সিদ্ধাই আছে। অবহেলা কর না।

কথাটাতে আমি আরও ঘাবড়ে গেলাম। এখানে আশ্রয় নিয়ে আছি, কলেজে পড়ি, নটু পুটুকে পড়াই। আমার ছোড়দিরা চারপাশে বড় হচ্ছে, কত আমার স্বপ্ন সামনে—আর কিনা বাবাঠাকুর গত হলে আমাকে বসিয়ে দিতে চায়!

বাবাঠাকুরের মনে মনে এ-সব আছে তবে। আমি বললাম, তুমি যে কি না, এ-সব আমি করবই না।

এই চুপ। এ-ভাবে বলো না। বাবাঠাকুর শুনতে পেলে আবার খেপে যাবে। শেষে বিলের জলে নামিয়ে দেবে সবাইকে।

এ-সব খবর আমার জানা, আমি এখানে আসার মাসখানেক আগে বাবাঠাকুর সহসা ক্ষিপ্ত। ঠিক সহসা বলা যায় না। রাতে শিবাভোগের সময়, দুটো সাদা শেয়াল ঝিলের ধারে রোজ ডাকলেই ভোগ খেতে আসে। হাতে কলাপাতা, কাচা মাংস আর দুধ। এই দিয়ে শিবাভোগ। ঝড় তুফান, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বন্যা যাই এই ইহসংসারকে গ্রাস করুক না কেন, নিশীথে শিবাভোগ তিনি সেই প্রাচীন অশ্বত্থের নিচে ঝিলের পাড়ে দিতে যাবেনই। আর ঝড় জল প্রাকৃতিক দুর্যোগ যাই থাকুক না, সেই শিবাভোগে যে দুটি প্রাণী রোজ আসে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে তারা আসবেই। না এলেই ব্যাস—কোথাও কিছু ত্রুটি ঘটে গেছে। বাবাঠাকুর তখন সেবাইত বদরিদার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। সেবাইতের মনে কোন পাপ ঢুকেছে হয়তো ভাবেন। সে-কারণে সে-রাতে প্রাণী দুটো ভোগ খেতে না আসায় দুপুর রাতে সবাইকে বলেছিলেন, এখনই গৃহত্যাগ। বাবাঠাকুরের উপর কোনো অলৌকিক প্রবাহ তবে ছুঁড়ে দিচ্ছে কেউ। তারই নির্দেশে তিনি সবাইকে গৃহত্যাগ করতে বলছেন। মন্দির এবং পাশের সংলগ্ন কোঠাবাড়ি থেকে সবাইকে বের করে নিয়ে ঝিলের ঘাটে গিয়েছিলেন। সারারাত গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে রেখেছিলেন সব কজনকে, শিবাভোগে ত্রুটি ঘটায় সংসারের উপর যে রোষ নেমে আসার কথা ছিল, এই করে তা থেকে বাবাঠাকুর মুক্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন বদরিদা এবং তার পরিবার পরিজনদের।

কার্তিক মামা দেখছি আগের চেয়ে একটু বেশি সমীহ করতে শুরু করেছেন আমাকে। যার থানে আমিই ভাবি পুরোহিত। কুলীন বামুন, তার উপর আমার নিষ্ঠাবান পিতার খবর এ-বাড়িতে আগেই পৌঁছে গেছে। যাজনে এত পটু যার বাবা তার পক্ষে কালীবাড়ির পুরোহিত হওয়া খুব স্বাভাবিক এবং গর্বের বস্তু। লক্ষ্মীকেও দেখছি আগের মতো তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছে না। বৌদির সেবাযত্ন আমার প্রতি এমনিতেই একটু বেশি মাত্রায় ছিল—এই ঘটনার পর কথাবার্তায় যেন তার শ্রদ্ধার ভাব এসে গেছে। এ-সব কারণে আমি আরও সংকোচের মধ্যে পড়ে গেলাম। আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করলে ঠিক আবার পলাতক হব—কে আমাকে একটা মন্দিরের পুরোহিত বানায় দেখব। সাধ্য কি—কিন্তু যেটা এর চেয়ে দুঃখের, তা হচ্ছে মিমির অবমাননা। মিমির নরম হাত, কী সরু আর লম্বা

চাঁপাফুলের মতো, হাতে হীরের আংটি, যেন পদ্মকলিতে কোন রুপোলি ভ্রমর এসে উড়ে বসেছে। মেয়েটাকে খুঁজছি মনে মনে।

গাড়ি দুটো আমার পড়ার ঘরের পাশে ঠিক আছে। ওরা ভোগের প্রসাদ খেয়ে তবে যাবে। বদরিদার ঘরে সবাই বসে আছে। বদরিদা ওদের একটু বেশিই খাতির যত্ন করছেন। চা আসছে, মন্দির থেকে সন্দেশ আসছে এবং বাবাঠাকুর এত প্রসন্ন হওয়ায় কপালে যার যা দুশ্চিন্তার রেখা ফুটে উঠেছিল সব মুছে গেছে। ওরা কথায় কথায় হা হা করে হাসতেও পারছে।

শুধু এ তীর্থস্থানে বোধ হয় একজন তার অবমাননায় হাসতে পারছে না। সমবয়সী একটা ছোঁড়ার পা ধরে, তুমিই আমার সব ঠাকুর বলার পর সে উধাও। এই মেয়ে পড়ার ঘরে গিয়ে বসেছিল, আমাকে নিয়ে কিঞ্চিৎ মজা উপভোগ করবে বলে বোধ হয়। নাহলে আর কী কারণ থাকতে পারে—আগে বুঝতে পারি নি, দেখার পর বুঝেছি, যে মেয়ের গুমর এত, কলেজে কারো দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে পর্যন্ত দেখে না, সেই মেয়ের তার কলেজের এক আশ্রিত ছাত্রকে দেখার জন্য এত কৌতূহল। মনে মনে ভাবলাম, বেশ হয়েছে, এখন বোঝ—তারপরই আর এক দুর্বলতা এসে গ্রাস করতে থাকল। বাবাঠাকুর সিদ্ধ পুরুষ। অন্তর্যামী। তিনি বোধ হয় আগেই টের পেয়ে গেছিলেন, তার বিলুকে নিয়ে মজা করার জন্য রায়বাহাদুরের নাতিন পড়ার ঘরে ঢুকে বসে আছে। রায়বাহাদুরের নাতিন বলেই তুমি সবাইকে অবজ্ঞা করতে পার না!

মিমি কোথায় আছে কাউকে বলতেও পারছি না। তোমার ছোকরা এমন রূপসীকে খুঁজে বেড়ানো কেন? মনে মনে খোঁজা। নটুকে একবার দেখলাম দৌড়ে মন্দিরের চত্বরের দিকে গেল। তাকে বললে হয়, এই নটু জানিস, মিমি কোথায়। মাস্টারমশাই আমি, আমাকে ডাকছেন? আমার বয়স আর ওদের বয়সের তফাত পাঁচ সাত বছরের। কিন্তু এঁড়ে বাছুরের মতো গুঁতাতে এখনই এরা শিখে গেছে। অকালপক্ক। আমার খোঁজাখুঁজির মধ্যে যদি কোন দুর্বলতা আছে টের পায়। ধুস্ মরুকগে। আমি কি করব। দরকার নেই। পড়ার ঘরে গিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে থাকাই ভাল। না হয় স্নান-টান সেরে ফেলি। এক সঙ্গে পাত পড়বে লম্বা বারান্দায়। রায় বাহাদুর আর তার পরিবারবর্গের সঙ্গে এক সঙ্গে ভোজন। বৌদিও দু-বার তাড়া দিয়েছে, এই বিলু স্নান করে নে। কলেজে গেলি না, তোর দাদার সঙ্গে খেতে বসবি।

আর আশ্চর্য মন্দির থেকে বের হয়ে লক্ষ্মীকেও দেখছি না। লক্ষ্মী আর মিমি কী তবে বাগানের দিকে গেছে। যাওয়া ঠিক হবে না—তবু টানে। দু'জন

দু'রকমের। দুই মেরুর। একটা জায়গায় বোধ হয় ওরা এখন সমব্যথী। একজন অনাথ, অন্যজন আর এক অনাথের কৃপালাভে পা জড়িয়ে ধরেছে। তবে তুমিও অনাথ, এ-সব হিজিবিজি চিন্তা মাথায় খেলা করলে দেখতে পেলাম ওরা দু'জনেই খিড়কি দরজা দিয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে ছুটে আসছে। সব ভেস্তে গেল। পায়ে ধরে বলাটাও যেন এক মজা। আমাকে দেখে গুম মেরে গেল। বাবাঠাকুরের চর সামনে।

হঠাৎ আমার মাথায় রাগ চড়ে গেল। রাগ চড়ে গেলেও নিজের সম্পর্কে সচেতন বলে, রাগ সামলেই কথা বলতে হল। ডাকলাম, এই লক্ষ্মী শোন।

লক্ষ্মী থামলে মিমি দাঁড়াবে। আসলে যতই মাথা গরম হয়ে থাক, মিমিকে আমি সম্বোধন করতে পারি না। কারণ কলেজে যে মেয়ে উর্বশীর মতো ঘুরে বেড়ায় তাকে একজন বাউণ্ডুলে বাবার সন্তান নাম ধরে ডাকতে পারে না।

মিমি আর লক্ষ্মী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। দু'জনের চোখেই কৌতূহল—আমি কী বলব শোনার জন্য।

লক্ষ্মীকে বললাম, দেখ লক্ষ্মী তোমাদের মিমিকে বলে দিও আমি বাঘও নই, ভাল্লুকও নই।

লক্ষ্মী স্বভাবসুলভ ভঙ্গীতে বলল, ওমা এ কি কথা মাস্টার। তোমাকে বাঘ ভাল্লুক আমরা ভাবব কেন?

আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম, আমার কোন দোষ নেই মিমি। বাবা ঠাকুর বললে কী করি। তাই পা দুটো বাড়িয়ে না দিয়ে পারি নি।

মিমি এবার বেশ কিছুক্ষণ আঁচলে শরীর ঢেকে দাঁড়াল। বলল, আপনি আমাদের কলেজে পড়েন?

পড়ি।

কোন ইয়ার?

সেকেণ্ড ইয়ার।

মিছে কথা, কখনও তো দেখিনি।

আপনি তো কাউকে দেখেন না।

সবাইকে দেখি। সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে না দেখে উপায় আছে!

তাহলে মিমি সব দেখে। শুধু আমাকে দেখেনি। সাহসই হয়নি কখনও মিমির কাছে যাবার। দূর থেকে দেখলে, মিমি তাকে লক্ষ্য করবে কী করে, কিন্তু আসল কথাটা যে বলা হল না।—মিমি বুঝলে। ঢোক গিললাম।

লক্ষ্মী কেমন মাস্টারী গলায় বলল, বলেই ফেল না। ঢোক গিলছ কেন?

মিমির চোখ দুটো আরও বেশি বড় হয়ে যাচ্ছে। সেই দুষ্টু হাসি ঠোঁটে। আমাকে দেখলে এ-ভাবে হাসে কেন? আমি যে গোবিন্দদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে পলাতক হয়েছিলাম, সে কথা কি লক্ষ্মী বলে দিয়েছে। ছোড়দি যে আমাকে সাইকেলের পেছনে চড়িয়ে দামোদরের বালিয়াড়িতে নিয়ে যেত তার কথাও কি··· ? যে ছেলে একটা মেয়ের সাইকেলের ক্যারিয়ারে উঠে হাওয়া খেতে যায়, সে আবার পুরুষ মানুষ কী করে। এই অবজ্ঞা থেকেই হাসি। আমাদের দারিদ্র্যের কথাও জানতে পারে। মিমিকে কিছু বলার অর্থই হচ্ছে, আমার অধিকার সম্পর্কে আমি ঠিক সচেতন নই। কিছুটা ক্ষমা চাওয়ার মতো ব্যাপার। পায়ে ধরে তুমি আমার সব ঠাকুর বলার সময় মুহূর্তে যে বিষণ্ণতা জেগে উঠেছিল চোখে, মন্দির থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে তা শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলেছে দেখছি। একজন খ্যাপা মানুষ দাদুর গুরুদেব, তার ইচ্ছে অনিচ্ছেতে দাদু ভয় পেলেও মিমি পায় না। দাদু ছোট না হয়ে যায় ভয়েই মিমি আমায় চরণ দুখানি ধরে সবার সামনে নাটক করেছিল।

আমার আর কথা বলার সাহস থাকল না। ভারি বিব্রত বোধ করতে থাকলাম। কেন যে কথা বলতে গেলাম। মেয়েদের সম্পর্কে আমার একটা ভয় কিংবা সংকোচ এমনিতেই এত প্রবল যে যা কিছু ইচ্ছে গোপনে। প্রকাশ করার ক্ষমতা কম। মিমি তখন যেন না বলে পারল না, কী চলে যাচ্ছেন!

স্নান করতে যাব।

কিছু বললেন না যে।

না মানে।

আপনি ধনমান যশ হলে সবাইকে নাকি আবার সব ফিরিয়ে দেবেন।

লক্ষ্মী সহসা কেমন ঠেলা দিয়ে বলল, এই মিমিদি······

লক্ষ্মী এই প্রথম আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। সমবয়সী বলে আমার সব কথা মিমিকে বলে দেওয়া ঠিক হয়নি। আমি গুম মেরে গেলাম। চলে যাচ্ছিলাম, মিমি ডাকল, শুনুন। যেন আদেশ। আমাকে ফিরে দাঁড়াতেই হবে।

মেয়েরা ডাকলে আমি চলে যেতে পারি না। খিড়কি দরজার দিকটায় তখন কেউ নেই। আমরা তিনজন। লক্ষ্মী যেন আমাকে দেখছে না। মন্দিরের গায়ের কারুকার্য দেখছে এমন চোখে তাকিয়ে আছে। এতক্ষণ এরা তবে বাগানে বসে বসে আমাকে নিয়েই কথা বলেছে। লক্ষ্মী কাজটা ভাল করেনি। পিলুর কথাও বলে দিতে পারে—আমরা দেশ ছাড়া এবং উদ্বাস্তু এসবও বলে দিতে

পারে। লক্ষ্মী তো আমাদের বাড়ি গিয়ে সবই দেখে এসেছে। কত গরীব আমরা মিমি টের পেয়ে গেছে।

আমরা খুব গরীব। এ-কথা টের পেলে আমি বড় ছোট হয়ে যাই। বাবার বিচিত্র খেয়ালের কথাও বলে দিতে পারে। অভিজাত পরিবার বিষয়টা কি আমার জানা হয়ে গেছে। ছোড়দির বাড়িতে তা টের পেয়েছি। দেশে বাবার জমিদার দীনেশবাবুর বাড়ি গেলে তা টের পেয়েছি। যেন ওরা মানুষ না। অন্য গ্রহের দেবদেবী। আমাদের কুঁড়েঘরে নিজেদের থাকবারই জায়গা হয় না, তার মধ্যে আবার শংকরাকে ডাকা। বাড়িতে এক পাল বেড়াল, হাঁস কবুতর একটা হনু পর্যন্ত পিলুর কৃপায় আশ্রয় লাভ করেছে। লক্ষ্মী সব বলে দিলে আমরা যে একটা মজার দেশের মানুষ মিমি ভাবতেই পারে। এখন যত রাগ গিয়ে আমার কেন জানি লক্ষ্মীর উপর পড়ল। কিছু বলারও উপায় নেই। নালিশ দিলে বড়রিদা বলবে, বিলু লক্ষ্মীর সঙ্গে তোদের বনে না কেন বুঝি না। ও তোদের জন্য এত করে আর তোরা ওর পেছনে লাগলে খাপ্পা হবে না। তোদের অর্থে, আমি নটু পুটু। নটু পুটু একদিন অত্যন্ত বিমর্ষ মুখে বলেছিল, আমরা আর ওর সঙ্গে কোন কথা বলব না। আড়ি। সেটাও থাকে না শেষ পর্যন্ত। জল দিতে এসে, খাবার দেওয়া হয়েছে বলতে এসে কিংবা বিছানা করে দেবার সময় এমনভাবে কথা বলা শুরু করে দেবে যে জবাব না দিয়ে থাকা যায় না।

এ দেশের মানুষেরা উদ্বাস্তুদের যে কত করুণার চোখে দেখে! আমি যখন উদ্বাস্তু আর মিমি যখন তা টেরই পেয়ে গেছে তখন আর ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। বরং আমার বাবাঠাকুর সাজার বিষয়টা নিয়ে মিমি এখন কী বলে সেটা শোনাই ভাল।

মিমি সেদিকটায় একেবারেই গেল না। শুধু বলল, মাস্টার তোমার বাড়ি আমাকে নিয়ে যাবে?

আপনি থেকে তুমি! লক্ষ্মী-বাগানে বসে ঠিক সারাক্ষণ মাস্টার মাস্টার করেছিল। সব ধরে ফেলেছে।

আমার বাড়ি কেন?

বেড়াতে যাব।

না না আপনি আমাদের বাড়ি বেড়াতে যাবেন কেন?

বেড়াতে গেলে দোষের কিছু আছে?

না, দোষের হবে কেন।

লক্ষ্মী টানতে থাকল মিমির হতে ধরে। চল মিমিদি। বলেছিলাম না, মাস্টার স্বার্থপর। ছোট ভাইটাকে পর্যন্ত এখানে দূরদার করে। আমি তো জোরজার করে গেছিলাম। তোমাকে যেতে হলে জোরজার করে যেতে হবে।

তাই যাব ভাবছি। মিমি শুধু এইটুকু বলেই চলে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি পিছু পিছু এগিয়ে গেলাম। —আমাদের বাড়ি আপনি যাবেন কেন? বন জঙ্গলের মধ্যে বাড়ি। ঢোকাও যায় না।

তোমরা ঢোক কী করে!

অভ্যাস হয়ে গেছে। আপনাকে আমি নিয়ে যাব না! মনে মনে বললাম, মজা পেয়েছ না? বাড়ি গিয়ে দেখবে, মা হয়ত বাবার সঙ্গে গলা ছেড়ে ঝগড়া করছে। পিলু হয়তো খালি গায়ে এক বোঝা ঘাস নিয়ে ঢুকছে বাড়িতে। বাবা তখন হয়ত হাঁটুর কাপড় তুলে নিশ্চিন্তে হুকা খাচ্ছেন। মায়া হয়তো হনুটাকে কাঁধে নিয়ে দুলে দুলে পড়ছে। ঘরের মধ্যে একটা তক্তপোশ নেই। বাঁশের মাচান। বারান্দায় একটা চেয়ার নেই, মাদুর পাতা। রান্নাঘর বলতে শণ দিয়ে ছাওয়া ঝাঁপের বেড়া। হয়তো বাবা গামছা পরে স্নানে যাবার আগে পোষা কুকুরটার এঁটুলি বাছছেন। মানুষের চেয়ে জীবজন্তুর প্রতি সেবাযত্ন লক্ষ্য করলেই ধরতে পারবে অবস্থা বিপাকে আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি। ও সব দেখে তুমি মজা পাও সে হতে দেব কেন। শুধু মজা, কলেজের আর মেয়েরা, শুনে আমার দিকে ঠিক যাবার সময় চোখ তুলে তাকাবে। তাকালেই বুঝতে পারব ওরাও জেনে গেছে। তুমি শ্রীময়ী কলেজে এত অহংকারী এখানে এসে এত মুখরা হয়ে উঠলে কী করে? বাবা বলেন, স্ত্রীজাতি যা দেবী সর্বভূতেষু—তোমরা কখন যে কী যদি ঈশ্বর বুঝতে পারতেন।

মিমি আমাকে চুপচাপ থাকতে দেখে বলল, শোনো মাস্টার তুমি নিয়ে না যাও, আমি লক্ষ্মীকে নিয়ে যাব।

লক্ষ্মী আমার সঙ্গে একবার গেছে। আর একবার গেলে এমন বনজঙ্গলে ঢুকে যাবে, যে সে আবার নবমী বুড়ি না হয়ে যায়।

নবমী বুড়ি মানে?

লক্ষ্মী জানে।

নবমী বুড়ির কথায় মিমি বোধহয় কিছুটা ঘাবড়ে গেল।

লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, নবমী বুড়িটা কেরে?

আরে মাস্টারের বাড়ি যাবার পথে জঙ্গল পড়ে।

তুমি বল লক্ষ্মী কী গভীর বনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

না মিমিদি, সুন্দর রাস্তা। একবার গেলে তোমার কতদিন যে রাস্তাটার কথা মনে থাকবে। বড় বড় গাছের ছায়া, কত রকমের পাখি, দু পাশের ঝোপ জঙ্গলে কত অচেনা ফুল।

ভীষণ রেগে গিয়ে বললাম, কবি হয়ে গেলে দেখছি।

কবি মানে? লক্ষ্মী মিমির দিকে তাকিয়ে বলল, কবি কিগো মিমিদি!

তুমি নিজেই কবি মাস্টার। ভীতু মানুষেরা কবি হয় জান। নারীর স্বভাব সুলভ সেই এক মুখ ঝামটা মিমির।

আমি ভীতু মানুষ!

তা-ছাড়া কী।

যাই হোক আর যাওয়ার কথা উঠছে না বলে নিশ্চিন্ত। এবারে কেটে পড়লে হয়। বৌদি এসে এমন নিরিবিলি জায়গায় দুটো মেয়েকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখলে খারাপ ভাবতে পারে। পা বাড়াতেই আবার ডাক, বাবাঠাকুর আমরা কিন্তু যাব।

মিমির কাছে বাবাঠাকুর হয়ে গেলাম! আমাকে পায়ে ধরার সময় ঠাকুর বলেছিল। ঠাকুর না বাবাঠাকুর! আমি কিঞ্চিৎ বিভ্রমে পড়ে গেলাম। তাকালাম না। চলে যাওয়াই শ্রেয়। এখন দরকার আমার লক্ষ্মীকে একা পাওয়ার। রাত দশটা এগারটা নাগাদ পাওয়া যাবে। সে তখন আমার নটু পুটুর বিছানা করতে আসে পড়ার ঘরে। নটু পুটুকে সঙ্গে নিয়ে পড়তে হবে। তুমি শেষ পর্যন্ত আমার পেছনে এতটা লেগেছ! রায় বাহাদুরের নাতিনকে লেলিয়ে দিয়েছ। কলেজের দেখা আর এখানে দেখা একেবারে আলাদা রকমের। কত সম্মান দিতাম, কত মহিমময়ী ভাবতাম, দেবী মনে হত, শাড়ির খসখস শব্দ শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন করত। এখন দেখছি, তুমি আর মিমি একরকমের। আমার পেছনে লেগে মজা খুঁজে বেড়াও। আমি তোমাদের কাছে বাবাঠাকুর।

দেখুন আমাকে বাবাঠাকুর ডাকবেন না। আমি বিলু। কমার্স নিয়ে পড়ি। কম্পার্টমেন্টালে পাস। বাবার কথায় দশটা বিষয়ের মধ্যে নটাতে পাস। জীবনে কে কবে সব বিষয়ে পাস করে। অবশ্য এ-সবই মনে মনে। যা বললাম, তা অন্যরকম।—বাবাঠাকুর হতে যাব কেন! বাবাঠাকুর নরেন খ্যাপা। তার ভক্ত আপনার পিতামহ।

হাঁ মাস্টার, তুমি বাবাঠাকুর তবে! লক্ষ্মী গলা উঁচিয়ে কথাটা বলল।

না, আমি বাবাঠাকুর না।

মিমি বলল, বাবাঠাকুর স্ত সেকেণ্ড।

ইস কেন যে সাড়া দিয়েছিলাম বাবাঠাকুরের ডাকে। তাঁর কাছে শরীর পবিত্র অপবিত্র বলে কিছু নেই। মানুষের মন পবিত্র থাকলে সে সব সময় পবিত্র। হাগামোতা কাপড়ে পূজা আটকায় না। স্নান না করেও মায়ের মন্দিরে ঢোকা যায়। পূজা দেওয়া যায়। আমি শুধু তার আজ্ঞা শিরোধার্য করেছি। আমি বাবাঠাকুর স্ত সেকেণ্ড হতে যাব কেন। আসলে মিমি তার অপমানের জ্বালা এভাবে মেটাতে চায়। মিমির এই ব্যবহারে নারী জাতির উপর ভারি বিদ্বেষ জন্মাল। ছোড়দির জন্য যে ভাবালুতায় ভুগছিলাম তাও কেটে গেল। অবশ্য আমার মার অভাবে অনটনে যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তি রূপেন সংস্থিতার চেহারাটা জীবনে বার বার দেখা। দেখা সত্বেও, একা থাকলেই কোনো ফুলের উপত্যকায় এক তরুণী কেবল দৌড়ায় এমন একটা ছবি মাথার মধ্যে কে যে গুঁজে দিয়ে যায়। আর এটা থাকে বলেই পড়ার প্রতি আগ্রহ জন্মাচ্ছে। এটা আছে বলেই বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখি। না হলে যেন সব ফাঁকা মাঠ, জীবন মৃত বৃক্ষের মতো। আবার সেই ধন মান যশের কথা মনে উঁকি দিল। ও-সব হলে কেউ আর মজা করতে পারবে না। তখন গাড়ি থেকে নেমে এ-শর্মার গলায় মালা দেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এবং এ-ভাবে কোনো এক উঁচু মঞ্চ থেকে আমি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেই, কখনও নিমগ্ন থাকি বই লেখায়, কখনও কবি হয়ে যাই। অথবা শিল্পী, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি—আয়ে না বালম—যা কিছু আমার নাগালের বাইরে সেই সব স্বপ্নে মনটা বিভোর হয়ে থাকে।

এদের সঙ্গে কথায় পারব না। মেয়েদের সঙ্গে আমি ঠিক গুছিয়ে কথাও বলতে পারি না। আমার দৃঢ়তা কম। আমার মধ্যে নারীজাতির জন্য দুর্বলতাই বেশি। সব সুন্দরী বালিকাকেই মনে হয় এদের ছুঁতে পারলেও পবিত্র হওয়া যায়। ছোড়দি নীল রঙের গাড়িতে যখন স্কুলে যেত, আমি রোয়াকে বসে দেখতাম। এই দেখার এক সৌন্দর্য আবিষ্কারের নেশা ছিল, তার পায়ে সাদা কেডস, সাদা মোজা, বব করা চুল রেশমের মতো, যেন আমার সামনে আস্ত তাজা ফুল হয়ে ফুটে থাকত। এ-সৌন্দর্যবোধ কোথায় রাখি। সৌন্দর্যবোধই আমাকে বড় বিপাকে ফেলে দেয়। কলেজে এই মিমিকেও সেই এক সৌন্দর্য-বোধ থেকে আবিষ্কার। এখন দেখছি কত নিষ্ঠুর হতে পারে মিমি। সে আমাকে জব্দ করার জন্য বাড়ি পর্যন্ত যেতে চায়। বংশ যার এত দীন হীন তার আবার বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখা কেন? বাবাঠাকুর স্ত সেকেণ্ড বলায় এত রাগ যে বলি, বাড়ি গেলে ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে পিলু। ওকে তো জানেন না

সে তার দাদার সঙ্গে কেউ মস্করা করছে জানলে আর রক্ষা রাখবে না। দাদাই হচ্ছে পৃথিবীতে দেখা তার বড় মানুষ। দাদা আর বিদ্যাসাগর তার কাছে সমান। দাদা তার কলেজে পড়ে সোজা কথা না।

সহসা খিড়কির বাগানের দিকটায় পুটু হাজির। স্যার আপনি এখানে। মামা খুঁজছে।

তাড়াতাড়ি পালাতে হয়। মিমি আর লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলা নিভৃতে অশালীন ব্যাপার। বয়স তো হচ্ছে। আঠার বয়সটা কম না। বড়রিদার বিবাহ ষোল বছরে। বৌদির বয়স নয়। বার বছর বয়সে নটুর দাদা জন্মেই মরে গেল। নটু তার অনেক পরের। অনেক মানত তার জন্য। বড়রিদা বোঝে সব। আমার বয়সটা ভাল না। বৌদি অন্যরকমের। তার কাছে বিলু সংসারে পাপ আছে বলে জানে না। নাহলে একা লক্ষ্মীকে আমার সঙ্গে বাড়ি যেতে দেয়। কিংবা রুচির প্রশ্নও থাকতে পারে। শত হলেও মাস্টারদার ভাইপো।

যাই হউক কারো দিকে না তাকিয়ে ধর্মশালা রান্নাবাড়ি পার হয়ে ছুটে যাচ্ছিলাম, তখনই মিমি বলছে, তুমি গেলে কী হবে। ছাড়া পাবে না। তোমার সঙ্গে কথা আছে। ছোড়দি নাকি চিঠি লিখবে তোমাকে।

মাথাটা ঝাঁঝাঁ করতে থাকল। লক্ষ্মী আমাকে সত্যি ডুবিয়েছে। লক্ষ্মীকেই একমাত্র সেই পলাতক জীবনের কথা বলেছিলাম। ঠিক বলিনি, লক্ষ্মী খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একা পেলেই বেশ সমব্যথীর মতো কথা তুলেছে ছোড়দির। যেন ছোড়দি তার একাই নয়, লক্ষ্মীরও। এখন বুঝতে পারছি আমি কত হাবা। যদি বড়রিদার কানে যায়। ইস্ সত্যি কেন যে বলতে গেলাম বিশ্বাস করে। তুমি বিলু গরীবের ছেলে। তোমার এই ঘোড়ারোগ কেন।

আরে বিলু চান করবি না? সবার হয়ে গেছে।

রায়বাহাদুর পত্নীর এতক্ষণে চৈতন্য উদয়—মিমিটা কোথায়?

সঙ্গে তার পুত্র, কন্যা, পুত্রবধু—ছোট ছোট কাচ্চা-বাচ্চা, মিমি তোমাদের ছোট নেই। বাগানে বসে মাস্টারের মুণ্ডুপাত করছে দেখগে। বাবাঠাকুর ত সেকেণ্ড ভাবতে শুরু করেছে আমাকে।

রায়বাহাদুর উঠে দাঁড়ালেন, হ্যাঁ আপনি চান করে নিন।

এ-আবার কেমন কথা। আমাকে আপনি আজ্ঞে করছে। রায়বাহাদুরও কী আমাকে বাবাঠাকুর ত সেকেণ্ড ভেবে ফেলেছে। যার হবার কথা নেতা, না হয় কবি, শিল্পী কিংবা সংগীত বিশারদ, তাকে নাজা সন্ন্যাসী বানিয়ে দেবার এই ষড়যন্ত্র কেন। আমি ক্যালক্যাল করে তাকাতেই যেন পরমগুরুর করুণা ভেবে বলা,

আপনার উপর বাবাঠাকুরের অশেষ কৃপা। তিনি তাঁর যদি এক বিন্দু আমাদের দিতেন।

এই প্রথম জীবনে আমার জিভে শালা কথাটা এসে গেছিল—শালা আমি কি খুব তোমাদের গুরু ভাই।

আপনি আজ্ঞে করায় মনটা তিক্ততায় ভরে গেল। বদরিদার উপর এদের প্রভাব, সীমাহীন খাতিরযত্ন দেখেই এটা টের পেয়েছি। যদি বদরিদাও বুঝে ফেলে, কুলীন বামুনের ছেলে, তায় আবার দেখতে ব্রহ্মচারীর মতো, সহজেই মন্দিরের বলির পাঁঠা করে ফেলা যায়। আমার বাবা যা একখানা মানুষ, তাতে করে বদরিদার প্রস্তাব সহজেই লুফে নিতে পারে। যদি বলে, বাবাঠাকরের বয়েস হয়ে গেল, যে কোনদিন দেহরক্ষা করতে পারেন, বিলুকে দিন মন্দিরে ঢুকিয়ে দিই। ইহজন্ম এবং পরজন্মের কাজ একই সঙ্গে সারা হয়ে যাবে। কত বড় কথা এমন জাগ্রত দেবীর থানের পুরোহিত হওয়া। সাত পুরুষের পুণ্যফল না থাকলে এমন সৌভাগ্য মানুষের জন্মায় না।

আসলে রায়বাহাদুর বোধহয় ভেবে ফেলেছেন, আমার আহার না হলে ওদের পাতে বসা অনুচিত। বাবাঠাকুর এদিকটায় খেতে আসেন না। তিনি আহার কখন করেন কেউ আমরা জানিও না। কাঁচা ফলমূল দই সন্দেশ এই তাঁর আহার। মন্দিরে বসেই তিনি নিজের খুশিমত খান, খেতে ইচ্ছে না হলে শুয়ে থাকেন। শুতে ইচ্ছে না হলে মন্দিরে প্রদক্ষিণ করেন, কিংবা তাঁর ঘরে পুঁথি ডাঁই করা আছে তা পাঠ করেন। সকালবেলায় হোতার সাঁকো পর্যন্ত যান। কারণ তখন প্রাতঃকৃত্যের দরকার হয়। দু'পাশের গরীব মানুষ-জন, ফড়ে, সাধু, পাটের মহাজন বাবাঠাকুরকে দেখার জন্য অপেক্ষা করে থাকে। দেখলে পুণ্য। দিন ভাল যায়। একজন মানুষ দর্শনে শুভাশুভ বোধ এমন তীব্র তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে এ-অঞ্চলে না এলে তা বিশ্বাস করা যায় না।

খেতে বসে বোঝা গেল, আমার প্রতি সবার নজর। ধর্মশালার বারান্দায় আজ পাত পড়েছে। রায়বাহাদুরের পরিবার সহ আমরা সবাই। নটু পুটু কার্তিক মামা, ধনুদা এবং আমি। আমার দু'পাশে দু'জন, বদরিদা ডান পাশে, বাঁ পাশে রায়বাহাদুর। সবার খালি গা, সাদা উপবীত। ঠিক সামনে বসে আছে মিমি। লক্ষ্মীর এখন কাজ জল, পাতে লেবু এবং নুন দেওয়া। সে খেতে বসবে বৌদির সঙ্গে। মিমি আমার সামনে বসে। নির্বিঘ্নে যে খাব তা উপায় নেই।

রায়বাহাদুর গদ্‌গদ হয়ে প্রশ্ন করলেন, আপনার পিতৃদেব কী করেন?

আমার মাথায় রক্ত উঠে গেল। শুধু বললাম, কিছু করেন না।

বদরিদা জানেন আমি নিরীহ গোবেচারা মানুষ। সেই মানুষ কোন কারণে অতিষ্ঠ না হয়ে উঠলে এমন জবাব দেয় না। বদরিদা গণ্ডুষ করার সময় আমার দিকে তাকালেন।

আমিও তখন পঞ্চদেবতাকে নিবেদন করে গণ্ডুষ করতে যাচ্ছি। দুজনের চোখাচোখি হয়ে গেল। গণ্ডুষ সেরে বদরিদা বেশ ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন, তোর হয়েছেটা কি? সকাল থেকে নাকি মেজাজ খারাপ করে আছিস। নটু পুটুকে পড়াতে বসালি না। কলেজে গেলি না। রেল লাইনে গিয়ে বসে থাকলি।

স্থূলকায় রায়বাহাদুর সরু আতপ-চালের ভাত ঘি এবং সুকতোর ডাল দিয়ে মাখছিলেন, গন্ধরাজ লেবুর সুঘ্রাণ উঠছে—তিনি তাঁর খাওয়ার চেয়ে আমার সম্পর্কে বেশি কৌতূহল অনুভব করছেন বোধ হয়—কারণ ভোগের দিকে তাঁর মন নেই—বদরিদার কথার দিকে তার মন। বদরিদা ঠিক বাবাঠাকুরের মহিমা বুঝে উঠতে পারছেন না—তাকে বিষয়টা অধিগত করানো দরকার ভেবেই যেন বলা, বাবাঠাকুরের ইচ্ছে। তুমি বদরি কেন যে বুঝছ না।

অর্থাৎ আমার আজকের মেজাজ মর্জি সবই বাবাঠাকুরের মহিমার ফলে হয়েছে। বাবাঠাকুরকে আমিও শ্রদ্ধা ভক্তি করি। বিষয় আশয় থেকে মুক্ত তিনি। তার জ্ঞান অসীম। এ-সব এখানে থাকতে টের পেয়েছি। কিন্তু তাকে পার্থিব জগতের বাইরের কোন শক্তি ভাবিনি।

বদরিদা বললেন, তা ঠিক।

বাবাঠাকুরের অসুখের সময় বৃন্দাবন চক্রবর্তীকে নিয়ে এলে মন্দিরে ফুল জল দেবার জন্য। ঢোকাতে পারলে! বাবাঠাকুর বলির খাঁড়া নিয়ে লোকটার পেছনে ছুটেছিলেন। তিনি সব বোঝেন। ধরতে পার বাবাঠাকুর তাঁর নিজের উত্তরাধিকারী ঠিকই করে ফেলেছেন। তোমার মাস্টারের মুখখানি দেখেছ। নিষ্পাপ, পবিত্র, নবীন সন্ন্যাসীর মতো দেখতে। নবীন সন্ন্যাসী কথাটা শুনে মিমি আমার দিকে একবার চোখ তুলে তাকাল।

আমি গালে হাত দিলাম। সোনালী রেশমের মতো গালে দাড়ি। এরই জন্য তবে যত হুজ্জুতি। আচ্ছা দেখা যাবে। কোনরকমে খেয়ে উঠে ঘরে এসে বসতে না বসতেই দেখি মিমি হাজির। ও আমাকে ছেড়ে দেবে না বলেছে। না-ছাড়ার কাজটা বোধহয় এখন থেকেই শুরু করতে চায়।

খুব ভাল মানুষ হয়ে গেলাম। বিনীত কথাবার্তা—আপনারা কখন যাচ্ছেন।

সে দিয়ে তোমার কী দরকার।

যখন জানার দরকার নেই বালিশটা টেনে শুয়ে পড়া যাক। চোখ বোজার চেষ্টা করি। ঘুমই এখন এর থেকে পরিত্রাণ করতে পারে। পাশ ফিরলাম।

ছোড়দি নাকি তোমাকে পুলিশে দেবে বলেছিল?

ভয় দেখিয়েছে। চোখ বুজেই বললাম। কারণ লক্ষ্মী যা ডোবাবার ডুবিয়েছে। এখন ভেসে উঠে লাভ নেই।

কেন ভয় দেখাল।

হুঁ। কিছু বলছেন। হাই তুললাম।

কেন ভয় দেখাল!

চুরি করেছিলাম।

কী চুরি করেছিলে?

টাকা। আমি আস্ত একটা চোর। হাই উঠতে থাকল। হাই তুলে যদি রেহাই পাই।

কার টাকা?

গোবিন্দদার। গ্যারেজে কাজ করতুম। মেট্রিকে কম্পার্টমেন্টালে পাস করে এর চেয়ে বেশি কিছু করা যায় না।

এখানে উদয় হলে কী করে?

সেও ভাগ্য।

তোমাকে গ্যারেজেই মানায়।

ঠিকই বলেছেন। হাই তুলেও দেখছি নিস্তার নেই।

আমাদের গ্যারেজে কাজ করবে?

না। আমি যে কথা দিয়েছি।

কাকে কথা দিয়েছ?

ছোড়দিকে।

কী কথা!

মানুষ হব। বাবাঠাকুর হব না। চোর জোচ্চোরকে বাবাঠাকুর মানায় না। তারপরেই উঠে সোজা মিমির কাছে হাতজোড় করে বললাম, দোহাই বলবেন না যেন, আমি চুরি করেছিলাম গোবিন্দদার কৌটো থেকে। টাকা চুরি করে পালিয়েছিলাম। আপনার পিতামহ জানলে দুঃখ পাবে।

বয়ে গেছে দুঃখ পেতে।

শুনলেন না, বলল, দেখতে নবীন সন্ন্যাসী।

ঐটুকু তো তোমার সম্বল। শ্রীচরণ দুখানি বাড়িয়ে দিতে লজ্জা করল না। এক কলেজে পড়ি, এক ইয়ারের ছাত্র।

মিমি কলেজে আপনাকে দূর থেকে দেখতাম। কী গম্ভীর। আমাদের সাহসই হত না আপনার কাছ দিয়ে যাবার। আপনি এখন আমার পেছনে লেগেছেন। একটা কাজ করবেন, বড় উপকার হয়।

কী কাজ—?

পিতামহকে নিবৃত্ত করুন। যা আজ্ঞে, আপনি করছে?

ভাবছ তোমাকে করছে?

না তা না। বাবাঠাকুরের ভামি আমি তিনি বুঝে ফেলেছেন। তবু যাই হোক অমন বুড়ো মানুষ আজ্ঞে আপনি করলে অস্বস্তি হয়।

দাদুকে সব বলে দিলেই আজ্ঞে আপনি বন্ধ হয়ে যাবে।

কী বলবেন?

তুমি একটা চোর।

বলবেন ত!

তার মানে।

যদি দয়া করে বলেন, জানাজানি হয়।

তুমি আমাকে আপনি আজ্ঞে করছ কেন? বলব না।

গেল সব, প্রথম ভেবেছিলাম দোহাই বলবেন না বললে, ঠিক বলে দেবে। পরে ভাবলাম কথা যদি রাখে, তাহলে আমি যে চোর ছ্যাচোড় জানাজানি হবে না। এটা এখন সত্যি দেখছি জানাজানি হওয়া দরকার। বৃন্দাবন চক্রবর্তীকে ঢুকতে দেন নি বাবাঠাকুর, এক পঞ্চতীর্থ এসেছিল দেবীর পুরোহিত হবে বলে, বাবা-ঠাকুর তার গেরুয়া বসন এক হ্যাঁচকায় নাঙ্গা করে দিয়েছিলেন—আরও এভাবে দু-একজন এসে বাবাঠাকুরের কোপানলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তাঁর মহিমা বোঝা দায়। এখন ভেবে ফেলেছে সবাই আমিই সেই মানুষ বাবাঠাকুর যার সন্ধানে ছিলেন। একমাত্র চোর জোচ্চোর প্রতিপন্ন হলে যদি এই বিষম দায় থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। বললাম, দোহাই বলুন। সবাইকে বলুন, চোর ছ্যাচোড় দিয়ে কখনও থানে পূজা হয়! সব প্রণামীর পয়সা মেরে দেবে না।

মিমি কিঞ্চিৎ ঘাবড়ে গেল। বলল, জানাজানি হলে ভাল হবে? এখান থেকে সটকে যেতে হবে না? বাদরিদা একটা চোরকে জেনেশুনে রাখবে?

মিমি আমার কাছে দুই সমান।

তার মানে।

তার মানে আপনি বুঝবেন না। আমার চোখ সত্যি বড় কাতর দেখাল। কাতর চোখ দেখলে বোধহয় মেয়েদের মধ্যে মাতৃভাব জাগে। মিমির মধ্যেও মাতৃভার

জাগছে। এই সুযোগ। বললাম, আপনি আতুরে নাতিন। রায়বাহাদুরকে দিয়ে বলান, আমাকে দিয়ে ওসব কাজ হয় না। হবে না।

তুমি দেখছি খুব ভয় পেয়ে গেছ?

আপনি তো আমার বাবা কাকাকে জানেন না।

মাস্টারমশাই তোমার কাকা না?

হ্যাঁ, আমার মানুকাকা। তিনি কম্পার্টমেন্টালে পাস করেছিলাম বলে গ্যারেজে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। হাতের কাজ শিখলে নাকি অনেক পয়সা। তাঁর বন্ধু গাড়ি বাড়ি পর্যন্ত করেছেন।

তোমার বাবা মত দিলেন।

বারে দেবেন না। গাড়ি চালাব। একটা আস্ত গাড়ি আমার হাতে। কত লোকের প্রাণ আমার হাতে। অফিস কাচারিতে ঠিকমতো হাজিরা আমার হাতে। বাবা তো একেবারে গদ্‌গদ। গ্যারেজে কাজ শিখতে শিখতে একদিন গাড়ি চালাতেও শিখে যাব। আমার বাবার বড় স্বপ্ন ছিল আমি গাড়ি চালাই।

মাতৃভাবটা আরও দেখছি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে মিমির।

তোমার বাবা এটা ঠিক কাজ করেন নি। তুমি গাড়ির ড্রাইভার হবে, ছিঃ ভাবা যায় না।

আচ্ছা বলুন তো ভাবা যায়। কেবল আমার ছোট ভাই পিলু বলত, দাদা কলেজে পড়বে। বোনটাও। মারও ইচ্ছে।

তাই তো হওয়া উচিত।

সে আর হচ্ছে। আপনার দাদু, বাবাঠাকুর, বদরিদা মিলে মানুকাকার কাছে যদি যায়—আমি মরেছি।

ওরা যাবে কেন?

বাবাঠাকুর বানাবার জন্য।

ওরা বললেই তোমার বাবা মত দেবেন কেন।

হায় ভগবান তুমি তো আমার বাবাকে চেন না। বাবা দেশ ছেড়ে এসে কতকাল যে জাতমান উদ্ধারের জন্য নামাবলি গায়ে ঘোরাফেরা করেছেন। তুমি তো জানো না, মানুকাকার ইচ্ছেই বাবার ইচ্ছে। মানুকাকার উপর আর কারো কথা নেই। হাতের কাছে এত বড় সুযোগ বাবা কী সহজে ছাড়বেন। এত বড় মন্দিরের বাবাঠাকুরের তিনি বাবা হবেন—মন্দিরের প্রণামী থেকে সব কিছুর বখরা তাঁর হবে—তিনি কী ছাড়তে পারবেন।

সহসা আমি কেন যে মিমিকে তুমি বলে ফেললাম! এটা ধৃষ্টতা হতে পারে।

ভয়ে ভয়ে চোখ তুলে তাকালাম। চোখে-মুখে মাতৃভাব আছে না মিলিয়ে গেছে লক্ষ্য করা দরকার। যদি দেখি বদল হয় নি সঙ্গে সঙ্গে সংশোধন। এই যে আপনি মানে আপনার পিতামহ মানে সবাই আমার কাছে স্বপ্নের দেশের মানুষ —লক্ষ্মী বলল, আপনাদের সামনের বাগানে নাকি একটা কাকাতুয়া বসে থাকে —একদিন নিয়ে যাবেন, দেখে আসব। এত সব মনের মধ্যে যখন ক্রিয়া করছে, তখনই লক্ষ্য করলাম, মাতৃভাব বদলে গিয়ে চোখ ঘুরপাক খেতে খেতে কেমন সামান্য প্রেমিক-প্রেমিক মুখ। আমার দিকে আর সোজাসুজি তাকিয়ে কথা বলতে পারছে না। এতে প্রবল উৎসাহ সঞ্চার হল আমার মধ্যে। বললাম, মিমি তুমিই পার আমাকে এ-বিপদ থেকে রক্ষা করতে।

মিমি আঁচল সামলাচ্ছে। শরীর ঢাকছে। যাক আমি যে পুরুষমানুষ এ-বোধটা এতক্ষণে ভেসে উঠছে মনের মধ্যে। এ-বোধটা একজন তরুণ এবং তরুণীর মধ্যে থাকা ভাল। এতক্ষণ মনে হচ্ছিল বলের মতো পায়ে গড়াচ্ছিলাম, এখন মনে হচ্ছে বল না হাতের বটুয়া। একেবারে পায়ে নিয়ে গিয়ে গোলের কাছে ফেলার আগেই হাতে তুলে বটুয়া করে ফেলেছে। মিমি বলল, তোমাদের সঙ্গে নিরঞ্জন পড়ে না।

হ্যাঁ পড়ে।

ও আমাদের পাড়ায় থাকে।

মিমি কি তাহলে এ-বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চায় না। মিমিকে বললাম, বোস না। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন।

মিমি বসে বলল, তুমি কমার্স নিয়ে ভর্তি হলে কেন?

আসল কথায় আসছে না। তবু বেশী চাপ দেওয়া ঠিক না। যখন একবার বশ মেনেছে এবং আমি কমার্স নিলাম কেন, কম্পার্টমেণ্টালে পাস করলে হয় কমার্স না হয় আর্টস—তা বলতে পারে আর্টস নিতে পারতে—কিন্তু বোঝাই কী করে তিন চার মাস লেট করে ফেললে আমার জন্য কে জায়গা রাখবে? মিমি সায়েন্স নিয়ে পড়ে। জেলা থেকে জলপানি পাওয়া মেয়ে। ও-মেয়েকে কে না দেখতে ভালবাসে। আর সাদা জমিন আর নীল পাড়ের শাড়ি পরে মিমি যে কত নীল হয়ে যায় গাছপালা পর্যন্ত তার সাক্ষী দিতে পারে। আমি তো সামান্য কম্পার্টমেণ্টাল পাস করা ছেলে—আমার কথা না হয় বাদই দিলাম।

আমি বললাম, কমার্স আমার ভাল লাগে।

তোমাকে আর্টস নিয়ে পড়লে মানাত।

এ-কথা কেন। সায়েন্স নয় কেন? আর্টস মানে ত বাংলা ইংরেজি সংস্কৃত।

বাবা বললেন, রাতে ঘুম হয় না তোমার। ঘুম হলে সব সেরে যাবে।

মা বলল, ওসব শুনছি না। তুমি ওকে শরৎ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও।

মাকে প্রবোধ দিলাম, মিছিমিছি এত ভাবছ কেন বুঝি না।

মা কেমন কেঁদে ফেলল কথা বলতে গিয়ে, তুই তো এমন ছিলি নারে!

আমি উঠে ভিতরে ঢুকে গেলাম। ভিতরে যাবার সময় শুনলাম, বাবা মাকে বলছেন, অত অধীর হলে চলে না ধনবৌ।

বাবা এবার ভিতরে ঢুকে আমার পাশে বসলেন। কি ভেবে বললেন, তুমি কি আজকাল কোন দুঃস্বপ্ন দেখছ। অপমৃত্যু তেমন ভয়ের কিছু নয়। তবে মানুষের উচিত না, আত্মঘাতী হওয়া। লক্ষ্মী বড় ভুল করেছে। বেঁচে থাকার মতো জীবনে বড় কিছু নেই। এ-জীবন তো আর তুমি দ্বিতীয়বার পাচ্ছ না।

বাবার কথার মধ্যে কেমন অসংগতি ধরা পড়ছে। বাবাই বলেছেন, আত্মার বিনাশ নেই, আবার আজ তিনিই বলছেন, এ-জীবন তো আর তুমি দ্বিতীয়বার পাচ্ছ না। কিন্তু আমার মন ভাল নেই। বাবার সঙ্গে তর্ক করার স্পৃহা নেই। আমি বিছানায় লম্বা হয়ে গেলাম। বাবা ফের বললেন, কি হয়েছে খুলে বল। সব প্রকাশ করতে পারলে হালকা বোধ করবে। মা-বাবার কাছেই একমাত্র সব কথা খুলে বলা যায়।

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল, আমার অবস্থা দেখে তাঁর মুখও কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। এতটা বাবাকে ভেঙে পড়তে কখনও দেখিনি। মা পিলু মায়া দরজায় দাঁড়িয়ে। বাবা বললেন, এই তোরা যা। পিলু মায়া উঠোনে নেমে গেল। এখন পাশে মা বাবা। তবু আমি কিছু বলছি না দেখে বাবা উঠে বের হয়ে গেলেন। মাকে যাবার সময় মনে হয় আমার সম্পর্কে কিছু বলে গেলেন। আর এলেন সন্ধ্যা করে। সঙ্গে নিয়ে এলেন, একটা নিমগাছের চারা। ডাকলেন, বিলু আয়। একটা খোন্তা নে। আমার সঙ্গে আয়।

মা ডাকল, যা তোর বাবা ডাকছে।

আমার কিছু ভাল লাগছে না মা।

বাবা ফের ডাকলেন, বয়স হচ্ছে। একা পারি না। আয় না।

এরপর আর শুয়ে থাকতে পারলাম না। বাবা এই প্রথম মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর বয়স হচ্ছে। উঠে গেলে বললেন, গাছটা এই কোণায় লাগিয়ে দে। গর্তটা হাঁটু সমান করবি। পিলু এসে আগ বাড়িয়ে করতে গেলে বাবা বাধা দিলেন—সবটাতেই তোমার বাড়াবাড়ি। তুই তো অনেক গাছ লাগিয়েছিস। বিলুকে একটা অন্ততঃ গাছ লাগাতে দে। তারপর বাবা নিমগাছের গুণাগুণ

বলতে থাকলেন। নিমের হাওয়া ভাল। বাতাসের বীজাণু নাশ করে। নিমপাতার গন্ধে মশার উপদ্রব বাড়তে পারে না। পাকা নিমফল খেতে নানা-রকম পাখি উড়ে আসবে বাড়িটায়। নিমের বড় গুণ অশুভ কোন প্রভাব থেকে বাড়িঘরকে রক্ষা করে। তারপর বাবা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, যত্ন করে লাগাও। গাছটা যেন বাঁচে। এতে তোমার কর্মমোচন হবে। গাছটাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব তোমার।

এক হাঁটু গর্ত করার পর বাবাকে বললাম, হয়েছে?

তুমিই বল হয়েছে কিনা?

মনে হচ্ছে ঠিকই আছে।

মা একটা হারিকেন নিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। এই অসময়ে আমাকে দিয়ে কেন গাছটা লাগাচ্ছেন মা বুঝতে পারছে না। তবু আমার ত্রাসের চেহারা দেখে বোধহয় এখন বাবার সঙ্গে মা তর্কে প্রবৃত্ত হতে চাইছে না।

গাছটা লাগাবার পর বাবা বললেন, তোমার কিছু বলার থাকলে একে বল। যদি দুঃস্বপ্ন দেখে থাক, একে বল।

পরদিন ভোরে বাবা আমাকে একখণ্ড জমি দেখিয়ে বললেন, জমিটা কুপিয়ে ফেল। আগাছা তুলে ফেল।

সারা সকাল আমি কাজটা করলাম। বাবা পিলুকে এদিকে একদম ঘেঁষতে দিতে চাইছে না।

বাবা বললেন, পালংয়ের বীজ লাগিয়ে দাও। দু'দিন বাদ দিয়ে জল দেবে রোজ। মনে করে কাজটা করবে।

এই প্রথম বাবাকে দেখছি, আমাকে একদণ্ড বসতে দিচ্ছেন না। বাড়িটার যে আগাছা হয়েছে তাও আমাকে দিয়ে তিনি সাফ করালেন। জমিতে মুনিষ চাষ দিতে এলে আমি বাবার সঙ্গে জমির সব আগাছা সাফ করে দিলাম। বাবা এ-কথা সে-কথার ফাঁকে একসময় বললেন, মনে রেখ কাজই হল গে পরমায়ু। বাবা পরদিন আমাকে বললেন, যাও বাজারে। তোমার পছন্দ মতো মাছ এন। তোমার মা অনেকদিন থেকে বলছে আমসির ডাল খাবে। সেরখানেক মটর ডাল এন।

এ-ভাবে কাজের মধ্যে থাকতে থাকতে এক সকালে আমার মনে হল, আমি আর দুঃস্বপ্ন দেখছি না। সেই প্রেতাত্মার ভয়ও আমার কেমন কেটে গেছে। চোখ মুখ আমার আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। বাবা খেতে বসে বললেন,

বা সুন্দর বাজার করেছিস। তুই কি করে জানিস, আমি পটল ভাজা খেতে এত ভালবাসি। এখন তো পটলের সময়ও না।

বাবা পরদিন নিমগাছটার পাশে দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকলেন। কাছে গেলে বললেন, গাছটা তোর লেগে গেছে। আর ভয় নেই। এখন আর জল দিতে হবে না। বাবা সেদিনই নিজের বাড়িতে প্রথম শনিপূজার জন্য সওদা করে ফিরলেন। দুধ, চাল কলা নারকেল সব আমি পিলু বাবা একসঙ্গে বাজার থেকে নিয়ে এলাম। মা মায়া এক এক করে সব ঘরে নিয়ে তুলে সাজিয়ে রাখছে। তারপরই পিলুর সেই ডাক—দাদারে…যাবি।

সমাপ্ত

॥ পুনশ্চ ॥

তারপর দিন যায়, বয়স বাড়ে। ঘরবাড়ি থেকে ক্রমে আলগা হয়ে পড়ি। আরও দিন যায়, বয়স বাড়ে। বাবার মৃত্যুসংবাদ আসে। বাড়ি গেলে টের পাই, আমাদের এক সময় কিছু ছিল না। বাবা সম্বল ছিল। এখন আমাদের সব হয়েছে ঘরবাড়ি গাছপালা। কেবল আমাদের বাবা নেই।

কিছুদিন থেকে মার একটা চিঠি পাচ্ছি। তাতে একটাই অভিযোগ—তুই আসছিস না। গাছটা ওরা কেটে ফেলবে বলছে। সময় করে উঠতে পারছি না। সাংসারিক ঝামেলা চাকরির ঝামেলা এবং স্ত্রীর অসুখ-বিসুখ যাচ্ছে। রোজই ভাবি দু দিনের সময় হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে ঘুরে আসব। মার চিঠিতে এমন অভিযোগ কখনও বড় থাকে না। বরং লেখা থাকে এ-মাসের টাকাটা এত দেরি হল কেন পাঠাতে। আর কটা টাকা বেশি পাঠাস। দোকান বাকি, ওষুধের খরচ এমন সব তালিকার মধ্যে টাকার দরকারের কথাই চিঠির অধিকাংশ জায়গা জুড়ে থাকে। একটা গাছের জীবন রক্ষা মার কাছে এত জরুরী হয়ে পড়েছে যে নিজের অভাব অনটনের কথাও লিখতে ভুলে গেছে।

পিলু নিজের সংসার এবং চারটি পুত্র কন্যা নিয়ে বিব্রত। তার কাছে মার আর প্রত্যাশার কিছু নেই। প্রত্যাশার কথা বললে উল্টো এমন চাপ আসে যে মাকেই চিন্তায় পড়ে যেতে হয়। এই চিন্তার ফল হচ্ছে পিলু তার বড় মেয়েটিকে মার কাছে শেষ পর্যন্ত গছিয়ে দিতে পেরেছে। ছোট থেকে মাই বড় করেছে। কাছাকাছি থাকলে যা হয় মার এখন তার নাতিন সম্বল করে বাবার ঘরবাড়ি পাহারা দিচ্ছে। পাহারা দিচ্ছে না, এরই মধ্যে এক নতুন জীবন কিংবা বলা যায় বাবার স্মৃতিসৌধ আগলাচ্ছে বোঝা কঠিন। কিছুতেই তাঁকে ঘরবাড়ি থেকে আলাদা করে নিজের কাছে নিয়ে আসতে পারছি না।

এই নিয়ে আমার স্ত্রীর একটা ক্ষোভ আছে। তার ধারণা মার সঙ্গে আমার শুধু টাকার সম্পর্ক। এমন কি আমার অসুখ-বিসুখেও মা বিচলিত হয় না। একবার প্রস্টেট সংক্রান্ত চিকিৎসায় হাসপাতালে থাকাকালে মা একদিনের জন্য এসে থেকে দেখে গেছে। সেখানে তাঁর কী যে রাজসূয় যজ্ঞ চলছে আমার স্ত্রী সেটা ভেবে পায় না। একবার মাত্র মাস তিনেক কলকাতার বাড়িতে এক টানা রাখা গেছিল। চোখের যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে এক সময় মনে হয়েছিল বোধ হয় কলকাতায় না গেলে সারবে না। তাঁর ছোট নাতি ডাক্তারি পড়ে। সে ঠাকুমার

নিরাময়ের কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারবে এমন ধারণার বশবর্তী হয়েই তাঁর চলে আসা। আমার ছোট পুত্র অর্থাৎ তাঁর নাতিটির দুষ্টু বুদ্ধি পাকিয়েছিল। সে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ঠাকুমাকে দেখাল ঠিক, কবে যেতে পারবে বাড়িতে তা বলতে পারল না। আসলে ঠাকুমাকে কাছে রাখার জন্য কেবল সময় নিতে থাকল।

মা কিছু বললেই নাতিটি বলত, আবার দেখবে বলেছে।

কবে দেখবে ?

ছোট নাতি বলেছিল ডাক্তার জানাবে। সময় হলেই জানাবে।

সেই সময়টাতে মা দোতলার বারান্দায় বসে কেবল বাড়ির কথা বলত। বাড়িতে গাছপালা কত! কে কোনটা না নষ্ট করে! আমার ছোট দুই ভাই একই বাড়িতে থেকেও দুই ভিন্ন গ্রহের মানুষ। মা যে তাদেরও মা এটা আর তাদের আচরণের বোঝা যায় না। বাড়িটা যেহেতু পাঁচ বিঘার উপরে, সামনের দিকের অংশ ছোট ভাইকে দেওয়া হয়েছে। পিলুকে দেওয়া হয়েছে বাড়ির শেষের দিকের কিছুটা জায়গা। মাঝখানটায় বাড়িটার তিন চতুর্থাংশ জায়গা নিয়ে এবং ভরভরতি গাছ-পালা নিয়ে মার পৃথিবী। এই ভাগটাগ করার সময় একটা শর্ত ছিল মা যতদিন বেঁচে থাকবে বাড়ির গাছপালায় কেউ হাত দিতে পারবে না। ফলপাকুড় যা হবে সব মার। হাত ধরে দিলে খাবে না দিলে খাবে না। দু ভাই বিষয়টা নিয়ে কোন গোল পাকায়নি। ভাইরা এক অন্নে থাকতে রাজি না। ঝগড়া বিবাদ যখন চরমে তখনই মার চিঠি। চিঠি দিয়ে বাড়ি এবং জায়গা দেখিয়ে দিয়ে আমার আবার চলে আসা। ওরা যেহেতু আর্থিক দিক থেকে খুব একটা সচ্ছল নয় সে জন্য ঠিক থাকল মা যতদিন বেঁচে থাকবে, বাড়ির গাছপালা সহ উত্তরের জমি মার দখলে থাকবে। মাসান্তে আমার পাঠানো টাকা এবং গাছপালার আয় নিয়ে সংসার কোথাও মার আটকে থাকবে না এমন একটা বোধ থেকেই কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে বিষয়টা এভাবে একটা আবর্ত সৃষ্টি করবে বুঝতে পারিনি। কারণ শেষ পর্যন্ত যে যার হিসাব বুঝে নেবার জন্য বড় বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

এই ভূমিকা আমার উপন্যাসকে বোঝার জন্য। গল্পটা এখন শুরু করা যেতে পারে। এর আগে আরও দু একটা কথা বলিনি। গল্পটা বুঝতে সুবিধে হতে পারে। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য দায়ে অনাদায়ে আমিই ছোটভাইদের ভরসা। সে জন্য কোন ঝগড়া বিবাদে আমার সালিশিই শেষ কথা। গাছটা ওরা কেটে ফেলবে, ওরা বলতে কাকে বোঝাচ্ছে জানি না, বাড়ি গেলে টের পাব।

এখন বাড়ির কথা।

শহর থেকে মাইল দুই দূরে স্টেশন থেকে রিকশায় গেলে বাড়িটা পাওয়া যায়। বাদশাহী সড়কের পাশে আগে যেখানে পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্প ছিল এখন যেখানে এম আই টি কলেজ ঠিক তার পেছনটাতেই আমাদের বাড়িঘর। ত্রিশ বত্রিশ বছর আগে গভীর বনজঙ্গল ছিল এই জনপদ কে বলবে! আমার বাবা যে সংসারি মানুষ ছিলেন না সে বিশ্বাস এখনও মার অটুট।

বাবার কোন এতে যেত আসত না—কারণ বাবার কাছে মা যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা—সুতরাং মার রাগ পড়ে গেলেই যে ফের বাড়ি এসেই অধিষ্ঠান হবেন তাতে বাবার কোন সংশয় ছিল না। শেষদিকে রাগ কিংবা অভিমান বলা চলে, বাবার উপর এতই বেশি যে কখনও কখনও না বলে না করে মামার বাড়িতে কিংবা আমার কলকাতার বাড়িতে এসে মা উঠত। মার ধারণা, বাবাকে আজীবন সবাই ঠকিয়েছে হেলাফেলা করেছে। সবই হয়েছে বাবার নির্বুদ্ধিতার জন্য। বাউণ্ডুলে স্বভাবের জন্য সংসারে যে চরম দারিদ্র্য ছিল সেও বাবার অসংসারী মনোভাবের জন্য। অর্থাৎ এক কথায় মার কাছে বাবা ছিলেন একজন অনাসৃষ্টিকারী মানুষ। গাছপালা লাগানো বাদে মানুষটার জীবনে আর কোন সখ ছিল না। উদ্যোগী হলে মানুষের কী হয় না! কার কোথায় কী গাছের ফল মুখে লেগে রয়েছে বলে, তার কলম করা থেকে তার রোপণ এবং সেবাযত্ন ছাড়া জীবনে আর কিছু বুঝতেন না। সংসার ভেঙে গেল কী থাকল তাতে তাঁর কিছু আসত যেত না। এই নিয়ে বাবার উপর মার চরম গঞ্জনা ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। বাবা কিছু বললেই বলতেন, ছেলেরা তোমার সব বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। যা লাগিয়ে গেলাম, জীবনেও তারা বেইমানি করবে না। এই করে বাবা মাকে যেন তখন আরও বেশি করে ক্ষিপ্ত করে তুলে মজা দেখতেন।

এখন আর আমার বাবা নেই। বাবার বাড়িটা আছে। আর অসংখ্য গাছপালা জঙ্গল সাফ করে পাঁচ বিঘে জমিতে হেন গাছ নেই যা লাগিয়ে যাননি। আগের ঘরবাড়িও ছন্নছাড়া। পিলু এখন আর সে পিলু নেই। দাদারে বলে সেই যে সুমার মাঠে দাঁড়িয়ে ডাক তা আর বাড়ি গেলে শোনা যায় না। পিলু পুন্টু। আমার মেজ আর ছোট। দুজন দুই মেরুর বাসিন্দা। গাছটা ওরা কেটে ফেলবে এই একটা লাইনই চিঠিতে বার বার ভেসে উঠছে।

বাড়ি পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। শরতের আকাশ নির্মল। একটু শীত শীত পড়েছে। রাস্তাটা আমার বড় চেনা। যেন কত কাল পার হয়ে আবার একই রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছি। মার চিঠির উদ্বেগের চেয়েও আমার এই নিজের কাছে বার

বার ফিরে আসার মধ্যে কেমন এক স্বস্তি থাকে। চার পাশে আগের মতো আর শস্যক্ষেত্র নেই। করাতকলটা কবেই হয়েছে। আরও সব নতুন ঘরবাড়ি। পঞ্চাননতলায় দোকানপাট, গমের কল। সবই বদলাচ্ছে। আগে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বাড়ি এবং একটা কালীমন্দির বাদে রেল লাইন পার হলে কিছুই চোখে পড়ত না। মাঝে মাঝে বড় বড় আমবাগান, বাগ্দিদের ছোট কুঁড়েঘর এবং দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ। ক্রমশ মানুষের ঘরবাড়ি উঠে জায়গাটার সেই পুরানো মাহাত্ম্য যেন একেবারেই নষ্ট করে দিয়েছে।

বাড়িতে ঢুকে অবাক। আগে রিকশা থামলেই ভাইঝিটার গলা পেতাম, ঠাকুমা রাঙাজেঠু এয়েছে। পুনুর ঘরটা রাস্তার পাশে। পুনুর ছেলেটা দৌড়ে আসত উলঙ্গ শরীরে। প্যান্ট জামা জোরজার করে পরিয়ে রাখতে হয়। আমি গেলে তার একটাই প্রশ্ন, জেঠু আমার জন্যে কি এনেছ ? সেও নেই। বৌমা বের হয়ে প্রণাম করে তার দেখাও নেই। মার সাদা ধবধবে চুল। এখনও ঋজু শরীর। বার্ধক্য এতটুকু নোয়াতে পারেনি। হাতে কিছু না কিছু থাকে। কাজ ফেলে বড় পুত্রটি যে তবে সত্যি এসেছে যেন বের হয়ে দেখা। কেবল দেখলাম একটা গরুর গাড়ি এবং সেই সুস্বাদু সাতুল্লা আমগাছটি নেই। তার কাণ্ড আগেই তুলে নেওয়া হয়েছে এখন ডালপালা কেটে গাড়িতে বোঝাই করা হচ্ছে। গাড়োয়ান এবং তার লোকজন আমাকে দেখছে বিস্ময়ের চোখে। ধনঠাকুরুনের এমন লায়েক শহুরে ছেলে তাদের বোধহয় বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। গাছটা নেই। বাবা গাছটার নিচে বসে কতদিন যজমানদের কাজ কামের লিষ্টি করে দিয়েছেন। একটা গাছ না থাকলে বাড়িটা কি শ্রীহীন হয়ে যায় এই প্রথম টের পেলাম। মার আশঙ্কা তবে ঠিক। গাছটা পুনুর সীমানার মধ্যে। বোধ হয় সে গাছটা কেটে বিক্রি করে বাবার একজন যথার্থ উত্তরাধিকার প্রমাণ করতে চেয়েছে।

বাবার করা চার ভিটায় চারটা ঘরও এখন নেই। ঠাকুরের নামে জমি আছে। জমির লোভে পিলু ঠাকুরকে নিয়ে তার বাড়িতে তুলেছে। টিনের বেড়া দিয়ে ফুল জল দেয় এবং জমি ভোগ করে। ঠাকুর নেই, ঠাকুরঘরটিও নেই। উত্তরের দিকের ঘরটা পিলু তার সীমানায় নিয়ে চলে গেছে। সুতরাং একটাই ঘর। চারপাশে শণের বারান্দা। মাটির দেওয়াল। উপরে টিনের চাল। বাবা যে তক্তপোশে শুতেন, মা এখন তাতে শোয়। লাগোয়া বারান্দায় রান্না। ঘরটার দরজা ভেজানো। ডাকলাম, মা। কোন সাড়া পেলাম না। দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। দেখি ভাইঝিটা শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বললাম, কীরে কোনো সাড়া শব্দ নেই। মা কোথায়।

চোখ মুছতে মুছতে উঠে বসল। তারপর ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলল।।

—কী হয়েছে।

ঠাকুমা রাগ করে কোথায় চলে গেছে।

বলিস কী।

সকালে উঠে দেখি নেই।

মামার বাড়িতে গেছে কী না।

না যায় নি। পিসি বলল, আপনার ওখানে হয়ত গেছে।

যেতে পারে। মা একা আমার বাড়ি যেতে পারে। আগেও গেছে। সকালের ট্রেনে যদি যায়, এখন হয়ত পৌঁছে গেছে। চিঠির জবাব দিইনি বলে ক্ষেপেও যেতে পারে। আমার মাকে সেই কবে থেকে দেখছি বড় জেদি। কিন্তু যদি না যায়।

বললাম, কী হয়েছে। হঠাৎ না বলে চলে গেল।

কাল খায়নি কিছু। সারাদিন কান্নাকাটি করেছে।

একটা গাছের জন্য মার এত মায়া আমারও কেমন চোখের জল এসে গেল। তোরা মানুষ না। পুনু তুই বুঝলি না। গাছগুলো বাবার স্মৃতি। মা আর ক'দিন। তারপরই মনে হল, পুনু তুই পারলি।

ভাইঝিটা কল থেকে জল তুলে আনছে। বাড়ি এসেই বারান্দার একটা হাতল ভাঙা চেয়ারে আমি বসি। বাবাও এখানে বসে থাকতেন সব সময়। যতবার বাড়ি এসেছি, দেখেছি তিনি খালি গায়ে বসে আছেন। পায়ে একজোড়া খড়ম। আর ফাঁক পেলেই মার নামে নালিশ। তোমার মার বড় বেশি অভাব। টাকা পয়সার দরকার সবার। তোমার চয়ে বেশি হলে তো দেবে। তোমার সংসার আছে, ছেলেপুলে মানুষ করা আছে—কত দায়। সংসারে টানাটানি পড়লেই খোঁটা দেবে, বোঝ সব তোমার কেমন সুপুত্তুর। শেষ বয়েসে একটু দুধ পর্যন্ত জোটে না। যে মা বাবাকে এত খোঁটার উপর রাখত তারই একটা গাছ কেটে ফেলায় সারাদিন কিছু খায়নি, সকালে কোথায় বের হয়ে গেল না বলে না কয়ে। আমার হাত মুখ ধোওয়ার কথা মনে থাকল না। পুনু পিলুর এখন বাড়ি থাকার কথা না। একজনের অফিস, অন্যজনের দোকান। এ ছাড়া মনে হল মা যে না বলে না কয়ে কোথায় গেল, সে জন্যও ভাবনা নেই তাদের তেমন। কোথায় আর যাবে, গেছে রাঙাদার কাছে নালিশ দিতে—এই আপ্তবাক্য সার করে বোধহয় নিশ্চিন্তে নিজেদের কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে আছে।

ডাকলাম, বৌমা?

ছোট বৌ জড়সড় হয়ে এসে দাঁড়াল।

মা কোথায় গেছে জান ?

ঘোমটার আড়াল থেকে বলল, না।

পুন্নুর ছেলেটা কেমন আমার দিকে ভয়ের চোখে তাকাচ্ছে। সে তার মার হাঁটু জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তালপাতার একটা বই করে দিয়েছে পুন্নু। ওতে অ আ ক খ লেখে। স্কুলে যায় একটা পাঁউরুটি পাবে বলে। বৌমার শাড়ি সায়াও মনে হল তালিমারা। বললাম, পুন্নুর দোকান কেমন চলছে ?

ছোট বৌ কিছু বলল না। ভাল চলছে না বলতেও বোধহয় সাহস পেল না। গত বছর পুন্নু দোকান চলছে না, কিছু নগদ টাকার দরকার এই সব অজুহাত দেখিয়ে বেশ কিছু টাকা আমার কাছ থেকে নিয়ে এসেছে। এরপরও দোকান যদি ভাল না চলে তার দায় নিতে যেন বৌমা রাজি না। এ-সব কথায় না থাকাই ভাল। বললাম, মা তোমাদের কিছু বলে গেছে ?

মা আমাদের সঙ্গে কথা বলে না।

মার এই দোষ। ক্ষেপে গেলে মাথা ঠিক রাখতে পারে না। এই পুন্নুকে নিয়েই এক সময় আমার স্ত্রীর সঙ্গে কত অশান্তি গেছে। যেখানে যখন গেছি সঙ্গে নিয়ে গেছি পুন্নুকে। পুন্নু আর আমার বয়সের তফাৎ অনেক। ওর বৌদি পুন্নুর জন্য আলাদা মাস্টার, আলাদা দুধ রেখেছে। কিন্তু যে পড়াশোনা করবে না তাকে পড়ায় কে ? সামান্য ছোটখাট অজুহাতে পুন্নুকে নিয়ে মার অশান্তি ছিল চরম। সেই পুন্নু এখন বাবার সেই দশ ক্রোশ দূর থেকে বয়ে আনা, শুধু কি বয়ে আনা, জীবনের অন্য অনেক গভীর অতল রহস্য—বলা যায় বাবার যৌবনকালের এক সঙ্গী সেই গাছ—তাকে হত্যা করেছে। বললাম, বৌমা পুন্নু এটা ঠিক কাজ করেনি।

বৌমাটি আমার পায়ে গড় হল। চোখে জল। দারিদ্র্য মানুষের কত বড় অভিশাপ টের পেলাম। আসলে পুন্নু চোখের সামনে কোনো কূলকিনারা দেখতে না পেয়েই হয়তো গাছটা বিক্রি করে টাকা নিয়েছে। ডাকলাম, এই কুন্তল, চল তোর খ্যাপা ঠাকুমাকে খুঁজতে বের হই। সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলের চোখ থেকে ভয় সরে গেল। সে ওর মাকে বলল, প্যান্ট পরিয়ে দাও মা। জেঠুর সঙ্গে যাব।

বললাম, রসগোল্লা খাবি !

হ্যাঁ খাব।

কুন্তলের হাত ধরে বের হতেই ভাইঝিটি বলল, খেয়ে বের হন।

না, দেখি আমার মা আমাদের ফেলে কোথায় গেল ! কোথায় যেতে পারে !

কিছু গাছগাছালি পেরিয়ে পিলুর বাড়ি। গাছপালার ছায়ায় আমরা দুজন কেমন ছায়াচ্ছন্ন হয়ে গেছি। কুন্তলকে বললাম, তোর ঠাকুরদা এ-সব লাগিয়ে গেছে। বলে গেছে, আমার নাতিরা বড় হলে খাবে। জাম, জামরুল, সফেদা, কাঁঠাল, নারকেল, কাগজি লেবু, বাতাবি লেবু, লিচু কী নেই যা বাবা তার সন্তান-সন্ততিদের জন্য লাগিয়ে যায় নি। বাবা বোধহয় ভেবেছিলেন, সব কিছুর ক্ষয় আছে, কেবল এই গাছগাছালির ক্ষয় নেই। না কি বাবা বুঝেছিলেন, গাছই মানুষের একমাত্র সঙ্গী। সে জীবনেও বেইমানী করতে জানে না।

পিলুর বাড়ি এসে ডাকলাম, পিলু ফিরে এয়েছে? পিলুর সেজ মেয়েটা ঘর থেকে বের হয়ে আমাকে দেখল, ভিতরে গিয়ে ওর মাকে কি বলল, তারপর ছুটে এল আমার কাছে। আমাকে প্রণাম করে বলল, জান, ঠাকুমা না তোমাদের সবার উপর রাগ করে কোথায় চলে গেছে!

আমার এখন কাজ মাকে খোঁজা। এত কাজ আমার, চিঠিটার জবাব পর্যন্ত দিইনি। নিজের স্বার্থপরতার কথা ভেবেও বড় কষ্ট হল। আমরা কেউ মানুষ না। মার কথা মনে রাখি না। নেপাল গোপালেরা পাশের সীমানায়, সেখানেও খোঁজ করা গেল। কাছাকাছি আত্মীয়স্বজন এমনকি মায়াদের বাড়ি গেলাম। মায়ার দৃঢ় ধারণা মা আমার কাছেই চলে গেছে। ফিরতি ট্রেনে যে যাব তারও উপায় নেই। রাতে ট্রেন। পরদিন সকালের ট্রেন ছাড়া যেতে পারছি না। নিজের স্বার্থপরতার কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমারও চোখে জল চলে আসছিল। আসলে মাকে আমরা আর কোথাও নিয়ে যেতে পারি না। বাড়ির গাছপালার মতো মাও এই জমিতে বাবার স্মৃতি অবলম্বন করে শেকড় চালিয়ে দিয়েছে গভীরে। সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অর্থ হচ্ছে পুত্তুর মত আর একটি গাছকে হত্যা করা।

রাস্তায় কুন্তলকে আজ পেট ভরে রসগোল্লা খাওয়ালাম। সে কেবল ঠাকুমার কথাই বলছে। ওর মা ঠাকুমার কোনো দেওয়া জিনিস খেতে দেয় না। আরও কত নালিশ মার নামে। আমি বললাম, সবই বাবা একটা বয়সে, আর একটা বয়সে এরা কেউ তোমার না। তুমি তোমার নিজের। তোমার গাছ তোমার মধ্যে বড় হচ্ছে। সে নিজের মর্জিমতো শেকড় ছড়ায়। আমরা কেউ তার হয়ে কিছু করতে পারি না।

রাত হয়ে গেল ফিরতে। ভাইঝিটা একা থাকবে ভয়ে পাশের বাড়ির একটা মেয়েকে সঙ্গে শুতে বলেছিল। সেও এসেছে। আমি আসায় তার একা থাকার ভয়টা নেই। সে ওকে বাড়ি চলে যেতে বলেছে। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে শুয়ে

আছি। দুশ্চিন্তা। কোথায় গেল আমাদের মা। আমার কাছে। তাই যেন হয়। মার জন্য এভাবে ভেতরে কতদিন যেন আমার এমন তোলপাড় হয়নি। ভাইঝিকে খাওয়াদাওয়ার পর বললাম, বারান্দায় বিছানা করে দিতে। ঘরের জানালা ছোট, কেমন এখন নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট। অভ্যাস সব। এ-ঘরেই আমার কৈশোর প্রাক যৌবন কেটেছে। এখন একটু বেশি বড় জানালা শিয়রে থাকায় নতুন এক অস্বস্তি। তবু ঘুম আসছিল না। আসবে না। মা বাড়ি না থাকলে এতবড় শূন্যতা পৃথিবীতে সৃষ্টি হয় আগে কখনও টের পাইনি।

বেশ রাত হয়েছে। গাছপালাগুলি হাওয়ায় নড়ছে। কত রকমের পাখি আসে বাড়িটাতে। বাবা বলতেন মানুষের বসবাসের জন্য চাই গাছপালা পাখি। মানুষ থাকবে, গাছপালা থাকবে না, পাখপাখালি থাকবে না সে কী করে হয়। সংসারে সবচেয়ে বড় অভাবের দিকটাতেই ছিল তাঁর আজীবন লক্ষ্য। মা শেষ বয়সে সেটা টের পেয়ে অভিমানে কোথায় যে চলে গেল।

আর এ-সময় মনে হল জ্যোৎস্নায় কাটা গাছটার গুঁড়ির পাশে কেউ বসে আছে। সারাক্ষণ মনটা মা মা করছে বলে এমন একটা দৃশ্য চোখে ভেসেও উঠতে পারে। উঠে বসলাম। সাদা ধবধবে জ্যোৎস্নায় আরও অধিক সাদা কিছু-উবু হয়ে বসে কী যেন হাতড়াচ্ছে। দৌড়ে গেলাম। দেখি মা আমার গাছটার গুঁড়ির পাশে বসে আছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মা বাড়ি ছেড়ে বেশিদূর যেতে পারেনি।

বললাম, মা আমি।

আমার মা লুটিয়ে পড়ল কাটা গাছটার গুঁড়ির পাশে। একটা কথাও বলতে পারলাম না। নিজেকে বললাম, মা তুমি বড় বৃক্ষ। দাঁড়িয়ে আছ ডালপালা মেলে। ফুল ফোটে। ফল ধরে। হাওয়ায় কে কোথায় সব বীজ উড়িয়ে নিয়ে যায়। জল পড়ে। শস্য দানার মতো তারাও মাটির নিচে শেকড় চালিয়ে দেয়। বড় দূরের হয়ে যায় সব কিছু। সারা পৃথিবী জুড়ে কত গাছপালা, ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে তারও ফুল ধরে ফল হয়। আবার ঝড়ো হাওয়ায় বীজ উড়িয়ে কোন এক সুদূরে নিয়ে যায়। আমরা তোমার সেই বীজ উড়ে গেছি।